রাজনীতিকোষ

হারুনুর রশীদ



বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। মুক্তবাজারের যুগ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগ। তথ্যবিপ্লবের যুগ। বিশ্বায়নের যুগ। জ্ঞান ও তথ্যের সর্বব্যাপী প্রবাহই এ যুগের মৌল বৈশিষ্ট্য।

এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে কোন দেশের কোন নাগরিকের পক্ষেই রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকার কোনই সুযোগ নেই। কারণ আজকের দুনিয়ায় রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ম্যাক্রো ও মাইক্রো পর্যায়ের অগ্রগতি, সিভিল সমাজ ইত্যাদি সবই পরস্পর গ্রথিত।

বস্তুতঃ, এই অনিবার্যতার পটভূমিতেই 'রাজনীতি বিশ্বকোষ' প্রকাশের বিনীত উদ্যোগ।

"রাজনীতি বিশ্বকোষ" একার্থে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দর্শন—এরই বিশ্বকোষ। এতে বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক দর্শন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে প্রায় সোয়া তেরো'শ ভুক্তি বা প্রসঙ্গের সংজ্ঞা/বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রয়াস পাওয়া হয়েছে বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্ব মুক্ত থাকার। বস্তুনিষ্ঠ থাকার। দলমতনির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক নেতাকর্মী, রাজনীতি দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র-শিক্ষক, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এবং এলিট-বুদ্ধিজীবীসহ সকল স্তরের মানুষের জ্ঞান পিপাসা মেটাতে পুস্তকটি সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

এই বিষয়ের ওপর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সম্ভবতঃ এটিই বৃহত্তম সংকলন।

প্রচ্ছদ   কাইয়ূম চৌধুরী

হারুনুর রশীদ। জন্ম ১৯৪০ সালে, বর্তমান মায়ানমারের রাজধানী ইয়াংগনের প্রায় ৬০০ মাইল উত্তরে নামেয়ো নামক শহরে। পৈতৃক নিবাস মীরসরাই, চট্টগ্রাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ও এম. এ.। ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য বিষয়ে তৎকালীন পাকিস্তান ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ডের সার্টিফিকেট কোর্সে বিশেষ কৃতিত্ব। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

কর্মজীবনে সীতাকুণ্ড কলেজ ও পাহাড়তলী কলেজের অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ভারপ্রাপ্ত সচিব, স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, সাউথ-ইস্ট জোনের সচিব, ক্রিসেন্ট গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রশাসক, ব্রডওয়ে শিপিং লাইন গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক, সেভ দি চিলড্রেন ইউ. এস. এ.-র প্রোগ্রাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইত্যাদি পদে দায়িত্ব পালন। বর্তমানে ইনফরমেশন, রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাসিসটেন্স ফর ডেভেলপমেন্ট (ইরাড)-এর এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান।

প্রকাশিত পুস্তক Odyssey of Palestine, বাংলাদেশের মৌল সমস্যা ও সমাধানের রূপরেখা। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক।

প্রকাশিতব্য পুস্তক বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম, আদি নাই অন্ত নাই, ডাক দিয়ে যাই।

ISBN 984 410 125 5

রাজনীতিকোষ

হারুনুর রশীদ

মাওলা ব্রাদার্স ।। ঢাকা

প্রকাশনার ছয় দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

সপ্তম মুদ্রণ
জুলাই ২০১৩
প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৬৮৭৭৩ ৭১৭৫২২৭
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
পাণিনি
৫৩ পাতলা খান লেন
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টার্স
১০/১ বিকে দাস রোড ঢাকা ১১০০

দাম
চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 984 410 125 5

RAJNITIKOSH by Harunur Rashid. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers, 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price Taka Four Hundred and Fifty only.

উৎসর্গ

আব্বা, মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
ও
আম্মা, বদরুন্নিসা বেগমকে
যাঁরা আমার জন্য অপরিসীম কষ্ট
ও ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন,
অথচ
যাঁদের জন্য আমি কোনোকিছুই করতে পারিনি।

প্রসঙ্গ-কথা

মানুষ রাজনৈতিক জীব। বলতে গেলে সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই রাজনীতির সূচনা। আর বর্তমান যুগে তো রাজনীতি, অর্থনীতি, উন্নয়ন, এমনকি সংস্কৃতি পর্যন্ত পরস্পর গ্রথিত ও অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে।

বর্তমান যুগ তথ্যবিপ্লবের যুগ, বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশনের যুগ। এ-যুগে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে, যে-জাতির ভাণ্ডারে যত বেশি তথ্য ও জ্ঞানের সমাহার সে জাতির বিকাশ, অগ্রগতি ও উন্নয়নের তত বেশি সুযোগ ও নিশ্চয়তা।

সকল অর্থেই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। এ-যুদ্ধের সমগ্র জাতির শুধু সামরিকীকরণই ঘটেনি, রাজনৈতিকীকরণও ঘটে গেছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশের এত বেশি মানুষ রাজনীতি নিয়ে এত বেশি কৌতূহলী কি না, তা বাস্তবিকই বলা দুষ্কর।

কিন্তু, একটা ব্যাপার আমাকে অনেক দিন থেকেই পীড়া দিত, আজও দেয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সুধীজনের সঙ্গে মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনা থেকে প্রায়শই এটা মনে হত যে, কোনো বিষয়কে সত্যিকারভাবে না জেনেই, শুধুমাত্র পূর্বনির্ধারিত ধারণা বা প্রি-কন্সিভড্ নোশান থেকে মন্তব্য, কটাক্ষ বা সমালোচনা করার প্রবণতা আমাদের অনেকেরই যেন মজ্জাগত। যেটা পছন্দ করি না, সেটা সম্পর্কে কিছু জানতেও চেষ্টা করব না, বরং না জেনেই যথেচ্ছ মন্তব্য-কটাক্ষ করে যাব–এটাই যেন আমাদের কারও কারও প্রতিজ্ঞা।

প্রায়শই লক্ষ্য করতাম, যাঁরা সমাজতন্ত্রকে অগ্রহণীয় মনে করতেন, তাঁরা সমাজতন্ত্র ও তৎসম্পর্কিত বিবিধ বিষয়ে যথেচ্ছ মন্তব্য ও কটাক্ষ করতেন এবং প্রায়শই তা করতেন সমাজতন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে কিছু না জেনেই, মৌলিক গ্রন্থাদি আদৌ না পড়েই। একইভাবে যাঁরা ইসলামকে অপছন্দ করতেন, তাঁরাও ইসলাম বা তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ঢালাও মন্তব্য-কটাক্ষ করতেন, প্রায়শই কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান বা অধ্যয়ন ব্যতিরেকেই। অন্যদিকে, একশ্রেণীর ইসলামপন্থিরাও সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, মুক্তবাজার, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে মন্তব্য-কটাক্ষ করতেন এসব বিষয় সম্পর্কে জানার বা অধ্যয়নের কোনো তোয়াক্কা না করেই। এই মানসিকতার আজও বোধহয় তেমন একটা পরিবর্তন ঘটেনি।

কোনো নীতি-আদর্শ, বিষয় বা ব্যক্তিকে অন্ধভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও অন্ধভাবে ঘৃণা-প্রত্যাখান করা কতটা র‍্যাশনাল ও সিভিল, তা গুণীজনেরাই ভালো বলতে পারবেন।

অবশ্য এটাও সত্য যে, একজন ব্যক্তির পক্ষে সব মতবাদ বা দর্শনের সব বইপুস্তক পড়ে সবকিছু জানা আদৌ কোনো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এক মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওয়ের চিন্তাধারার ওপরই তো আছে লাখ লাখ পুস্তক। পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের ওপর কত গ্রন্থ লিখিত হয়েছে, তার সংখ্যাও কারও জানা নেই। ইসলাম ও অন্যান্য বিষয়ের ওপরও আছে অগণিত বই-পুস্তক। আর বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা ও ইস্যুর তথ্য তো ছড়িয়ে আছে একেবারেই যত্রতত্র। আজকের যুগের অধিকাংশ ব্যস্ত মানুষের সুযোগ কোথায় এতসব বই-পুস্তক ও পত্রপত্রিকা অধ্যয়নের?

বস্তুত, এই পটভূমিতেই আমার মনে হয়েছিল যে, এমন একটি কোষজাতীয় গ্রন্থ থাকা দরকার, যে-গ্রন্থে আদর্শ ও মতবাদ–নির্বিশেষে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দর্শনের বিভিন্ন টার্ম, ইস্যু ও ঘটনাবলির বস্তুনিষ্ঠ সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে এবং যে-গ্রন্থ থেকে যে-কোনো ব্যক্তি রাজনীতি ও রাজনৈতিক দর্শনসম্পর্কিত যে-কোনো বিষয়ে অন্তত একটা প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে সমর্থ হবেন।

আমার জানাটা ভুল হতে পারে, তবে আমি যতদূর জানি, এরকম all-comprehensive কোনো কোষ বা অভিধান বাংলায় তো নেই-ই, ইংরেজিতেও নেই। পেঙ্গুইন Dictionary of Politics নামে যে-পুস্তকটি প্রকাশ করত, সেটা ছিল প্রধানত সাময়িক ইস্যুভিত্তিক পুস্তক। ফলে, তা প্রতিনিয়ত update করা ছিল অপরিহার্য। ১৯৬৮ সালের পর এ-পুস্তক আর বোধহয় প্রকাশিত হয়নি। মস্কোর প্রগ্রেস পাবলিশার্স ১৯৬৭ সালে প্রকাশ করে A Dictionary of philosophy. এই পুস্তকে সমাজতান্ত্রিক দর্শন, বনেদি (classical) দর্শন ও বিজ্ঞানের দর্শনের বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু, সমকালীন রাজনৈতিক ইস্যু, ঘটনা, চুক্তি, জোট ইত্যাদি বিষয় সঙ্গত কারণেই এ-পুস্তকের আওতাধীন ছিল না।

এ ছাড়াও দর্শন, রাজনীতি ও রাজনৈতিক দর্শনের ওপর ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায়ই বেশকিছু অভিধান ও কোষজাতীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বাংলাদেশে সরদার ফজলুল করিম প্রমুখ অনেকেই এ-বিষয়ে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'রাজনৈতিক অভিধান'-এর কথাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এসব অধিকাংশ পুস্তকেই কাজ করা হয়েছে নির্বাচিত অল্পকিছু বিষয় নিয়ে, অবশ্য তা করা হয়েছে তুলনামূলকভাবে ব্যাপকতর পরিসরে।

আদর্শ, মতবাদ ও ঘরানা-নির্বিশেষে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দর্শনসংক্রান্ত সব বিষয় বা ইস্যুকে সন্নিবেশিত করে একটি গ্রন্থ-রচনা বা সংকলন করা যে-কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য। তথাপি, আমি আমার সীমিত জ্ঞান, বুদ্ধি ও সুযোগ নিয়ে এ-কাজে হাত দিই ১৯৭৯-৮০ সালে। ১৯৯০-৯১ সালের দিকে কাজটি মোটামুটি শেষ হয়। অবশ্য, ছাপতে দেওয়ার আগে বিষয়সমূহকে যথাসম্ভব update করা হয় এবং শতাধিক নতুন ইস্যু সংযোজন করা হয়।

এ-গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে আমি Encyclopaedia Britannica, মস্কো থেকে প্রকাশিত A Dictionary of philsophy, পেঙ্গুইন কর্তৃক প্রকাশিত Dictionary of Politics, Dictionary of Economics ও Dictionary of Science, ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ', ফ্রাঙ্কলিক বুক প্রোগ্রামস-এর বাংলা বিশ্বকোষ, Chamber's Encyclopaedia, Popular Encyclopaedia, Nelson-এর New Age Encyclopaedia, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অসংখ্য, টেক্সট্ বই, কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি রাজনীতির অভিধান

(যার প্রথম দিকটা ছিল না বলে লেখকের নাম জানতে পারিনি) এবং অংসখ্য পুস্তক ও কোষজাতীয় গ্রন্থের সহায়তা নিই।

তবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও ইস্যুর ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি সাহায্য নিই Time, Newsweek, Asiaweek, Far Eastern Economic Review, Daliy Telegraph সহ বিভিন্ন ইংরেজি ও বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকা থেকে।

এসব পুস্তক-পুস্তিকা, কোষ-বিশ্বকোষ ও পত্রপত্রিকার কাছে আমার ঋণ অপরিসীম।

এ-গ্রন্থটির ৯০% বিষয় ১৯৮০-৯০ সালের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং প্রতিটি ইস্যু বা বিষয়ের বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত রাখতে হয়েছে বিধায় এতে নিম্নলিখিত ক্রটিবিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়

এক. অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই বাদ পড়ে গেছে ;

দুই. কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রদত্ত তথ্য বা বর্ণনায় ভুল থেকে গেছে ;

তিন. বর্ণনা / ব্যাখ্যা অপর্যাপ্ত বা ভাসা-ভাসা হয়েছে ;

চার. কোনো কোনো বিষয় / ইস্যু যথাযথভাবে update করা হয়নি।

আশা করি, পাঠক এসব ক্রটি অনিচ্ছাকৃত বিবেচনা করে ক্ষমা করবেন। এই কোষের যে-কোনো ভুল, ক্রটি, দুর্বলতা বা অপর্যাপ্ততা যাঁরা ধরিয়ে দেবেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনে অবশ্যই সচেষ্ট হব।

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে, প্রতি জোড় পৃষ্ঠার শীর্ষে প্রথম ভুক্তিটির বদলে শেষ ভুক্তিটি এবং বেজোড় পৃষ্ঠার শীর্ষে শেষ ভুক্তিটির বদলে প্রথম ভুক্তিটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আশা করি এতে পাঠকদের কোনো অসুবিধা হবে না। পরবর্তী সংস্করণে বিষয়টি নিয়মানুগ করা হবে।

আমি চেষ্টা করেছি গ্রন্থটিকে যথাসম্ভব অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে রাখতে এবং আমার নিজস্ব মতামত বা সমর্থন-প্রত্যাখ্যানের প্রভাব থেকে এটাকে মুক্ত রাখতে। তার পরও যদি কোনো ক্ষেত্রে অনবধানতাবশত আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণের কোনো প্রতিফলন ঘটে গিয়ে থাকে, তা হলে সেজন্যও আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

এ-গ্রন্থটি কপি করার ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করেছেন আমার স্ত্রী রাফিয়া হাসিনা। এটি প্রকাশ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহায়তা দিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল লতিফ।

এ-গ্রন্থটি বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করতে রাজি হন মাওলা ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী আহমেদ মাহমুদুল হক। তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও তৎপরতা ব্যতীত এ-গ্রন্থ প্রকাশ করাই সম্ভবপর হত না।

গ্রন্থটির প্রুফ দেখার ব্যাপারে সহায়তা করেছেন তরুণকুমার মহলানবীশ এবং প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন কাইয়ূম চৌধুরী।

আশা করি এ-গ্রন্থটি রাজনীতি, সমাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সাংবাদিকতা ও দর্শনের ছাত্র-শিক্ষকদের বিশেষভাবে কাজে লাগবে। কাজে লাগবে দলমত-নির্বিশেষে আমাদের শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের। যাঁরা সিভিল সার্ভিসসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেবেন, তাঁদের জন্যও গ্রন্থটি হয়তো খুবই সহায়ক হবে। সর্বোপরি, সুধীজন ও জ্ঞানপিপাসু সকল ব্যক্তির জন্যও গ্রন্থটি প্রয়োজনীয় হতে পারে বলে বিবেচনা করি।

এ-গ্রন্থের মধ্যে যদি প্রশংসনীয় কোনোকিছু থেকে থাকে, তা হলে সেটা প্রাপ্য প্রকাশকের, প্রাপ্য তাঁদের যাঁরা সহায়তা দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে প্রন্থটির রচনা ও প্রকাশনা সম্ভব করে তুলেছেন। আর এ-গ্রন্থের যা-কিছু ত্রুটি, দুর্বলতা ও ব্যর্থতা, সেটা আমারই, একান্তভাবেই আমারই।

জ্ঞান ও তথ্যের চিরন্তন অন্বেষা আমাদের আরও যুক্তিবান করুক, যোগ্যতাবান করুক, সিভিল ও র‍্যাশনাল করুক।

সবেশেষে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে জানাই অসীম কৃতজ্ঞতা।

ঢাকা
জানুয়ারি ১৯৯৯

হারুনুর রশীদ

বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

হট কেক-এর মতো প্রায়শই বিকোয় না প্রবন্ধ পুস্তক, রেফারেন্স বই ইত্যাদি, বিশেষত বাংলাদেশের বাজারের মতো সীমিত বাজারে। সেখানে এক বছরের মধ্যেই এই লেখকের মতো একজন অজ্ঞাতকুলশীল লেখকের বইয়ের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি। তবে, এজন্য লেখকের কৃতিত্বের চাইতেও বেশি কৃতিত্ব সম্ভবত প্রকাশের বিপণন দক্ষতার এবং পাঠকদের সহৃদয় গ্রহণশীলতার। এবাবদ উভয়েরই ধন্যবাদ প্রাপ্য।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, পেঙ্গুইন কর্তৃক প্রকাশিত A Dictionary of Politics শীর্ষক পুস্তকটি সম্ভবত ১৯৬৮ সালের পরে আর প্রকাশ করা হয়নি। এখন দেখা যাচ্ছে, সেই পুস্তকটির প্রকাশ ঠিকই বন্ধ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু পেঙ্গুইন গ্রুপ ভিন্ন আঙ্গিকের অপর একটি Dictionary of Politics প্রকাশ করেছে ১৯৯৩ সালে। David Robertson লিখিত এই পুস্তকটি অবশ্য ১৯৮৪ সালে প্রথম প্রকাশ করে, Europa Publications.

পেঙ্গুইন গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখিত পুস্তকটির ভুক্তির সংখ্যা ৫০৯টি। অথচ রাজনীতিকোষ-এর প্রথম সংস্করণেরই ভুক্তিসংখ্যা ছিল ১৩৪৩টি। বর্তমান সংস্করণে আরও ১১১টি ভুক্তি যোগ করা হল। ফলে এখন ভুক্তির সংখ্যা দাঁড়াল ১৪৫৪টি। তা ছাড়া কতিপয় ভুক্তি সংশোধনও করা হল। আশা করা যায় পুস্তকটি এখন অধিকতর সমৃদ্ধ ও পাঠকদের কাছে অধিকতর গ্রহণীয় হবে।

সর্বশেষে পরম করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

ঢাকা
১ জুলাই ২০০০

হারুনুর রশীদ

সূচিপত্র

।। অ ।।

অক্ষশক্তি Axis Power। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গড়ে-ওঠা জার্মানি, ইতালি ও জাপানের ঐক্যজোট। ১৯৩৬ সালে ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে স্পেন ও জার্মানি ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য সকল রাষ্ট্রই ইতালির বিরোধিতা করে। এই সময় থেকেই ইতালি ও জার্মানির ঐক্য ও সহযোগিতা আরম্ভ হয়। এই ঐক্য 'রোম-বার্লিন অক্ষশক্তি' নামে অভিহিত হয়। পরবর্তীকালে জাপানও এই জোটে যোগদান করে।

অছি পরিষদ Trusteeship Council. আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার-বঞ্চিত যে-সমস্ত জাতি বা অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জাতিসংঘের ওপর অর্পিত, সে-সমস্ত জাতি বা দেশের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং যাতে তারা যথাসম্ভব সত্বরতার সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে, তার জন্য কাজ করাই অছি পরিষদের দায়িত্ব। অছি পরিষদ জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ।

অজ্ঞেয়তাবাদ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুকে একদিন জানা যেতে পারে, এই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে অস্বীকার করার নামই হল অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnosticism)। অজ্ঞেয়তাবাদীদের মতে বহু কিছুই চিরকাল মানুষের অজ্ঞাত থেকে যাবে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী টমাস হেনরি হাক্সলি (১৮২৫-৯৫) 'অজ্ঞেয়তাবাদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করলেও গ্রিক দর্শনে এই মতবাদের সন্ধান মেলে। গ্রিক দার্শনিক পাইরো (খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৫-২৭৫) বলেন যে, 'বস্তুত, কিছুই জানার আমাদের সাধ্য নেই। সুতরাং বস্তুজগৎ নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই। খামোকা অশান্তি।' তবে অজ্ঞেয়তাবাদকে একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর প্রথম প্রয়াস পান ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬) ও ইমান্যুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)। কান্ট বলেন যে, যুক্তিমাত্রই দ্বন্দ্ব বা বিরোধিতার দ্বারা বিভক্ত। এই প্রহেলিকার কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে বুঝতে হবে যে, 'নিজ সত্তায় বস্তু (Thing in itself)' এবং 'দৃশ্য (Phenomenon)' এক নয়; 'নিজ সত্তায় বস্তু' বস্তুত অজ্ঞেয়। এভাবে অজ্ঞেয়তাবাদ বিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস পায়; যুক্তিবাদকে বর্জন করতে শেখায় এবং বস্তুর, বিশেষত সমাজের বস্তুগত নিয়মসমূহ থেকে মানুষের দৃষ্টি ও চেতনাকে ফিরিয়ে নেয়।

অতিমানব : Superman. জার্মান দার্শনিক নিতসেই প্রথম 'অতিমানব'-এর কল্পনা করেন। তাঁর মতে মানুষ নৈতিক শক্তি ও প্রাণশক্তির চরম বিকাশসাধনের মাধ্যমে অতিমানবে পরিণত হতে পারে। আত্মশক্তি বৃদ্ধি ও অগ্রগতিই হল মানুষের অতিমানব হওয়ার সাধনার পদ্ধতি ও লক্ষ্য। অনেকের মতে, এই মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই ইতালিতে ফ্যাসিবাদী বেনিটো মুসোলিনি এবং জার্মানিতে হিটলারের অভ্যুদয় ঘটে। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নিতসের দর্শনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল মানুষের চূড়ান্ত ও কল্যাণকর গঠন ও বিকাশ। ধ্বংসাত্মক বা অকল্যাণকর অতিমানব সৃষ্টি তাঁর চিন্তায় ছিল না।

অতিশুদ্ধাচারিতা অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে শতকরা একশো ভাগ সৎ গুণাবলি দাবি করার প্রবণতা। অনেকে মনে করেন যে, সমাজ পরিবর্তন বা কোনো বৃহৎ কাজের নেতৃত্বদানকারী নেতা বা কর্মীদের মধ্যে দোষ-ত্রুটির লেশমাত্রও থাকা উচিত নয়। অতিশুদ্ধাচারিতার নেতিবাচক দিক হল এই যে, দোষ-গুণ-সমন্বিত মানবসমাজে ১০০% শুদ্ধ মানুষ পাওয়া কার্যত প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া, দোষ-গুণের ব্যাপারটা অনেকটা আপেক্ষিকও বৈকী। ফলে, অতিশুদ্ধাচারীরা বৃহৎ কোনো সংগঠন গড়ে তুলতে প্রায়শই সমর্থ হন না এবং পরিণামে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আর অতিশুদ্ধাচারিতার সমালোচকরা মনে করেন যে, সর্বগুণান্বিত মানুষ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সেরূপ মানুষ পাওয়া না গেলে যাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভালো বা মহৎ কাজটি সম্পাদনের অনুকূল গুণাবলির ভাগ বেশি, তাঁদেরকেই নেতা বা কর্মী হিসেবে গ্রহণ করা যায় এবং তাঁদের ছোটখাটো দোষগুলোকে বড় করে না দেখে, সেগুলোকে ধীরে ধীরে সংশোধন করার চেষ্টা করাই বরং বিধেয়।

অদৃশ্য রফতানি Invisible Export. একটা দেশ সরাসরি পণ্য রফতানির মাধ্যমে যে-আয় করে তা হল প্রত্যক্ষ রফতানিলব্ধ আয়। কিন্তু ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম, বৈদেশিক ঋণের সুদ, বিদেশে পুঁজি বিনিয়োগ বাবদ আয়, ব্যাংক, শিপিং সার্ভিস ইত্যাদি বাবদ আয়, ট্যুরিজম বাবদ আয় প্রভৃতি পণ্য রফতানি-বহির্ভূত আয়ই হল অদৃশ্য রফতানি বাবদ আয়।

অদ্বৈতবাদ Monism. একটি মৌল পদার্থ (element) বা একটি সচেতন মূল উৎস থেকেই যাবতীয় বস্তুর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে—এই মতবাদ।

অধিবিদ্যা : Metaphysics. এই দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী বস্তু ও বস্তু সম্পর্কে ধারণা পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যাপার; ধারণা বা ভাব আসে আগে, বস্তু আসে পরে এবং ভাবের সঙ্গে বস্তু সম্পর্কহীন। Metaphysics শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'বস্তু-জগতের ঊর্ধ্বে', অর্থাৎ বাস্তব জগতের ঊর্ধ্বের জগৎ সম্পর্কে আলোচনা। অধিবিদ্যা কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। খ্রিস্টপূর্ব ৭০ সালে অ্যারিস্টটলের রচনায় দেহাতীত বস্তু অর্থাৎ যা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে, তা বোঝানোর জন্য প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

অনাক্রমণ চুক্তি Non-aggression Pact. দুই বা ততোধিক দেশ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করবে না—বরং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যাবতীয় বিরোধের নিষ্পত্তি করবে—এই মর্মে সম্পাদিত চুক্তি।

অনাস্থা প্রস্তাব Vote of No-confidence. সাধারণত কোনো আইন পরিষদের সদস্যারা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়ে যে-প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাকেই বলে অনাস্থা প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পড়লে সরকারের পতন ঘটাই নিয়ম। কোনো কোনো দেশে রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করতে হলে শুধুমাত্র সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হলেই চলে না, দুই-তৃতীয়াংশ বা তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন সংগঠনেও কমিটি বা কোনো কর্মকর্তা-বিশেষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যবস্থা থাকতে দেখা যায়।

অনুদান Grant-in-Aid. কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রাজস্ব-ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা সরকারের তরফ থেকে যে-সাহায্য প্রদান করা হয় তাকেই বলে

অনুদান। অনুরূপভাবে, ধনী দেশসমূহ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ-সংস্থাসমূহ অনুন্নত বিশ্বের সদস্যদেরও অনুদান দিয়ে থাকে।

অনুন্নত বিশ্ব : এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার যেসব দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে বিশ্বের সাধারণ অগ্রগতির স্তরের তুলনায় পিছিয়ে আছে, সেসব দেশকেই সমন্বিতভাবে অনুন্নত বিশ্ব বলে অভিহিত করা হয়। উৎপাদনযন্ত্র ও প্রক্রিয়ার বিচারে এসব দেশ পশ্চাৎপদ এবং শোষণ, দারিদ্র্য ও পরনির্ভরতা এসব দেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এসব দেশের প্রায় সবকটিই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত কোনো-না-কোনো বিদেশী শক্তির উপনিবেশ ছিল। সামাজিক-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাও এসব দেশের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এসব দেশের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান। বস্তুত, পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহ তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল সংগ্রহ এবং শিল্পোৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের বাজার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে এসব দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক অনিশ্চয়তা, প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা, শোষণ, দারিদ্র্য ও পরনির্ভরতাকে বিভিন্ন কৌশলে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস পায়। এসব দেশকে কেউ স্বল্পোন্নত দেশ (Less Developed Countries বা LDC, কেউবা উন্নয়নশীল দেশ (Developing Countries) নামে অভিহিত করেন। এই অনুন্নত দেশসমূহ 'তৃতীয় বিশ্ব'-এরও অন্তর্গত বটে, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের সব দেশের উন্নয়নের পর্যায় একইরূপ নয়। যেমন তৈলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ, ভারত, চীন, কোরিয়া ইত্যাদিকেও তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলে বিবেচনা করা হলেও, কার্যত, এসব দেশের অনেকেই সম্পদশালী এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকেও অন্যান্য দরিদ্র-অনুন্নত দেশসমূহের তুলনায় অনেক অগ্রসর। তাই অনুন্নত দেশসমূহ এবং তৃতীয় বিশ্ব হুবহু সমার্থক ব্যাপার নয়।

অনুপ্রবেশ Infiltration. কোনো দেশ বা সংগঠনের অভ্যন্তরে শত্রুপক্ষ অথবা ভিন্ন দেশ বা সংগঠনের ব্যক্তি বা চরদের গোপনভাবে ঢুকে পড়াকেই বলে অনুপ্রবেশ।

অন্তর্ভুক্তিকরণ বা গ্রাস Annexation. অন্য রাষ্ট্রের মালিকানাধীন বা কোনো রাষ্ট্রেরই মালিকানাধীন নয় এমন এলাকা জবরদখল করে নিজ এলাকাভুক্ত করে নেয়ার নামই গ্রাস। এরূপ গ্রাস বা অন্তর্ভুক্তির সময় মূল মালিক-রাষ্ট্রের কোনো অনুমতি গ্রহণ করা হয় না। এরূপ গ্রাসের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, গ্রাসকৃত এলাকাকে গ্রাসকারী রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা হয়। গ্রাস যুদ্ধকালীন সামরিক দখল বা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানাধীন অথবা অনুরূপ অন্তর্বর্তীকালীন বা মধ্যবর্তী কোনো অবস্থা নয়।

অপরাধী প্রত্যার্পণ Extradition. এর অর্থ হল কোনো ব্যক্তি যদি কোনো রাষ্ট্রে অপরাধ করে অন্য রাষ্ট্রে পালিয়ে যায়, তা হলে দ্বিতীয় রাষ্ট্র কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রথম রাষ্ট্রের হাতে হস্তান্তর। এ-ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট আন্তর্জাতিক আইন না থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যার্পণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এসব চুক্তি অনুযায়ী রাজনৈতিক অপরাধী ছাড়াও অন্যান্য মারাত্মক অপরাধীদের প্রত্যার্পণের রীতি প্রচলিত আছে।

অপারেশন ঈগল : Operation Eagle. ১৯৪০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এ-যাবৎকালীন ইতিহাসের সর্বাধিকসংখ্যক বিমানের বহর নিয়ে হিটলারের নাৎসিবাহিনী ইংল্যান্ডের ওপর আক্রমণ চালায় এবং বেপরোয়া বোমাবর্ষণ করে। এই বিমান-হামলাই ইতিহাসে

অপারেশন ঈগল নামে খ্যাত। শোনা যায়, হিটলারের বিমান বাহিনী (লেফট্ ভাফে)-র প্রধান মার্শাল গোয়েরিং স্বয়ং এই অভিযান পরিচালনা করেন। আরও শোনা যায় যে, হিটলার ১৯৪০ সালের ক্রিসমাস (২৫ ডিসেম্বর) দিবসের বৈকালিক চা বাকিংহাম প্রাসাদেই গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু কয়েক হাজার বিমানের এই আক্রমণ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, হিটলারের স্বপ্ন ভেঙে যায় এবং ফলে উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে মূর্ত হয়ে ওঠেন।

অপারেশন জোনাথন Operation Jonathon. সত্তরের দশকে তেলআবিব থেকে প্যারিসগামী এয়ার ফ্রান্সের একখানি বিমানকে পি. এল. ও. এবং পশ্চিম জার্মানির বাদের-মেইনহফ-এর সন্ত্রাসবাদীরা ২৫৬ জন যাত্রীসহ উগান্ডার এন্টেবি বিমানবন্দরে অবতরণ করায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইসরায়েলের জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ইউনিটের কমান্ডোবাহিনী অতর্কিত পালটা হামলা চালিয়ে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে বিমানদস্যুদের হত্যা করে এবং যাত্রী ও বিমানকে মুক্ত করে ফেরত নিয়ে আসে। ছিনতাই মোকাবেলার ইতিহাসে এই বিস্ময়কর ঘটনাই 'অপারেশন জোনাথন' নামে খ্যাত।

অপারেশন জ্যাকপট Operation Jackpot. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা অপারেশনসমূহের সম্মিলিত সাঙ্কেতিক নাম ছিল অপারেশন জ্যাকপট। ভারতীয় সমরবিদরাই এই নামকরণ করেছিলেন। এমনিতে জ্যাকপট শব্দটির অর্থ হচ্ছে এমন পাত্রবিশেষ যার মধ্যে সৌভাগ্য সঞ্চিত হতে থাকে।

অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম Operation Desert Storm. ১৯৯১ সালে ইরাক আকস্মিকভাবে কুয়েত দখল করে নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনীকে হটানোর জন্যে যে-সামরিক অভিযান শুরু করে, সেটারই কোড নাম ছিল অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম বা অপারশন মরুঝড়। এই অপারেশনের নামে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিন কর্তৃত্বাধীনে বহুজাতিক বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও এসব বাহিনী বহাল রাখা হয়।

অপারেশন বারবারোসা Operation Barbarossa. সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলার যে-সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তারই সাঙ্কেতিক নাম ছিল অপারেশন বারবারোসা। সম্ভবত এটাই ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও বৃহত্তম স্থলযুদ্ধ।

অপারেশন ব্লু স্টার ১৯৪৭ সাল থেকেই ভারতীয় পাঞ্জাবের শিখরা স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে আসছে। ১৯৭৩ সালের পর শিখদের চরমপন্থি নেতা জর্নাল সিং ভিন্দ্রেনওয়ালের নেতৃত্বে শিখরা 'স্বাধীন খালিস্তান'-এর জন্যে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮২ সালে ভিন্দ্রেনওয়ালে তাঁর সমর্থকদের নিয়ে শিখদের প্রধান ধর্মপীঠ অমৃতসরস্থ স্বর্ণমন্দিরে আশ্রয় নিয়ে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ১৯৮৪ সলের ৫-৭ জুন ভারতীয় সেনাবাহিনী স্বর্ণমন্দিরে অভিযান চালায় এবং প্রচণ্ড নৃশংসতার সাথে বিদ্রোহীদের দমন করে। শিখদের পবিত্র 'আকাল তখ্ত্' রক্ষা করতে গিয়ে অসংখ্য শিখ প্রাণ হারায়। স্বয়ং জর্নেল সিং ভিন্দ্রেনওয়ালেকে হত্যা করা হয়। ভারতীয়

সেনাবাহিনীর এই অভিযানেরই কোড নাম ছিল অপারেশন ব্লু স্টার। ভিন্দ্রেনওয়ালের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শিখরা ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেই গুলি করে হত্যা করে। ১৯৮৫ সালের ২৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সাথে মধ্যপন্থি শিখ নেতা সন্ত হরচাঁদ সিং লাঙ্গোয়ালের এক চুক্তি হয়। চুক্তির ২৭ দিন পর (২০.৮.৮৫) লাঙ্গোয়াল আঁততায়ীর গুলিতে নিহত হন। ফলে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে এবং স্বর্ণমন্দিরে চরমপন্থিরা পুনরায় ঘাঁটি গাড়ে। এমতাবস্থায় ৯-১৮ মে, ১৯৮৮ ভারতীয় আধাসামরিক বাহিনী পুনরায় স্বর্ণমন্দিরে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণমন্দিরকে মুক্ত করে। তবে শিখরা স্বাধীন খালিস্তানের দাবি কখনোই পরিত্যাগ করেনি।

অবচেতন Sub-conscious. মানসিক অবস্থাকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা চেতন, অচেতন ও অবচেতন। চেতনতার আওতাভুক্ত হল সেসব বিষয়, চিন্তা ও উপলব্ধি, যেগুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাধারণভাবে অবগত এবং যেগুলোর ভিত্তিতে উক্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমাদি সাধারণভাবে পরিচালিত হয়। অচেতনতার আওতাভুক্ত হল সে-সমস্ত বিষয়, চিন্তা ও উপলব্ধি, যেগুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবগত নয় এবং তার সিদ্ধান্ত ও কার্যে যেগুলোর কোনো দৃশ্যমান প্রভাব নেই। আর অবচেতনতার আওতাভুক্ত হল সে-সমস্ত বিষয়, চিন্তা ও উপলব্ধি, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মস্তিষ্ক-প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত আছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেগুলো সম্পর্কে ঐ সময় পর্যন্ত সাধারণভাবে অবগত নয়। অবচেতন বিষয়, চিন্তা ও উপলব্ধি, বিশেষ অবস্থায় চেতনতার পর্যায়ে চলে আসতে পারে। আর অবচেতন প্রেক্ষিতসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অজান্তেই তার সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে। এমতাবস্থায়, তার ঘোষিত বক্তব্য ও কার্যক্রমের তুলনায়, তার প্রকৃত কার্যক্রমকে অনেক সময়ই স্ববিরোধী মনে হতে পারে।

অবতারবাদ অনেকে মনে করেন যে, ভগবান বা সৃষ্টিকর্তা মানবকুলকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে মানুষ বা অপর কোনো জাগতিক রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। যেমন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন যে, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ আসলে মনুষ্যরূপে স্বয়ং ভগবান। খ্রিস্টানরাও যীশুর অবতারত্বে (Incarnation) বিশ্বাস করেন। মানুষ বা জাগতিক কোনো প্রাণী বা বস্তুকে ভগবানরূপে কিংবা ভগবানের ন্যায় সকল দোষ-ক্রুটি-ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে এবং সর্বজ্ঞ ও মহাক্ষমতাবান বলে বিবেচনা করাই হল অবতারবাদ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো নেতাবিশেষকে তাঁর অনুসারীরা অবতারের মতোই দোষ-ক্রুটি-ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে বলে বিবেচনা করেন, তাঁর চিন্তা ও বক্তব্যকে অভ্রান্ত বলে জ্ঞান করেন এবং তাঁকে ও তাঁর আজ্ঞাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেন, ঠিক যেমনটি করা হয় অবতারের ক্ষেত্রে। এরূপ ক্ষেত্রে, নেতা সমষ্টির প্রতিনিধি না হয়ে, সমষ্টির উর্ধ্বে এক একক পরিচালক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। অনেক সময় নেতৃত্বের ব্যক্তিকরণের নামে এরূপ অবতাররূপী নেতৃত্ব চেপে বসে। প্রথমত, এরূপ অযৌক্তিক নেতৃত্ব প্রায়শই জাতির বিপর্যয়ের কারণ হয়। দ্বিতীয়ত, এরূপ নেতৃত্ব কোনো সময়ে কোনো কারণে অপসৃত হয়ে গেলে, বিকল্প নেতৃত্বের অভাবে গোটা সাংগঠনিক বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোও ধসে পড়তে পারে। অনুন্নত বিশ্বের রাজনীতিতে এই প্রবণতা প্রায়শই লক্ষ করা যায়।

অবমূল্যায়ন, মুদ্রার Devaluation. এটা হল কোনো দেশের মুদ্রার মূল্য অন্য কোনো দেশের মুদ্রা বা মুদ্রা-ধাতু (স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি)-এর তুলনায় হ্রাস করা। কোনো দেশে লেনদেনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বিরূপ অবস্থা দেখা দিলে, রফতানিকে উৎসাহিত করা এবং আমদানিকে নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অবমূল্যায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট দেশের পণ্য বিদেশীরা কম দামে আমদানি করতে পারে: অপরদিকে বিদেশ থেকে উক্ত দেশে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেশি পড়ে। বলাবাহুল্য, অবমূল্যায়ন সমস্যার কোনো স্বাভাবিক সমাধান নয়। বারংবার অবমূল্যায়ন করা হলে, বিদেশের কাছে অবমূল্যায়নকারী দেশের মুদ্রা সম্পর্কে আস্থাহানি ঘটে। তা ছাড়া অবমূল্যায়নের ফলে অভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং আনুপাতিক হারে মানুষের আয় না বাড়লে মানুষের কষ্টও বৃদ্ধি পায়। শুধুমাত্র লেনদেনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে মৌলিক ব্যত্যয় দেখা দিলেই মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা যেতে পারে।

অবরোধ Blockade. সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ইত্যাদির সাহায্যে শত্রুপক্ষ বা শত্রুদেশকে এমনভাবে ঘিরে রাখা যাতে ঐ শত্রুপক্ষ বাইরের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র, রসদ, জ্বালানি ইত্যাদির সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। অবরোধের উদ্দেশ্য শত্রুকে দুর্বল ও দিশেহারা করে তোলা কিংবা নতিস্বীকারে বাধ্য করা।

অবস্থান ধর্মঘট এরূপ ধর্মঘটে শ্রমিকরা কারখানা বা কর্মস্থল ত্যাগ করে যাওয়ার বদলে সেখানেই অবস্থান করে। কর্মস্থল ত্যাগ করলে মালিক বা কর্তৃপক্ষ নতুন শ্রমিক নিয়োগ করে কারখানা চালাতে পারে, এই আশঙ্কাতেই শ্রমিকরা অবস্থান ধর্মঘটের কৌশল অবলম্বন করে। ১৯৩৪ সালে পোল্যান্ডের কয়লাখনির শ্রমিকেরা দাবিপূরণের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট করে এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত খনির মধ্যেই অবস্থান করে। এটাই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম অবস্থান ধর্মঘট। পরবর্তীকালে অবস্থান ধর্মঘটের কৌশল সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

অবাধ অর্থনীতি Free Economy. সমাজতান্ত্রিক বা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির বিপরীতে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বোঝানোর জন্যেই এই কথা প্রচলন করা হয়। অবাধ বা মুক্ত অর্থনীতিতে উৎপাদন ও বিপণনের ওপর মূলত রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না; ক্রেতাসাধারণের গড় চাহিদাই উৎপাদনের রকম ও পরিমাণ নির্ধারণ করে। তবে, বস্তুত বিশ্বের সকল রাষ্ট্রেরই উৎপাদন ও বিপণনের ওপর কিছু-না-কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকেই এবং বিভিন্ন দেশে, এমনকি উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহেও এখন রাষ্ট্র ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর হারে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করছে। জার্মানির সিলভিও গোসেল (১৮৬২-১৯৩০) প্রমুখ অবাধ অর্থনীতির প্রবক্তারা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক বৈকল্যের চিকিৎসার প্রধান উপায় হল নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট হারে মুদ্রামান হ্রাস করা এবং এর ফলে সৃষ্ট ফাঁক পূরণের জন্যে নয়া মুদ্রা বাজারে ছাড়া। এই ব্যবস্থায় মুদ্রার সার্কুলেশন বেড়ে যাবে, কারণ জনসাধারণ চাইবে মুদ্রামান কমার আগেই তা দিয়ে কোনো-না-কোনো দ্রব্য কিনে ফেলতে। মুদ্রার এই গতিশীলতা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গতি সৃষ্টি করবে এবং ফলে কোনো অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেবে না।

অবাধ প্রতিযোগিতা তত্ত্বগতভাবে এমন একটা পরিস্থিতি, যে-পরিস্থিতিতে উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর সরকারের কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ থাকে না, বরং সরবরাহ ও

চাহিদার শক্তিসমূহ এবং মূল্য প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন গতিতে চলতে পারে এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে গুণগত ও পরিমাণগত বিকাশলাভ করে।

অবাধ বাণিজ্য Free Trade. বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিনা বাধায় ও বিনা শুল্কে বাণিজ্য। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এই অবাধ বাণিজ্যনীতির উদ্ভব ঘটে। তখন পর্যন্ত ইউরোপীয় দেশসমূহে ব্যাবসা-বাণিজ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতিই প্রচলিত ছিল। এর বিপরীতেই দেখা দেয় অবাধ বাণিজ্যনীতি। ইংল্যান্ড প্রভৃতি যেসব দেশে পণ্য উৎপাদনব্যবস্থা বিশেষ বিকাশ লাভ করে, সেসব দেশের উদ্যোগেই অবাধ বাণিজ্যের নীতি উৎসাহিত হয়, কারণ ঐসব দেশে উৎপন্ন বিপুল পরিমাণ পণ্য তখন অন্য দেশের বাজারে বিক্রি করার প্রয়োজীয়তা দেখা দেয়। এই প্রয়োজন থেকেই অবাধ বাণিজ্যনীতির উদ্ভব ঘটে এবং ইংল্যান্ড তার নেতৃত্ব গ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী অবাধ বাণিজ্যনীতি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। এ-সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপুল শিল্পোন্নয়ন-প্রয়াস দেখা দেয়। কিন্তু ইংল্যান্ডের উন্নততর কল-কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে অসমান প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে না পারায় দুর্বলতর দেশসমূহের শিল্পোন্নয়ন-প্রয়াস প্রায়শই বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্র বিদেশী পণ্যের ওপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক ধার্য করে স্ব-স্ব দেশের শিল্পোৎপাদন অব্যাহত রাখার প্রয়াস পায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বহু দেশই উচ্চহারে শুল্ক বসিয়ে অসমান প্রতিযোগিতার কবল থেকে স্ব-স্ব দেশের শিল্পকে রক্ষা করার প্রয়াস পেয়ে আসছে।

অভিজাততন্ত্র যে-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণীরই কর্তৃত্ব বহাল থাকে সেই ব্যবস্থাকেই বলে অভিজাততন্ত্র। প্রাচীন গ্রীসে দাস-মালিকেরা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র হওয়া সত্ত্বেও, শুধুমাত্র তারাই ছিল ভোটের অধিকারী এবং প্রতিনিধিত্ব ও রাষ্ট্র-পরিচালনার একমাত্র হর্তাকর্তা। জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ জন অর্থাৎ দাসদের নাগরিক অধিকার দান তো দূরের কথা, তাদের মানুষ বলেই গণ্য করা হত না। প্রাচীন ভারতেও রাষ্ট্র পরিচালিত হত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা। বিপুলসংখ্যক বৈশ্য ও শূদ্রদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনো এখতিয়ার ছিল না।

অভিব্যক্তিবাদ Expressionism. বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিল্প ও সাহিত্যে এই ধারার উদ্ভব ঘটে। জার্মানির এফ. মার্ক, অস্ট্রিয়ার কোকোচকা, রাশিয়ার শ্যাগাল প্রমুখ ছিলেন এর প্রথম প্রবক্তা। অঙ্কনশিল্পে ভ্যানগগ, সাহিত্যে স্ট্রিন্ডবার্গ, ভাস্কর্যে ল্যামব্রাক, চলচ্চিত্রে আর. ওয়েইন, সঙ্গীতে শোনবার্গ প্রমুখ অভিব্যক্তিবাদের অনুশীলন করেন। অভিব্যক্তিবাদীদের দর্শন হল, 'আমাদের হৃদয়ই হল বিশ্বের একমাত্র প্রতিবিম্ব বাকি সব নিয়ম-কানুন অনর্থক, অগ্রহনীয়'। অভিব্যক্তিবাদীদের মতে বাস্তবে যাই-ই ঘটুক-না কেন, তাঁরা যা সৃষ্টি করেছেন এবং যেভাবে করেছেন সেটাই একমাত্র সত্য। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অভিব্যক্তিবাদীরা এমন বস্তু 'সৃষ্টি' করেন, যা প্রায়শই বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন অথবা বাস্তবের পরিবর্তিত বা অতিরঞ্জিত রূপ।

অরাজকতা Anarchy. সুপরিচালিত সরকার, শাসনব্যবস্থা, সুনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদির অনুপস্থিতিজনিত পরিস্থিতিকেই বলে অরাজকতা। অনেক সময় ব্যক্তি বা দল রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য

এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে দ্বিধা করেন না। যাঁরা এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল বা অপর কোনো গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পান তাঁদেরকে বলা হয় অরাজকতাবাদী বা Anarchist. অরাজক অবস্থায় অবশ্যম্ভাবীরূপেই আপামর জনগণ ভোগান্তির শিকার হয়।

অরাজকতাবাদ : বা নৈরাষ্ট্রবাদ বা Anarchism. গ্রীক 'এনার্কিয়া' শব্দ থেকে এর উদ্ভব। 'এনার্কিয়া' শব্দের অর্থ 'শাসনহীনতা' বা 'শাসনের অভাব'। এই মতবাদীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল প্রকার কর্তৃত্ব বা সংগঠিত নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অবসান ঘটানো ও তৎপরিবর্তে রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই মতবাদীদের মতে রাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, এমনকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসহ সকল শাসনব্যবস্থাই খারাপ ও উৎপীড়নমূলক। তাঁদের মতে সমাজে বল প্রয়োগকারী কোনো সংগঠন সশস্ত্রবাহিনী, আদালত, কারাগার, আইন-কানুন ইত্যাদিরও মোটেই প্রয়োজন নেই।

অরেঞ্জ অর্ডার Orange Order. এটি আয়ারল্যান্ডের চরমপন্থি প্রোটেস্ট্যান্ট সংগঠন। অরেঞ্জ অর্ডারের সদস্যরা প্রতি বছর পোর্টাডাউন থেকে মিছিল বের করে ড্রামক্রির একটি চার্চে যায় এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের পর ভিন্ন পথ দিয়ে ফিরে আসে। এরা আয়ারল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত।

অরোরার বিদ্রোহ : ১৯১৭ সালের ২৪ অক্টোবর রুশ নৌবাহিনীর ক্রুজার 'অরোরা'-র বলশেভিক আদর্শে অনুপ্রাণিত নৌসেনারা জাহাজটিকে পেট্রোগ্রাডস্থ শীতপ্রাসাদ-এর ঠিক সামনাসামনি, বাল্টিক সাগরে এনে নোঙর করে। ক্রেনস্কি সরকার জাহাজটিকে সরে যাওয়ার হুকুম দিলে তারা সে-হুকুম মানতে অস্বীকার করে। বস্তুত অরোরার নৌসেনাদের বিদ্রোহই ছিল রাশিয়ার সফল কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ২৫ অক্টোবর ক্রেনস্কি পলায়ন করেন এবং ২৬ অক্টোবর লালফৌজ শীতপ্রাসাদ ঘেরাও করে ভেতরে বৈঠকরত মন্ত্রিসভার সদস্যদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। এ-সময় অরোরা থেকে শীতপ্রাসাদের ওপর গোলাবর্ষণ করা হতে থাকলে ভীতসন্ত্রস্ত মন্ত্রীরা পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং পরিণামে শীত প্রাসাদের পতন ঘটে।

অর্ডার অব প্রিসেডেন্স Order of Precedence. বা মর্যাদাগত অগ্রাধিকারের তালিকা। একটা দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিমণ্ডলী, স্পিকার, পার্লামেন্ট সদস্যগণ, সচিববৃন্দ, প্রধান বিচারপতি, অন্যান্য বিচারপতি, সামরিক কর্মকর্তাগণসহ রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে কার পরে কে তার যে ক্রমিক তালিকা প্রণয়ন করা হয় সেটাকেই বলে অর্ডার অব প্রিসেডেন্স। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত, আসনগ্রহণ ও অন্যান্য আচারের ক্ষেত্রে এই অর্ডার অব প্রিসেডেন্স অনুসরণ করা হয়।

অর্থনীতি, জাতীয়ভিত্তিক National Economy. যে-অর্থনীতি জাতীয় উৎপাদন, সরবরাহ ও চাহিদার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাকে বলে জাতীয়ভিত্তিক অর্থনীতি। এরূপ অর্থনীতির ক্ষেত্রে পণ্যের বাজারদর স্থানীয় উৎপাদন বা চাহিদার ভিত্তিতে নির্ণীত হয় না, বরং জাতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক উৎপাদন, চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতেও নির্ধারিত হয়। জাতীয়ভিত্তিক অর্থনীতি সামন্তবাদ-এর পরিপন্থী। এরূপ অর্থনীতির বিকাশ স্থানিক বা সামন্তবাদী অর্থনীতির গণ্ডিকে অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয়। পুঁজির

বিকাশ, উন্নততর বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রয়োগ, জীবনধারণের উপকরণাদির পরিমাণ বৃদ্ধি, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে স্থানিক অর্থনীতি লোপ পেতে থাকে এবং জাতীয়ভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটে।

অর্থনীতি, পরিকল্পিত Planned Economy. সাধারণভাবে এর অর্থ হল রাষ্ট্র কর্তৃক পরিকল্পিত অর্থনীতি। এর চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্রই সমগ্র উৎপাদন ও বণ্টনকে নিয়ন্ত্রণ করে; এমনকি দেশের সমগ্র অর্থনীতির কোথায় কারা কাজ করবে—তাও রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটিই সমগ্র ব্যাপার নির্ধারণ করে। বস্তুত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই পরিপূর্ণ পরিকল্পিত অর্থনীতি সম্ভবপর বলে মনে করা হত, কেননা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই সমগ্র উৎপাদন, উৎপাদনের উপকরণসমূহ এবং সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শোষণমুক্ত, সুষম সমাজ-নির্মাণের লক্ষ্যে সমগ্র অর্থনীতির পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। পুঁজিবাদি দেশসমূহেও বর্তমানে ক্রমবর্ধমান হারে পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। অবাধ অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে পুঁজিবাদী সমাজেও ক্রমশ বাড়ছে রাষ্ট্রীয় খাত। রাষ্ট্রীয় খাত ছাড়াও এ-সমাজে কাঁচামাল, ঋণ, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ; উচ্চতর ট্যাক্স নির্ধারণ ইত্যাদির মাধ্যমেও ব্যক্তিগত খাতকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পাওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে বহু দেশেই আজ গড়ে উঠেছে মিশ্র ধরনের অর্থনীতি। পোল্যান্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অসকার লাঙ্গে (Oscar Lange)-র মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা সফল করে তোলার পক্ষে যে-সমস্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলোকে বিলোপ অথবা নিষ্ক্রিয় অথবা নিরপেক্ষ করে ফেলতে হবে। তবে এ-ব্যাপারে কোথায় কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের ঐতিহাসিক ও বস্তুগত অবস্থার ওপর।

অর্থনীতি, বনেদি Classical Economy. ব্রিটেনের অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো প্রমুখ অর্থনীতিবিদ যে-অর্থনীতির রূপরেখা তুলে ধরেন, সেটাই বনেদি অর্থনীতি নামে পরিচিত। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের কাজ ছিল অর্থনীতিটাকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে সামন্তবাদী বাধা ও দুর্বলতা অপসারিত হয়ে তৎকালীন নবজাত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ অবাধ হয়। বনেদি অর্থনীতিবিদরা পুঁজিবাদের স্বার্থে উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধি ও শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁরা তাঁদের তত্ত্বের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সামন্তবাদী ব্যবস্থার চেয়ে উন্নততর এবং জাতীয় ধন-ঐশ্বর্য ও জনগণের সুখসমৃদ্ধির কারক। তাঁরা আরও দেখান যে, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমই সকল ধন-ঐশ্বর্যের উৎসমূল, শ্রমই পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে এবং শ্রমই উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের মূল বস্তু। শ্রমিক যে-শ্রমের দ্বারা মূল্য সৃষ্টি করতে গিয়ে শারীরিক কষ্ট ও অভাব-অনটনজনিত নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করে, তাঁদের মতে এটা নিতান্তই সাময়িক।

অর্থনীতি, বুর্জোয়া Bourgeoise Economy. অন্য কথায়, পুঁজিবাদী অর্থনীতি। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের শ্রমের ফলে পণ্যের মূল্য সৃষ্টি হয়, কিন্তু তারা মজুরি পায় সে-মূল্যের তুলনায় অনেক কম। উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতির হিসাবে জমা হয়। এই প্রক্রিয়ায় পুঁজি বাড়তে বাড়তে আসে একচেটিয়া বা মনোপলি, আসে বহুজাতিক কর্পোরেশন, আসে নয়া সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক

দুনিয়ার মোকাবেলায় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা অনেক ক্ষেত্রে আপোসের প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন। পুঁজিবাদকে সঙ্কটের কবল থেকে বাঁচিয়ে যুগোপযোগী করার জন্যে যেসব অর্থনীতিবিদ প্রয়াস চালিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে লর্ড কেইনস (Lord Keyenes). নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পল স্যামুয়েলসন (Paul Samuelson) প্রমুখ অন্যতম। এই বিবর্তনের ফলে বনেদি বা ধ্রুপদী পুঁজিবাদ অনেকটা কল্যাণবাদী রূপ পরিগ্রহ করছে, শ্রমিকরা এখন মার্কস-লেনিন-বর্ণিত শ্রমিকের চেয়ে অনেক বেশি মজুরি পাচ্ছে, দেখা দিচ্ছে শ্রমিক-আভিজাত্য, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ারও ক্রমশ গণায়িত বা Mass-oriented হচ্ছে, শ্রমিকরাও কিনে নিচ্ছে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ব্যক্তিগত খাতের পাশাপাশি পরিপূরক হিসেবে বাড়ছে রাষ্ট্রীয় খাত। ফলে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে শ্রেণীদ্বন্দ্ব কখনোই তেমন একটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 'বুর্জোয়া', 'বুর্জোয়া অর্থনীতি' ইত্যাদি শব্দসমূহ মূলত সমাজতন্ত্রীরাই ব্যবহার করে থাকেন।

অর্থনীতি, মিশ্র : Mixed Economy. যে-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারি খাত ও ব্যক্তিগত খাত—উভয়েরই উল্লেখযোগ্য অস্তিত্ব রয়েছে, সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই বলা হয় মিশ্র অর্থনীতি। কেউ-কেউ মনে করেন যে, মিশ্র অর্থনীতি অনেকটা সমাজতন্ত্রঘেঁষা। তবে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদের মতে, চূড়ান্ত বিচারে মিশ্র অর্থনীতি আসলে পুঁজিবাদী অর্থনীতিই। সমাজতন্ত্রীদের মতে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদীরাই পুঁজিবাদের সুবিধার্থে কিছু-কিছু খাতকে (যেমন রেলপথ, জলপথ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, মৌলিক শিল্প ইত্যাদিকে) রাষ্ট্রায়ত্ত করে রাখে। এদের মতে, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পুঁজিবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রায়ত্ত খাত মূলত পুঁজিবাদী চরিত্রেরই হতে বাধ্য; এরূপ রাষ্ট্রীয়করণ কখনোই মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষা করে না। অপরদিকে সমাজতন্ত্রীদের ক্ষমতাদখলের প্রথম দিকে কিছুসংখ্যক ব্যক্তিগত খাত বলবৎ থেকে গেলেও, তার চরিত্র পুঁজিবাদী হয় না, তা হয় সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে একটি সাময়িক অবস্থামাত্র। চূড়ান্ত বিচারে 'মিশ্র অর্থনীতি' বলে আসলে কিছুই নেই।

অর্থনীতি, রাজনৈতিক Political Economy. সাধারণ অর্থে, অর্থনীতির যে-শাখা কোনো রাষ্ট্রের ধনসম্পদ, আয়, পণ্যোৎপাদনের উপকরণ ও পদ্ধতি, জাতীয় আয়ের বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে, সে শাখাকেই বলা হয় রাজনৈতিক অর্থনীতি। মার্কসীয় মতে, রাজনৈতিক অর্থনীতি হল সামাজিক উৎপাদনের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক ধারা-সম্পর্কিত বিজ্ঞান। লেনিনের মতে, এটা হল, ঐতিহাসিক বিকাশধারার একটা নির্দিষ্ট স্তরের সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিলোপ ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা। ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের মতে, ব্যাপকতর অর্থে রাজনৈতিক অর্থনীতি হল মানবসমাজের জীবিকানির্বাহের বাস্তব উপকরণসমূহের উৎপাদন ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলীসংক্রান্ত বিজ্ঞান (অ্যান্টিড্যুরিং)।

অর্থনীতি, সামাজিক Social Economy. এটা হল প্রায়োগিক অর্থনীতিরই সেই শাখা, যে-শাখা জনসংখ্যা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, গৃহসংস্থান, জাতীয় বীমা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে।

অর্থনীতি, স্থানিক Localized Economy. যে-অর্থনীতি স্থানীয় উৎপাদন, স্থানীয় চাহিদা ইত্যাদির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক উৎপাদন, চাহিদা,

সরবরাহ ইত্যাদির ভিত্তিতে নয়, সে-অর্থনীতিকেই বলে স্থানিক অর্থনীতি। স্থানিক অর্থনীতি সামন্তবাদের অন্যতম লক্ষণ। একটি সমাজের অর্থনীতি যতটুকু স্থানিক, সমাজটা ততটুকু সামন্তবাদী বলে অনেকে মনে করেন। পুঁজিবাদের ব্যাপ্তির সাথে সাথে স্থানিক অর্থনীতি লোপ পেতে শুরু করে। স্থানিক অর্থনীতির প্রধান লক্ষণ হল, স্থানীয় উৎপাদন ও চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত পণ্যমূল্য ও বাজার। বর্তমান দুনিয়ায় স্থানিক অর্থনীতি অবলুপ্তপ্রায়।

অর্থনীতিবাদ Economism. এটি সোশ্যাল ডেমোক্রেসির একটি সুবিধাবাদী ধারা। অর্থনীতিবাদীদের মতানুযায়ী, রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করবে উদার বুর্জোয়ারা, আর শ্রমিকশ্রেণী তাদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখবে তাদের বেতনবৃদ্ধি, অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাবৃদ্ধি ইত্যাদি অর্থনৈতিক আন্দোলনের গণ্ডির ভেতরে। শ্রমিক আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তাঁরা বলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বা বিপ্লবী তত্ত্বের কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁদের তত্ত্ব হল, 'রাজনীতি সর্বদাই অর্থনীতির বিশ্বস্ত অনুচরমাত্র'। মার্কসবাদীরা এ-তত্ত্বকে সংশোধনবাদী বলে অভিযুক্ত করেন। লেনিন 'ইসক্রা'য় লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'কী করতে হবে' ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনীতিবাদীদের সংশোধনবাদী চরিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পান।

অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ : রাজনৈতিক মোড়লি এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বা দখল প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে বলে অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ। অর্থনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সাধারণত নিম্নলিখিত পন্থাসমূহই গ্রহণ করা হয়ে থাকে বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ, কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা বা ক্রয়, রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ, বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠা, দুর্বল রাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহের উদ্ভব এই প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছে। দুর্বল রাষ্ট্রসমূহকে ঋণ ও অনুদানের ক্রমবর্ধমান হারের দ্বারা নির্ভরশীল করে তোলার মাধ্যমে তাদের ওপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মোড়লি চাপিয়ে দেয়ার কৌশল বর্তমানে বহুলভাবে অনুসৃত। অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ (Economic Infiltration)-এর অপর নাম অর্থনৈতিক আগ্রাসন (Economic Aggression)।

অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদ এটা অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ-এরই অপর নাম। কেউ-কেউ এ মতবাদকে কার্ল মার্কসের মতবাদ বলে প্রচার করতেন। তাই ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, "...চূড়ান্ত বিচারে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের দ্বারাই ইতিহাসের গতি নির্ধারিত হয়ে থাকে—আমি বা মার্কস এর বেশি কিছু বলিনি।"

অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ Economic Determinism. 'একটি রাষ্ট্র বা সমজের সকল কিছু; যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের ধরন, কাঠামো ও ক্রমবিকাশ এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ ও বিবর্তন মূলত নির্ভর করে ঐ রাষ্ট্র বা সমাজে অবস্থিত অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ (যেমন উৎপাদনের উপায়সমূহ, উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়ব্যবস্থা ইত্যাদি)-এর ওপর'—এই মতবাদকেই বলে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ UN Economic and Social Council. জাতিসংঘের এই পরিষদের কাজ হল বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র, নিপীড়িত ও পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন প্রকার আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। এই পরিষদ দারিদ্র্য দূরীকরণে অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমও পরিচালনা করে। বর্তমানে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত উনিশটি সংস্থা রয়েছে। যথা ১. আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি (IAEA), ২. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), ৩. খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), ৪. জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), ৫. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), ৬. আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক বা বিশ্বব্যাংক (IBRD বা World Bank), ৭. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA), ৮. আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (IFC), ৯. আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), ১০. আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO), ১১. বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU), ১২. আন্তর্জাতিক টেলিফোন ইউনিয়ন (ITU), ১৩. বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO), ১৪. আন্তঃ সরকারি নৌ-পরামর্শ সংস্থা (IMCO), ১৫. শুল্ক ও বাণিজ্যসংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি (GATT), ১৬. জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু জরুরি তহবিল (UNICEF), ১৭. বাস্তুহারা সম্পর্কিত জাতিসংঘ হাই কমিশনারের দফতর (UNHCR) ১৮. কারিগরি সহায়তা প্রশাসন (TAA) এবং এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP)।

অলিগার্কি Oligarchy. ব্যাপক জনগণের বদলে মুষ্টিমেয়সংখ্যক ব্যক্তির হাতে সর্বময় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনকে বলে অলিগার্কি। এরূপ ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয়সংখ্যক ব্যক্তি বা পরিবারের কায়েমি স্বার্থেই মূলত রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ বৌদ্ধ ধর্মমতে মুক্তি বা মোক্ষলাভের আটটি পথ। যথা ১. সৎ বিশ্বাস: ২. সৎ চিন্তা; ৩. সৎ বাক্য; ৪. সৎ কর্ম; ৫. সৎ উপার্জন; ৬. সৎ চেষ্টা; ৭. সৎ স্মৃতি এবং ৮. সৎ ধ্যান। এই আটটি পথ বা মার্গই অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে অভিহিত।

অসহযোগ আন্দোলন : Non-cooperation Movement. এই আন্দোলনের প্রবক্তা মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি ব্রিটিশ আইন ও প্রশাসনকে বর্জন করার নির্দেশ দেন এবং ভারতবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ১. ইংরেজ-প্রদত্ত সকল খেতাব বর্জন করো; ২. সকল সরকারি অনুষ্ঠান বর্জন করো; ৩. স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষায়তন পরিহার করো; ৪. আইন-আদালত বর্জন করো; ৫. আইনসভা বর্জন করো এবং ৬. ট্যাক্স ও খাজনাপ্রদান বন্ধ করো। এই আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে হাজার হাজার ছাত্র স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে এবং হিন্দুরা তো বটেই, বিপুলসংখ্যক মুসলমানও সরকারি চাকরি ত্যাগ করে। আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে গান্ধীজি অকস্মাৎ আন্দোলন হিংস্র হচ্ছে এই যুক্তিতে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। বস্তুত, গান্ধীজি শান্তিভঙ্গ না করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন বিধায় তিনি সর্বদাই অসহযোগের কর্মসূচির সঙ্গে শান্তিভঙ্গ না করার ব্যাপারটিকে জুড়ে দিতেন। এজন্যে গান্ধীজির আন্দোলন-প্রক্রিয়ার নাম ছিল শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন (Non-cooperation Nonviolence Movement)। খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আন্দোলন একপর্যায়ে তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

অসাম্প্রদায়িকতা Non-communalism. সাম্প্রদায়িক বা Communal বলা হয় তাদের, যারা সমগ্র সমাজের বদলে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উগ্র আনুগত্যসম্পন্ন (Having strong allegiance to one's ethnic group, rather than to society as a whole)। এখানে সম্প্রদায় বলতে ধর্মীয় সম্প্রদায়, নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায় বা ভাষাভিত্তিক সম্প্রদায়, যে-কোনোটি হতে পারে। অতএব, অসাম্প্রদায়িকতা হল অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি ও সহনশীল ও উদার হওয়া। বস্তুত, সাম্প্রদায়িকতা ও অসাম্প্রদায়িকতা শব্দদ্বয় প্রধানত ধর্মীয় প্রশ্নেই অধিক ব্যবহৃত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে অসাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য এই যে, অনেকের মতে ধর্মনিরপেক্ষতা বস্তুত ধর্মহীনতার সমার্থক; কিন্তু অসাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে নিজের ধর্ম বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত থেকেই অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ও সহনশীল হওয়া।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, চট্টগ্রামের ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবীরা (যাঁরা ছিলেন আসলে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র উইং 'অনুশীলন সমিতি'-র সদস্য) চট্টগ্রামস্থ পুলিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস দখল করে নেন এবং চট্টগ্রামে ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাকের স্থলে স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়িয়ে দেন। ২২ এপ্রিল তারিখে বিপ্লবীরা নিকটবর্তী জালালাবাদ পাহাড়ে সরকারি ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস ও সুরমা ভ্যালী রাইফেলস-এর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হন এবং এতে ১২ জন বিপ্লবী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করেন। ৬ মে কালারপুলের যুদ্ধে প্রাণ দেন আরও ৪ জন বিপ্লবী। পয়লা সেপ্টেম্বর চন্দননগর সংঘর্ষে আরও একজন প্রাণ দেন। ১৯৩২ সালের ১৩ জুন ধলঘাটের যুদ্ধে প্রাণ দেন বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নির্মল সেনসহ দুজন। ২৪ সেপ্টেম্বর তরুণ নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার পাহাড়তলীস্থ ইউরোপীয় ক্লাবে হামলা চালানোর পর গ্রেফতার ও অসম্মান এড়ানোর উদ্দেশ্যে পটাশিয়াম সায়ানাইড পান করে ঘটনাস্থলেই আত্মহত্যা করেন। ১৮ মে গহিরা সংঘর্ষে আরও ৩ জন বিপ্লবীর প্রাণহানি ঘটে। ১৯৩৪ সালের ৭ জানুয়ারি ব্রিটিশদের ক্রিকেট খেলার মাঠে সম্মুখযুদ্ধে দুজন বিপ্লবী মারা যান। ১৯৩৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা সূর্য সেন (মাস্টারদা) ধরা পড়েন এবং স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের রায় মোতাবেক ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলে সূর্য সেন (মাস্টারদা) ও ঃতারকেশ্বর দস্তিদার (ফুটুদা)-এর ফাঁসি হয়। তাঁদের মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দেয়া হয়। এই বিদ্রোহের অন্যান্য প্রধান নেতা ছিলেন অনন্ত সেন, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, কল্পনা দত্ত প্রমুখ। ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষের আর কোথাও বেসামরিক ব্যক্তিদের এরকম বিদ্রোহ আর সংঘটিত হয়নি। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী তো দূরের কথা, এমনকি সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়েও এই বিদ্রোহের সমর্থনে তেমন কোনো কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত না হওয়ায়, ব্রিটিশদের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভবপর হয়।

অহং Ego. অর্থাৎ আমিত্ব। নিজের সত্তা বা অস্তিত্বকেই মুখ্য বিবেচনা করে আত্মজাহিরেরই নাম হল অহং।

অহংবাদ Egoism. অর্থাৎ নিজের সত্তা বা অস্তিত্ব ব্যতীত অন্যকিছুকে স্বীকার না করা। যেসব মতবাদ ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের প্রেরণা যুগিয়েছিল, অহংবাদ তার মধ্যে অন্যতম; কেননা এই মতবাদ সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, নিপীড়ন ও যথেচ্ছাচারের তীব্র বিরোধিতা করত। অহংবাদের অনুসারীদের বলা হয় অহংবাদী (Egoist বা

Egocentric)। রাজনীতি ছাড়াও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অহংবাদীদের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

অহিংসা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধই সর্বপ্রথম অহিংস নীতি বা অহিংসাবাদ প্রচার করেন। মহাত্মা গান্ধী এই নীতিকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করেন। অহিংসাবাদ সন্ত্রাসবাদের বিপরীত। গান্ধীজি মনে করতেন যে, যা হিংসার দ্বারা অর্জিত হয় তা হিংসার মাধ্যমেই ধ্বংস হতে বাধ্য। আর যা অহিংসার মাধ্যমে লব্ধ, তা স্থায়ী হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর মতে গণতন্ত্র হল 'অবিকৃত অহিংসার শাসন'। তিনি আরও বলতেন যে, যতদিন পর্যন্ত অহিংসাকে একটি জীবন্ত শক্তি হিসাবে স্বীকার করা না যাবে, ততদিন গণতন্ত্র বহুদূরের স্বপ্ন হয়েই থাকবে। তাঁর মতে, কোনো সরকারের পক্ষেই সম্পূর্ণ অহিংস হওয়া সম্ভবপর না হলেও, 'সেই সরকারই সর্বশ্রেষ্ঠ, যে-সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে'।

অ্যাকিনো হত্যাকাণ্ড ১৯৮৩ সালের ২১ আগস্ট ফিলিপিনসের বিরোধীদলীয় নেতা বেনিগনো অ্যাকিনো (নিনয়)-কে জেনারেল ভার-এর নির্দেশে ভাড়াটে ঘাতক রোল্যান্ডো গলম্যানকে দিয়ে হত্যা করানো হয়। বস্তুত, প্রেসিডেন্ট মার্কোসের রুদ্ররোষ থেকে বাঁচার জন্যে অ্যাকিনো দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন এবং মার্কোসের তরফ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে সেদিনই তিনি ফিলিপিনসে ফিরে এসেছিলেন। বিমান থেকে নেমে সিকিউরিটি ভ্যানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়েই গলম্যান ৩৫৭ ম্যাগনাম রিভলবার দিয়ে গুলি করে অ্যাকিনোকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে মার্কোসের চক্রান্ত আছে বলে সন্দেহ করা হয় এবং ফলে মার্কোসের পায়ের নিচ থেকে মাটি দ্রুত সরে যায়। পরবর্তী নির্বাচনে অ্যাকিনোর বিধবা পত্নী কোরাজন অ্যাকিনো বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং মার্কোস সপরিবারে বিদেশে পালিয়ে যান।

অ্যাটম বোমা Atom Bomb. পারমাণবিক বিকিরণভিত্তিক প্রচণ্ড ধ্বংসক্ষমতাসম্পন্ন বোমা। ১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে এর প্রথম সাফল্যজনক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ওই বছরের ২৫ জুলাই পোটসডাম সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল সাব্যস্ত করেন যে, জাপানের কাছে অবিলম্বে এক চরমপত্র প্রদান করা হবে এবং জাপান তা মেনে না নিলে জাপানের ওপরই অ্যাটম বোমা বর্ষণ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৬ আগস্ট ভোর ৮-১৫ মিনিটে বাস্তবিকই জাপানের হিরোশিমা নগরীর ওপর অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ হয়, যার ফলে প্রায় দুই মিলিয়ন ডিগ্রি তাপের সৃষ্টি হয় এবং প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হয় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় নতুবা মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়। হিরোশিমা নগরীর শিল্প যাদুঘরের দালানটির কাঠামো ছাড়া শহরটির বাদবাকি সমস্ত দালানকোঠা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ৯ জুলাই জাপানের অপর নগরী নাগাসাকির ওপর দ্বিতীয় অ্যাটম বোমা বর্ষিত হয় এবং একই কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মানব-ইতিহাসের এই বৃহত্তম হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র সভ্যতা কেঁপে ওঠে। ১৪ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। আণবিক বিকিরণের ফলে ঘটনাস্থলে মৃতেরা ছাড়াও লক্ষ লক্ষ মানুষ তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয় এবং পরবর্তী কালে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, ভারত ও পাকিস্তান দৃশ্যতই আণবিক বোমার

অধিকারী। এ ছাড়া উত্তর কোরিয়া, জাপান, ইরান, ইসরায়েল ও কাজাকস্তানের কাছেও আণবিক বোমা থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করে।

অ্যাটলি, ক্লিমেন্ট রিচার্ড জন্ম ৩ জানুয়ারি, ১৮৮৩। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ব্রিটিশ লেবার পার্টির পার্লামেন্টারি নেতা। বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি ছিলেন অনেকটা সমাজতন্ত্রী। ১৯২২ সালে তিনি হাউস অব কমন্সের সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড-এর ব্যক্তিগত সচিবের দায়িত্বসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এবং তাঁর দল লেবার পার্টির উদার নীতির ফলশ্রুতিতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত উপমহাদেশসহ ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ছিলেন উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী।

অ্যানথ্রোপয়েড পরিবার বোঝার সুবিধার্থে জীববিজ্ঞানীরা শারীরিক সাদৃশ্যসম্পন্ন বিভিন্ন প্রাণীকে এক-একটি পরিবার বা ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত করেন। যেমন, বিড়াল বা ক্যাট পরিবারে রয়েছে বিড়াল, বাঘ, সিংহ প্রমুখ প্রাণী। আবার কুকুর বা ডগ পরিবারে রয়েছে কুকুর, হায়েনা, শিয়াল প্রভৃতি। অনুরূপভাবে অ্যানথ্রোপয়েড (Anthropoid) বা মানুষ (Man) পরিবারে রয়েছে পাঁচজন সদস্য, যথা, মানুষ, গরিলা, ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জি ও গিবন। কারণ, এদের শারীরিক গঠনের মধ্যে সাযুজ্য রয়েছে। লক্ষণীয় যে, বানর, হনুমান ইত্যাদি আদৌ এ-পরিবারের সদস্য নয়। অথচ অনেকে অজ্ঞতাবশত মনে করে থাকেন যে, ডারউইন প্রমুখ বিজ্ঞানী বানরকে মানুষের গোত্রভুক্ত করেছেন এবং মানুষের পূর্বপুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

অ্যানোলা গে : যে-বিমানটিতে করে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমায় বিস্ফোরণের জন্যে অ্যাটম বোমাটি বহন করে নেয়া হয়েছিল, সেই বিমানটিরই নাম ছিল 'অ্যানোলা গে' (Annola Gay)। দুটি বি-৫২ বিমান অ্যানোলা গে-কে এসকর্ট করে নিয়ে যায়। অ্যানোলা গে ৩১,৬০০ ফুট উচ্চতায় উড়ে গিয়েছিল এবং এর পাইলট ছিলেন ২৭ বছর বয়স্ক কর্নেল পল টিবেটস। পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে তাঁর দ্বারা কি ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছে, তখন পল টিবেটস উন্মাদ হয়ে যান।

অ্যান্টি কমিনটার্ন প্যাক্ট কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল বা কমিনটার্নের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালের ২৫ নভেম্বর জার্মানি ও জাপানের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৩৭ সালের ৬ নভেম্বর ইতালি এবং এর পরবর্তীতে আরও কতিপয় রাষ্ট্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়।

অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স উন্নতির অবস্থা থেকে পতন। যেমন, একটি আন্দোলন বা ঘটনাপ্রবাহ বিকাশ লাভ করতে করতে, এক পর্যায়ে তা যদি হঠাৎ অবনতি বা ধ্বংসের দিকে চলে যায়, তা হলে তাকে বলে অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স (Anti-Climax)। ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, এমনকি নাটকেও অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স-এর সাক্ষাৎ ঘটে।

অ্যান্টি-ড্যুরিং Anti-Duhring. পেটি বুর্জোয়া তাত্ত্বিক ইউজেন ড্যুরিং-এর মতবাদের বিরুদ্ধে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস এই পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকের রয়েছে তিনটি উপাদান, যথা ১. দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ; ২. রাজনৈতিক অর্থনীতি

এবং ৩. বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের অবশ্যম্ভাবিতার দিক তুলে ধরেন। পুস্তকটির প্রথমাংশে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে ডারউইনের তত্ত্ব, কান্ট-এর প্রতিপাদ্য, নৈতিকতা, তর্কবিদ্যা ইত্যাদির বিচার করা হয়। দ্বিতীয়াংশে ড্যুরিং-এর মতবাদ-খণ্ডনের পাশাপাশি পণ্য ও মূল্য, উদ্বৃত্ত মূল্য, পুঁজি, ভূমি-খাজনা ইত্যাদি সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদের বিশ্লেষণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি, সমাজের শ্রেণীবিভক্তি এবং বিপ্লবে বলপ্রয়োগের প্রগতিশীল ভূমিকার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। তৃতীয়াংশে তুলে ধরা হয়, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব ও ইতিহাস, কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের স্বরূপ, সমাজকে সাম্যবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়া, রাষ্ট্র, পরিবার, শহর ও গ্রামের মধ্যেকার বৈষম্য দূরীকরণের প্রক্রিয়া, মানসিক ও শারীরিক শ্রমের বৈষম্যের অবসান ইত্যাদি বিষয়। লেনিনের মতে, 'অ্যান্টি-ড্যুরিং দর্শন, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ব্যাখ্যা প্রদান করেছে, এটি একটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ, শিক্ষামূলক বিস্ময়কর গ্রন্থ'।

অ্যান্টি-থিসিস কোনো থিসিস বা প্রতিপাদ্যের বিপরীত যুক্তিরূপে উপস্থাপিত কোনো বিষয় বা প্রবন্ধই হল অ্যান্টি-থিসিস। কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, তার গতিধারা, সংগঠন ও জনগণের করণীয় সম্পর্কে কোনো উপস্থাপিত বিষয় বা প্রবন্ধের বিপরীত বিষয় বা প্রবন্ধই হল রাজনীতির ক্ষেত্রে অ্যান্টি-থিসিস (Anti-thesis)। অ্যান্টি-থিসিস, বিপরীতক্রমে থিসিসও বটে। অর্থাৎ, তার বিপরীত যুক্তিসংবলিত বিষয় বা প্রবন্ধের তুলনায় সেটিই থিসিস। থিসিস ও অ্যান্টি-থিসিসের দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের ফলেই সিন্থেসিস (Synthesis) বা সংশ্লেষণ ঘটে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও থিসিস, অ্যান্টি-থিসিস ও সিন্থেসিস-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

অ্যান্টিমাইন মুভমেন্ট Anti-Mine Movement. বা মাইনবিরোধী আন্দোলন। মাইন হল একপ্রকার বিস্ফোরক, যা জাহাজ-চলাচলের পথে অথবা মানুষ ও যানবাহন-চলাচলের পথে পেতে রাখা হয় এবং মাইনের সঙ্গে সামান্য সংঘর্ষ বা স্পর্শমাত্রই তা বিস্ফোরিত হয়ে বিপর্যয় ঘটায়। মাইন মূলত শত্রুপক্ষের জাহাজ, যানবাহন, ট্যাঙ্ক, সৈন্যবাহিনী ইত্যাদির ক্ষতিসাধনের জন্যে পাতা হলেও এর দ্বারা সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ২৭ কোটি স্থলমাইন পাতা আছে এবং এর সংস্পর্শে এসে প্রতিবছর হতাহত হচ্ছে অন্তত ৩০ হাজার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। স্থল মাইন প্রধানত তিন প্রকার। যথা : ব্লাস্ট মাইন, ফ্রাগমেন্টেশন মাইন ও বাউন্ডিং-ফ্র্যাগমেন্টেশন মাইন। প্রতি স্থলমাইন পাতার খরচসহ দাম পড়ে মাত্র ৩ ডলার; কিন্তু তা নিষ্ক্রিয় করতে খরচ পড়ে ১০০০ ডলার। এ. এফ. পি.-এর খবরে প্রকাশ, সকল নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে অস্ত্রব্যবসায়ীরা প্রতিবছর লাখ লাখ পীস মাইন তাদের ক্রেতাদের সরবরাহ করে। স্বভাবতই এই অমানবিক কাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছে আন্দোলন। ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গে অনুষ্ঠিত হয় ৪০ জাতি কাউন্সিল অব ইউরোপের শীর্ষ সম্মেলন। এতে ২১টি দেশের প্রেসিডেন্ট ও ১৯টি দেশের প্রধানমন্ত্রী যোগ দেন। এই সম্মেলনে ফরাসি প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক ভূমিমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ইতিপূর্বে অ্যান্টি-পার্সোনাল মাইন নিয়ন্ত্রণের জন্যে ৫৩ জাতির এক চুক্তি

স্বাক্ষরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক ভূমিমাইনবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী ও সমন্বয়কারী জোডি উইলিয়ামস ১৯৯৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ব্রিটেনের সাবেক প্রিন্সেস অব ওয়েলস প্রয়াত প্রিন্সেস ডায়ানাও ছিলেন অ্যান্টি-পার্সোনাল মাইন বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে জর্দানের রানি নূরও অ্যান্টি-মাইন আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

অ্যান্টি ট্রাস্ট মামলা কমপিউটারজগতের একচ্ছত্র অধিপতি, মাইক্রোসফটের মালিক, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী মার্কিন নাগরিক বিল গেট্সের বিরুদ্ধে এই মর্মে মামলা দায়ের হয় যে, তিনি কমপিউটারজগতে একচেটিয়াত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিযোগীদের বিভিন্ন কৌশলে প্রায় নির্মূল করে দিয়েছেন। আরও অভিযোগ করা হয় যে, নেটস্কেপকে হটিয়ে মাইক্রোসফটের ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ওয়েব ব্রাউজকে একচ্ছত্র করার জন্য বিল গেট্স্ মরিয়া হয়ে ওঠেন এবং দুটি জনপ্রিয় সাইটের অপমৃত্যু ঘটান। বিল গেট্স্ এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, মাইক্রোসফট আপন নীতি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে, মাইক্রোসফটের উন্নততর প্রযুক্তি ও আবিষ্কারের ফলে মুক্তবাজারে কেউ টিকতে না পারলে তার জন্য মাইক্রোসফট বা তার মালিককে দায়ী করা সমীচীন নয়।

অ্যান্টি-সেমিটিসিজম বা ইহুদি বিরুদ্ধবাদ (Anti-Semiticism). ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই কোনো-না-কোনো সময়ে ইহুদি বিরুদ্ধবাদের উদ্ভব ঘটেছে। এটা হয়েছে কখনো অর্থনৈতিক, কখনো ধর্মীয় এবং কখনো জাতিগত বিদ্বেষ থেকে। ১৮৭০-এর দশকে একদল জার্মান লেখক জার্মানিদের আর্য ও ইহুদিদের নিকৃষ্ট জাতি বলে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করেন। ১৮৭১-৭৩ সালে জার্মানিস্থ ইহুদি ব্যবসায়ীরা মোটা অঙ্কের মুনাফা অর্জন করলে এই বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে ইহুদিবিরোধী আন্দোলন অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও জার্মানিতে দ্রুত দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ৯০-এর দশকেই তা ড্রেফাস মামলা ও পানামা খাল কেলেঙ্কারির পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৮১ সালে রাশিয়ায় ইহুদি-বিরুদ্ধবাদ প্রবল রক্তক্ষয়ী রূপ নেয় এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। ১৮৮২ সালের মে মাসে যে-ইহুদিবিরোধী আইন পাশ হয়, তা ৩০ বছর যাবৎ বলবৎ থাকে এবং এ-সময়ের মধ্যে বিপুলসংখ্যক ইহুদি যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়। ১৯০৫-৯ সালে কৃষ্ণ শত বা ব্ল্যাক হান্ড্রেডরা আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার ইহুদিকে হত্যা করে। রুমানিয়ায় এবং দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীতেও ইহুদি বিরুদ্ধবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। হিটলার জার্মানিতে ক্ষতিকর সবকিছুর জন্য ইহুদিদের দায়ী করেন এবং ১৯৩৩ সাল থেকে "সকল গুরুত্বপূণর্ণ পদ থেকে ইহুদি খেদাও" অভিযান শুরু করেন। বহু ইহুদিকে এ-সময় নির্বাসিত করা হয়। হিটলার, 'আর্যরাই আধিপত্যকারী জাতি' এই তত্ত্বের বিকাশে ব্রতী হন (১৯০০ সালের দিকে এই তত্ত্ব হাজির করছিলেন এইচ. এস. চেম্বারলেন নামক জনৈক ব্রিটিশ, যিনি পরবর্তীকালে জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন)। ১৯৩৫ সালে নুরেমবার্গ আইন পাশ করার মাধ্যমে নাৎসিরা আর্যতত্ত্বকে আইনসংগত করে নেয়, ইহুদিদের নাগরিক অধিকার বাতিল করে দেয় এবং কোনো জার্মান-এর সঙ্গে ইহুদিদের বৈবাহিক সম্পর্কও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৩৮ সালে অপর এক আইনের বলে ইহুদিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে, ব্যাপকভাবে ইহুদিনিধনযজ্ঞ চালু করা হয়। ১৯৩৯-১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ে নাৎসিরা প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে (বিশ্বের মোট ইহুদি জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে) হত্যা করে বলে ইহুদিরা অভিযোগ করে।

অ্যাপার্টহিড Apartheid. আফ্রিকান এই শব্দটির অভিধানগত অর্থ হল আলাদাকরণ বা আলাদা সত্তা। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তথাকার জাতীয় পার্টি বলে কথিত শ্বেতাঙ্গদের দল এই নীতি গ্রহণ করে। বস্তুত, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য নীতি চালু হয়; কিন্তু এই 'জাতীয় দল' ক্ষমতায় এসে এমন কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যা সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের (যারা মোট জনসংখ্যার ৭৯%) কার্যত অনাগরিক ও অস্পৃশ্যে পরিণত করে। শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বর্ণগত বৈষম্য অক্ষুণ্ন রাখার মনোবৃত্তি থেকেই বর্ণবৈষম্যবাদের জন্ম। ১৯৫৩ সালে আইন পাশ করা হয় যে, অশ্বেতাঙ্গরা যদি কোনো ধর্মঘটে যোগদান করে বা ধর্মঘটের উসকানি দেয়, তবে তা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে পরিগণিত হবে। অশ্বেতাঙ্গদের যাতায়াত, ঘরবাড়ি নির্মাণ, বিয়েশাদি ও রাজনীতির অধিকার ইত্যাদিকে আগেই আইন করে খর্ব করে দেয়া হয়েছিল। ১৯৫২ সালে জাতিসংঘে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথম বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট তৈরির জন্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব ড. রাল্‌ফ্ বুঁশেসহ তিন সদস্যের একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এঁদেরকে উক্ত দেশে প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করে। বলাবাহুল্য, প্রবল আন্দোলনের মুখে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কৃষ্ণাঙ্গদের কিছু অধিকার প্রদান করতে বাধ্য হলেও, বর্ণবাদিতা বা বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ দেশেও কমবেশি (কোথাও আইনগত ভিত্তিতে, কোথাও সামাজিকভাবে) বর্ণবাদ বা বর্ণবৈষম্য চালু আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অ্যাপার্টহিডবিরোধী মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম নেতা ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা ও তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী উইনি ম্যান্ডেলা। বর্ণবৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাফল্যে ও নেলসন ম্যান্ডেলার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাংবিধানিকভাবেই অ্যাপার্টহিডের অবসান ঘটে।

অ্যাফ্লুয়্যান্ট সোসাইটি Affluent Society বা প্রাচুর্যের সমাজ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সুউচ্চ জীবনমানকে বোঝানোর জন্য 'অ্যাফ্লুয়্যান্ট সোসাইটি' টার্মটি ব্যবহার করা হয়। অধ্যাপক কেনেথ গলব্রেথ রচিত 'অ্যাফ্লুয়্যান্ট সোসাইটি' নামক পুস্তক থেকেই একথার প্রসিদ্ধি। আপামর জনগণের প্রকৃত আয়ের ব্যাপক বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নির্মূলীকরণের প্রক্রিয়ায় এমন একটা পর্যায় আসে, যখন প্রায় সকল নাগরিকের কাছেই মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পরও উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে যায়, যা দিয়ে অন্যান্য সামগ্রী, বিশেষত বিলাসসামগ্রীও ক্রয় করা যায়। এমতাবস্থায় উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টির জন্য বিপুল বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই পর্যায়ে উৎপাদনের মৌল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় জনগণের কর্মসংস্থান—মৌলিক চাহিদাপূরণ নয়। অধ্যাপক গলব্রেথের মতে, এর ভালো দিক হল এই যে, চাহিদার ওপর উৎপাদনের নির্ভরশীলতা কমে যাওয়ার দরুন উৎপাদনের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়।

অ্যাবসল্যুট রেন্ট ডিফারেন্সিয়াল রেন্ট-এর মতো অ্যাবসল্যুট রেন্ট (Absolute Rent)-ও পুঁজিবাদের অন্যতম অব্যর্থ সূচক। ধরা যাক, দুজন কৃষকের দুটি জমি সমপরিমাণ। কিন্তু প্রথমটি কম উর্বর, দ্বিতীয়টি বেশি উর্বর। এদের প্রত্যেকে স্ব-স্ব জমিতে, ধরা যাক, ২০০ টাকা পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি বিনিয়োগ করল। প্রথমজনের ফসল হল ৩ মণ, দ্বিতীয়জনের ৪ মণ। বলাবাহুল্য, বাজারদর নির্ধারিত হয় সর্বোচ্চ

উৎপাদনখরচের ভিত্তিতে। যেহেতু, প্রথমজনের খরচ পড়েছে মণপ্রতি প্রায় ৬৭ টাকা এবং দ্বিতীয়জনের মণপ্রতি ৫০ টাকা, সেহেতু ফসলের বাজারমূল্য মণপ্রতি ৬৭ টাকার কম হতে পারে না। ধরা যাক, কিঞ্চিৎ লাভসহ ফসলের বাজারদর নির্ধারিত হল মণপ্রতি ৭০ টাকা। তা হলে প্রথম কৃষকের লাভ হল (৭০ × ৩)—২০০ = ১০ টাকা; আর দ্বিতীয় কৃষকের লাভ হল (৭০ × ৪)-২০০ = ৮০ টাকা। অর্থাৎ প্রথমজনের লাভের হার শতকরা ৫ টাকা এবং দ্বিতীয়জনের লাভের হার শতকরা ৪০ টাকা। দ্বিতীয় কৃষক একই পরিমাণ বিনিয়োগ করেও এই যে শতকরা ৩৫ ভাগ লাভ করল, অর্থনীতির ভাষায় এটাকেই বলে অ্যাবসল্যুট রেন্ট। সর্বোচ্চ উৎপাদন-খরচের ভিত্তিতে বাজার দর নির্ধারিত হওয়ার ফলেই অ্যাবসল্যুট রেন্ট-এর উদ্ভব ঘটে। যেখানে সমাজের চরিত্র মূলত পুঁজিবাদী এবং বাজার জাতীয়ভিত্তিক, সেখানেই অ্যাবসল্যুট রেন্ট ও ডিফারেন্সিয়াল রেন্ট বলবৎ থাকে।

অ্যামনেস্টি গ্রিক শব্দ Amnesty-র অর্থ হল ভুলে যাওয়া। এটি হল এমন একটি আইনগত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র রাজনৈতিক বা অন্যান্য অপরাধীদের ক্ষমা করে দিতে পারে, যাতে তারা কারাগারে থাকলে কারামুক্ত হয়, শাস্তিপ্রাপ্ত হলে শাস্তি মওকুফ হয় কিংবা তাদের বিরুদ্ধে মামলা চালু থাকলে মামলা খারিজ হয়। রাজনৈতিক সমঝোতার প্রেক্ষিতে প্রায়শই রাজবন্দিদের অ্যামনেস্টি বা সাধারণ ক্ষমা প্রদান করা হয়। সাধারণত একটা সরকারের পরিবর্তন ঘটলে, নতুন সরকার সাবেক সরকারের আমলের রাজবন্দিদের অ্যামনেস্টি প্রদান করে থাকে। আবার অবস্থিত সরকারও অবস্থাগত চাপের প্রেক্ষিতে অ্যামনেস্টি ঘোষণা করতে পারে। তা ছাড়া, বিদ্রোহী বা সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিও অবস্থার চাপে অ্যামনেস্টি ঘোষণা করার নজির দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে অ্যামনেস্টির তাৎপর্য হল এই যে, সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহী বা সন্ত্রাসবাদীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। বর্তমানে অর্থনৈতিক অ্যামনেস্টি বা ট্যাক্স অ্যামনেস্টির ব্যাপারও প্রচলিত হয়েছে। এরূপ অ্যামনেস্টির মাধ্যমে কালো টাকার মালিককে (সে-টাকা উৎপাদনমূলক খাতে বা সরকার-নির্ধারিত অপর কোনো খাতে বিনিয়োগ করা হবে—এরূপ শর্তে) কিংবা ট্যাক্স ফাঁকি দানকারীকে (কিস্তিবন্দিতে ট্যাক্স পরিশোধের সুযোগদান বা ট্যাক্সের অংশবিশেষ মওকুফ করা হবে—এরূপ কোনো শর্তে) ক্ষমা প্রদর্শন করা যেতে পারে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ১৯৬১ সালে গঠিত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (Amnesty International)-এর সদর দফতর যুক্তরাজ্যে অবস্থিত। পৃথিবীর দেশে দেশে পরিচালিত রাজনৈতিক নির্যাতন, কারারুদ্ধকরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং এরূপ অপরাধ যথাসম্ভব প্রতিরোধ করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। বর্তমানে ১৫০টি দেশে এর শাখা রয়েছে এবং এর সদস্যসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৫,০০০। মানবতা ও শান্তির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্যে ১৯৭৭ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অ্যারিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) অ্যারিস্টটল ছিলেন প্লেটোর ছাত্র। তিনি গুরুর 'দেহমুক্তরূপ' বা 'ভাব'-এর সমালোচনা করলেও, মূলত গুরুর ভাববাদী ঘরানা থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হননি। তিনি সর্বদাই ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে দোদুল্যমান

ছিলেন। দর্শনের ক্ষেত্রকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেন, যথা ১. তাত্ত্বিক দিক, জীব (মানুষ) এবং জীবের উৎপত্তি, উৎপত্তির কারণ, উপাদান ইত্যাদির চর্চা এই দিকের অন্তর্গত, ২. প্রায়োগিক দিক, মানুষের বিভিন্ন কাজের আলোচনা এইদিকের আওতাভুক্ত এবং ৩. কাব্যিকতা—সৃষ্টিশীলতা (Creativity) নিয়েই এদিকের কারবার। তিনি চারটি মৌল কারণে বিশ্বাস করতেন, যথা, ১. বস্তু, ২. রূপ (Form) ৩. গতির সূচনা ও ৪. উদ্দেশ্য (Aim)। তাঁর মতে সকল গতির চূড়ান্ত উৎস হল পরম সৃষ্টিকর্তা, যিনি স্থির অথচ মূল গতির উৎস (Unmoved Prime Mover)। নীতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে, তাঁর মতে, মনের কাজসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল 'চিন্তা'। চিন্তার দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র স্বাধীন মানুষদের অর্থাৎ দাস-মালিকদের আর শারীরিক শ্রম দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে ক্রীতদাসদের। তাঁর সামাজিক তত্ত্বানুযায়ী, দাসব্যবস্থার মূল প্রকৃতিতেই নিহিত। তাঁর মতে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ রূপ হল ক্ষমতার স্বার্থপর ব্যবহারকে রাষ্ট্রের পূর্বশর্তরূপে গণ্য করা, যার মাধ্যমে শাসকরা গোটা সমাজের জন্য কাজ করতে সমর্থ হন। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে 'দ্বন্দ্বতত্ত্বের জীবাণু' নিহিত ছিল বলে লেনিনও তাঁর প্রশংসা করেন।

অ্যাসাসিন একাদশ শতাব্দীতে আলামুত পর্বতের বয়োবৃদ্ধ বলে খ্যাত হাসান সাকা একটি সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সংগঠন গঠন করেন। হাসান সাকা আলমুত পর্বতের পাদদেশে ফল, ফুল ও সুন্দরী তরুণীসমৃদ্ধ এক কানন গড়ে তোলে, সেটাকে 'বেহেশত' বলে অভিহিত করেন। তিনি নিজেকে পির বা মুর্শিদ এবং তাঁর সহকারীদের রোকন বা ফিদাই বলে অভিহিত করতেন। এই রোকনদের নিয়ে গঠিত সুইসাইড স্কোয়াডের মাধ্যমে কোনো রাজা-বাদশাহ বা রাজপুরুষকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হত এবং অপারেশন শুরুর পূর্বমুহূর্তে সংশ্লিষ্ট রোকনদের তীব্র মাদকদ্রব্য হাশিশ (বা ভাং) পান করানো হত এবং বলা হত যে তারা সাফল্যমণ্ডিত হলে তাদেরকে ওই 'বেহেশত'-এ স্থান দেয়া হবে এবং তারা হুরিদের উপভোগ করতে পারবে। রোকনদের হাশিশ খাওয়ানো হত বলে, তাদের বলা হত 'হাশাশিন' যা ইংরেজিতে পরিণত হয়েছে 'অ্যাসাসিন' (Assassin)-এ, যার বর্তমান অর্থ গুপ্তঘাতক। যাই হোক, মুর্শিদের নির্দেশ মোতাবেক রোকন বা ফিদাইরা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করত এবং এটাকে তারা একটি ধর্মীয় কাজ বলে বিবেচনা করত। বস্তুত ১০৯০-৯১ সালে আলামুত দুর্গ বিজয়ের মাধ্যমেই অ্যাস্যাসিনদের প্রকৃত যাত্রা শুরু। তারপর তারা বিভিন্ন গুপ্তহত্যা ও আক্রমণের মাধ্যমে আরও বহুসংখ্যক দুর্গ ও এলাকা দখল করে নিয়ে রীতিমতো একটি রাজ্য স্থাপন করে বসে। ক্রুসেডের সময় বহু মুসলিম শাসক দুর্বল হয়ে পড়ার সুযোগে তারা তাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি করে। অ্যাসাসিন শাসনকর্তারা ছিলেন যথাক্রমে হাসান সাব্বা (১০৯০-১১২৪), বুজুর্গ উমিদ রুদবারি (১১২৪-৩৮), মোহাম্মদ ইবনে বুজুর্গ উমিদ (১১৩৮-৬৬), নুরুদ্দিন মোহাম্মদ (১১৬৬-১২১০), সালাহউদ্দিন মোহাম্মদ (১২১০-২০), আলাউদ্দিন মোহাম্মদ (১২২০-৫৫) এবং রুকনুদ্দিন মোহাম্মদ (১২৫৫-৫৬)। ১২৫৬ সালে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের পৌত্র দুর্ধর্ষ হালাকু খান অ্যাসাসিনদের বিভিন্ন দুর্গ ধ্বংস করে দেন এবং রুকনুদ্দিন মোহাম্মদকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। ১২৫৮ সালের মধ্যেই হালাকু খান আলামুত দুর্গ ধ্বংস করে অ্যাসাসিনদের মূলোৎপাটন করে দেন এবং সেসঙ্গে আব্বাসীয় খিলাফতেরও অবসান ঘটান।

॥ আ ॥

আই. আর. এ. : Irish Republican Army-IRA. ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপ-এর এটাই সাধারণ পরিচিতি। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঈস্টার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই প্যারামিলিটারি গেরিলা সংগঠনের উদ্ভব। এর রাজনৈতিক সংগঠন ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সিন ফিন। এদের যৌথ আন্দোলনের ফলে ১৯২২ সালে আয়ারল্যান্ড আইরিশ ফ্রি স্টেট হিসাবে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভ করে এবং ১৯৩৭ সালে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব অর্জন করে। ১৯৪৯ সালে দেশটির নামকরণ করা হয় রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ড। ১৯২২ সালে আইরিশ ফ্রি স্টেট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় গৃহযুদ্ধ,—চুক্তিপন্থিদের সঙ্গে সমগ্র আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতাপন্থি আই.আর.এ.-এর। ১৯২৩ সালে আই.আর.এ. পরাজিত হলেও ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত তারা সশস্ত্র হামলা অব্যাহত রাখে। ১৯৬০ সালের পর থেকে আই.আর.এ. নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকতে থাকে। স্বাধীনতা- উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং ব্রিটিশ শাসনাধীন দক্ষিণাঞ্চলে আই.আর.এ. গেরিলারা অসংখ্য হামলা চালায় এবং বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হত্যা করে। আই.আর.এ.-এর সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দল ও গ্রুপের যোগাযোগ রয়েছে এবং উত্তর আমেরিকাস্থ আইরিশ প্রবাসীরা এদেরকে মোটা অর্থের যোগান দেয়।

আই.এন.এফ মাধ্যমিক পারমাণবিক শক্তিচুক্তি বা Intermediate Nuclear Forces (INF) Treaty. ১৯৭৭ সালের 'ইউরোমিজাইল' সংকট (Euromissile Crisis) থেকেই এই চুক্তির উদ্ভব। এ-সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর দিকে তাক করে যে-সমস্ত মিজাইল বসিয়েছিল, সেগুলোর স্থলে অধিকতর শক্তিশালী নতুন মিজাইল বসাতে শুরু করে। ন্যাটো এর বিরুদ্ধে একদিকে আলাপ-আলোচনা ও অন্যদিকে নিজেদের মিজাইল-শক্তিবৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে আগ্রাসন শুরু করলে অবস্থার অবনতি ঘটে। ১৯৮৬ সালে রেকজাভিকে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ও মিখাইল গর্বাচেভের মধ্যে বৈঠক ও চুক্তি হয়। এই চুক্তি মোতাবেক ৫০০ কিলোমিটারের অধিক অথচ অতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র(ICBM)-এর তুলনায় কম রেঞ্জসম্পন্ন সকল ক্ষেপণাস্ত্রের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এই চুক্তির মাধ্যমেই সর্বপ্রথম অন্তত একটি ক্যাটেগরির ক্ষেপণাস্ত্র নিষিদ্ধ হয়।

আই. এম. এফ. বা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (International Monetary Fund–IMF) জাতিসংঘের একটি এজেন্সি হলেও কার্যত এটি একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এর উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন, প্রকৃত আয় ও কর্মসংস্থানকে গতিময় করা, বিনিময়হারকে স্থিতিশীল রাখা এবং এর নিজস্ব তহবিল থেকে সদস্যরাষ্ট্রসমূহকে সাহায্য প্রদান করা। আই. এম. এফ. স্বর্ণ ও মার্কিন ডলারের মূল্যমানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক বিনিময়হার নির্ধারণ করে এবং কোনো সদস্যরাষ্ট্রই আই. এম. এফ.-এর পূর্বঅনুমতি ব্যতিরেকে এই হারের শতকরা ১০ ভাগের বেশি পরিবর্তন করতে পারে না। আই. এম. এফ.-এর সদস্যদেরকে এই ফান্ডে কোটা অনুযায়ী চাঁদা প্রদান করতে হয়। সাধারণত, চাঁদার

২৫% স্বর্ণে বা স্বর্ণ ও ডলারে এবং বাকি অংশ স্ব-স্ব জাতীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা যায়। (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলও দ্রষ্টব্য)।

আইখম্যান, এডল্ফ্ : প্রখ্যাত নাৎসি যুদ্ধাপরাধী। তিনি হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর ইহুদিসংক্রান্ত দফতরের প্রধান ছিলেন এবং হাজার হাজার ইহুদিকে হত্যা করার জন্যে দায়ী ছিলেন। ষাটের দশকের শুরুতে তিনি আর্জেন্টিনায় পালিয়ে থাকা অবস্থায় ধরা পড়েন। ১৯৬১ সালে তাঁকে বিচারের জন্যে ইসরায়েলে নিয়ে আসা হয় এবং ১৯৬২ সালেই তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

আইজেনহাওয়ার ডুইট ডি. আইজেনহওয়ার ১৮৯০ সালের ১৪ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের পর তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপান যখন পার্ল হারবার আক্রমণ করে, তখন তিনি ওয়াশিংটনে অপারেশন ডিভিশনের সহকারী চীফ অব স্টাফ হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি ইউরোপে সেনাপতিত্ব করেন। ১৯৪২-৪৪ সালে তিনি ছিলেন উত্তর আফ্রিকায় সম্মিলিত বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ। ১৯৪৫ সালে জার্মানির মার্কিন-অধিকৃত এলাকার কমান্ডার. ১৯৪৫-৪৮ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ এবং ১৯৫০-৫২ সালে ন্যাটোর সর্বাধিনায়ক হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে তিনি রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দেন এবং সে-বছরই ডেমোক্রেটিক দলীয় প্রার্থী আদলাই স্টিভেন্সনকে পরাজিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মধ্যপ্রাচ্য নীতি 'আইজেনহাওয়ার নীতি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আইজেনহাওয়ার নীতি Eisenheuer Doctrine. মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ১৯৫৭ সালের ৫ জানুয়ারি কংগ্রেসে যে-মধ্যপ্রাচ্য নীতি ঘোষণা করেন, সেটাই আইজেনহাওয়ার নীতি নামে পরিচিত। তাঁর প্রস্তাবের প্রধান দিক ছিল নিম্নরূপ ১. সমাজতান্ত্রিক শক্তির তরফ থেকে আগত হামলা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ সাহায্য চাইলে তা প্রদান করার জন্যে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনবাহিনী মোতায়েন করা উচিত; ২. মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রদান করা উচিত এবং ৩. যারাই চাইবে তাদেরকে সামরিক সাহায্য দেয়াও যুক্তরাষ্ট্রের কর্তব্য। এই নীতিতে ঘোষিত মধ্যপ্রাচ্যের সীমানা হল পশ্চিমে লিবিয়া, পূর্বে পাকিস্তান, উত্তরে তুরস্ক এবং দক্ষিণে ইথিপিওয়া ও সুদান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা।

আই. ডি. এ. International Devolopment Agency (IDA). অর্থাৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা। জাতিসংঘের এই সংস্থাটি ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত ১৯৫০-এর দশক থেকেই দরিদ্র দেশসমূহকে ব্যাংকঋণ ছাড়াও সহজ শর্তে ঋণদানের যে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, তারই ফলশ্রুতিতে এই সংস্থার উদ্ভব। আই. ডি. এ.-এর ফান্ডের উৎস তিনটি ১. ব্যাংকের আয় থেকে সংগৃহীত অর্থ; ২. সদস্যদের দ্বারা বিনিময় মুদ্রায় দেয় পুঁজি এবং ৩. সদস্যদের চাঁদা।

আইদিদ, মোহাম্মদ ফারাহ : সোমালিয়ার জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা। ১৯৯১ সালে একনায়ক মোহাম্মদ সাঈদ বারিকে উৎখাতের পর থেকে ফারাহ আইদিদ বস্তুত

সোমালিয়ার শাসনকার্য পরিচালনা করে আসছেন। কিন্তু জাতিসংঘ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর শাসনকে কখনোই মেনে নেয়নি এবং তারা অর্থনৈতিক অবরোধ ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর সরকারকে উৎখাতের অবিরাম প্রচেষ্টাই চালিয়ে এসেছে। ফলে, ১৯৯২ সালে সোমালিয়ায় তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং প্রায় তিন লাখ মানুষ অনাহারে প্রাণ হারায়। কিন্তু জনসমর্থনপুষ্ট ফারাহ আইদিদকে উৎখাত করা তাদের পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভবপর হয় নি।

আইন Law. আইন হচ্ছে শৃঙ্খলার বিধান। অর্থাৎ একটি সমাজ বা দেশের সদস্যেরা কী করতে পারবে এবং কী করতে পারবে না, তারই বিধান হল আইন। আপাতদৃষ্টিতে বা বাহ্যিক বিচারে আইন সংশ্লিষ্ট সকল নাগরিকের ওপর সমভাবে প্রযোজ্য হওয়ার কথা। কিন্তু সভ্যতার আদিকাল থেকে আইনের ইতিহাস নিলে দেখা যায় যে, আইন আসলে ক্ষমতাবানদেরই নিরঙ্কুশ স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। শক্তিমানরা প্রায়শই অবস্থিত আইনকে লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল করেছেন, আইনের পরিবর্তন করেছেন। দাসসমাজে আইন ছিল দাস প্রথাকে পাকাপোক্ত রেখে দাস-মালিকদের একচ্ছত্র স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার। অনুরূপভাবে সামন্তসমাজের আইন ছিল সামন্তপ্রভুদের নিরঙ্কুশ স্বার্থেরই রক্ষাকবচ। পুঁজিবাদী সমাজে আইন কার্যত পুঁজি ও পুঁজিপতির স্বার্থই রক্ষা করে। সমাজতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি (প্রায়শই পলিটব্যুরো কিংবা পার্টিপ্রধান)-এর অভিলাষই আইনে রূপ লাভ করে। মোটকথা, যাঁরাই যখন ক্ষমতায় যান, আইন তাঁদেরই হাতিয়ারে পরিণত হয়। বর্তমানে বিশ্বে আইন মূলত দু প্রকার। যথা—১. জাতীয় আইন এবং ২. আন্তর্জাতিক আইন। জাতীয় বা একটি দেশের অভ্যন্তরীণ আইনের মতো আন্তর্জাতিক আইনের সুবিধাও প্রধানত ভোগ করে প্রবল বা শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ। আইনের এরূপ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, আইন আছে বলেই সমাজ ও জনগণ বল্গাহীন নৈরাজ্য ও অপরাধপ্রবণতা থেকে রক্ষা পেয়ে আসছে।

আইন অমান্য আন্দোলন : Civil Disobedience Movement. অবস্থিত সরকারকে কাবু করার জন্যে বিরোধী দলসমূহের আন্দোলনের একটি রূপ। এই পর্যায়ের আন্দোলনে বিরোধীদলসমূহ খাজনা-ট্যাক্স প্রদান বন্ধ, আদালত-বর্জন, সরকারি যন্ত্রের সঙ্গে অসহযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সভা-সমিতি-মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ থাকলে বিরোধীদলসমূহ তা অগ্রাহ্য করে সভা-সমিতি ও মিছিলের আয়োজন করতে পারে। বস্তুত, আইন অমান্য আন্দোলন প্রায়শই নিরস্ত্র আন্দোলনের সর্বশেষ পর্যায় এবং প্রকাশ্য সশস্ত্র সংঘর্ষের সূচনাস্বরূপ।

আইন, প্রাকৃতিক Natural Law. প্রাকৃতিক আইন বলতে বোঝায় সৃষ্টিকর্তার আইন কিংবা সৃষ্টি বা জগৎসংসারের গঠন ও নিয়মের মধ্যে যে-নীতি ও নৈতিক শিক্ষা আছে, তা। ইউরোপের নবজাগরণের পর প্রাকৃতিক আইনের ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। অনেকের মতে প্রাকৃতিক আইন ও প্রকৃতির আইন (Laws of Nature) প্রায় সমার্থক। প্রাকৃতিক আইনের প্রবক্তারা মনে করেন যে, মানবসমাজ কীভাবে চলবে তা সৃষ্টিকর্তা বা প্রকৃতি কর্তৃকই নির্ধারিত। অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে সেন্ট অগাস্টাইন, এমনকি অ্যাকুইনাস পর্যন্ত অনেকেই প্রাকৃতিক আইনের কথা বলেছেন। তবে এ-ব্যাপারে সকলের সংজ্ঞা হুবহু এক নয়। যেমন, হব্‌স্ ও লক্-এর সংজ্ঞার

মধ্যেও ভিন্নতা আছে। আবার, ডেভিড হিউম, জেরেমি বেন্থাম প্রমুখ প্রাকৃতিক আইনের সমালোচনা করে উপযোগবাদের পক্ষে মত দিয়েছেন। কান্ট এবং হেগেলও প্রাকৃতিক আইনের কথা বলেছেন, কিন্তু সেটা ভিন্ন প্রেক্ষিতে।

আইনস্টাইন, অ্যালবার্ট : (১৮৭৯-১৯৫৫); জার্মান পদার্থবিদ এবং আপেক্ষিকতার তত্ত্বসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের আবিষ্কারক। তাঁর তত্ত্বের ফলশ্রুতিতে মহাশূন্য, সময়, গতি, বস্তু, আলো, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়। ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জার্মানি ত্যাগ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটনে বসবাস শুরু করেন। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা ছিল স্পিনোজার চিন্তাধারার কাছাকাছি। সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে তিনি সামাজিক নিপীড়ন, সমরবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরোধী ছিলেন। যুদ্ধের জন্যে আণবিক শক্তি ব্যবহারেরও তিনি ঘোরতর বিরোধিতা করেন।

আইনি মার্কসবাদ Legal বা Constitutional Marxism. এটি উদার বুর্জোয়াদের হাতে মূল মার্কসবাদের বিকৃত রূপ। ১৮৯০-এর দশকে রাশিয়ায় নারোদবাদের ধ্বংস এবং মার্কসবাদের ক্রমবিকাশের পটভূমিতে উদারনৈতিক বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা এই মতবাদ নিয়ে হাজির হন এবং সরকারের স্বীকৃতি নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মার্কসবাদের ওপর লেখালেখি শুরু করেন। তাঁরা মার্কসবাদের নামে নারোদবাদের সমালোচনা করেন। লেনিনের মতে, এঁরা নারোদবাদ থেকে সরে এসেছেন বটে, কিন্তু মার্কসবাদে আসার বদলে চলে গিয়েছেন বুর্জোয়া উদারতাবাদে। আইনি মার্কসবাদীরা মার্কসবাদের মূল কথা 'সর্বহারা বিপ্লব'কে এড়িয়ে গিয়ে 'পুঁজিবাদ'-এর 'ভালো' দিকসমূহ থেকে শিক্ষা নেয়ার কথা বলেন।

আইনের শাসন : আইনের শাসন (Rule of Law)-এর মূল কথা হল : ১. কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা নয় বরং সুনির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হবে; ২. আইনের চোখে অবস্থান-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার সমান হবে; ৩. বিচার বিভাগ সম্পূর্ণরূপে প্রশাসন ও সরকারে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রভাবমুক্ত হবে এবং রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তা ও নাগরিক অবস্থান-নির্বিশেষে আদালতের কাছে দায়ী থাকবেন এবং ৪. সংবিধানই জনগণের মৌলিক ও নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করবে এবং কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের ইচ্ছামাফিক সংবিধান বাতিল, স্থগিত বা পরিবর্তন করা যাবে না।

আই. বি. আর. ডি. পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্যে স্থাপিত আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development —IBRD), যা সাধারণত 'বিশ্বব্যাংক' (World Bank) নামেই বহুলপরিচিত। এটি জাতিসংঘেরই একটি প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উড্স্-এ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মুদ্রা ও অর্থবিষয়ক সম্মেলনে আই. বি. আর. ডি. এবং আই. এম. এফ. প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের একটি সংস্থা হলেও এটিও কার্যত স্বাধীন। এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য হল সদস্যরাষ্ট্রসমূহে উৎপাদনমূলক খাতে পুঁজি বিনিয়োগের সুবিধাবৃদ্ধির ব্যাপারে সহযোগিতা করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহের সঞ্চার করা, বেসরকারি বৈদেশিক বিনিয়োগবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্যারান্টি প্রদান করা ও এরূপ বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করা এবং উৎপাদনমূলক কাজের জন্যে ঋণের সংস্থান করা, বিশেষত, যেক্ষেত্রে

যুক্তিসঙ্গত শর্তে বেসরকারি পুঁজি দুর্লভ। অর্থনীতিবিদ মেনার্ড কেইনস (যুক্তরাজ্য) ও হ্যারি ডেক্সটার হোয়াইট (যুক্তরাষ্ট্র) একসময় এই মত পোষণ করতেন যে, এই ব্যাংক বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট-নিরসনে সহায়ক হবে। এ-পর্যন্ত এই ব্যাংক বন্যানিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগব্যবস্থা, খনিজসম্পদ উত্তোলন, জলসেচ, পরিবহণ, কৃষি, বন, বিদ্যুৎশক্তি, শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে এসেছে। ঋণপ্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ততটুকু বিবেচনা করা হয়, যতটুকু সে-দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ঋণ পরিশোধ-ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ঋণ প্রদান করা হয় সদস্যরাষ্ট্রকে। তা ছাড়া সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করলে বেসরকারি উদ্যোক্তাকেও ঋণ দেয়া হয়। তা ছাড়া এই ব্যাংক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তাও প্রদান করে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের বিনিয়োগ-কর্মসূচি প্রণয়ন ও উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক অবস্থা জরিপের জন্যে বিভিন্ন মিশনও প্রেরণ করে। তদুপরি, ব্যাংক-কর্মসূচি বিশেষে উপদেষ্টা-সহায়তাও দিয়ে থাকে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র ব্যাংকের বোর্ড অব গভর্নর্স-এ সদস্য নিয়োগ করতে পারে। বোর্ডের অধিকাংশ ক্ষমতা ১৬ জন নির্বাহী পরিচালকের ওপর অর্পিত। এই নির্বাহী পরিচালকরা প্রতিমাসেই মিলিত হন। ১৬ জনের মধ্যে ৫ জন পরিচালক আসেন পুঁজিতে সর্বাধিক শেয়ারসম্পন্ন ৫টি দেশ থেকে। বাকি ১১ জন অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন। পরিচালকরা একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। ১৯৫৫ সালে এই ব্যাংক অনুন্নত দেশসমূহে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ তদারকের জন্যে আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন (International Finance Corporation—IFC) গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৬০ সালে এই ব্যাংকের অপর এজেন্সি বিশ্ব উন্নয়ন সংস্থা (International Development Agency—IDA) গঠিত হয়। বিশ্বব্যাংকের সদর দফতর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অবস্থিত। (আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতিও দ্রষ্টব্য)।

আইরিশ প্রজাতন্ত্রী সেনা : আয়ারল্যান্ডের জঙ্গি জাতীয়তাবাদীদের সমিতি হল আইরিশ প্রজাতন্ত্রী সেনা (Irish Republican Army—IRA)। এঁরা দাবি করেন যে, এঁরা আইরিশ প্রজাতন্ত্রী স্বেচ্ছাসেবক বা সিন ফিনার (Sinn Fieners)দেরই উত্তরসূরি। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রশ্নে সিন ফিনাররা দক্ষিণাঞ্চলীয় আইরিশ স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসেন এবং ১৯১৬ সালে জার্মান সাহায্যপুষ্ট হয়ে ডাবলিনের বিখ্যাত 'ঈস্টার অভ্যুত্থান' সংঘটিত করেন। তাঁরা ব্রিটিশশাসিত ৬টি উত্তরাঞ্চলীয় কাউন্টির সমন্বয়ে আইরিশ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং ১৯২২ সালে আয়ারল্যান্ডের তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে এক গৃহযুদ্ধের সূচনা করেন। ১৯৩১ সালে প্রেসিডেন্ট কসগ্রেভ এই সংগঠনকে বেআইনি ঘোষণা করেন। ১৯৩৯ সালে এই সংগঠন লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টারে ব্যাপক বোমানিক্ষেপের মাধ্যমে তীব্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ১৯৫৪-৫৫ সালে এঁরা আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ব্যারাক আক্রমণ করে অস্ত্র সংগ্রহ করেন। ১৯৫৫ সালে এঁদের দুজন সদস্য জেলে থেকেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে সংগঠনের জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এই সংগঠন অস্তিত্ব বজায় রাখলেও তেমন ব্যাপক বিপ্লবাত্মক কিছু করতে আর সমর্থ হয় না।

আই. সি. এস. আই. ডি. International Centre for Settlement of Investment Disputes অর্থাৎ বিনিয়োগসংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পন্নের জন্যে আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। এটি বিশ্বব্যাংকের একটি উপ-প্রতিষ্ঠান। সরকার ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যেকার মতবিরোধ দূর করা, বিনিয়োগপ্রবাহ বৃদ্ধি করা, বিদেশী বিনিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া, গবেষণাকার্য পরিচালনা করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সালিশির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৬৬ সালে এই কেন্দ্র গঠিত হয়।

আওয়ামী লীগ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর যখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তানে বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষিত হবে না, তখন ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। এই দলগঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা শামসুল হক। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দলের সভাপতি, শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক ও শেখ মুজিবুর রহমান যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে আটক থাকায় এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি ভারত থেকে পাকিস্তান আসেন এবং গঠন করেন জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ। পরবর্তীকালে এই দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং সোহরাওয়ার্দি এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জন্মের পর থেকেই এই দল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সপক্ষে কাজ করে এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট এবং এই যুক্তফ্রন্টেরও প্রধান শরিক দল ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা দাবি পেশ করলে তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ৮-১২ মার্চ (১৯৫৪) তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টিতে বিজয়ী হয়। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু ৩০ মে মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করে ৯২-ক ধারা জারি করা হয়। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে যথাক্রমে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ করা হয়। ইতিমধ্যে ১৯৫৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন। মাঝখানে কেন্দ্রে ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ দুএকবার স্বল্পকালীন কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেও পাকিস্তানের রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা কখনোই আসেনি। ১৯৫৭ সালের ৭-৮ ফেব্রুয়ারি কাগমারী সম্মেলনে কার্যত আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এর পরিণামে ২৫ জুলাই মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করা হয়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইউব খান সামরিক শাসন জারি করেন এবং সকল দল নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৬২ সালের ২২ ডিসেম্বর বৈরুতে সোহরাওয়ার্দির মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর দল পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান দলের সভাপতি হন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা দাবি ঘোষণা করলেন, তা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ম্যাগনা কার্টায় পরিণত হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে শুরু হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। কিন্তু প্রবল গণআন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ৬-দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ফলে বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি এমনই আকাশচুম্বি হয় যে, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে বিজয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রাদেশিক পরিষদেও ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি পায় আওয়ামী লীগ। কিন্তু পাকিস্তানি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামরিক ও প্রশাসনিক এলিটশ্রেণী বাঙালিদের হাতে কোনো ক্রমেই পাকিস্তানের শাসনভার ছেড়ে দিতে রাজি না হওয়ায় এবং চক্রান্ত শুরু করায় দেখা দেয় অচলাবস্থা। দাবি উঠতে থাকে স্বাধীনতার। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তোলিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা, ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে পঠিত হয় স্বাধীনতার ইশতেহার। ৭ মার্চ রেসকোর্সের সুবিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ওই তারিখ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পাকিস্তান সরকারের কর্তৃত্ব কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ২৬ মার্চ পাকিস্তানি শাসকও শোষকগোষ্টি শুরু করে 'অপারেশন সার্চ লাইট'। বঙ্গবন্ধু বন্দি হয়ে পাকিস্তানে নীত হন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায় গঠিত হয় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। রাষ্ট্রপতি হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী হন তাজউদ্দিন আহমদ। উল্লেখ্য, মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই ছিলেন আওয়ামী লীগের। প্রধান সেনাপতি আতাউল গনি ওসমানীও ছিলেন আওয়ামী লীগের নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য। মুজিববাহিনীর ৪ নেতাও ছিলেন আওয়ামী লীগের এবং সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের প্রাণপুরুষ ও ঐক্যের প্রতীক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং। ৯ মাসের প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সদস্যরা কলকাতা থেকে ঢাকা আসেন। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেন এবং ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে এসে পৌঁছেন। ১৯৭২ সালের ৩০ অক্টোবর সিরাজুল আলম খান, মেজর জলিল ও আ.স.ম. আবদুর রবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি তরুণ অংশ দল থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করেন। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের ২৯৩টিতে বিজয়ী হয়। ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) অধ্যাদেশ জারি করা হয় এবং তদানুযায়ী ৬ জুন গঠন করা হয় একক দল বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটি। সামরিক বাহিনীর সদস্য ও সিভিল সার্ভেন্টদেরও কমিটির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধু দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। ২৩ জুন দেশকে ৬১টি জেলায় ভাগ করে ৬১ জন দলীয় জেলা গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর কতিপয় অফিসার এক অভ্যুত্থান ঘটায় এবং বঙ্গবন্ধু, তাঁর স্ত্রী, তিন পুত্র, ভাই, ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি, মনির স্ত্রী, ভগ্নীপতি আবদুর রব সেরনিয়াবত প্রমুখকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর প্রেসিডেন্ট হন বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও বাকশালের অন্যতম শীর্ষ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ। মোশতাক মন্ত্রিসভার সকল সদস্যও ছিলেন আওয়ামী লীগের। আবদুল মালেক উকিলও

স্পিকার পদে বহাল ছিলেন। ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোশতাক সরকারের পতন ঘটান ; কিন্তু ৭ নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ নিজেই নিহত হন। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের ফলে ক্ষমতায় আসেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান শর্ত সাপেক্ষে রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবনের অনুমতি দিলে 'বাকশাল'-এর বদলে পুনরায় আওয়ামী লীগ নামে দল আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮১ সালে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ ১৯৮২ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত জেনারেল এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে এবং ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত খালেদা জিয়া (বিএনপি) সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে ২১ বছর পর পুনরায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ এখন গণতন্ত্র, মুক্তবাজার অর্থনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে।

আঁতাঁত : Entente. কোনো বিষয়ে একইরূপ নীতি বা কর্মধারা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের সমঝোতাকেই বলা হয় আঁতাঁত। গভীরতর তাৎপর্যপূর্ণ আঁতাঁতকে বলা হয় আঁতাঁত কর্ডিয়াল (Entente Cordiale) বা আন্তরিক আঁতাঁত। ১৯০৪ সালে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মধ্যে মিশরে ব্রিটিশ প্রভাব এবং মরক্কোতে ফরাসি প্রভাব কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে এরূপ 'আন্তরিক আঁতাঁত' গড়ে তোলা হয়েছিল।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এই মামলা শুরু হয় ১৯৬৮ সালের জুন মাসে। মামলার প্রধান আসামি ছিলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও পাকিস্তান নৌবাহিনীর কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। মামলায় অভিযোগ আনা হয় যে, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনীর কিছুসংখ্যক বাঙালি কর্মকর্তা এবং কতিপয় রাজনৈতি নেতা ভারতের সঙ্গে যোগসাজশ করে সশস্ত্র উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার উদ্যোগ নেন। ভারতের আগরতলায় কথিত চক্রান্তের কথিত মূল কেন্দ্র ছিল বিধায়, এই মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামেই অভিহিত হয়। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি এস. এ. রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই মামলা শুরু হলে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলব্যাপী বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ-সময় ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফেডারেশনের একাংশকে নিয়ে গঠিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে শুরু হয় ১১ দফা আন্দোলন, যার অন্যতম দফা ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার। ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি ঢাকায় বিভিন্ন রাজনৈতি দল (ন্যাপ ও পিপলস্ পার্টি ছাড়া)-এর সমন্বয়ে গঠিত হয় গণতান্ত্রিক অ্যাকশন কমিটি (DAC)। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ-এর সভাপতি (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)কে বাদ দেয়ায় বৈঠক তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ এই মামলার সকল আসামিকে মুক্তি প্রদান করা হয়। তবু শেষরক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। ওই বছরেরই ২৫ মার্চ আইয়ুব খানকে উৎখাত করে সেনাবাহিনী-প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন।

আগ্রাসন Aggression. এর অর্থ হল এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্র আক্রমণ। সাধারণত দেখা যায়, আগ্রাসনকারী রাষ্ট্র দাবি করে যে তারা আগ্রাসনকারী নয়, বরং আত্মরক্ষার্থে কিংবা গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক বা অপর কোনো আদর্শরক্ষার স্বার্থে অথবা সভ্যতা-স্বকীয়তাকে রক্ষার স্বার্থেই তারা ঐ ভূমিকা পালনে বাধ্য হয়েছে। ১৯৩৩ সালের ৩ জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্ক, রুমানিয়া, পোল্যান্ড, ইরান, লাটভিয়া, এস্টোনিয়া ও আফগানিস্তান আগ্রাসনের সংজ্ঞা নির্ণয়ার্থে এক কনভেনশনে মিলিত হয় এবং এতে সাব্যস্ত হয় যে, নিম্নলিখিত সংজ্ঞায় যা-কিছুই পড়বে তাই-ই হবে আগ্রাসন ১. অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা; ২. যুদ্ধ-ঘোষণা ব্যতিরেকেই এক রাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক অপর রাষ্ট্র আক্রমণ; ৩. যুদ্ধ-ঘোষণা ব্যতিরেকে এক রাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী বা নৌবাহিনীর ওপর আক্রমণ; ৪. অন্য রাষ্ট্রের সমুদ্রগামী বা বন্দরে অবরোধ (Blockade) সৃষ্টি এবং ৫. অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গঠিত বেসরকারি বাহিনীকে সহায়তা বা আশ্রয়দান। ১৯৩৩ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে নিরাপত্তার প্রশ্নে গঠিত কমিটিও আগ্রাসনের প্রায় একই প্রকার সংজ্ঞা প্রদান করে। এই সংজ্ঞা মোটামুটি সর্বজনগৃহীত।

আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক : নয়া উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের বিভিন্ন দিকের অন্যতম হল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে যখন একের পর এক সাবেক উপনিবেশসমূহ স্বাধীন হয়ে যেতে থাকে, তখন নয়া উপনিবেশবাদীরা তাদের প্রভাব ও বাজার বজায় রাখার অন্যতম কৌশল হিসেবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন (Cultural Aggression)-এর নীতি গ্রহণ করে। বিশেষ করে, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, ইরিত্রিয়া, মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশে পরাজয়ের পর নয়া উপনিবেশবাদীরা আরও সুনিশ্চিত হয় যে, বর্তমান যুগে কোনো জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে জেতা অত্যন্ত দুরূহ। বরং সে-জাতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার মাধ্যমেই সে-জাতিকে কাবু করা ও বাগে আনা সহজতর। তাই তারা তাদের প্রদত্ত এইড-লোন ইত্যাদির প্রক্রিয়ায় অনুন্নত বিশ্বের দেশসমূহে যৌনবিকৃতি, মাদকাশক্তি, অশ্লীল সাহিত্য-চলচ্চিত্র, নয়া উপনিবেশবাদীদের ওপর নির্ভরশীলতার মনোবৃত্তি, মস্তক ধোলাইকৃত বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি উপসর্গের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াতেই তারা অনুন্নত বিশ্বের জনগণের, বিশেষত তরুণসমাজের মন-মানসকে বিপ্লবের দিক থেকে ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে রাখার প্রয়াস পায়। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনবাদীরা মনে করে যে, কোনো জাতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করলে সে-জাতির প্রতিরোধক্ষমতাও নষ্ট হতে বাধ্য।

আজাদ হিন্দ ফৌজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুই প্রথম জাপানকেন্দ্রিক আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। অপরদিকে, ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও জার্মানিতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে তিন ডিভিশন-সংবলিত আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন এবং ১৯৪২ সালের ২৬ জানুয়ারি এডলফ হিটলার আনুষ্ঠানিকভাবেই ভারতের জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানান। অতঃপর ১৯৪৩ সালের জুন মাসে সুভাষ বসু সাবমেরিনযোগে জার্মানি থেকে জাপান এসে পৌঁছালে রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বময় কর্তৃত্ব সুভাষ বসুর ওপর অর্পণ করেন। এই বাহিনীর অন্যতম প্রধান নেতা হন কর্নেল শাহনেওয়াজ। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় ফৌজের মহিলা শাখা—ঝাঁসির রানি বাহিনী। ঐ

বছরই সিঙ্গাপুরে সুভাষ বসু ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী তো জো আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিবাদন গ্রহণ করেন। এর পরপরই নেতাজির নেতৃত্বে গঠিত হয় প্রবাসী আজাদ হিন্দ সরকার। এই সরকারের সদস্য ছিলেন এস. এ. আয়েঙ্গার, লেফট্যানেন্ট কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জি, এম. এস. ভগৎ, জে. কে. ভোঁসলে, গুলজার সিং, এম. জেডকারনি, এ. ডি. লোকনাথন, আজিজ আবেদ প্রমুখ। ১৯৪৩ সালের ২৪ অক্টোবর আজাদ হিন্দ ফৌজ আনুষ্ঠানিকভাবে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে জাপান আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে তার শাসনভার আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতেই অর্পণ করে। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কর্নেল শাহনেওয়াজ, কর্নেল এনায়েত কিয়ানি ও কর্নেল মোহন সিং-এর নেতৃত্বে সুভাষ ব্রিগেড, গান্ধী ব্রিগেড ও আজাদ ব্রিগেড মণিপুর আক্রমণ করে। তাদের পশ্চাৎবাহিনী হিসাবে কাজ করে বাহাদুর শাহ সুইসাইড স্কোয়াড. বালসেনা ও গুরুবক্স সিং ধীলনের নেতৃত্বাধীন নেহেরু ব্রিগেড। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের পতন যখন আসন্ন, ঠিক তখনই এক প্রবল পাহাড়ি বন্যার ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানি বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে, মিত্রবাহিনীও রেঙ্গুন পৌঁছে যায়। এমতাবস্থায়, নেতাজি ব্যাংককে চলে আসেন এবং জানতে পারেন যে জার্মানি আত্মসমর্পণ করেছে। অতঃপর রাশিয়া জাপান আক্রমণ করেছে, এই খবর পেয়ে নেতাজি সিঙ্গাপুরে উপনীত হন। এর মধ্যে জাপানও আত্মসমর্পণ করে (সেপ্টেম্বর ২, ১৯৪৫)। এমতাবস্থায়, আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মকাণ্ডের যবনিকাপাত ঘটে। নেতাজিও হ্যানয় থেকে বিমানযোগে টোকিও যাওয়ার পথে বিমান-দুর্ঘটনায় নিহত হন বলে জানা যায়।

আঞ্চলিক উত্তেজনা পৃথিবীর কোনো একটি অঞ্চলবিশেষের দুটি বা ততোধিক দেশের মধ্যে সৃষ্ট তীব্র বিরোধ বা উত্তেজনাকেই বলে আঞ্চলিক উত্তেজনা (Regional Tension)। অভিযোগ করা হয় যে, বৃহৎ শক্তিসমূহ তাদের প্রভাববলয় বজায় রাখার স্বার্থে, প্রতিপক্ষকে হীনবল করার স্বার্থে, বাজার সংরক্ষণের স্বার্থে, অস্ত্রবিক্রয়ের স্বার্থে কিংবা অনুরূপ অপর কোনো স্বার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উসকানিদান, দালালসৃষ্টি বা কূটনৈতিক চালের মাধ্যমে এরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে কিংবা সৃষ্ট উত্তেজনায় ইন্ধন যোগায়। অবশ্য, পরাশক্তির উসকানি বা ভূমিকা ব্যতীতও আঞ্চলিক উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।

আঞ্চলিক সহযোগিতা : Regional Co-operation. বিশ্বের কোনো একটা অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, প্রতিরক্ষামূলক বা সার্বিক সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা সহযোগিতাকেই বলে আঞ্চলিক সহযোগিতা। এরূপ সহযোগিতা কোনো-না-কোনো সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমেই রূপ লাভ করে। ইইসি বা ইউরোপীয় সাধারণ বাজার, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা অধুনালুপ্ত ওয়ারশ জোট, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'আসিয়ান', দক্ষিণ এশিয়ার 'সার্ক' ইত্যাদি আঞ্চলিক সহযোগিতার উদাহরণ।

আটত্রিশ অক্ষরেখা এই অক্ষরেখা-বরাবর উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সীমানা। জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আটত্রিশ অক্ষরেখা-বরাবর অঞ্চলকে অসামরিকীকৃত অঞ্চল (Demilitarized Zone) বলে বিবেচনা করা হয়। এই অক্ষরেখায় অবস্থিত

পানমুনজম নামক স্থানে প্রয়োজনমতো উভয়পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার জন্যে একটি যৌথ আলোচনা-স্থান রয়েছে।

আটলান্টিক সনদ Atlantic Charter. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে নিউফাউন্ডল্যান্ডের আর্জেন্টিয়া উপসাগরে মার্কিন ক্রুজার 'অগাস্টা' এবং ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস'-এ (৯-১২ আগস্ট, ১৯৪১) অনুষ্ঠিত বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চর্চিল কতিপয় মৌলনীতি সম্পর্কে একমত হয়ে যে-বিবৃতি প্রদান করেন, সেটাই আটলান্টিক সনদ নামে খ্যাত। এই সনদের মৌল প্রতিপাদ্য হল ১. ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আঞ্চলিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজ নিজ একক স্বার্থ পরিত্যাগ; ২. সংশ্লিষ্ট জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আঞ্চলিক পরিবর্তন প্রতিহতকরণ; ৩. স্ব-স্ব সরকার-কাঠামো নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট জনগণের অধিকারের প্রতি সমর্থন; ৪. ব্যাবসা-বাণিজ্যের ওপর থেকে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও কাঁচামালের ব্যাপারে সমতাভিত্তিক কর্তৃত্বের প্রতি সমর্থন; ৫. যুদ্ধোত্তরকালে প্রত্যেক জাতির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহযোগিতাপ্রদান; ৬. ভবিষ্যৎ শান্তির ক্ষেত্রে ভয় ও দারিদ্র্যমুক্তি সুনিশ্চিতকরণ; ৭. সমুদ্র-চলাচলের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সুনিশ্চিতকরণ এবং ৮. সাধারণ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত আক্রমণকারী দেশসমূহের নিরস্ত্রীকরণ। ১৯৪১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয় যে, জার্মানি ও ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ১৫টি দেশ (সোভিয়েত ইউনিয়নসহ) আটলান্টিক সনদের প্রতি সমর্থন প্রদান করেছে।

আত্মগত : বা আত্মমুখী (Subjective)। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ, বাস্তবকে উপেক্ষা করে নিজস্ব খেয়াল, সংস্কার বা পূর্বনির্ধারিত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হওয়া। এর অপর অর্থ হল, কোনো কজের সচেতন কর্তৃত্ব; যেমন একটি শিল্পকারখানায় মালিকপক্ষের কর্তৃত্ব হল একটি আত্মগত দিক (Subjetive Factor)।

আত্মগত প্রস্তুতি, বিপ্লবের সাংগঠনিক প্রস্তুতিই হল বিপ্লবের আত্মগত প্রস্তুতি। অর্থাৎ বিপ্লব সম্পন্ন করা ও বিপ্লবকে ধরে রাখার উপযোগী নেতৃত্ব ও কর্মীসংবলিত যথার্থ সংগঠন ও সাংগঠনিক শক্তি গড়ে তোলা। বলাবাহুল্য, সাংগঠনিক প্রস্তুতি না থাকলে কোনো বিপ্লবের বস্তুগত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও বিপ্লব আপনাআপনিই সংঘটিত হয় না।

আত্মগত ভাববাদ Subjective Idealism. এই মতবাদ অনুযায়ী আপন সত্তার বাইরের যাবতীয় বস্তু আসলে আপন মনেরই রূপান্তরমাত্র এবং অনুভূতির দ্বারা এসব বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বোঝা যায় বলেই তারা আছে (বা exist করে)।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার : Right of Self-determination. কোনো দেশের কোনো জাতির আপন রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ভাগ্য-নির্ধারণের অধিকার। পরাধীন দেশ ও উপনিবেশসমূহের জনগণ প্রায়শই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি উত্থাপন করে। অনেকে স্বায়ত্তশাসন, ডোমিনিয়ম স্ট্যাটাস, হোমরুল ইত্যাদিকেও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আওতাভুক্ত বলে মনে করেন। লেনিনের মতে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার হল অন্য জাতির আধিপত্যমুক্ত হয়ে একটি জাতির স্বতন্ত্র, স্বাধীন, জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকার।

আদর্শ : Ideology 'আদর্শ' ব্যাপারটা খানিকটা উপলব্ধি করা গেলেও এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা খুবই কঠিন। তবে অনেকে মনে করেন যে, জার্মান শব্দ 'Weltanschauung'-ই আইডিওলজি শব্দের কাছাকাছি। এই জার্মান শব্দটির অর্থ

'বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি' (World-view)। অন্য কথায়, 'সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক -সাংস্কৃতিক বিশ্ব' সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ধারণা বা উপলব্ধিই হল ওই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর 'আদর্শ'। সেই হিসাবে 'মার্কসবাদ লেনিনবাদ'-কে একটি আদর্শ বলা যায়। একই ভাবে, ইসলামও একটি সামগ্রিক জীবন-বিধান বিধায় ইসলামকেও একটি আদর্শ বলা যেতে পারে। মুক্তবাজার অর্থনীতি ও অবাধ গণতন্ত্রসম্বলিত 'পুঁজিবাদ'-ও একটি আদর্শ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। রাজনীতিতে 'আদর্শ' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার হলেও প্রায়শই দেখা যায় যে, অনেক রাজনৈতিক দল ও নেতানেত্রীরই ক্ষমতাদখলের অন্ধ মোহ ও কিছু সাধারণ স্লোগান-কর্মসূচি ইত্যাদি ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে সুনির্দিষ্ট কোনো আদর্শই থাকে না।

আদর্শবাদ, ব্যবহারিক Practical Idealism. এর অর্থ হল কর্তব্যে এগিয়ে যাবার জন্যে একটি বিশেষ আদর্শ বা লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রতা; বিশেষত যে-আদর্শ বা লক্ষ্যকে মানবজাতির মুক্তির অনুকূল বলে বিবেচনা করা হয় তাকে আঁকড়ে থাকা। এটি দার্শনিক ভাববাদের প্রায় বিপরীত।

আদর্শের ব্যক্তিকরণ Personification of Ideology. কোনো ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কোনো আদর্শের মূর্ত রূপ ধারণের নামই হল আদর্শের ব্যক্তিকরণ। সমাজতান্ত্রিক শিবিরে এই কথাটি বহুলপ্রচলিত। আদর্শের ব্যক্তিকরণে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, ব্যক্তি-নেতার মধ্যে যখন আদর্শের ব্যক্তিকরণ ঘটে, তখন তিনি আর ব্যক্তিমাত্র থাকেন না, তিনি হয়ে যান যৌথ নেতৃত্বেরই মূর্ত রূপ। তাঁদের মতে, এরূপ ব্যক্তিকরণের সঙ্গে যৌথ নেতৃত্বের কোনোই বিরোধ নেই। আবার অনেকে মনে করেন যে, এরূপ ব্যক্তিকরণ কার্যত যৌথ নেতৃত্ববিরোধী এবং ব্যক্তিত্ববাদ (Personality Cult)-এরই নামান্তর। তাঁদের মতে এই উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি সংগঠনকে ছাড়িয়ে যান এবং যৌথ নেতৃত্ব কার্যত ঐ ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার হাতিয়ারে পরিণত হয়। এজন্যেই দেখা যায় যে, এরূপ 'অসাধারণ' নেতা সম্পর্কে তাঁর ভক্তরা যখন আদর্শের ব্যক্তিকরণ ঘটেছে মনে করে ভক্তিতে গদগদ হচ্ছেন, অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদীরা ঐ ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্ববাদ, এমনকি একনায়কত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার দায়ে অভিযুক্ত করছেন।

আদি সাম্যবাদী সমাজ : মানুষের প্রথম আর্থসামাজিক কাঠামো, যার উদ্ভব ঘটেছিল কয়েক হাজার বছর পূর্বে। এই পর্যায়ে শ্রমবিভাগ ছিল প্রাকৃতিক, অর্থাৎ নর-নারী ও তাদের বয়সভিত্তিক। এ-সময়ে উৎপাদনযন্ত্র অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় ছিল বলে উৎপাদিকাশক্তিও ছিল নিতান্ত পশ্চাৎপদ। এই পর্যায়ে উৎপাদনের উপায়সমূহ (জমি, হাতিয়ার ইত্যাদি)-এর মালিকানা ছিল সামাজিক। অবশ্য সামাজিক মালিকানার কাঠামোয় গৃহস্থালি দ্রব্যাদির মতো কিছু-কিছু বস্তুর ওপর ব্যক্তিমালিকানাও বলবৎ ছিল বটে। এ-সময়ে এক-একটি গোত্রের সকলে যৌথভাবে উৎপাদন করত এবং তা সকল সদস্যের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হত। যৌথতার মাধ্যমেই তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শত্রু ও বন্য পশুর হামলার মোকাবেলা করত। মানবেতিহাসের প্রথম শ্রমবিভাগ ছিল কৃষি ও পশুপালনের মধ্যে। আদি সাম্যবাদী সমাজের চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘটে দ্বিতীয় শ্রমবিভাগ, কৃষি ও হস্তশিল্পের মধ্যে। এই পর্যায়েই ক্রমশ ধনী, দরিদ্র, শোষণ, শ্রেণী ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটতে শুরু করে এবং আদি সাম্যবাদী সমাজ অবলুপ্ত হয়ে দাসসমাজের সূচনা ঘটে।

আধা সর্বহারা সমাজের যে-অংশটি সামান্য কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হলেও মূলত শ্রমশক্তি বিক্রয়ের ওপরই নির্ভরশীল, সেই অংশটিকে বলা হয় আধা সর্বহারা (Semi-proletariate)। কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকার দরুণ এদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিজনিত মনমানসিকতা খানিকটা বিরাজমান থাকলেও, এরা মূলত শোষিত ও নিপীড়িত বিধায়, এদের মধ্যে সর্বহারা শ্রেণীচরিত্রেরই থাকে প্রাধান্য। তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এদেরকে সর্বহারা শ্রেণীর নিকটতম মিত্র বলে গণ্য করা হয়।

আধা-সমাজতান্ত্রিক সমবায় এরূপ সমবায়ের প্রধানত দুটি দিক থাকে। প্রথমত, এরূপ সমবায়ে সমবায়ভুক্ত জমি ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় যৌথভাবে, যৌথ শ্রমের ভিত্তিতে এবং উৎপাদিত দ্রব্য বণ্টিত হয় শ্রম অনুযায়ী। এই যৌথতার রূপ সমাজতান্ত্রিক। দ্বিতীয়ত, এরই পাশাপাশি আধা-সমাজতান্ত্রিক সমবায়ে জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, গবাদি পশু ইত্যাদির ওপর সংশ্লিষ্ট সদ্যদের স্ব-স্ব ব্যক্তিমালিকানাও বহাল থাকে। এরূপ সমবায়কে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমবায়ে উত্তরণের পথে এক অন্তর্বর্তীকালীন ধাপ বলে বিবেচনা করা হয়।

আধিপত্যবাদ : Hegemony. এক রাষ্ট্র যখন অন্য বা অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর নিজের আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চায়, অর্থাৎ অন্যান্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে নস্যাৎ বা খর্বিত করে সেসব রাষ্ট্রের সরকার, প্রশাসন, অর্থনীতি, সমাজ ইত্যাদির ওপর নিজের প্রাধান্য বা মাতব্বরি চাপিয়ে দিতে চায়, তখন প্রথম রাষ্ট্রের এরূপ প্রবণতাকে বলা হয় আধিপত্যবাদ। সাধারণত কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক বা অন্য কোনো দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই অপর রাষ্ট্র ঐ রাষ্ট্রের ওপর তার আধিপত্য চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস পায়।

আধুনিক আধ্যাত্মবাদ : জীবিত ও মৃতের আত্মার সম্পর্ক-সম্পর্কিত মতবাদ। ১৮৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এর উৎপত্তি। এই মতবাদ অনুযায়ী আত্মার অভিব্যক্তি দ্বিবিধ, দেহনির্ভর ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রথমটির কারণ হল অচেতন পেশিসমূহের ক্রিয়া এবং দ্বিতীয়টির কারণ হল অচেতন মস্তিষ্কের ক্রিয়া।

আধুনিকীকরণের চারনীতি ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত চীনা জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে, চীনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জো এন লাই (চৌ এন লাই) আধুনিকীকরণের চার নীতি উপস্থাপন করেন। এই চার নীতি হল : ১. শিল্প; ২. কৃষি; ৩. সশস্ত্রবাহিনী এবং ৪. বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশের নীতি। মাও-পরবর্তী নেতৃত্বের মতে এই চার নীতি ছিল শ্রমজীবী জনগণের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক প্রগতির স্মারক। তাই তাঁরা এই চার নীতি এবং তা চিং তৈলখনি ও তা চাই স্বনির্ভর গ্রামের আদর্শ অনুসরণ করেন। 'চার কুচক্রী' এই চার নীতি মেনে নেয়নি এবং জো এন লাই ছিলেন বস্তুত 'চার কুচক্রী'-র ঘোর বিরোধী।

আধ্যাত্মিকতা : Spiritualism. সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ধারণা থেকেই আধ্যাত্মিকতার উদ্ভব। আধ্যাত্মিকতাবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, বস্তুজগৎ হল সর্বশক্তিমান সত্তা কর্তৃক সৃষ্ট এবং বস্তুজগতের মাধ্যমেই তাঁর ও তাঁর অসীম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। তাঁরা আরও মনে করেন যে, আত্মা অবিনশ্বর এবং দেহাতীতভাবে আত্মা অবস্থান করতে পারে। তাঁদের মতে, বস্তুগত জীবনের পরই রয়েছে বস্তুহীন অনন্ত জীবন। তাই

আধ্যাত্মিকতাবাদীদের সাধনা হল আত্মার শান্তি ও সুখময় অনন্ত জীবনের সাধনা। অবশ্য কোনো কোনো ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন যে, এক-এক জন্মের পাপ-পুণ্য অনুযায়ী আত্মা উন্নততর বা হীনতর দেহ ধারণ করে বারবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। এটাকে তাঁরা বলেন জন্মান্তরবাদ। কারও কারও মতে (যেমন বৌদ্ধদের) জন্মান্তরের একপর্যায়ে আত্মা চিরশান্তি বা নির্বাণ লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাবাদীরা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কৃপালাভের জন্যে এবং তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্যে সাধনা করেন। তাঁদের মতে, সঠিক পথে সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে একাত্মতায় উপনীত হওয়ার পর্যায়ে অতিপ্রাকৃত বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অর্জনও সম্ভবপর। বস্তুবাদীরা অবশ্য, আধ্যাত্মিকতাকে নিছক ভাববাদী ও অবান্তর ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চান।

আনজাস অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ইউনাইটেড স্টেটস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)-এর সমন্বিত-সংক্ষেপিত রূপ হল আনজাস (ANZUS)। বস্তুত এটি একটি জোটের নাম। ১৯৫১ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর সানফ্রান্সিসকোয় উক্ত তিনটি দেশের মধ্যে এক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে সাব্যস্ত হয় যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার এই তিন দেশের যে-কেউ আক্রান্ত হলে, তা তিন দেশের ওপরই আক্রমণ বলে গণ্য হবে এবং তিন দেশ সমবেতভাবেই তা প্রতিরোধ করবে। এতে সাব্যস্ত হয় যে, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের সামরিক-প্রতিরোধ শক্তিও জোরদার করা হবে। এই চুক্তির ফলশ্রুতিতে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড যুক্তরাজ্যের চাইতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেই অধিকতর অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ে।

আনন্দমার্গ ১৯৫৫ সালে ভারতীয় রেলওয়ের হিসাব বিভাগের কর্মচারী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সরকার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে 'হিন্দুত্ব' ভিত্তিক এই উগ্রপন্থি সংগঠনটি গঠন করেন। আনন্দমার্গীদের কাছে তাঁর নাম আনন্দমূর্তিজী। আনন্দমার্গ শব্দটির অর্থ আনন্দের পথ। মার্গের দাবি অনুযায়ী বর্তমানে ভারতে মার্গের ৪০ লাখেরও অধিক সদস্য আছে, তা ছাড়া বিদেশে আছে ৪৫ হাজারেরও বেশি সদস্য। মার্গের সদস্যদের কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হয়। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ৩২ থেকে ৩৬ দফা এবং সংসারীদের ১৬ দফা অনুশাসন মানা বাধ্যতামূলক। এ ছাড়াও মার্গীদের পালন করতে হয় মাসিক উপবাস। এঁরা মানুষের মাথার খুলি ও খড়্গ নিয়ে শ্মশানে উলঙ্গনৃত্য করেন। এঁরা সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। সারা ভারতে এঁদের প্রায় ৫০০টি অনাথ আশ্রম আছে। দলত্যাগীদের ব্যাপারে মার্গীরা অতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একসময় আনন্দমূর্তিজীর স্ত্রী ও ৫ জন সদস্য দলত্যাগ করলে তাঁদের সবাইকেও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ১৯৬৭ সালে মার্গের পুরুলিয়াস্থ সদর দফতর আক্রমণ করে। পরে সদর দফতর বিহারে স্থানান্তরিত করা হয় এবং পুলিশ এখানে হানা দিয়ে বিপুলসংখ্যক বোমা ও মানুষের মাথার খুলি উদ্ধার করে। ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল কলকাতার জনগণ ছেলেধরা সন্দেহে ১৭ জন আনন্দমার্গীকে পিটিয়ে বা পুড়িয়ে হত্যা করে। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী আনন্দমার্গসহ ২৫টি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরার ক্ষমতাচ্যুতির পর মার্গ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। আনন্দমার্গীদের প্রাণের মায়া তুচ্ছ, গুরুর প্রতি এঁদের অচলাভক্তি, নেতা বা গুরুর

জন্যে আত্মাহুতি দিতে এঁরা সদাপ্রস্তুত। আনন্দমার্গের চূড়ান্ত লক্ষ্য, অর্থের উৎস ইত্যাদি আজও রহস্যাবৃত।

আনসার : এই আরবি শব্দটির অর্থ স্বেচ্ছাসেবক। হজরত মুহাম্মদ (সা) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলে যেসব ব্যক্তি তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদের অভ্যর্থনা জানান এবং সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন তাঁরাই ইতিহাসে আনসার নামে খ্যাত।

আনোয়ার হোক্সা Enver Hoxha. আলবেনীয় রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ছিলেন। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর দল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু এ-সময় তাঁর সঙ্গে মস্কোর মতপার্থক্য শুরু হলে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন উভয়ের সমালোচনা করে কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক নতুন লাইনের সূচনা করেন। তাত্ত্বিক মতপার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সালে আলবেনিয়াকে ওয়ারশ চুক্তি থেকে বহিষ্কার করা হয়। আনোয়ার হোক্সা (বা হোজা)-এর মৃত্যুর পর আলবেনিয়ায়ও সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটে।

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র : Inter-Continental Ballistic Missile (ICBM) প্রচণ্ড ধ্বংসক্ষমতাসম্পন্ন, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপণাস্ত্র। এই ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আণবিক বোমাসহ বিভিন্ন বোমা নিক্ষেপণও সম্ভবপর। এই ক্ষেপণাস্ত্রকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধক (Anti-ICBM)-ও আবিষ্কৃত হয়েছে। মূলত, পরাশক্তিসমূহের এখতিয়ারেই রয়েছে এসব মারণাস্ত্রের সিংহভাগ। ফলে, পরস্পরের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এরা আবার নিজেদের মধ্যেই চালায় বিপজ্জনক অস্ত্র সীমিতকরণ আলোচনা, দাঁতাত ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ১৯৪৪ সালের ব্রেটন্ উড্স্ চুক্তি অনুযায়ী স্থাপিত হয় আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (International Monetary Fund—IMF)। এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বহুমুখী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। স্বর্ণমানের ভিত্তিতে সদস্য দেশসমূহের মুদ্রামানের সমতারক্ষা এবং পারস্পরিক বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষার মর্মেও সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে সদস্য দেশসমূহের চাঁদা ধার্য করা, যার ৭৫% স্ব-স্ব মুদ্রায় এবং ২৫% স্বর্ণে, মার্কিন ডলারে বা উভয়টি মিলিয়ে প্রদেয়। এই তহবিলের অপর উদ্দেশ্য হল কোনো সদস্যদেশের লেনদেনের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিলে, সংশ্লিষ্ট দেশকে বৈদেশিক মুদ্রা সাহায্যপ্রদান করা, যা সাধারণত তার কোটার ওপর ২৫%-এর অধিক হয় না। অবশ্য ১৯৬৮ সালে এই তহবিল বিশেষ উত্তোলন অধিকার (Special Drawing Rights—SDR)-এর প্রবর্তন করে, যাতে সদস্যেরা প্রয়োজনমতো তাদের ঘাটতি সম্পূরণ করতে পারে। (আই. এম. এফ.-ও দ্রষ্টব্য)।

আন্তর্জাতিক আইন যে-আইন মানতে একাধিক দেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ সেই আইনই আন্তর্জাতিক আইন। জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন দ্বিজাতিক বা বহুজাতিক জোট ও সংস্থাসমূহের চার্টার বা সনদ ইত্যাদিই আন্তর্জাতিক আইনের দলিল। যেমন সমুদ্রসীমা, জাহাজ-চলাচল, শুল্ক, সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তা, গণনির্যাতন রোধ, আগ্রাসনরোধ ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম প্রণেতা জাতিসংঘ।

কোনো দেশ যাতে তার প্রতি অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে সুবিচার পেতে পারে, তার জন্যে জাতিসংঘ গঠন করেছে আন্তর্জাতিক আদালত। এই আদালত অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে রায় বা Sanction দিতে পারে। তবে, সমস্যা হল এই যে, জাতীয় আদালতের ক্ষেত্রে যেমন, আদালত পুলিশের মাধ্যমে আইন অমান্যকারীকে আইন মানতে বা শাস্তি গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে; আন্তর্জাতিক আদালত প্রায়শই তা করতে ব্যর্থ হয়। প্রায়শই শক্তিশালী দেশসমূহ আন্তর্জাতিক আইন বা আদালতের তেমন একটা তোয়াক্কা করে না। এই দুর্বলতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক আইনই বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের মৌল বিধিমালা।

আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি International Atomic Energy Agency (IAEA)। আণবিক শক্তিকে শান্তি ও মানবকল্যাণের কাজে ব্যবহারে সদস্য রাষ্ট্রবর্গকে উদ্বুদ্ধ করাই জাতিসংঘের আওতাভুক্ত এই এজেন্সিটির মৌল কাজ।

আন্তর্জাতিক আদালত জাতিসংঘ সনদ মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)-এর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালের ১৮ এপ্রিল তারিখে, দি হেগে। এটি লীগ অব নেশানস-এর আন্তর্জাতিক স্থায়ী আদালত (Permanent Court of International Justice)-এরই উত্তরসূরি। এর প্রধান কাজ হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার বিবাদের নিষ্পত্তি করা। এর ১৫ জন বিচারপতি পরোক্ষভাবে সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক যৌথভাবে নির্বাচিত হন। প্রতি তিন বছরে এর এক-তৃতীয়াংশ পদ খালি হয়। এই আদালতের সনদে বলা আছে যে, জাতীয়তা-নির্বিশেষে এর বিচারকমণ্ডলী নির্বাচিত হবেন। বৃহৎ শক্তিসমূহের বিশেষ প্রভাব থেকে আদালতকে মুক্ত রাখাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু, কার্যত নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সর্বদাই এই আদালতে বহাল থাকেন এবং এঁদের কেউ মারা গেলে বা কারও মেয়াদ সমাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র থেকেই শূন্য পদ পূরণ করা হয়। বিবাদমান কোনো রাষ্ট্রের প্রতিনিধি-বিচারক না থাকলে, মামলা চলাকালীন উক্ত রাষ্ট্রের তরফ থেকে একজন অস্থায়ী বিচারক নিয়োগের বিধান রয়েছে। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ অন্তত বাহ্যত স্বীকার করে নিয়েছে যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ার একচ্ছত্র ১. কোনো চুক্তিবিশেষের ব্যাখ্যা; ২. আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত যে-কোনো প্রশ্ন; ৩. এমন কোনো বিষয়, যার অবস্থিতি আন্তর্জাতিক দায়িত্বভঙ্গের শামিল এবং ৪. আন্তর্জাতিক দায়িত্বভঙ্গের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য ব্যবস্থার প্রকৃতি ও আওতা। অবশ্য, যুক্তরাজ্য তার সঙ্গে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের বিবাদের ক্ষেত্রে এই আদালতের এখতিয়ার স্বীকার করতে চায় না। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও 'যেসব বিবাদ আবশ্যিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের এখতিয়ারভুক্ত'—সেসব বিবাদের ক্ষেত্রে এই আদালতের এখতিয়ার নেই বলে বিবেচনা করে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি ১৯৬০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাংক (IBRD)-এর অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (International Development Agency—IDA)-র জন্ম হয়। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক বিকাশে আর্থিক সাহায্যদানই এর মৌল উদ্দেশ্য। মার্কিন সিনেটর মাইক মনরোপন

১৯৫৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মার্কিন সিনেটে এরূপ একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং পরবর্তীকালে তা বিশ্বব্যাংকের গভর্নরগণ গ্রহণ করেন। এই সমিতির বিঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে সমিতির সদস্যভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এমন শর্তে ঋণ প্রদান করা, যা সহজ শর্তাধীন এবং যা অন্যবিধ ঋণের ন্যায় গ্রহীতা-দেশের লেনদেনের ভারসাম্যকে ব্যাহত করে না। এভাবে সমিতি বিশ্বব্যাংকের একটি পরিপূরক সংস্থা হিসেবে এর লক্ষ্যঅর্জনে সহায়তা করে। প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমিতির বিপুল স্বাধীনতা রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টই পদাধিকারবলে এই সমিতির প্রেসিডেন্ট। (আই. বি. আর. ডি.-ও দ্রষ্টব্য)।

আন্তর্জাতিক, প্রথম ১৮৬৪ সালে কার্ল মার্কস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সর্বহারা শ্রেণীর প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। প্রথম আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি স্থাপন করে। ১৮৭২ সালে এই আন্তর্জাতিকের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৮৭৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এর অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। ১৮৭২ সালের ২-৭ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হেগ কংগ্রেসে নৈরাজ্যবাদ ও পেটিবুর্জোয়া সুবিধাবাদের ওপর মার্কসবাদের বিজয় সূচিত হয় এবং বাকুনিন, গিল্যোম প্রমুখ আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন। মার্কস-এঙ্গেলস্-এর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেস ভবিষ্যতে মেহনতি মানুষের জাতীয় রাজনৈতিক পার্টি গঠনের পথকে প্রশস্ত করে।

আন্তর্জাতিক, দ্বিতীয় ১৮৮৯ সালে গঠিত সমাজতান্ত্রিক পার্টিসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বহু নেতা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন এবং নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পক্ষে যোগ দেন। ফলে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে যায়। ১৯১৯ সালে লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অনেক নেতা এতে যোগ দেন। তবে, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের সমাজতান্ত্রিক পার্টিসমূহের নেতারা বার্ন শহরে মিলিত হয়ে (১৯১৯) দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস পান। অবশ্য, এঁরা আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদীদের প্রতিভূরূপেই চিহ্নিত হন।

আন্তর্জাতিক, তৃতীয় ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের প্রথম কংগ্রেসে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত এই আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব দেন স্বয়ং লেনিন। এই আন্তর্জাতিক গঠনের ফলে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয় এবং নয়া কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের শক্তি ও প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণেও এই আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের যে সাংগঠনিক রূপ একটা ঐতিহাসিক পর্যায়ের প্রয়োজন মিটিয়েছিল, এখন সে-পর্যায় অতিক্রান্ত—এই যুক্তিতে ১৯৪৩ সালের মে মাসে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যকরি কমিটি এই আন্তর্জাতিকেরও অবলুপ্তি ঘটায়।

আন্তর্জাতিক, চতুর্থ দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে লিওন ট্রটস্কি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ১৯৩৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে চতুর্থ আন্তর্জাতিক গঠন করেন। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক তেমন একটা সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি। ১৯৫৩ সালে এই আন্তর্জাতিক দ্বিধাবিভক্ত ও কার্যত তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলাদেশের প্রস্তাবক্রমে ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদ ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। সৌদি আরব, ওমান, বেনিন, শ্রীলংকা, মিশর, রাশিয়া, বাহামা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, বেলোরুশ, ফিলিপিন্স, আইভরি কোস্ট, ভারত, হন্ডুরাস, গাম্বিয়া, মাইক্রোনেশিয়া, ভানুয়াতু, ইন্দোনেশিয়া, পপুয়া নিউগিনি, কমোরো, পাকিস্তান, ইরান, লিথুয়ানিয়া, ইতালি, সিরিয়া, মালয়েশিয়া, স্লোভাকিয়া ও প্যারাগুয়ে—এই ২৭টি দেশ প্রস্তাবটি সমর্থন করে। বিশ্বের ১৮৮টি রাষ্ট্রে প্রতি বছর দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। তৎকালীন পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। সরকারি বাহিনীর গুলিতে বরকত, সালাম, জব্বার, সালাউদ্দিন প্রমুখ শহীদ হন এবং তাঁদের প্রাণের মূল্যে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা অর্জন করে। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এই দিবসটি বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য বিধায় ইউনেস্কো এই দিবসটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (World Mother Language Day) হিসাবে গ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা International Labour Organisation (ILO)। ১৯১৯ সালে লীগ অব নেশনস্-এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে এর জন্ম হয়। আন্তর্জাতিক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে শ্রমিকসমাজকে সংগঠিত করা ও শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ, জীবনমান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নসাধনই এর উদ্দেশ্য। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৬ সালে এই শ্রম সংস্থার সঙ্গে জাতিসংঘের এক চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এটি জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবে বলে সাব্যস্ত হয়। সদস্যদেশসমূহের সরকার, শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই শ্রম সংস্থার কাঠামো গঠিত। শ্রমিক স্বার্থসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, ভিন্ন দেশে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়, বিশ্বব্যাপী শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখা ও শক্তিশালী করা এবং উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, কনভেনশন ইত্যাদির আয়োজন করা এই সংস্থার কর্মপরিধির অন্তর্গত। প্রতিবছর আহূত আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের মাধ্যমে সংস্থার নীতি-কর্মসূচি নির্ধারিত হয়। এই সম্মেলনে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র দুজন সরকারি, একজন মালিকপক্ষীয় ও একজন শ্রমিকপক্ষীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ২০ জন সরকারি প্রতিনিধি এবং মালিক ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ১০ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে এর গভর্নিং বডি গঠিত। এই বডি একজন মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন, যিনি সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অবস্থান করে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত করেন ও সংস্থার কার্যাবলী তদারক করেন। সংস্থার প্রধান কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত। পুঁজিবাদী দেশসমূহের মালিক-প্রতিনিধিরা একসময় দাবি উত্থাপন করেন যে, কমিউনিস্ট দেশসমূহ থেকে এই সংস্থায় মালিক-প্রতিনিধি নেয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই, কেননা তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মালিক নন, তাঁরা বরং তাঁদের স্ব-স্ব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ও সরকারেরই আজ্ঞাবহ। অবশ্য, এ-চেষ্টা সফল হয় না। সংস্থার গভর্নিং বডির ১০টি আসন কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, ভারত, ইতালি, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যে বরাদ্দ (এই সুবাদে যে, এই ১০টি

দেশে শিল্প ও শ্রমিকের গুরুত্ব সর্বাধিক)। বাকি ৩০টি আসন পূর্ণ করা হয় নির্বাচনের মাধ্যমে।

আন্তর্জাতিক, সর্বহারার সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে, ভৌগোলিক সীমা-নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল দেশের সর্বহারা শ্রেণী আসলে এক। কেননা তারা একইভাবে শোষিত, দরিদ্র ও মুক্তিকামী। এটাও মনে করা হয় যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তিসম্পন্ন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিততে হলে, সকল দেশের সর্বহারা শ্রেণীর মৈত্রী ও সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই বলা হয় সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা। কিন্তু উন্নত দেশসমূহের শিল্পশ্রমিকদের মজুরি ও জীবনমান অনেক উন্নত হওয়ার ফলে, তারা ক্লাসিক্যাল সর্বহারা শ্রেণীর মতো জঙ্গি নয়। তা ছাড়া, বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশ ও পার্টি অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গলানোর যে-নীতি গ্রহণ করেছে এবং সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের যে-সঙ্কট ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, তার ফলে সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার তত্ত্ব আপাতত অনেকখানিই তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে।

আন্তর্জাতিকতাবাদ Internationalism. আন্তর্জাতিকতাবাদীরা মনে করেন যে, জাতীয় সমস্যা মূলত আন্তর্জাতিক সমস্যারই বা তস্য ফলশ্রুতি বিশেষ। সুতরাং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমস্যার সমাধানের মধ্যেই জাতীয় পর্যায়ের সমাধান নিহিত। সমাজতন্ত্রীরাই প্রধানত এই মতবাদের অনুসারী। তাঁরা মনে করেন যে, শ্রমিক শ্রেণী বা সর্বহারা শ্রেণীর সমস্যা দেশ-নির্বিশেষে একই চরিত্রসম্পন্ন। সুতরাং বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন গড়ে তোলা ও বিজয় অর্জনের মধ্যেই জাতীয় পর্যায়ে সর্বহারাদের চূড়ান্ত ও স্থায়ী মুক্তি সম্ভবপর। আজকাল অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে মূলত কোনো বিরোধ নেই এবং ফলে জাতীয় সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার পাশাপাশি, বিশ্বের যে-কোনো দেশের জনগণের, বিশেষত সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বা সহযোগিতা প্রদান করতে কোনো বাধা নেই।

আপিল Appeal. নিম্নতর আদালত বা কর্তৃপক্ষের রায় বা সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে, উচ্চতর আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট পুনঃবিচার বা পুনঃবিবেচনার জন্যে আবেদন করাই হল আপিল।

আফিম যুদ্ধ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে দশকের পর দশক ধরে ব্রিটেন চীনে ক্রমবর্ধমানহারে বিপুল পরিমাণ আফিম রফতানি করার মাধ্যমে একদিকে ব্যাপক চীনা জনগণকে আফিমখোরে পরিণত করে এবং বিনিময়ে বিশাল পরিমাণ রৌপ্য নিজেদের দেশে পাচার করে আনে। ফলে, এর বিরুদ্ধে শুরু হয় বিক্ষোভ। ১৮৪০ সালে বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার অজুহাতে ব্রিটেন চীনে সামরিক হামলা শুরু করে। লিন সে সু-র নেতৃত্বে চীনের সিপাহিরা এই হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ক্যান্টন (বর্তমান গোয়াংজৌ)-এর জনগণের উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'ব্রিটিশদের ধ্বংস করো বাহিনী' গড়ে ওঠে। এর ফলে ব্রিটিশরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৮৪২ সালে দুর্নীতিবাজ চীন সরকার ব্রিটেনের সঙ্গে 'নানকিনের চুক্তি' স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুযায়ী সাব্যস্ত হয় যে, চীন ব্রিটেনকে ক্ষতিপূরণ দেবে, হংকং-এর স্বত্ব ত্যাগ করবে,

সাংহাই, ফু চো, এময়, নিংপো ও ক্যান্টনকে ব্রিটিশদের বাণিজ্যের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এবং চীনে আমদানিকৃত ব্রিটিশ পণ্যের ওপর শুল্ক নির্ধারণের ব্যাপারে ব্রিটেনেরও বক্তব্য থাকবে।

আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা Origanization of African Unity (OAU)। ১৯৬৩ সালের ২৫ মে আদ্দিস আবাবায় এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আলজিরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, বেনিন, বাতসোয়ানা, বুরুন্ডি, ক্যামেরুন, কেপ ভার্ডে, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, শাদ, কমোরোস, কঙ্গো, জিবুতি, মিশর, ইকোয়েটোরিয়াল গিনি, ইথিওপিয়া, গ্যাবন, গাম্বিয়া, ঘানা, গিনি, গিনিবিসাউ, আইভরি কোস্ট, কেনিয়া, লেসোথো, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, মালউয়ি, মাদাগাস্কার, মালি, মৌরিতানিয়া, মরিশাস, মরক্কো, মোজাম্বিক, নাইজার, নাইজেরিয়া, রুয়ান্ডা, সাওটোমে ও প্রিন্সিপ, সেনেগাল, সিসিলিজ, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সুদান, সোয়াজিল্যান্ড, তাঞ্জানিয়া, টোগো, তিউনিসিয়া, উগান্ডা, আপার ভোল্টা, জায়ারে, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে—এই ৫০টি রাষ্ট্র এই সংস্থার বর্তমান সদস্য। আদ্দিস আবাবায় এই সংস্থার সদর দফতর অবস্থিত। এর সদস্যরাষ্ট্রসমূহের প্রকিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অ্যাসেম্বলি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কাউন্সিল এবং একটি সেক্রেটারিয়েট রয়েছে। এই সংস্থার মৌল উদ্দেশ্যসমূহ হল ১. আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি জোরদার করা; ২. অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা; ৩. পারস্পরিক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা; ৪. আফ্রিকার বুক থেকে বর্ণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের উচ্ছেদ সাধন করা এবং ৫. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

আফ্রো-এশীয় সম্মেলন : এটি হল ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশসমূহের আন্তঃমহাদেশীয় সম্মেলন। যেসব দেশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিল তারা হল আফগানিস্তান, কম্বোডিয়া, শ্রীলংকা, চীন, মিশর, ইথিওপিয়া, গোল্ড কোস্ট, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, জাপান, জর্ডান, লাওস, লেবানন, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ইরান, ফিলিপিন্স, সৌদি আরব, সুদান, সিরিয়া, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও ইয়েমেন। সাইপ্রাস, যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকা জাতীয় সংগ্রেসের প্রতিনিধিরা দর্শক হিসেবে এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে কিছু মতভেদ হলেও সম্মিলিত সদস্যেরা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা; আনিয়ন্ত্রণাধিকার; কম্বোডিয়া, শ্রীলংকা, জাপান, জর্ডান, লাওস, লিবিয়া, নেপাল ও সংযুক্ত ভিয়েতনামকে জাতিসংঘের সদস্যত্ব প্রদান; মরক্কো ও তিউনিসিয়ায় ফরাসি উপনিবেশবাদ এবং নেদারল্যান্ডস ও নিউগিনিতে ওলন্দাজ উপনিবেশবাদসহ সকল উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধাচরণ, মানবাধিকারসংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণার প্রতি সমর্থন ইত্যাদির সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আবু বকর (রা), হজরত মহানবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ইন্তেকালের পর ৬৩২ সালের ৮ জুন হজরত আবু বকর (রা) মুসলিম রাষ্ট্রের খলিফা নির্বাচিত হন। সংখ্যাগুরুর অভিমত অনুসারে তিনি রাষ্ট্রপরিচালনা করতেন এবং সর্বদাই 'মজলিসে শূরা'র পরামর্শ মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তখন হজরত উমর (রা) ছিলেন মজলিসে শূরার সভাপতি। বায়তুল মাল বা গণকোষাগার থেকে তিনি একজন অতি সাধারণ কর্মচারীর সমপরিমাণ ভাতা গ্রহণ করতেন। এ-সময় হজরত আবু ওবায়দা (রা) ছিলেন বায়তুল মাল-এর অধিকর্তা। বায়তুল মালের সম্পদবণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি সাম্যের

নীতি গ্রহণ করেন। তিনি নবুওতের দাবিদারসহ সকল বিদ্রোহীদের যথাবিহিত কঠোরতার সঙ্গে দমন করেন এবং সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়েই মুসলিম বাহিনী তৎকালীন প্রবলপ্রতাপ পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের বাহিনীকে পরাজিত করে ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানা পরিবর্ধিত করে। 'ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ শাসকের জন্যে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য'—হজরত আবু বকর (রা) ছিলেন এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিমূর্তি। দুবছর তিন মাস এগারো দিন খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর ৬২৪ সালের ২৩ আগস্ট হজরত আবু বকর (রা) ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

আবুবকর তাফাওয়া বেলওয়া আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। ১৯৬০ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ নাইজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করলে আবু বকর তাফাওয়া বেলওয়া দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে নাইজেরিয়ার তিনটি অঞ্চলের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। এর শুরুতেই ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী আবু বকর তাফাওয়া বেলওয়া ও দুজন আঞ্চলিক মুখ্যমন্ত্রী নিহত হন এবং ইবো উপজাতীয় নেতা জেনারেল ইরনসি ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিনিও নিহত হন এবং জেনারেল ইয়াকুবু গাওয়ান ক্ষমতা দখল করেন।

আবুযর গিফফারি (রা) : হজরত বিবি খাদিজা (রা), হজরত আবুবকর (রা) ও হজরত আলি (রা) এই তিনজনের পরই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নিকটতম এই সাহাবি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (রা) বলেছিলেন, 'আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে আবুযরের চেয়ে অধিক সত্যবাদী।' তিনি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী ধনসম্পদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে এবং মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যান। তিনি মনে করতেন যে, সমস্ত সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর; সুতরাং সম্পদের ওপর সকল মানুষের সমান অধিকার। তাঁর মতে প্রয়োজনের (ন্যূনতম) অতিরিক্ত কোনো সম্পদ নিজের করায়ত্ত রাখার অধিকার কোনো মুসলমানের নেই। মসজিদের ভেতরে-বাইরে, খলিফার দরবারে, জনসমাবেশে, এক কথায় সর্বত্রই তিনি নির্ভয়ে ও জোরালো ভাষায় শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করতেন। এক অর্থে তিনিই ছিলেন বিশ্বের প্রথম সমাজতন্ত্রী। বস্তুত মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তাঁর মতবাদের মৌল পার্থক্য ছিল এই যে, মার্কসীয় সমাজতন্ত্রীরা আল্লাহ বা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; কিন্তু হজরত আবুযর গিফফারি (রা)-এর দ্ব্যর্থহীন সাম্যের ভিত্তিই ছিল আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল (সা) আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত কুরআন। রাসুলুল্লাহ (দঃ), হজরত আবুবকর (রা) ও হজরত উমর (রা)-এর আমলে কার্যত কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান (রা)-এর আমলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটায় এবং বৈষম্যের উন্মেষ দেখা দেওয়ায় হজরত উসমান (রা)-এর সঙ্গে হজরত আবুযর গিফফারি (রা)-র তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। তাঁকে কোনোক্রমেই নিরস্ত করতে না পেরে খলিফা তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা মারওয়ানের পরামর্শমতো আবুযর গিফফারি (রা)কে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেখানেও বিলাসপ্রিয় ও বিপুল সম্পদের অধিকারী আমির মা'বিয়া (রা)-র সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দিলে, তিনি নিপীড়িত জনগণকে মা'বিয়া (রা)-র বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে আহ্বান জানান। এমতাবস্থায় আমির মা'বিয়া (রা) তাঁকে নির্মমতার সঙ্গে মদিনায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। মদিনায় ফিরে এসেও তিনি

খলিফার বৈষম্যমূলক নীতির বিরোধিতা করতে থাকেন এবং অতিরিক্ত কর প্রদান বন্ধ করে দেয়ার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। ক্রুদ্ধ খলিফা নির্দেশ জারি করেন যে, জনগণ যেন হজরত আবুযর গিফফারী (রা)-র সঙ্গে কোনো কথাবার্তা পর্যন্ত না বলে। কিন্তু জনগণ তা মানছে না দেখে, খলিফা তাঁকে মরুভূমির মাঝখানে রাবজ নামক স্থানে নির্বাসিত করেন। এখানে পরম দারিদ্র্যের মধ্যে ৩২ হিজরির ৮ জিলহজ্ব তারিখে হজরত আবুযর গিফফারী (রা) ইন্তেকাল করেন। বস্তুত তিনিই ছিলেন নিখুঁত কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক ইসলামি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রধান উদ্গাতা।

আমলাতন্ত্র Bureaucracy. ফরাসি ব্যুরো (Bureau) বা সংস্থা এবং গ্রীক ক্রাটিন (Kratin) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে এই কথাটির উদ্ভব। প্রথমদিকে এই শব্দটি সরকারি কর্মচারীদের সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মকভাবে ব্যবহার করা হলেও পরবর্তীকালে শব্দটি সরকারি কর্মচারী শ্রেণী, বিশেষত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী শ্রেণীর সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে শক্তিশালী আর্থসামাজিক কাঠামো অনুপস্থিত বা দুর্বল বিধায়, এসব দেশে বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং কার্যত সকল কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। এঁদেরকে সিভিল সার্ভেন্ট বা জনগণের কর্মচারী হিসেবে অভিহিত করা হলেও অনুন্নত বা অর্ধন্নোত দেশে এঁরাই হয়ে দাঁড়ান জনগণের প্রকৃত মালিক-মোক্তার এবং দেশী-বিদেশী শোষণের প্রতিভূ। সাবেক উপনিবেশ বা কলোনিসমূহে এঁরাই সাবেক উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও স্বার্থের যোগসূত্র। উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে শক্তিশালী আর্থসামাজিক কাঠামোর অবস্থানের দরুন আমলাতন্ত্র তেমন প্রবল নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ সম্পর্কেও অনেকে অভিযোগ করেন যে, সেসব দেশেও বনেদি আমলাতন্ত্রের স্থলে পার্টি-আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছে এবং এই পার্টি-আমলাতন্ত্রই সেসব দেশের কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী (Vested Interest Group)-এ পরিণত হয়েছে। অবশ্য যেসব সাবেক কমিউনিস্ট দেশ বর্তমানে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদে ফিরে এসেছে, সেসব দেশ থেকে পার্টি-আমলাতন্ত্রেরও অবসান ঘটছে। উদাহরণ, পূর্ব ইউরোপীয় সাবেক কমিউনিস্ট দেশসমূহ।

আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র Bureaucratic State. যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য, তাকেই বলে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) প্রমুখ তত্ত্ববিদরা বলেন যে, কালক্রমে সমাজতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী নির্বিশেষে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রব্যবস্থাই প্রায় একই রূপ ধারণ করবে, কারণ সময়ের সাথে সাথে জটিলতাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সকল দেশেই আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে এবং আমলাতন্ত্রের সদস্যদের চরিত্র সর্বত্রই প্রায় একই রূপ আছে এবং থাকবে।

আমলা-দালাল Bureaucrat-Comprador. কোনো দেশের আমলারাই যখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রিমিয়াম, দালালি বা উৎকোচের বিনিময়ে বিদেশী স্বার্থ বা বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দালালিতে লিপ্ত হয় এবং তাদের স্বার্থে জাতীয় শিল্প ও জাতীয় অর্থনীতির বিকাশকে ব্যাহত করে, তখন এরূপ আমলাদের বলা হয় দালাল-আমলা বা আমলা-দালাল। অনুন্নত বিশ্বে প্রায়শই রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার সুযোগে এই আমলারাই ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে বিদেশী স্বার্থের দালালি করে এবং জাতিকে পশ্চাৎপদ

রাখার মূল্যে নিজেদের অর্থসম্পদ গড়ে তোলে। সমাজতন্ত্রীদের মতে, এরা দালাল ব্যবসায়ী বা দালাল শিল্পপতিদের তুলনায়ও অধিকতর ভয়াবহ ও ক্ষতিকর; কেননা এরা উচ্চ পদাধিকার ও প্রশাসনিক ক্ষমতার দরুন জাতীয় স্বার্থের অধিকতর ক্ষতি করতে সমর্থ। একই কারণে, এদের প্রতিহত করাও অধিকতর দুঃসাধ্য। অনুন্নত দেশসমূহের রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প ও ব্যাবসার মূল ফায়দাটাও প্রায়শ এরাই লুটে থাকে। যেখানে সামরিক আমলারা সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন, সেখানে সামরিক আমলারাও আমলা-দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

আমলা-পুঁজি : আমলা নিয়ন্ত্রিত বা আমলানির্ভর পুঁজিকেই বলে আমলা-পুঁজি। অনুন্নত দেশসমূহে, বিশেষত সাবেক উপনিবেশসমূহে এরূপ পুঁজির দৌরাত্ম্য দেখা যায়। এসব দেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন প্রায়শই, এসব দেশ শিল্প ও শিল্পোৎপাদনের দিক থেকে পশ্চাৎপদ থাকে। অপরদিকে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবের দরুন, রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও পৃষ্ঠপোষণায় পুঁজি গড়ে ওঠারও অবাধ অবকাশ থাকে না। ফলে, যতটুকুই শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে কিংবা ব্যাবসা-বাণিজ্য ও আমদানি-রফতানি চালু থাকে, সেসবের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায় সংশ্লিষ্ট দেশের আমলারা। আমলাদের স্বার্থ অনুযায়ীই এরূপ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আমলারা একাধারে প্রশাসক, সিদ্ধান্তদাতা ও ধনসম্পদের মালিক হয়ে বসে। এই পরিস্থিতিতে, আমলারা যেহেতু কোনো বিনিয়োগ করে না, সেহেতু শিল্পকারখানা বা ব্যাবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক বিকাশের বদলে, উৎকোচ ও দালালিপ্রাপ্তিকেই তারা অধিকতর প্রাধান্য দেয়। ফলে আমলা-পুঁজি জাতীয় শিল্প-কারখানা, উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মাও ঝে ডং (মাও সে তুং)-এর মতে অবশ্য মুষ্টিমেয় বৃহৎ বুর্জোয়া যখন রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে, তখন একচেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে একীভূত হয়ে যে-পুঁজির সৃষ্টি করে, সেটাই হল আমলা-পুঁজি।

আমানুল্লাহ, বাদশাহ : বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহ ও তাঁর স্ত্রী রানি সুরাইয়া পশ্চাৎপদ আফগানিস্তানকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার সংস্পর্শে আনার এবং আফগানদের একটি উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। কামাল আতাতুর্কই বাদশাহ আমানুল্লাহকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ১৯২৭-২৮ সালে তিনি ইউরোপ ও নিকট প্রাচ্য সফর করে এসে, অন্যান্য আধুনিকীকরণ-সংক্রান্ত আইনের পাশাপাশি এই আইনও জারি করেন যে, অতঃপর আফগানিস্তানে কোনো পুরুষ একাধিক স্ত্রী রাখতে পারবে না, মহিলারা ঘোমটা ব্যবহার করতে পারবে না এবং আফগানদের ঢিলেঢালা পোশাক ছেড়ে ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করতে হবে। স্বভাবতই মোল্লা ও গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহ শুরু করে। এর পরিণামে ১৯২৯ সালে বাদশাহ আমানুল্লাহ উচ্ছেদ হয়ে যান এবং বাচ্চায়ে সাক্কা নামক জনৈক আফগান সরদার ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু দেশে অরাজকতা অব্যাহত থাকলে, ব্রিটেনের সহায়তায় জেনারেল নাদির শাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

আমিরুল মুমেনিন এই আরবি কথাটির অর্থ বিশ্বাসীদের নেতা। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর বিন খাত্তাব (রা) প্রথম এই উপাধি গ্রহণ করেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাগণ এবং তাঁদের বিরুদ্ধবাদী, খিলাফতের দাবিদার হজরত আলি (রা) ও বিবি

ফাতেমা (রা)-র বংশধররাও এই উপাধি ব্যবহার করতেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে এই উপাধি অধিকতর ব্যবহৃত হত। বাগদাদের পতন (১২৫৮ খ্রিঃ)-এর পর পূর্বাঞ্চলের কোনো কোনো ক্ষুদ্র শাসকও এই উপাধি ধারণ করেন। আল-মুরাবিত প্রমুখ রাজবংশ, যাঁরা আব্বাসীয়দের প্রাধান্য স্বীকার করতেন না, তাঁরাও নিজেদের 'আমির আল মুসলিমিন' বলে পরিচয় দিতেন। তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী আল মুওয়াহ্‌হিদুন আফ্রিকায় স্বাধীন খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে 'আমিরুল মুমেনিন' উপাধি গ্রহণ করেন। মরক্কোর শরিফগণও দীর্ঘদিন যাবৎ এই উপাধি ব্যবহার করতেন।

আমেরিকান রাষ্ট্র সংস্থা : Organization of American States (OAS)। ১৯৪৮ সালের ৩০ এপ্রিল কলম্বিয়ার রাজধানী বাগোটায় স্বাক্ষরিত এক চার্টারের মাধ্যমে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালে এই চার্টার কার্যকর করা হয় এবং ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে এই চার্টারের দুটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন করা হয়। ওয়াশিংটনে সদর দফতর সম্পন্ন এই সংস্থা নিম্নলিখিত ২৮টি রাষ্ট্রসমন্বয়ে গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কিউবা, পানামা, জ্যামাইকা, হাইতি, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, এলসালভাডর, গ্রানাডা, গুয়াটেমালা, চিলি, বলিভিয়া, ব্রাজিল, কোস্টারিকা, বারবাডোজ, নিকারাগুয়া, প্যারাগুয়ে, পেরু, সেন্ট লুসিয়া, সুরিনাম, ত্রিনিদাদ, টোবাগো, হন্ডুরাস, উরুগুয়ে ও ভেনিজুয়েলা। ১৯৬২ সালে কিউবাকে সংস্থার কর্মধারায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয় এবং কানাডাকে স্থায়ী পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদান করা হয়। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর সদস্যরাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং পরস্পরের মধ্যে সংহতি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। জেনারেল অ্যাসেম্বলি এর সর্বোচ্চ পরিষদ এবং জেনারেল সেক্রেটারিয়েট এর স্থায়ী কার্যকরী পরিষদ। এ ছাড়াও সংস্থার বিভিন্ন শাখা রয়েছে।

আম্র কূটনীতি Mango Diplomacy. ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ভারতের পঞ্চাশতম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন, উপরাষ্ট্রপতি কৃষাণ কান্ত এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দরকুমার গুজরালসহ বিভিন্ন ভারতীয় নেতার কাছে পাকিস্তানি আমের উপহার পাঠান। এটাকেই কূটনৈতিক মহল ম্যাঙ্গো ডিপ্লোম্যাসি বলে অভিহিত করেন। নওয়াজ শরিফের এসব উদ্যোগের ফলে পাক-ভারত সম্পর্কের অনেকটা উন্নতি ঘটলেও, ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে উভয় দেশই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে সম্পর্কের পুনরায় অবনতি ঘটে।

আয়, আপাত Nominal Income. শুধু আর্থিক বা আঙ্কিক হিসেবে যে-আয়, তাকেই বলে আপাত আয়। আপাত আয়ের ক্ষেত্রে এরূপ আয়ে ক্রয়ক্ষমতা বাড়ল কি কমল, তা বিবেচনা করা হয় না।

আয়, প্রকৃত Real Income. আয়ের টাকায় কতটা সামগ্রী বা সার্ভিসেস ক্রয় করা যায়, তারই নিরিখে প্রকৃত আয় নির্ণীত হয়। যেমন ধরা যাক, কোনো এক সময়ে মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়ল ২০%, কিন্তু দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেল গড়ে ৩০%। এক্ষেত্রে আপাত আয় ঠিকই বেড়ে গেল, কিন্তু প্রকৃত আয় কমে গেল; কেননা এই ২০% বর্ধিত আয় সত্ত্বেও দ্রব্য ক্রয় করা যাবে আগের তুলনায় কম।

আরব লীগ ১৯৪৫ সালের ১০ মে মিশর, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, সৌদি আরব, সিরিয়া ও ইয়েমেনের সমন্বয়ে আরব লীগ নামক এই শিথিল কনফেডারেশনটি গঠিত হয়। আরব জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, আরব অঞ্চলের পারস্পরিক স্বার্থের ক্ষেত্রে সহযোগিতা, আরব এলাকায় উপনিবেশবাদের বিরোধিতা, ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ ইত্যাদিই ছিল এই সংস্থা গঠনের মৌল উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে আলজিরিয়া, বাহ্‌রাইন, লিবিয়া, কুয়েত, মরক্কো, ওমান, কাতার, সোমালিয়া, তিউনিসিয়া প্রমুখ দেশও এই সংস্থায় যোগ দেয়। ১৯৭৮ সালে মিশর ও ইসরায়েলের মধ্যে প্যালেস্টাইনের স্বার্থবিরোধী 'ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি' স্বাক্ষরিত হলে, আরববিশ্বে এর বিরুদ্ধে তীব্র ঝড় ওঠে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে মিশর আরব লীগ ত্যাগ করে। ফলে সংস্থার সদর দফতরও কায়রো থেকে তিউনিসে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্যসংখ্যা ২১।

আরুশা ডিক্লারেশন : তাঞ্জানিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিধান ও রূপ-কাঠামোর ঘোষণা। এই ঘোষণার মূল কথা হল 'মালিয়া উম্মা'—যার অর্থ সকল অর্থসম্পদ রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। এই ঘোষণা মোতাবেক তাঞ্জানিয়ার এরূপ সকল গ্রামাঞ্চলকে 'উজামা' বা যৌথ খামারের আওতায় সংগঠিত করা হয়। তাঞ্জানিয়ায় সমাজতন্ত্রের উদ্গাতা প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নাইরেরে। তিনি তাঁর জনগণের নিকট 'মুয়ালিম' বা শিক্ষক বলে পরিচিত।

আর্য একটি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর নাম। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে যিশুখ্রিস্টের জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্বে আর্যরা মধ্যএশিয়ায় বসবাস করত এবং পরবর্তীকালে তারা ভারতীয় উপমহাদেশসহ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। বলিষ্ঠ গড়ন, উন্নত নাসিকা ও নীলাভ চোখ এদের বৈশিষ্ট্য। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের মতে আর্যরা ইউরোপের আদিম অধিবাসী উরফোক (Urvolk) জাতিরই অংশবিশেষ। ভারতীয়দের, বিশেষত হিন্দুদের অনেকেই নিজেদের আর্য জাতিভুক্ত বলে মনে করেন। তবে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসী এবং উত্তর ভারতের কিছু-পরিমাণ জনগোষ্ঠীকে যথার্থ আর্য বলে বিবেচনা করা হয়। জার্মানরা মনে করে যে, তারাই একমাত্র নির্ভেজাল আর্য। হিটলার এই তত্ত্বের ভিত্তিতে জার্মানদের এই বলে বিশ্বজয়ে উদ্বুদ্ধ করেন যে, যেহেতু জার্মানরাই বিশ্বের নীলতম রক্তের অধিকারী, সেহেতু বিশ্বের তাবৎ নিকৃষ্টতর জনগোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব করার ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার একমাত্র তাদেরই। ইহুদিদের জার্মানরা নিচু জাতিভুক্ত বলে বিবেচনা করত। আর্যদের প্রতীক হল স্বস্তিকা।

আল-ফাতাহ ইহুদিদের কবল থেকে প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সালে ইয়াসির আরাফাত নামের এক তরুণ প্রকৌশলির নেতৃত্বে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে আল-ফাতাহ্ প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পি. এল. ও.) নামক যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিকদল হিসেবে যোগদান করে। পি. এল. ও.-র শরিকদলের মধ্যে আল-ফাতাহই বৃহত্তম এবং এই সুবাদে এর নেতা ইয়াসির আরাফাতই পি. এল. ও.-এরও প্রধান নেতা। পরবর্তীকালে ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে মতভেদের কারণে কিছুসংখ্যক সদস্য আল-ফাতাহ্ থেকে বেরিয়ে গেলেও আল-ফাতাহই প্যালেস্টাইন মুক্তিসংগ্রামে বৃহত্তম সংগঠন হিসেবে বহাল থাকে।

বর্তমানে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইয়াসির আরাফাত এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন এবং আল-ফাতাহই মূলত প্যালেস্টাইনের শাসনকার্য পরিচালনা করছে।

আল-ফারাবি (৮৭০-৯৫০); তুর্কি বংশোদ্ভূত আল ফারাবি ছিলেন প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রাজনৈতিক চিন্তাধারার অন্যতম অনুসারী ও ভাষ্যকার। তাঁর মতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক মানবদেহের বিভিন্ন অংশের মতোই পরস্পর-সম্পৃক্ত এবং শাসক হচ্ছে এর হৃৎপিণ্ড বা প্রাণকেন্দ্র। তিনি আরও বলেন যে, রাষ্ট্র-পরিচালনা ও প্রজাদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল গুণাবলী কোনো একক ব্যক্তিত্বের মধ্যে না থাকার সম্ভাবনাই অধিক বিধায় কতিপয় ব্যক্তির যৌথশাসনই শ্রেয়।

আলজিরিয়া সংকট : বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেনবেল্লা প্রমুখ তরুণরা আলজিরিয়াকে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত করার জন্যে গঠন করেন জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট (Front de Liberation Nationale—FLN)। প্রায় ৩,৫০,০০০ প্রাণের বিনিময়ে ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে আলজিরিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের জুন মাসে এক সামরিক ক্যু-এর মাধ্যমে কর্নেল হুয়ারি বুমেদিন বেনবেল্লা সরকারকে উৎখাত করেন। ১৯৮৮ সালের অক্টোবরে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দিলে সরকার তা কঠোর হস্তে দমন করে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য হলে এই নির্বাচনে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট প্রায় ৮০% ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়। এমতাবস্থায়, সামরিক বাহিনী আর-এক ক্যু-এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট শাদলি বেনাজাদিদ সরকারকে উৎখাত করে এবং বিজয়ী ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেও অস্বীকার করে। ফলে, শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধে ১৯৯৭ সাল নাগাদ ১,১০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

আলি (রা), হজরত হজরত উসমান (রা)-এর হত্যার পর হজরত আলি (রা) ইসলামের চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন (২৩ জুন, ৬৫৬ খ্রিঃ)। হজরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণে বিলম্ব করায় মহানবী (সা)-র পত্নী বিবি আয়েশা (রা) ও আমির মুআবিয়া খলিফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সিরিয়া, কুফা, মিশর প্রভৃতি অঞ্চলেও বিদ্রোহের শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। আলি (রা) ব্যক্তিগতভাবে একজন অতি বড় যোদ্ধা ও সেনানায়ক হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর পক্ষে এসব বিশৃঙ্খলা পুরোপুরি দমন করা সম্ভবপর হয় না। অপরদিকে, আমির মুআবিয়া অধিকতর কূটবুদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জোরে আত্মপ্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করে তোলেন। সুচতুর আমর বিন আস মুআবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করায় তাঁর শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। হজরত আলি (রা) ছিলেন মহাবীর, জ্ঞানী, বাগ্মী, সত্যনিষ্ঠ ও সর্বত্যাগী তাপস। কিন্তু সহনশীলতা, মহানুভবতা ও সরলতার জন্যে তিনি শাসক হিসেবে চূড়ান্ত কঠোরতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হননি। সিফফিনের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দুম্মাতুল জুন্দলে সালিশ বসলে ১২,০০০ সৈন্যের একটি দল 'আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন মানি না'—ধ্বনিসহকারে আলি (রা)-এর পক্ষ ত্যাগ করেন এবং ইতিহাসে দলত্যাগী বা খারিজি হিসেবে চিহ্নিত হন। খারিজিরা আমির মুআবিয়া, তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা আমর বিন আস ও খলিফা হজরত আলি (রা)—তিনজনকেই হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হলেও, ৬৬১ সালের ২৭ জানুয়ারি তারা ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলি (রা)-কে হত্যা করতে সমর্থ হয়। হজরত উমর (রা)-এর ন্যায় তিনিও সর্বপ্রকার শোষণ

ও অসম বণ্টনব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। হজরত উসমান (রা) আত্মীয়-পরিজনদের খানিকটা প্রশ্রয় দেয়ায়, আমির মুআবিয়া, আমর বিন আস ও মারওয়ানকে মুসলমানদের অসন্তোষ সত্ত্বেও প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে বহাল রাখায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণকে অনুমতি দেয়ায় হজরত আলি (রা) তাঁর প্রতি অনেকটা অসন্তুষ্ট ছিলেন। মুসলমানদের একটি দল, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মহানবী (সা)-র তিরোধানের পর শুধুমাত্র হজরত আলি (রা)-ই ছিলেন মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নেতৃত্বদানের একমাত্র অধিকারী, পূর্ববর্তী তিনজন খলিফার খিলাফত ছিল বস্তুত অবৈধ এবং হজরত আলি (রা)-এর বংশধররাই বংশপরম্পরায় মুসলমানদের সার্বিক নেতৃত্ব বা ইমামতের জন্যে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিনিধি—তাঁরাই আহলে তা'সি বা শিয়া নামে পরিচিত। তবে, হজরত আলি (রা)-র আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব সুন্নি মুসলমানরাও স্বীকার করেন।

আলেন্দে হত্যাকাণ্ড : সালভাদর আলেন্দে ছিলেন চিলির জনপ্রিয় সমাজতান্ত্রিক নেতা। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আলেন্দে সরকার গঠনের পর সিআইএ ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা তৎপর হয়ে ওঠে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য। মার্কিন ষড়যন্ত্রের মুখে ১৯৭৩ সালের ২৩ আগস্ট আলেন্দে জেনারেল অগাস্তে পিনোচেট (বা পিনোশে)-কে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করেন। এর ১৮ দিন পর ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে পিনোচেট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন এবং প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ 'লা মন্ডে' এর ওপর বেপরোয়া রকেট বর্ষণ করে প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দেসহ বহু লোককে হত্যা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে পিনোচেটকে অভিনন্দিত করে। চিলিতে কায়েম হয় সামরিক একনায়কত্ব। পিনোচেটের নির্মম নিপীড়নের ফলে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয় এবং চিলির তৎকালীন এক কোটি অধিবাসীর মধ্যে ১০ লক্ষই (আলেন্দে পরিবারের সকল সদস্যসহ) নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন। প্রতিবেশী দেশসমূহে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের খুঁজে বের করে হত্যা করার উদ্দেশ্যে পিনোচেট 'অপারেশন কনডর' (Operation Condor) নামে এক অপারেশন চালান এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ের সরকারকে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন। স্পেনের বিচারপতি বালটাসার গার্জন ৩০০ পৃষ্ঠার এক দলিলে পিনোচেটের গণহত্যা, সন্ত্রাস ও নির্যাতনের তথ্য প্রকাশ করেন। এতে দেখা যায় যে, অভ্যুত্থানের ১৯ দিনের মধ্যেই জান্তা কর্তৃক ৩২০ জনকে হত্যা করা হয় এবং পরবর্তী দুদশকে হত্যা করা হয় ২৫২৮ ব্যক্তিকে (মতান্তরে ৩১৯৭ ব্যক্তিকে), যার মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে। এই হত্যার প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। এ ছাড়াও হাজার হাজার লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ১৯৯০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পেত্রিসিও অলউইন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং পিনোচেটের শাসনের অবসান ঘটে। প্রেসিডেন্ট অলউইন সম্মানের সাথে আলেন্দের দেহাবশেষ সেন্টিয়াগোয় সমাহিত করেন। ১৯৯৪ সালে আলেন্দে-কন্যা ইসাবেলও সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন। ইতিমধ্যে আলেন্দে পুনরায় জাতীয় হিরো হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৯৮ সালে জেনারেল পিনোচেট ব্রিটেনে গ্রেফতার ও বিচারের সম্মুখীন হন।

আল্লাহ : পরম সত্তা বা সৃষ্টিকর্তা, যিনি অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড, নিরাকার, সদা সর্বব্যাপী সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা ও সর্বশক্তিমান। আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা, পালনকারী ও ধ্বংসকারী। ইসলাম ধর্মমতে আল্লাহ একক ও অংশীদারহীন। কিন্তু কোনো কোনো ধর্মে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বা গড বা ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ ও অংশীদারিত্ব কল্পনা করা হয়। যেমন হিন্দু ধর্মে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা), বিষ্ণু (পালনকর্তা) ও মহাদেব (ধ্বংসকর্তা) এই তিন রূপে অবস্থিত। আবার, খ্রিস্ট ধর্মমতে পবিত্র গড, পবিত্র গোস্ট বা জিব্রাইল (গ্যাব্রিআল) ও পবিত্র পুত্র বা যিশুখ্রিস্ট—এই ত্রয়ী সত্তা বা ট্রিনিটিই হল ধর্ম ও ত্রাণের সারকথা। যাঁরা মার্কসীয় দর্শন ও বস্তুবাদে বিশ্বাস করেন, তাঁদের মতে বস্তুর অভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি, বিকাশ ও ধ্বংসের কারক। এর বাইরে কোনো সত্তা বা সর্বশক্তিমানের চিন্তা মার্কসীয় মতে অবৈজ্ঞানিক, কল্পনাপ্রসূত ও শোষণের দূরভিসন্ধিমূলক। অবশ্য, বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের শেষের দিকে বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের সংকট দেখা দিলে ও কমিউনিস্ট দেশসমূহ থেকে কমিউনিজমের উচ্ছেদের ধারা শুরু হলে, সেসব দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষও পুনরায় ধর্মের দিকে ফিরে যেতে এবং পরম সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করতে শুরু করে। আধুনিক বিজ্ঞানও সর্বব্যাপী এক মৌল শক্তি (Fundamental Power)-র অস্তিত্ব স্বীকার করে। এ ছাড়া বিজ্ঞানের জেনেটিকস, সাইবারনেটিকস প্রভৃতি শাখা প্রমাণ করে যে, মানুষের মেধা, যোগ্যতা, ঝোঁক ইত্যাদি মূলত পূর্বনির্ধারিত বা Genetically Programmed। ফলে, অনেক বৈজ্ঞানিক এই সর্বব্যাপী মৌল শক্তি, যার ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি, বিকাশ ও ধ্বংস সাধিত হয় এবং সমগ্র সৃষ্টি একটি সূক্ষ্ম, সুনির্দিষ্ট ও অভ্রান্ত নিয়মে পরিচালিত হয়, সেই শক্তিকেই আল্লাহ বা সর্বশক্তিমান বলে বিবেচনা করেন। ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় আল্লাহর গুরুত্ব একক ও প্রশ্নাতীত, কেননা ইসলামি মতে সার্বভৌমত্ব, শাসন, আদেশ, হুকুম, পালন ও ত্রাণের একমাত্র কর্তৃত্ব আল্লাহর; তিনিই সৃষ্টির সবকিছুর (সম্পদসহ) একমাত্র চূড়ান্ত মালিক ও ব্যবস্থাপক। সুতরাং মুসলমানেরা মনে করেন যে, মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে, শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর নির্দেশাবলীকে কার্যকর করা। ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রবক্তারা আরও বিশ্বাস করেন যে, সম্পদ যেহেতু আল্লাহর, সেহেতু সম্পদে সকল মানুষের অধিকার সমান। আল্লাহয় বিশ্বাসীরা একথাও মনে করেন যে, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, সর্বস্রষ্টা আল্লাহ চূড়ান্ততম সচেতনতার অধিকারী।

আশাবাদ ও হতাশাবাদ Optimism and Passimissm. উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি দার্শনিক জে. সালি এবং ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক জর্জ ইলিয়ট 'অপটিমিজম' শব্দটির প্রচলন করেন। আশাবাদের চূড়ান্ত প্রবক্তা ছিলেন লিবনিজ (Leibniz)। তাঁর মতে, এই পৃথিবীর চেয়ে ভালো কোনো জায়গার কথা কল্পনাই করা যায় না। আশাবাদের মূলকথা হল, বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবীরূপেই ভালো। আর আশাবাদের বিপরীত দর্শন হতাশাবাদের মূলকথা হল, অবস্থা নিঃসন্দেহে খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যেতে বাধ্য। জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার প্রমুখ দার্শনিকের দর্শনের ভিত্তি ছিল এই হতাশাবাদ।

আসমাউল হুসনা : আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহকে (যা সংখ্যায় ৯৯) বলা হয় আসমাউল হুসনা। রহমান, রহিম, করিম, হান্নান, মান্নান, কুদ্দুস, সালাম, ওহাব ইত্যাদি ৯৯টি নাম

ছাড়াও আল কুরআনে আহাদ, রব, মুনএম, মুতি, সাদিক ও সাত্তার—আল্লাহর এই ছয়টি নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

আসিয়ান ASEAN. এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হল Association of South East Asian Nations, অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংঘ। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার সংঘর্ষের পরপরই ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন্স—এই পাঁচটি উদ্যোক্তা-সদস্যের উদ্যোগে আসিয়ান গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য হল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করা। সত্তরের দশকে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও লাওসে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে, শঙ্কিত আসিয়ান সদস্যরা ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত 'আসিয়ান ঐকমত্য ঘোষণা'—শীর্ষক ঘোষণায় যা বলা হয়, তার তাৎপর্য হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সমাজতন্ত্রেরমূলোৎপাটন। ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া এই ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করে। ১৯৭৮ সালে জাকার্তায় স্থাপিত হয় আসিয়ানের স্থায়ী সেক্রেটারিয়েট। এর প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল ইন্দোনেশিয়ার জেনারেল রেক্সো দার্শনো ইন্দোনেশীয় সরকারের বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির সমালোচনা করায় ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পদচ্যুত হন। আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে হ্রাসকৃত শুল্কে বাণিজ্য ও শিল্প বিনিয়োগ নীতি চালু করার কথা থাকলেও, স্বার্থের স্ববিরোধিতা একে আশানুরূপ গতিশীল করে তুলতে পারেনি। আসিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতা করছে প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া। এসব দেশ এবং ইইসিভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে আসিয়ানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। চীনও আসিয়ানকে সমর্থন দিয়েছে, প্রধানত এই ভরসায় যে, এর আওতাভুক্ত দেশসমূহ তৎকালীন সোভিয়েত প্রভাববলয়কে প্রতিহত করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহ কখনোই চীনকে তেমন একটা সুদৃষ্টিতে দেখেনি।

আহমদিয়া পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান-নিবাসী মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানির অনুসারীরাই কাদিয়ানি বা আহমদিয়া নামে পরিচিত। আহমদিয়ারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করলেও বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে তাদের মতপার্থক্য সুস্পষ্ট। যেমন—তারা বলে যে, ১. নবীর আগমন শেষ হয়নি; হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরও নবী আসতে পারে এবং গুলাম আহমদ কাদিয়ানি তেমনি একজন নবী; ২. হজরত ঈসা (আঃ) দৃশ্যত মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর ঐশী বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে আগমন করেন এবং ১২০ বছর বয়সে শ্রীনগরে ইন্তেকাল করেন; ৩. মাহদীকে যিশু, হজরত মুহাম্মদ (সা) ও শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে বিবেচনা করতে হবে এবং প্রতিশ্রুত 'মাসিহ'রূপে মির্জা আহমদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অঙ্গ। মির্জা গুলাম আহমদ রচিত প্রধান গ্রন্থ 'বারাহিন-ই-আহমদিয়া'। ১৯০৮ সালে মির্জা গুলাম আহমদের মৃত্যু হয়। দলমত-নির্বিশেষে অন্যান্য মুসলমানগণ, কাদিয়ানিদের অমুসলমান বা কাফের বলে বিবেচনা করেন।

আহলুল কিতাব যাঁরা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস ও অনুসরণ করেন; অর্থাৎ কুরআন, ইঞ্জিল (বাইবেল), তাওরাত ও যবুর-এর অনুসারীদেরই বলা হয় আহলুল কিতাব। ইঞ্জিলের অনুসারী হচ্ছেন খ্রিস্টানরা এবং তাওরাতের অনুসারীরা হচ্ছেন ইহুদিরা।

বর্তমান বিশ্বে যবুর-এর অনুসারী কেউ আর অবশিষ্ট নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে আহলুল কিতাবরা কাফির বা মুশরিকদের তুলনায় শ্রেয়। মুসলিম রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারপূর্বক 'জিযআ' কর দিলে কিতাবিদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্যে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। তাঁদের ধর্মপালনের পূর্ণ স্বাধীনতাদানও ইসলামের নির্দেশ। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তাঁদের ধনসম্পদ মুসলমানেরই ধনসম্পদের মতো, তাঁদের রক্ত মুসলমানদেরই রক্তের মতো, সুতরাং তাঁদের জানমালের ক্ষতি হলে মুসলমানদের মতোই তাঁদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য। আহলুল কিতাবদের সতী নারী বিয়ে করা (ধর্মান্তরিত না করেও) এবং জবাই করা পশু খাওয়াও মুসলমানদের জন্যে বৈধ।

আহলুল বয়েত : রাসুলুল্লাহ (সা)-র নিকটতম আত্মীয়রাই হচ্ছেন আহলুল বয়েত। তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা হজরত আলি (রা), কন্যা ফাতেমা (রা), দৌহিত্র হাসান (রা) ও হোসেন (রা)-কে নিয়েই হল আহলুল বয়েত।

আহলুস সুন্নাত বা সুন্নি অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসারী। সম্ভবত হিজরি তৃতীয় শতাব্দী (খলিফা মুতাওয়াক্কিল-এর সময়) থেকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর উদ্ভব। এই জামায়াতের অনুসারীরা মনে করেন ১. রাসুলুল্লাহ (সা) সকল মানবিক দুর্বলতা ও দোষত্রুটির উর্ধ্বে এবং তাঁর আধ্যাত্মিক জাগতিক সকল দিকের অনুসরণ মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য (কেউ-কেউ এমনও মনে করেন যে রাসুলুল্লাহ (সা)-র দেহ নূর বা আলোর তৈরি); ২. সকল নবী ও রাসুলই নিষ্পাপ; ৩. খুলাফায়ে রাশেদার অনুসরণ অত্যাবশ্যকীয়; ৪. সাহাবায়ে কেরামদের কারওরই সমালোচনা করা উচিত নয়; ৫. তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, সলফে সালেহিন, চার ইমাম ও পির-ফকিহবৃন্দ পরম শ্রদ্ধাভাজন; ৬. কেবলা দুটি, কাবা-শরিফ ও বায়তুল মুকাদ্দাস ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম শাফি (রঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) প্রমুখ ইমামবৃন্দ এবং হজরত আবদুল কাদির জিলানি (রঃ), খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রঃ) প্রমুখ আউলিয়াগণ এই জামায়াতের অনুসারী ছিলেন। মুসলিম-জগতে এই জামায়াতের অনুসারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের পথই একমাত্র সঠিক পথ বা সিরাতুল মুস্তাকিম। এঁরা কুরআন সুন্নাহ্‌র সমগ্রতায় ও অপরিবর্তনীয়তায়ও দৃঢ় বিশ্বাসী।

আহলে হাদিস : বা হাদিসের অনুসারী। আহলে হাদিসদের বিশ্বাস, শুধু কুরআন নয়, বরং হাদিসও ইসলামি আচার ও শরিয়তের উৎসমূল। তাঁরা সাহাবিগণ ছাড়া অপর কোনো ইমামের অনুসরণ জরুরি বলে মনে করেন না। নিরঙ্কুশ তৌহিদের ধারণায় কিঞ্চিৎমাত্রও ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, এমন কোনো রীতিনীতি বা ধর্মবিশ্বাসেরও তাঁরা বিরোধী। তাঁদের মতে নবীগণ নিষ্পাপ, কিন্তু তাঁরা আল্লাহ্‌রই বান্দা এবং মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উর্ধ্বে নন। নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত আছেন, একথাও তাঁরা স্বীকার করেন না। বিশ শতকের গোড়ার দিকে আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের মত ও পথ একটি আন্দোলনের আকারে বিস্তার লাভ করে।

॥ ই ॥

ইউটোপিয়া এই গ্রীক শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'কোথাও না' (Nowhere)—অর্থাৎ যা কোথাও নেই, একমাত্র কল্পনায় ছাড়া। টমাস মুর (১৪৭৮-১৫৩৫) রচিত 'ইউটোপিয়া'

নামক উপন্যাসে এমন একটা দ্বীপের কল্পনা করা হয়, যেখানে সম্পদের ওপর সমগ্র জনগণের সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং নিশ্ছিদ্র সুখশান্তি বিরাজমান। এই উপন্যাসে তিনি শোষিত কৃষকদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত করেন এবং তাদের ইউটোপীয় বা কাল্পনিক স্বর্গের স্বপ্ন দেখান। বর্তমানেও কাল্পনিক সুখী সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থাকে ইউটোপিয়া বলা হয় এবং যেসব রাজনীতিবিদ ও সমাজবিদ জনগণের সামনে এমন ভবিষ্যৎ সমাজচিত্র তুলে ধরেন, যা কল্পনায় চমৎকার কিন্তু বাস্তবে অসম্ভব, তাঁদেরকে ইউটোপীয় বলে অভিহিত করা হয়। এই শব্দ থেকেই 'ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র' কথাটির উৎপত্তি।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র বা কাল্পনিক সমাজতন্ত্র। ইউটোপিয়া (Utopia) হচ্ছে এমন একটি কাল্পনিক দ্বীপ যেখানে নিখুঁত আদর্শ সমাজ স্থাপিত হয়েছিল। ইউটোপীয় বা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরাও এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখেন, যে-সমাজে সম্পদ হবে জনগণের, প্রত্যেক মানুষের শ্রমদান হবে স্বেচ্ছামূলক এবং বণ্টন হবে সমান। কিন্তু ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা সম্পদ ও শ্রেণীর ভূমিকা এবং ইতিহাসের প্রগতিশীল বিকাশধারা উপলব্ধি করতে সমর্থ হননি। তা ছাড়া তাঁরা বিপ্লবের তত্ত্বও পরিহার করেন এবং অবস্থিত সামাজিক সম্পর্কসমূহের কীভাবে পরিবর্তন ঘটবে, সে-সম্পর্কেও কোনো সুস্পষ্ট ধারণা দিতে ব্যর্থ হন। তাঁরা মনে করেন যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, নৈতিক মান ও ধর্মই হল সমাজ বিকাশের চালিকাশক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রচার ও বিস্তারের মাধ্যমেই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ক্রম-পরিবর্তন করা সম্ভবপর। রেনেসাঁ ও রিফর্মেশন আন্দোলনের সময় থেকেই ইউটোপীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সূচনা ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীতে এর প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ফ্রান্সের সেন্ট সাইমন, চার্লস ফ্যুরিয়ার, ব্রিটেনের রবার্ট ওয়েন প্রমুখ। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস তাঁর বিখ্যাত 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' গ্রন্থটি রচনা করেন। এক কথায় যাঁরাই বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ না করে, কল্পনা বা পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা দিয়ে বাস্তবকে দেখা বা ব্যাখ্যার করার প্রয়াস পান, যাঁরাই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কাল্পনিক ও অবস্তুবাদী পথনির্দেশ করেন, তাঁদেরকেই বলা হয় ইউটোপীয় বা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী।

ইউনিগেট লিমিটেড Unigate Limited. গঠিত হয়েছিল ইউনাইটেড ডেইরিজ লিমিটেড এবং কাউ অ্যান্ড গেট লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠান দুটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্যে, একটি হোল্ডিং কোম্পানি হিসেবে। বর্তমানে এই বিশাল বহুজাতিক কর্পোরেশনটির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তিনশোরও বেশি কোম্পানি। এ-ধরনের বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহের মাধ্যমেই অনুন্নত বিশ্বজুড়ে নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালানো হয় বলে অনেকে মনে করেন। এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম বহুজাতিক (Multi-national) কর্পোরেশন।

ইউনিলিভার লিমিটেড : Uniliver Limited. এই হোল্ডিং কোম্পানিটি গঠিত হয়েছিল লিভার ব্রাদার্স লিমিটেড, ম্যাক ফিশারিজ লিমিটেড প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেয়ার জন্যে। বর্তমানে এই বহুজাতিক কর্পোরেশনটির নিয়ন্ত্রণে দুশোরও বেশি কোম্পানি রয়েছে। এটিও একটি অতি বৃহৎ বহুজাতিক কর্পোরেশন।

ইউনিসক্যান : ১৯৫০ সালে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন এবং যুক্তরাজ্যের মধ্যে নিবিড় অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যে-চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাই-ই

ইউনিসক্যান (Uniscan) নামে অভিহিত। এই চুক্তি অনুযায়ী সাব্যস্ত হয় যে, চুক্তিভুক্ত দেশসমূহ পারস্পরিক সুবিধাদি বিনিময় করবে। ট্যুরিস্টদের এলাউন্স বৃদ্ধি, স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশসমূহে স্টার্লিং পুঁজির ঘাটতি পূরণ ও লন্ডনের বাজার থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি প্রদান, রয়ালটি পরিশোধের ক্ষেত্রে রেয়াত ইত্যাদিই ছিল প্রস্তাবিত সুবিধা বিনিময়ের মৌল ভিত্তি। এই চুক্তির কোনো আন্তর্জাতিক কাঠামো বা স্থায়ী কর্মকর্তা নেই। তার বদলে চুক্তিভুক্ত চার রাষ্ট্র মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এর কার্যক্রম সাব্যস্ত ও পরিচালনা করে।

ইউনিসেফ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু জরুরি তহবিল বা United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর গঠিত হয়। মূলত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের শিশুদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণার্থে এই তহবিল গঠন করা হলেও, ১৯৫০ সাল থেকে এই তহবিল সমগ্র অনুন্নত বিশ্বের শিশুকল্যাণে অংশগ্রহণ করে আসছে। জাতিসংঘের এই অঙ্গ সংগঠনটির সদর দফতর নিউইয়র্কে অবস্থিত। পরামর্শগত সহায়তা ছাড়াও তহবিল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বস্তুগত সহায়তাদিও প্রদান করে থাকে।

ইউনেস্কো জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা বা United Nations Education, Science and Cultural Organization (UNESCO), প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর। এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি এবং শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ। এর রয়েছে একটি সাধারণ সভা (প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের এক-একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে), একটি নির্বাহী বোর্ড এবং একজন মহাসচিবসহ একটি সচিবালয়। এই সংস্থার প্রধান কার্যালয় প্যারিসে অবস্থিত। এই সংস্থার কার্যক্রম প্রধানত নিম্নরূপ ১. শিক্ষা নিরক্ষরতা দূরীকরণ, মৌলিক শিক্ষা, উন্নততর শিক্ষা-পদ্ধতির ওপর গবেষণা ও তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি; ২. প্রকৃতিবিজ্ঞান বিজ্ঞানীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টি ও বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণ; ৩. সমাজবিজ্ঞান বর্ণবৈষম্য, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ইত্যাদি নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহের ওপর গবেষণাকে উৎসাহদান; ৪. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনকে গণমুখীকরণ; ৫. ব্যক্তি-বিনিময় : বিদেশে চাকরি ও অধ্যয়নের ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ, ফেলোশিপ প্রদান ইত্যাদি; ৬. জনসংযোগ ইউনেস্কোর কর্মকাণ্ড এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ; ৭. পুনর্বাসন : অনুন্নত বিশ্বের এবং যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার শিক্ষায়তন, লাইব্রেরি, বিজ্ঞান সদন ইত্যাদির প্রয়োজন নির্ধারণ ও সে-প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান এবং ৮. কারিগরি সহায়তা সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা, মৌলিক শিক্ষা, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শদান।

ইউরো Euro-Money. সংক্ষেপে Euro.h ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে সংহত করার উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সাল থেকেই একটি সাধারণ বা কমন মুদ্রার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে আসছিল। ১৯৮৯ সালে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভায় সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের রাষ্ট্রনায়করা অর্থনৈতিক ও

মুদ্রাসংক্রান্ত ঐক্যের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর মাসত্রিশটে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক স্থির হয় যে, ১৯৯৯ সালে ঐকমত্যসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের জন্যে একটি সাধারণ মুদ্রা প্রচলন করা হবে, যে মুদ্রা ইউরোমানি বা ইউরো নামে পরিচিত হবে। মাসত্রিশটে এ-ব্যাপারে কয়েকটি মূল শর্ত আরোপ করা হয়। যেমন ১. দ্রব্যমূল্যের ওপরের স্তরে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দেশকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে-দেশ মুদ্রাস্ফীতির মোকাবেলা করতে সক্ষম; ২. অর্থনীতির স্বচ্ছতা ও ধারাবাহিকতা থাকতে হবে এবং জিডিপি-র ৩%-এর বেশি ঘাটতি রাখা যাবে না; ৩. সংশ্লিষ্ট দেশকে অন্তত দুবছর ইউরোপীয় মুদ্রাব্যবস্থা (EMS)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে এবং ৪. সংশ্লিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা থাকতে হবে আর এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে, জাতীয় বাজেটের ঘাটতি মেটাতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো ঋণ দেবে না। ইউরোপের যেসব রাষ্ট্র উপরোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করবে, তারাই এই একক মুদ্রাব্যবস্থার আওতায় আসতে পারবে। ১৯৯৯ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে ১১টি দেশে ইউরো চালু হয়েছে।

ইউরো কমিউনিজম European Communism. কথাটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ হল Euro-Communism. প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শিল্পোন্নত ইউরোপীয় দেশসমূহে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অংশত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ঠেকানোর লক্ষ্যে এবং অংশত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে এ-সমস্ত দেশের শিল্পপতিরা শ্রমিকদের উচ্চ থেকে উচ্চতর মজুরি দিতে বাধ্য হয়। আবার জাতীয় উৎপাদন ও আয়ের বিপুল বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনও উচ্চতর শ্রমিক-মজুরি প্রদানকে ত্বরান্বিত করে। মোট কথা, বিভিন্ন কারণে এ-সমস্ত দেশের শ্রমিকরা যে-মজুরি পেতে থাকে, তাতে তাদের নিম্নতম মৌলিক চাহিদা তো মেটেই, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ব্যক্তিগত কম্পিউটার ইত্যাদি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মোটরগাড়ি পর্যন্ত ক্রয় করতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে, উন্নত রাষ্ট্রসমূহ শ্রমিক-জনগণের বর্তমান ও ভবিষ্যতের আর্থসামাজিক নিরাপত্তামূলক অনেক দায়িত্ব গ্রহণ কর। ফলে, এইসব উন্নত দেশের শ্রমিকদের সমস্যা, কার্ল মার্কসের যুগের কিংবা বিপ্লবকালীন রাশিয়া ও চীনের কিংবা অনুন্নত বিশ্বের মানবেতর শ্রমিকদের সমতুল্য নয়। অর্থাৎ, মার্কস-কথিত শুধুমাত্র কোনোক্রমে আজ বেঁচে থেকে আগামীকাল ফ্যাক্টরিতে এসে পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত মূল্য সৃষ্টির জন্য যে-নিম্নতম মজুরি প্রয়োজন, এরা তার চেয়ে অনেক বেশি মজুরি, সুবিধাদি ও নিরাপত্তা পায়। এদের সমস্যা প্রায়শই দৈনন্দিন ভাত-কাপড়ের নয়, বরং অধিকতর বিলাসদ্রব্য অর্জনের। শৃঙ্খল ছাড়াও এদের হারানোর মতো গৃহস্থালি সম্পদ, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি অনেক কিছু রয়েছে। ফলে, তারা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-বর্ণিত শ্রমিকদের মতো আচরণ করে না, ঝুঁকি নিতে চায় না রক্তক্ষয়ী শ্রেণীসংগ্রামের। এই পটভূমিতে, ইউরোপে, তথা উন্নত বিশ্বে যাঁরা শোষণমুক্ত বা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে চান, তাঁরা এ-তত্ত্ব হাজির করেন যে, এ-সমস্ত দেশে যেহেতু ক্লাসিক্যাল সর্বহারার অস্তিত্ব নেই, সেহেতু ক্লাসিক্যাল শ্রেণীসংগ্রামেরও কোনো অবকাশ নেই। এখানে শোষিত মানুষকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে জোরদার করার মাধ্যমে এবং এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শোষিত শ্রেণীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে। তাঁদের মতে ইউরো

কমিউনিজম হল ইউরোপীয় পরিস্থিতির বাস্তবতা। কিন্তু গোঁড়া সমাজতন্ত্রীদের মতে, এই মতবাদ একধরনের সংশোধনবাদ মাত্র।

ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় European Economic Community(EEC). ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ তারিখে গঠিত এই সম্প্রদায়ের প্রধান কার্যালয় ব্রাসেলসে অবস্থিত। এই সংস্থার অপর নাম ইউরোপীয় সাধারণ বাজার (European Common Market)। ১৯৭৩ সালে যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক ও আয়ারল্যান্ডও এই সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। প্রথম দিকে এর সদস্য ছিল ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেমবার্গ। সদস্যদেশসমূহের মধ্যে অভিন্ন শুল্কব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নীতি ও বাণিজ্যিক আইনের সমন্বয়সাধন, অভিন্ন কৃষিনীতির প্রচলন ইত্যাদিই হল এই সংস্থার উদ্দেশ্য। এর সদস্যরাষ্ট্রসমূহ ইউরোপীয় আণবিক শক্তি কমিটি (Euratom) নামে একটি উপ-সংস্থাও গঠন করে। এই সংস্থার একটি কমিশন ও একটি পরিষদ রয়েছে।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজার : ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় ও এটি একই সংস্থা।

ইওকা : EOKA. সাইপ্রাসের গ্রিকরা ১৯৩১ সাল থেকে সাইপ্রাসকে গ্রিসের সঙ্গে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ইনোসিস (ENOSIS) বা গ্রিসের সঙ্গে সংযুক্তি আন্দোলন শুরু করে। পঞ্চাশের দশকে এই আন্দোলন গেরিলা রূপ ধারণ করে এবং 'ইওকা' নামের এই গেরিলা সংগঠন গড়ে ওঠে। গ্রিক গেরিলা নেতা জেনারেল গ্রিভাস ছিলেন ইওকার প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৫৫ সালে ইওকার আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। আর্চবিশপ ম্যাকারিওসও একসময় এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন ১৯২৯ সালে মিশরের হাসান আল বান্না এই ইখওয়ানুল মুসলিমিন বা মুসলিম ভ্রাতৃত্ব আন্দোলন শুরু করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইসলামি আদর্শের প্রতিফলন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে এর সদস্যসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষে উন্নীত হয়। শিগ্‌গিরই এর প্রভাব অন্যান্য আরব রাষ্ট্রেও সম্প্রসারিত হয়। এই সংগঠনের ওপর প্রচণ্ড সরকারি নির্যাতন চাপিয়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠন ১৯৪৮ সালে তৎকলীন মিশরীয় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করে। কিন্তু পরবর্তী সরকারের ভয়াবহতর শ্বেতসন্ত্রাসের পরিণতিতে হাসান আল বান্না নিজেও নিহত হন। ১৯৫২ সালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে জেনারেল নাজিব ক্ষমতায় এলে ইখওয়ান প্রথম দিকে নতুন সরকারের প্রতি সমর্থন দান করে। কিন্তু নাজিব-নাসের প্রমূখও পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের ও পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিলে ইখওয়ান সরকারের বিরোধিতা শুরু করে। ১৯৫৪ সালে ইখওয়ান নাসেরের জীবননাশের চেষ্টা করলে নাসের ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, ইখওয়ানের মিশরীয় সদস্যদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন চাপিয়ে দেন। এমতাবস্থায়, ইখওয়ানের তৎকালীন নেতা হাসান আল হোদায়বি কায়রো থেকে দামেস্কে এর প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত করেন। কিছুদিন পর পুনরায় মিশরে ইখওয়ানের কর্মকাণ্ড শুরু হয় এবং এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন প্রখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত সাইয়িদ কুতুব। নাসের ১৯৬৬ সালে সাইয়িদ কুতুবসহ কয়েকজন ইখওয়ান নেতার ফাঁসি দেন, ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং কঠোর হস্তে এই আন্দোলনকে দাবিয়ে দেন। কিন্তু এত নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও ইখওয়ানের কার্যক্রম এখনও বলবৎ আছে।

ইজভেস্তিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী সুপ্রিম সোভিয়েতের সরকারি মুখপত্র ছিল ইজভেস্তিয়া। সুপ্রিম সোভিয়েতের সিদ্ধান্তসমূহ এবং সেসব সিদ্ধান্তের ওপর মন্তব্য ও আলোচনাই ছিল ইজভেস্তিয়ার মূল প্রতিপাদ্য। রুশ 'ইজভেস্তিয়া' শব্দটির অর্থ 'খবর'। ১৯১৬ সালে ইজভেস্তিয়া সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

ইজতিহাদ হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর মৃত্যুপরবর্তী সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এমন সব নবতর ও জটিল সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে, যেগুলোর সমাধান কুরআন-সুন্নাহয় সরাসরি খুঁজে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায়, ইসলামি আইন ও শাস্ত্রবিদরা কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত মর্মবাণীর ভিত্তিতে ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে নবতর সমস্যাসমূহের সমাধান খুঁজে পেতে সচেষ্ট হন। নবতর পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের এই প্রক্রিয়ারই নাম হল ইজতিহাদ। খোদ হাদিস শরিফেও ইজতিহাদের প্রতি সুস্পষ্ট অনুমোদন রয়েছে। শব্দগতভাবে 'ইজতিহাদ'-এর অর্থ হল সাধ্যমতো নিজের শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রয়োগ করা। যাঁরা ইজতিহাদ করেন তাঁদেরকে বলা হয় মুজতাহিদ। অবশ্য ইসলামের মৌল নীতির ক্ষেত্রে ইজতিহাদের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। সুন্নি ও শিয়া উভয় সম্প্রদায়ই 'ইজতিহাদ'কে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কুরআন-সুন্নাহর মর্মবাণী বা মৌলনীতির প্রায়োগিক রূপ নির্ধারণের নির্ভরযোগ্য উপায় হিসাবে গ্রহণ করে।

ইজমা 'ইজমা' শব্দটি এসেছে আরবি 'জামাহ' শব্দ থেকে, যার অর্থ হল হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীদের মতৈক্য। অর্থাৎ, কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত নয়, এমন বিষয়ে উম্মত বা অনুসারীগণ কর্তৃক কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়ারই নাম হল ইজমা। এ-বিষয়ে কুরআন শরিফেও বলা হয়েছে, 'মুসলমানেরা যেটাকে সঠিক বলে গণ্য করে, আল্লাহর চোখেও সেটাই সঠিক', কিংবা 'যে জনগণের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে, তার এমন মৃত্যু হবে, যেন সে আইয়্যামে জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগে মৃত্যুবরণ করল'। বলাবাহুল্য, এখানে মত বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই বোঝানো হয়েছে। বস্তুত 'ইজমা' প্রচলনের মাধ্যমে ইসলাম সে-যুগে গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার আওতায় গণপ্রতিনিধিসভা বা পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তবলীও 'ইজমা'-র আওতায় পড়ে। উল্লেখযোগ্য যে, হজরত উমর (রা) ইজমার মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ইজমার মাধ্যমে একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, পুনরায় ইজমা ব্যতীত গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল করা যায় না। ইজমার ফলে ইসলামি আইন ও বিধিমালার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে-কোনো নতুন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। ইজমা বা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলেও, শিয়ারা এটাকে মেনে নেয় না। যেমন—হজরত আবুবকর(রা) ও হজরত উমর (রা)-এর নির্বাচনকে শিয়ারা সঠিক বলে মনে করে না। চার খলিফাসহ সাহাবায়ে কেরামরা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর চিন্তাধারাকে নিবিড়ভাবে জানতেন বিধায়, তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহই ইজমার ভিত্তি স্থাপন করে।

ইতিহাস : বা অতীতের ইতিবৃত্ত। ইতিহাসকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, প্রাচীন ইতিহাস (মানব-সভ্যতার প্রথম থেকে ৪৭৬ সালে রোম নগরীর পতনের সময়

পর্যন্ত), মধ্যযুগের ইতিহাস (রোম নগরীর পতন থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত) এবং আধুনিক ইতিহাস (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত)। গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪-৪২৪)-কেই ইতিহাসের জনক বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইতিহাস বলতে বোঝাত রাজারাজড়াদের কাহিনীকেই, তাও প্রধানত যুদ্ধের আর জয়-পরাজয়ের কাহিনীকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটেনের এডওয়ার্ড গিবন (১৭৩৭-১৭৯৪) এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানির লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে (১৭৯৫-১৮৮৬) রাজরাজড়াদের কাহিনীর পাশাপাশি সমকালীন রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদিকেও ইতিহাসের বিষয়ভুক্ত করেন। তাঁরা এটা দেখানোর প্রয়াস পান যে, সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনো ঘটনা আদৌ ঘটতে পারে না। এজন্য তাঁদেরকে বলা হয় আধুনিক ইতিহাসের জনক। কার্ল মার্কসের মতে, মানুষের সমগ্র ইতিহাসই হল মূলত শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস; শোষক এবং শোষিতের দ্বন্দ্বের ইতিহাস।

ইতিহাসের দর্শন Philosophy of History. জ্ঞানের এই শাখাটি ইতিহাসের অর্থ, এর নিয়ম এবং মানবসমাজের বিকাশের প্রধান ধারা নিয়ে চর্চা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভলতেয়ার, মন্টেস্ক প্রমুখ ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের ওপর ধর্মতত্ত্বের প্রভাবকে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে বিকাশতত্ত্বের সম্প্রসারণ করেন এবং মানুষের ওপর ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবকে গুরুত্ব প্রদান করেন। হেগেল ইতিহাসকে একটি একক ও নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। মার্কস-এঙ্গেলস ইতিহাসের দর্শনের বস্তুবাদী ভিত্তি প্রদান করেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে উপস্থাপিত করার মাধ্যমে। বর্তমানে ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি ও স্পেঙ্গলার প্রমুখের মতবাদও ইতিহাসের দর্শনসংক্রান্ত চিন্তার ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে।

ইতিহাসের রায় : অনেকে মনে করেন যে, মানবসমাজের বিকাশের একটা নিজস্ব ধারা আছে। এই ধারার বিপরীত দিকে কেউ যেতে চাইলে, সে ধ্বংস হতে বাধ্য। আবার, বস্তুজগতের মতো সমাজের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক কাজ বা কারণের এক-একটি ফল বা পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। সমাজবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিটি সামাজিক -রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অমোঘ পরিণতিরই নাম হল ইতিহাসের রায়। যেমন, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের যুগে কেউ সামন্তবাদকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলে তার ব্যর্থতা অনিবার্য। জনগণের ইচ্ছা বা কল্যাণকে উপেক্ষা করে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের স্বৈরাচার জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার পরিণতিতে উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী। যে-শাসকগোষ্ঠীর কথা ও কাজে সংগতি নেই, তারা কখনো জনগণের হৃদয় জয় করতে সমর্থ নয়। এরূপ অসংখ্য বিষয় ইতিহাসে বারংবার প্রমাণিত।

ইনতিফাদা এই আরবি শব্দটির চলতি অর্থ গণঅভ্যুত্থান। ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখলের বিরুদ্ধে ১৯৮৭-৯৩ সালে ফিলিস্তিনি জনগণের যে-ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটে, সেটাই ইনতিফাদা নামে খ্যাত। বস্তুত, এই ইনতিফাদার পরিপ্রেক্ষিতেই ইহুদিরা অনন্যোপায় হয়ে একটি আধাকাঁচড়া ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করতে দিতে রাজি হয়। এই রাষ্ট্রেরই বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত। ইয়াসির আরাফাতের আপোসমুখিতার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিলিস্তিনি জনগণই অসন্তুষ্ট এবং তারা ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ ও আপোসকামী ইয়াসির আরাফাত সরকারের বিরুদ্ধে ইনতিফাদা জারি রাখার পক্ষপাতী।

ইন্টারপোল International Criminal Police Commission, সংক্ষেপে Interpol. বিশ্বের পঞ্চাশটি দেশ এই ইন্টারপোলের সদস্য। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্যদেশসমূহের মধ্যে অপরাধ অনুসন্ধানের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলা। ১৯২৩ সালে এই আন্তর্জাতিক পুলিশ দফতর প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৬ সালে এর কাজ পুনরায় শুরু হয়। ইন্টারপোলের একটা সাধারণ পরিষদ রয়েছে। এর অধিবেশন এক-এক সময় এক-এক সদস্যরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যরাষ্ট্রের পুলিশবাহিনীর সঙ্গে ত্বরিত যোগাযোগ স্থাপন, অপরাধীদের সন্ধান, গতিরোধ ও গ্রেফতার ইত্যাদির জন্য এই কমিশনের বেতার-যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। এর সদর দফতর প্যারিসে অবস্থিত।

ইন্টারপ্যালেশন Interpellation সুইজারল্যান্ড, ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি দেশে প্রচলিত একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট দফতর সম্পর্কে পার্লামেন্টে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা যায়, তাঁর জবাবের ভিত্তিতে ভোট গ্রহণ করা যায় এবং ভোটে তাঁর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ না হলে তাঁকে দফতরচ্যুত করা যায়।

ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ : Empirio-criticism, এই মতবাদ অনুযায়ী ইন্দ্রিয়ানুভূতিই হল জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। এই মতবাদের প্রবক্তা অস্ট্রিয়ার ভাববাদী দার্শনিক অ্যার্নেস্ট ম্যাক বলেন যে, 'কোনো বস্তু নয়; শব্দ, স্থান, কাল, চাপ ইত্যাদি, অর্থাৎ যা পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায়, তা-ই বিশ্বের মৌল উপাদান'। ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় বিপ্লবের ব্যর্থতার পর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলের একটা অংশ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে এই মতবাদকে অবলম্বন করার প্রয়াস পান। লেনিন তাঁর 'বস্তুবাদ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ' (Materialism and Empirio-Criticism) শীর্ষক দার্শনিক গ্রন্থের মাধ্যমে এই মতবাদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, "দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণপদ্ধতি বস্তু ও বস্তুর ক্রিয়াকে বস্তুর আন্তঃসম্পর্ক, গতিশীলতা এবং এর সৃষ্টি ও ক্ষয়ের ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে; কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ বিশ্লেষণকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। ফলে ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ একটি হাতুড়ে পদ্ধতি এবং এই মতবাদ নিজেকে যতই সঠিক এবং বিচারক্ষমতাসম্পন্ন বলে দাবি করুক-না কেন, এটা খুবই সংকীর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট, অর্থাৎ এই মতবাদ ভাববাদেরই অসংখ্য রূপের একটি।" বলাবাহুল্য, ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ আধ্যাত্মিকতাবাদেরও বিরোধী।

ইফাদ : International Fund for Agricultural Development (IFAD), অর্থাৎ, কৃষিউন্নয়নে আন্তর্জাতিক তহবিল। উন্নয়নশীল দেশসমূহে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টির বিকাশে সাহায্য করার লক্ষ্যে সম্পদ আহরণ করাই ইফাদের উদ্দেশ্য। ১৯৭৬ সালের ১৩ জুন জাতিসংঘের এক সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৯৭৭ সালের ৩০ নভেম্বর এই তহবিলের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

ইবনে খলদুন : (১৩৩২-১৪০৬), তিউনিসে জন্মগ্রহণকারী এই দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের নিয়ম ব্যাখ্যা করেন, যাযাবর ও নগরজীবনের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেন এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের কারণ হিসাবে জনগোষ্ঠীবিশেষের মৌলিক চাহিদাসমূহের নিরাপত্তার আর্তিকে চিহ্নিত করেন।

তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড 'মুকাদ্দামা' মৌলিক চিন্তার জন্য কালজয়ী। মানুষের কর্মকাণ্ড ও ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে আল্লাহ্ বা দৈবের ভূমিকার ব্যাপারে তিনি নিশ্চুপ থাকেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রেরও জন্ম, বৃদ্ধি, জরা এবং মৃত্যু বা ধ্বংস আছে।

ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮)। জন্ম দামেস্কের নিকটবর্তী হাররান নামক স্থানে। তিনি তৎকালীন বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করে কুরআন, ফিকহ ও তর্ক বিদ্যায় বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি পির-দরবেশের প্রতি অন্ধভক্তি, কবর পূজা, মাযার জিয়ারত ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করতেন। হজরত উমর(রা), হজরত আলি (রা) প্রমুখ ব্যক্তিত্বকেও তিনি ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে বলে মনে করতেন না। বহুক্ষেত্রে তিনি তৎকালীন ফকিহদের সঙ্গেও দ্বিমত পোষণ করতেন এবং ইজমার বিপরীত মত পোষণকেও কুফর বা পাপ বলে মনে করতেন না। ইমাম গাজ্জালি (রঃ) প্রমুখেরও তিনি সমালোচনা করতেন। ইবনে তাইমিয়ার ইসলাম সম্পর্কে নিষ্ঠার প্রশ্নে মুসলিম পণ্ডিতরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে অনেকের মতেই তিনি ইসলামের সত্যিকার অনুরাগী ছিলেন। স্বাধীন ও আপোসহীন মতামতের জন্য তাঁর অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়। আল্লাহর প্রতি মানবীয় গুণ আরোপ করার অপরাধে ১৩০৬ সালে অভিযুক্ত হয়ে তিনি এক ভূগর্ভস্থ দুর্গে কারারুদ্ধ হন। ১৩০৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্তির অল্পকাল পরেই রাজনৈতিক কারণে আরও দেড় বছর কারাগারে কাটান। মাত্র কয়েকদিন মুক্ত জীবনযাপন করার পর তিনি পুনরায় আলেকজান্দ্রিয়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সুলতানের নিষেধাজ্ঞা পালনে অস্বীকার করায় ১৩২০ সালে তিনি আবার দামেস্কে কারারুদ্ধ হন। পির ও নবীদের মাযার জিয়ারতসংক্রান্ত ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩২৬ সালে তাঁর পুনরায় শাস্তি হয়। কারাগারে বসে তিনি পুস্তক রচনা করছেন, একথা জানতে পেরে সরকার তাঁকে লেখনীর উপাদান থেকে বঞ্চিত করেন। এই আঘাত সইতে না পেরে ২০ দিন পর কারাগারেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইন্তেকাল করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৫০০।

ইবনে রুশদ্ (১১২৬-১১৯৮)। জন্ম কর্ডোভায়। ইবনে রুশদ গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। অ্যারিস্টটল ও প্লাটোর ওপর তাঁর লিখিত ভাষ্য আজও সুপ্রসিদ্ধ। বিশ্বের চিরন্তনতা ও আল্লাহর জ্ঞানের স্বরূপ, তাঁর গায়েবের জ্ঞান, জীবাত্মা ও জ্ঞানের সম্পূর্ণতা, পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর দার্শনিক মতামতের জন্য কেউ-কেউ তাঁকে নাস্তিক বলে মনে করত। তাঁর মতে কোনো বস্তুই অনস্তিত্ব থেকে একবার মাত্র সৃষ্টি হয়েই চিরস্থায়ী হয় না, বরং প্রতি মুহূর্তেই তা নবতর রূপ পরিগ্রহ করে। এজন্যই পৃথিবী স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও পরিবর্তনশীল। প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে যে, একটি সৃজনশীল শক্তি দুনিয়ার সঙ্গে থেকে একে স্থায়ী ও গতিশীল রাখছে। মহাশূন্যে তারকাদের আকৃতি ও অবস্থান তাদের গতির ফলেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এই গতির উৎস হল সেই শক্তি, যা আদিকাল থেকে এদের ওপর ক্রিয়াশীল রয়েছে। আল্লাহতত্ত্ব সম্পর্কে ইবনে রুশদের মত হল, 'আদি কারণ কেবল নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কেই সচেতন'। তিনি স্বীকার করেন যে, আল্লাহ্ স্বয়ং নিজ সত্তায় বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান রক্ষা করছেন; কিন্তু তাঁর জ্ঞান সামগ্রিক বা আংশিক কোনোটিই নয়, কেননা তাঁর জ্ঞান মানুষের জ্ঞানের চাইতে উচ্চতর পর্যায়ের জ্ঞান। মানবাত্মা সম্পর্কে তাঁর মত হল এই

যে, প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর পর বিশ্ব বা পরম আত্মায় মিশে যায়। পরকালে তিনি বিশ্বাস করতেন, কিন্তু এ-সম্পর্কে বহুলপ্রচারিত কাহিনী ও বর্ণনাসমূহকে তিনি অশুদ্ধ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে 'ওহি' বা প্রত্যাদেশ দুই প্রকার। যথা ক. দার্শনিক সত্যমূলক ও খ. ধর্মীয় সত্যমূলক। ফলে কুরআনের কোনো বক্তব্য যদি সাধারণ অর্থে অগ্রহণীয় হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার কোনো নিগূঢ় অর্থ আছে এবং সেটাকে খুঁজে পাওয়াই হবে দার্শনিকের কাজ। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় আবু রুশদ Averroes নামে পরিচিত।

ইবনে সউদ (১৮৮০-১৯৫৩)। ইবনে সউদ আরবের বেদুইন উপজাতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করে একটি একক জাতি হিসাবে গড়ে তোলেন। তাই, তাঁরই নামানুসারে আধুনিক আরবকে বলা হয় সৌদি আরব। এই ঐক্যের প্রয়োজনেই তিনি বিভিন্ন উপজাতীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। ১৯০১-১৬ সালে তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কর্নেল টি. ই. লরেন্স তুরস্কের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলে, ইবনে সউদ তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকার করেন, এই কারণে যে, মিত্রপক্ষ হেজাজের হোসেনকে আরবের বাদশাহরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ইবনে সউদ হোসেনসহ অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে ১৯২৪–২৫ সালের মধ্যেই মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার ওপর নিজের পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করেন। ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি নিজেকে হেজাজ ও নেজদের বাদশাহরূপে ঘোষণা করেন। ১৯৩২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সাম্রাজ্য (যা আয়তনে ফ্রান্সের প্রায় চারগুণ)-র নামকরণ করা হয় সৌদি আরব। ১৯২৭-৩৬ সময়ে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি সাফল্য অর্জন করে এবং বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে তিনি সকল বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতি আদায় করে নেন। তিনিই সর্বপ্রথম মার্কিন তৈল ধনকুবেরদের তৈল উত্তোলনের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ করেন।

ইবনে সিনা, আবু আলি : (৯৮০-১০৩৭)। মধ্যএশিয়ার এই মুসলিম দার্শনিক ছিলেন একাধারে দার্শনিক, প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিদ। অ্যারিস্টটলের দর্শনে বিশ্বাসী ইবনে সিনা একান্তভাবে ইসলাম ধর্মের অনুগত ছিলেন। তবে তিনি সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরোধিতা করতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম'দানেশনামা' বা জ্ঞানের পুস্তক।

ইমান : বা দৃঢ় বিশ্বাস। একজন ব্যক্তিকে মুসলমান হতে হলে কতিপয় মৌলিক বিষয়ের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য হয় এবং সেই বিশ্বাসকেই বলা হয় ইমান। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হল ১. আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়; তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই ও মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ; ২. আল্লাহর আদেশ কার্যকর করার জন্য ফেরেশতারা নিয়োজিত আছেন; ৩. মানবসৃষ্টির কাল থেকে হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর সময় পর্যন্ত আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির ওপর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ প্রেরণ করেছেন; ৪. সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ মানুষের মধ্যে যুগেযুগে নবী বা সংবাদদাতা প্রেরণ করেছেন; ৫. পরকাল ও শেষবিচারের দিন অবশ্যম্ভাবী; ৬. ভালো-মন্দ ও তকদির (বা ভাগ্যনির্ধারণ) একমাত্র আল্লাহরই হাতে এবং ৭. শেষবিচারের দিন সকল মৃতকে পুনরোত্থিত করা হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলোর ওপর বিশ্বাসীদের 'মুমিন' ও অবিশ্বাসীদের 'কাফির' বলা হয়। ইমান ইসলামের প্রধান ও প্রাথমিক ভিত্তি। ইমানহীনের কোনো আমলই আল্লহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অধিকাংশের মতে উপরোক্ত বিষয়সমূহসহ আল্লাহর প্রদর্শিত পথে দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকারোক্তি ও তদনুযায়ী আমালুস সালেহ বা সৎকর্ম—এই তিনের সমন্বয়েই ইমান।

ইম্পিচমেন্ট Impeachment. রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার-প্রধান বা মন্ত্রীপর্যায়ের কোনো ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে পার্লামেন্টে বিচার অনুষ্ঠানকেই বলে ইম্পিচমেন্ট। সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার-প্রধানের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট দেশের পার্লামেন্ট-সদস্যরা প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তা ছাড়া, উচ্চ পর্যায়ের ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত কোনো অপরাধের বিচার করাকেও ইম্পিচমেন্ট বলা হয়ে থাকে। বিলাতের পার্লামেন্টে ওয়ারেন হেস্টিংসের ইম্পিচমেন্ট ইতিহাসে অনন্য।

ইয়াংকি Yankee. এই শব্দ দ্বারা মূলত স্কটল্যান্ডের নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীদের বোঝানো হত। পরবর্তীকালে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় (১৭৭৫-৮৩) আমেরিকার বিদ্রোহী বাহিনীর সৈন্যদের ব্রিটিশ সেনাপতি ও সৈন্যগণ 'ইয়াংকি' বলে অভিহিত করত। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় (১৮৬১-৬৫) দাসপ্রথার সমর্থক দক্ষিণ অঞ্চলের জনসাধারণও দাসপ্রথাবিরোধী উত্তরাঞ্চলের সেনাবাহিনী ও জনসাধারণকে ইয়াংকি বলে গালাগাল করত। বর্তমানে ইয়াংকি বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীসহ সকল জনগণকে (প্রায়শই অবজ্ঞার্থে) বোঝানো হয়ে থাকে।

ইয়ালটা সম্মেলন ১৯৪৫ সালের ৪-১১ই ফেব্রুয়ারি ক্রিমিয়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইয়ালটায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং রাশিয়ার স্ট্যালিনের মধ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জার্মানিকে পরাজিত ও দখল করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাব্যস্ত হয় যে, এই তিন শক্তিই জার্মানির এক-একটা অংশ দখল করবে, ফ্রান্সকে একটা অংশ দখলের জন্য আহবান জানানো হবে এবং সমন্বয়ের জন্য বার্লিনে চার বাহিনীর অধিনায়কদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হবে। এতে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, জার্মানবাহিনী সম্পূর্ণ ভেঙে দেয়া হবে, সমস্ত জার্মান অস্ত্র হয় দখল করা হবে অথবা ধ্বংস করে দেয়া হবে, যুদ্ধাপরাধীদের দ্রুত বিচার ও শাস্তি দেয়া হবে, জার্মান সামরিক কারখানাসমূহ হয় ভেঙে দেয়া হবে নতুবা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হবে এবং জার্মানবাসীর জীবন থেকে সকল নাৎসি প্রভাব নির্মূল করা হবে। তদুপরি, ডাম্বার্টন ওক্স্ সম্মেলনের সূত্র ধরে এই সম্মেলনে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, আসন্ন এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনে প্রস্তাবিত জাতিসংঘ সনদ প্রস্তুত করা হবে। এই সম্মেলনে প্রস্তাবিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদসংক্রান্ত রুজভেল্টের তিনটি প্রস্তাবও গৃহীত হয় এবং স্থায়ী সদস্যদের ভেটোক্ষমতার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতঃপূর্বে দাবি করেছিল যে, তার ১৬টি প্রজাতন্ত্রের জন্য জাতিসংঘে ১৬টি আসন চাই। কিন্তু এই বৈঠকে সোভিয়েত ইউনিয়ন একমত হয় যে, রুশ ফেডারেল প্রজাতন্ত্র ছাড়া, ইউক্রেন প্রজাতন্ত্র ও বাইলোরুশিয়া প্রজাতন্ত্রেরই শুধু জাতিসংঘে আসন থাকবে। তিন নেতা আরও একমত হন যে, নাৎসি কবলমুক্ত ইউরোপীয় যে-কোনো দেশে তাঁরা সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্রমনা ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার গঠন করে দিতে বা নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবেন। এতদিন যাবৎ লন্ডনস্থ প্রবাসী পোল্যান্ড সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সমর্থন দিয়ে আসছিল। এই সম্মেলনে তাঁরা তা প্রত্যাহার করেন, কিন্তু তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে, পোল্যান্ডে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং এর পূর্ব সীমান্তে কার্জন লাইন মেনে চলতে হবে।

ইশতেহার, কমিউনিস্ট পার্টির Communist Manifesto. মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক রচিত, ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্মসূচিসংক্রান্ত প্রথম

দলিল। এর প্রথম অধ্যায়ের নাম 'বুর্জোয়া ও সর্বহারা'। এই অধ্যায়ে তাঁরা সমাজ-বিবর্তনের নিয়ম এবং এক উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্বারা অন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার অপসারণের অনিবার্যতা তুলে ধরেন। তাঁরা আরও দাবি করনে যে, আদি সাম্যবাদী সমাজ ছাড়া এ-যাবৎকালীন সকল সমাজের ইতিহাসই হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণীসংগ্রামের ফলশ্রুতিতে বুর্জোয়াসমাজ ধ্বংস হয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী বলেও তাঁরা দাবি করেন। তাঁদের মতে সর্বহারা শ্রেণীর কাজ হল পুরনো শোষণমূলক সমাজ ভেঙে নতুন শোষণহীন সমাজ নির্মাণ করা। 'সর্বহারা ও সাম্যবাদী' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁরা বলেন যে, সর্বহারা শ্রেণীর আশু কর্তব্য হল শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হওয়া, বুর্জোয়া আধিপত্য ছুড়ে ফেলা এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। এই অধ্যায়ে পরিবার, সম্পত্তি, রাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্যবাদীদের সম্পর্ক এবং সর্বহারা শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে কী কী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়। তৃতীয় অধ্যায় হল, 'সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সাহিত্য'। এই অধ্যায়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া ঝোঁক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং ভুয়া সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়। পরের অধ্যায় হল, 'অবস্থিত বিভিন্ন বিরোধীদলের প্রেক্ষিতে সাম্যবাদীদের অবস্থান'। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন বিরোধী শক্তি সম্পর্কে সাম্যবাদীরা কী কৌশল অবলম্বন করবে, তা ব্যাখ্যা করা হয়। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'—এই বিশ্ববিখ্যাত স্লোগান দিয়ে ইশতেহার সমাপ্ত করা হয়। এই ইশতেহারেই ঘোষণা করা হয় যে, 'শ্রমিকশ্রেণীর (সর্বহারার) শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর আর কিছুই নেই'। (কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো দ্রষ্টব্য)

ইশনা আসারিয়া মুসলমানদের শিয়া মতবাদীদের আদর্শ ও বিশ্বাস। এই মতবাদ অনুযায়ী, আল্লাহতায়ালা হজরত আদম (আ)-এর মধ্যে তাঁর নূরের যে-অংশ প্রদান করেন, সেই 'নুর' বংশবংশানুক্রমে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হয়ে আসছে। এই নূর যখন যাঁর মধ্যে থাকবে, তখন তিনিই আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নেতৃত্বের একমাত্র অধিকারী। শিয়ারা মনে করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-র পর ঐশী শৃঙ্খলা অনুযায়ী একমাত্র হজরত আলি (রা)-রই খলিফা, অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উত্তরাধিকারী হওয়া অনিবার্য ছিল। কিন্তু, 'চক্রান্তকারীরা' হজরত আবুবকর (রা) হজরত উমর (রা) এবং হজরত উসমান (রা)-কে খলিফা বানানোর মাধ্যমে শুধু হজরত আলি (রা)-র প্রতি অবিচারই করেনি, ঐশী সিদ্ধান্তকেও লঙ্ঘন করেছে। ইশনা আসারিয়ার অনুসারীদের মতে 'নেতা' নির্বাচনের ব্যাপার নয়, বরং তা আল্লাহ কর্তৃকই নির্ধারিত। বর্তমান নেতা তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে জানতে পারবেন, আল্লাহর 'নূর' তাঁর পর কার মধ্যে অবস্থান করবে এবং সে-অনুযায়ী তিনি ওসিয়ত করে যাবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম খোমেনির নেতৃত্বে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর বর্তমান ইরানের রাষ্ট্রীয় নীতিও ইশনা আসারিয়াভিত্তিক। এই মতবাদের অনুসারীরা ইসলামের প্রথম তিন খলিফাকে স্বীকার করেন না।

ইসক্রা ১৯০০ সালে প্রকাশিত নিখিল রুশ মার্কসবাদীদের বিপ্লবী পত্রিকা। ইসক্রা শব্দের অর্থ স্ফুলিঙ্গ। লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকা প্রথমে মিউনিখ থেকে এবং পরে জেনিভা থেকে প্রকাশিত হত ও গোপনে সমগ্র রাশিয়ায় বিলি করা হত। এর সম্পাদকমণ্ডলীল মধ্যে ছিলেন লেনিন, প্লেখানভ, মার্তভ, এক্সেলরড এবং ভেরা

জাসুলিখ। ১৯০৩ সালে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে রুশ সোস্যালিস্ট ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (RSDLP) বলশেভিক ও মেনশেভিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং 'ইসক্রা' মেনশেভিকদের এক্তিয়ারে চলে যায়। তারা লেনিন কর্তৃক সম্পাদিত ইসক্রার সঙ্গে পার্থক্য দেখানোর উদ্দেশ্যে এর নাম পালটে রাখে 'নতুন ইসক্রা'। অবশ্য 'নতুন ইসক্রা' বিপ্লবী মার্কসবাদের মুখপত্র ছিল না, বরং মার্কসবাদের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদ প্রচারের মাধ্যম হিসাবেই কাজ করছিল। তবে জন্মলগ্ন থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত সময়ে (এ-সময়ে ইসক্রার মোট ৫২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়) ইসক্রা রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

ইসলাম আক্ষরিক অর্থে ইসলাম মানে শান্তি। ৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে বর্তমান রূপে ইসলাম ধর্মের যাত্রা শুরু। ভয়াবহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দাসঅধ্যুষিত, গোষ্ঠী সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন আরবের পটভূমিতে ইসলাম সাম্য, শোষণহীনতা, গণতন্ত্র, সকলের জন্য শিক্ষা, নারীর সম্মান ইত্যাদির বাণী প্রচার করে এবং বাস্তবে তা কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়ে, তৎকালীন সময় ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এক অভাবনীয় প্রগতিশীল, যুগান্তকারী ও বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে। ইসলাম অনুযায়ী, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান, মুহাম্মদ (সা) তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল এবং কুরআন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ, সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত ধর্মগ্রন্থ। ইসলামের অনুসারীরা আরও বিশ্বাস করেন যে আত্মা অবিনশ্বর, মৃত্যুর পর এক ভিন্নতর ও অনন্ত জীবন আছে, প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য শেষবিচারের দিন জবাবদিহি করতে হবে এবং প্রত্যেকে পাপ-পুণ্য অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের একটি মৌলিক পার্থক্য হল এই যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থাও বটে। ইসলাম আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কর্মকাণ্ড ও নেতৃত্বের সমন্বয়ে বিশ্বাস করে। কুরআন-হাদিসের মর্মবাণী এবং রাসুলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদা (রা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম শোষণহীনতা, প্রগতিশীলতা ও অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করে। কুরআনে একথা বারংবার বলা হয়েছে যে, 'সার্বভৌমত্ব', 'আদেশ', 'আধিপত্য' 'ফয়সালা' ও 'সকল সম্পদের মালিকানা' একমাত্র আল্লাহ্‌র, মানুষ তাঁর দাসমাত্র, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর আদেশ-নির্দেশসমূহ কার্যকর করা। ইসলামের অনুসারীরা দাবি করেন যে, ইসলামি বিধিবিধান ইজতিহাদ, কিয়াস ও ইজমার মাধ্যমে সকল দেশে, সকল যুগে ও সকল পরিস্থিতিতেই বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর। ইসলামের এই প্রগতিশীলতা ও গতিময়তার জন্য সূচনার অল্পকালের মধ্যেই ইসলাম তৎকালীন বিশ্বের এক বিশাল অংশকে তার প্রভাববলয়ের অন্তর্গত করে ফেলতে সক্ষম হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রেও ইসলাম সূচনা করেছিল এক স্বর্ণময় যুগের। ইসলামের এই গতিময়তার কথা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব তো বটেই, এমনকি স্বয়ং কার্ল মার্কসও স্বীকার করে গেছেন। ইসলামের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, সূচনালগ্নের ১৪০০ বছর পরও ইসলাম টিকে আছে, চর্চিত হচ্ছে এবং বিস্তৃতি লাভ করছে।

ইসলামি উম্মাহ্ কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্র ও অঞ্চল-নির্বিশেষে বিশ্বের সমস্ত মুসলমানগণই এক জাতি। তাই, ইসলামি উম্মাহ বলতে শুধু মুসলিম বা মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রসমূহের মুসলমানদেরকেই বোঝায় না, বরং বিশ্বের

সমস্ত মুসলমানকেই বোঝায়। এককথায়, ইসলামি উম্মাহর অর্থ অঞ্চল ও রাষ্ট্র-নির্বিশেষে সমগ্র ইসলামি জনগণ বা মুসলমানদের সমষ্টি।

ইসলামি ঐক্য সংস্থা : Organization of Islamic Conference (OIC). এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে ১৯৭১ সালে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল সদস্য হল আফগানিস্তান, আলজিরিয়া, বাহরাইন, বাংলাদেশ, ক্যামেরুন, শাদ, কমোরোজ, জিবুতি, গ্যাবন, জাম্বিয়া, গিনি, গিনিবিসাউ, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মালি, মৌরটানিয়া, মরক্কো, নাইজার, ওমান, পাকিস্তান, প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা, কাতার, সৌদি আরব, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সুদান, সিরিয়া, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, সাইপ্রাস (তুর্কি যুক্তরাষ্ট্র), উগান্ডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, আপার ভোল্টা, ইয়ামেন আরব প্রজাতন্ত্র ও ইয়ামেন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮০ সালে আফগানিস্তানের সদস্যপদ স্থগিত করা হয় এবং ইসরায়েলের সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সম্পাদনের দরুন ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত মিশরের সদস্যপদও স্থগিত থাকে। এই সংস্থার মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে ১. সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করা; ২. বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা; ৩. পারস্পরিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সহায়তা করা এবং ৪. প্যালেস্টাইনি জনগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার পুনরুদ্ধার করা।

ইসলামি বিপ্লব, ইরানের ইরানের শাহ আর্যমেহের পাহলভির স্বৈরাচারী দুঃশাসনের পটভূমিতে ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইরানের প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে এই ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হয়। সামরিক বাহিনীর সিংহভাগ সদস্য ধর্মীয় নেতাদের এই বিপ্লবের প্রতি সমর্থন দেয়। ব্যাপক জনগণও ইসলামি বিপ্লবের পক্ষ অবলম্বন করে। পতনের পর শাহ সপরিবারে আমেরিকায় পালিয়ে যান। তখন অনেকেই ভেবেছিল যে মোল্লারা শেষ পর্যন্ত দেশ চালাতে সক্ষম হবে না। কিন্তু ইরানের ইসলামি সরকার তৎকালীন দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ের হুমকি-হামলা মোকাবেলা করে শুধু টিকেই থাকে না, ইরানকে একটি শক্তিশালী ইসলামি রাষ্ট্রেও পরিণত করে। কুরআন-সুন্নাহর বিধিবিধান মোতাবেক ইরানই বর্তমান বিশ্বের একমাত্র যথার্থ ইসলামি রাষ্ট্র বলে অনেকে মনে করেন।

ইসলামি সমাজতন্ত্র : অধিকাংশ মুসলমান মনে করেন যে, ইসলামে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনো স্থান নেই; কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ এবং সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার; সুতরাং সকল সম্পদের ওপর সকল মানুষের সমান অধিকার। এই অধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের প্রক্রিয়া নির্মূল করার জন্য ইসলাম প্রয়োজনে বলপ্রয়োগেও দ্বিধান্বিত নয়। অধিকাংশ মুসলমান আরও বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর ইবাদতের সঙ্গে সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত সুষম সমাজপ্রতিষ্ঠার কোনোই দ্বন্দ্ব নেই। এঁরা আরও মনে করেন যে, ইসলামি সমাজতন্ত্র, মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের তুলনায় সর্বাংশে শ্রেষ্ঠতর; কেননা মার্কসীয় সমাজতন্ত্র শুধু বস্তুবাদী মুক্তির অঙ্গীকার করে, কিন্তু ইসলামি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বস্তুবাদী ও আধ্যাত্মিক, উভয় প্রকার মুক্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। তদুপরি, মার্কসীয় সমাজতন্ত্রে,

কার্যত সকল স্বাধীনতা-স্বকীয়তা স্তব্ধ হয়ে যায়; কিন্তু ইসলামি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা অনিরুদ্ধ থাকে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা)-এর সময় যে-আর্থসামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটাকেই ইসলামি সমাজতান্ত্রিক, তথা সত্যিকার ইসলামি ব্যবস্থার মডেল বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ-সময়ে স্বয়ং খলিফাও একজন অতি সাধারণ নাগরিকের ন্যায় বায়তুল মাল থেকে একই হারে মাসোহারা প্রাপ্ত হতেন। এ-সময় যারা উত্তমরূপে জমি চাষ করতে পারত না তাদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হত; স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধেও প্রয়োজনে নিম্নতম আদালতে পর্যন্ত মামলা দায়ের করা যেত এবং খলিফাও আদালতে হাজির হতে বাধ্য থাকতেন। এ-সময় প্রধান সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)সহ বিপুলসংখ্যক অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে, তা বায়তুল মালে জমা করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্যতম নিকটতম সাহাবি আবু য'র গিফফারী শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরণ আপোসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করেন এবং সেজন্য অনেকেরই বিরাগভাজন হন। বস্তুত, আবু যর গিফফারি যে-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন, তা কার্যত আধুনিক সমাজতন্ত্রেরই বিকল্প। ইসলামি সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা মনে করেন যে, তৎকালীন দাস ও সামন্তসমাজঅধ্যুষিত বিশ্বপরিস্থিতির তুলনায় ইসলামি ব্যবস্থা অনেক বেশি অগ্রগামী ছিল এবং তাই কায়েমি স্বার্থবাদীরা ইসলামি ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে ইসলামি সমাজতন্ত্র কায়েম সহজতর বলেও অনেকে মনে করেন। বস্তুত ইসলাম সীমিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে ভারসাম্যরক্ষার নীতিতে বিশ্বাস করে।

ইসলামিক স্যালভেশন আর্মি আলজিরিয়ার সামরিক জান্তা নির্বাচনে বিজয়ী ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট (এফ.আই.এস.)-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করলে, ১৯৯২ সাল থেকে এফ.আই.এস. শুরু করে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম। বস্তুত এফ.আই.এস.-এর সামরিক উইং-এরই নাম হল ইসলামিক স্যালভেশন আর্মি। এই আর্মির সদস্যদের বলা হয় মুজাহিদ। এঁদের অধিকাংশই দাড়ি রাখেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তাঁরা সামরিক জান্তাকে হটিয়ে আলজিরিয়ায় 'ইসলামি রাষ্ট্র' কায়েম করতে সক্ষম হবেন। তাঁদের যুদ্ধের কোনো নির্দিষ্ট ফ্রন্টলাইন বা ক্ষেত্র নেই। তাঁরা যখন যেখানে সুবিধা সেখানেই গেরিলাপদ্ধতিতে সরকারি বাহিনী বা তার এজেন্টদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইসলামি স্যালভেশন ফ্রন্ট প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছিল।

ইহুদি প্রোটোকল Jewish Protocol. জায়নবাদী ইহুদিরা তাদের আন্তর্জাতিক মিত্রদের সহায়তায় মিসরের নীলনদ থেকে শুরু করে ইরাকের ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইহুদি রাষ্ট্র সম্প্রসারণের যে নীলনকশা নিয়ে কাজ করছে, সেটারই নাম হল জিউইশ প্রোটোকল।

ইহুদি-বিরুদ্ধবাদ Anti-Semetism. নাৎসি জার্মানি ছিল এই মতবাদের মূল ঘাঁটি। উনবিংশ শতাব্দীতে আর্য আভিজাত্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি বিরুদ্ধবাদেরও উদ্ভব ঘটে। ইহুদিরা বিভিন্ন দেশের শিল্প-বাণিজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকায় অর্থনৈতিক ঈর্ষাও ইহুদি-বিরুদ্ধবাদের অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন। হিটলার আর্য

এবং অনার্যদের পৃথক সত্তা হিসাবে গণ্য করেন এবং ঘোষণা করেন যে ইহুদিরা নিকৃষ্ট ও শত্রুভাবাপন্ন জাতি, তাদের রক্ত বিষাক্ত এবং জন্মগতভাবেই তারা অপরাধপ্রবণ। তিনি আইন করে কোনো আর্যের সঙ্গে ইহুদির বিয়ে, প্রেম বা সম্মিলন নিষিদ্ধ করে দেন। আইনস্টাইন ও সিগমান্ড ফ্রয়েডসহ বিভিন্ন ইহুদি বিজ্ঞানী জার্মানি থেকে বিতাড়িত হন। মেন্ডেলসন ও অফেনবাখ-এর মতো বরেণ্য ইহুদি শিল্পীদের সংগীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ইহুদিদের নাগরিক অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়, তাদের ব্যবসা ও চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ ইহুদি নর-নারী-শিশুকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পূর্ব ইউরোপেও ইহুদিবিরোধিতা তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৪৫ সালের পর এসব দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইহুদিবিরোধিতা কমবেশি বলবৎ থাকে। পরবর্তীকালেও ইসরায়েলের, তথা ইহুদিদের একগুঁয়েমি ও নৃশংসতার দরুণ ইহুদিবিরোধিতা মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

॥ ঈ ॥

ঈশ্বরতন্ত্র : ঈশ্বর বা তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পুরোহিতরা রাষ্ট্র শাসন করবে, এই মতবাদ। ইহুদিদের ধর্ম প্রবর্তক মুসা (আ)-র সময় থেকে রাজতন্ত্রের উদ্ভব পর্যন্ত ইহুদিশাসনের দার্শনিক নাম ছিল ঈশ্বরতন্ত্র (Theocracy)। খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মেও এরূপ মতবাদী সম্প্রদায় ছিলেন এবং আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, পরম সৃষ্টিকর্তার 'মনোনীত' ধর্মীয় নেতারাই দেশ শাসনের একমাত্র ন্যায়সংগত অধিকারী।

ঈস্টার অভ্যুত্থান ১৯১৬ সালের ২৪–২৯শে এপ্রিল সময়ে আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার লক্ষ্যে ডাবলিনে যে-অভ্যুত্থান ঘটে, তা-ই ঈস্টার অভ্যুত্থান নামে খ্যাত। এই অভ্যুত্থানের নেতা ছিলেন আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুডের পি.এইচ.পিয়ার্স এবং সিন ফিনের জেমস কনোলি। এই অভ্যুত্থানকালে রাস্তায় রাস্তায় ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং ডাবলিন জেনারেল পোস্টঅফিসের চতুর্দিকে প্রচুর লোক নিহত হয়। জার্মানি থেকে যে-সাহায্য পাওয়া যাবে বলে অভ্যুত্থানকারীরা আশা করেছিল, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরবর্তীকালে অভ্যুত্থানের ১৪ জন নেতার কারাদণ্ড হয় এবং বাদবাকিদের, যুক্তরাষ্ট্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এই আশঙ্কায় রেহাই দেওয়া হয়। অবশ্য, শাস্তিপ্রাপ্তরাও ১৯১৭ সালের জুনের সাধারণ ক্ষমার আওতায় মুক্তি পায়।

॥ উ ॥

উইটেভীন সুবিধা Witteveen Facility. ১৯৭৭ সালে গৃহীত একটি ব্যবস্থা, যে-ব্যবস্থায় বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ১৭টি দেশ অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত দেশসমূহের সহায়তার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)-এ ১০,০০০ (দশ হাজার) মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত চাঁদা দিতে রাজি হয়।

উগ্র স্বাদেশিকতা : Chauvinism. এর অর্থ প্রচণ্ড অন্ধ স্বদেশপ্রেম বা জাত্যাভিমান। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বীয় দেশ বা জাতি ছাড়া, বাকি সকল দেশ ও

জাতিকে হেয় ও বৈরী বলে বিবেচনা করে এবং তীব্র অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে। যেমন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে হিটলার জার্মানবাসীদের মধ্যে এমন জাত্যাভিমান জাগিয়ে তুলেছিলেন যে, তারা মনে করত তারাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাতি, নীলতম রক্তের অধিকারী এবং ফলত সমস্ত নিকৃষ্টতর জাতিসমূহের ওপর আধিপত্য করার জন্য সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মনোনীত। পৃথিবীর বহু জাতির মধ্যে আজও অন্ধ জাত্যাভিমানের অস্তিত্ব দেখা যায়।

উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা North-South Dialogue. বর্তমান বিশ্বের শিল্পসমৃদ্ধ ও উন্নত দেশসমূহের অধিকাংশই বিষুবরেখার তো বটেই, কর্কটক্রান্তিরও উত্তরদিকে অবস্থিত এবং অনুন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এই রেখার দক্ষিণে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার উদ্যোক্তারা মনে করেন যে, উত্তরের (বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপীয় দেশসমূহের) অর্থনৈতিক উন্নতি ও সম্পদের ভিত্তি হচ্ছে দক্ষিণের অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশকে যুগোপযোগী প্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত রাখার মাধ্যমে পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র করে রাখা এবং এ-সমস্ত দেশকে বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন উপায়ে শোষণ করা। সত্তরের দশকের শেষের দিক থেকে এই আলোচনার সূত্রপাত হয়। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ দক্ষিণকে উন্নত ও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পুঁজি ও প্রযুক্তির যোগান দিতে এবং শোষণমূলক বাণিজ্যিক ও অন্যান্য প্রক্রিয়া বন্ধ করতে উন্নত উত্তরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ক্রমশ উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যেকার বর্তমান বৈষম্য কমিয়ে আনা। এই আলোচনার উদ্যোক্তারা একথাও মনে করেন যে, উত্তরের বর্তমান শিল্পায়ন ও সমৃদ্ধিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থেও দক্ষিণের উন্নয়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য।

উৎপাদন : শ্রমের দ্বারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুকে মানুষের ব্যবহারযোগ্য বস্তুতে পরিণত করা। প্রচলিত অর্থনীতি অনুসারে জমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন এই চারটির সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই উৎপাদনকাজ সম্পন্ন হয়। মার্কসীয় মতে উৎপাদনের অর্থ ও তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও গভীর, কারণ, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষ কেবল প্রকৃতির ওপরই কাজ করে না, পরস্পরের ওপরও কাজ করে এবং পরস্পরের সঙ্গে কতগুলো নির্দিষ্ট যোগাযোগ ও সম্পর্কও স্থাপন করে। অবশ্য, যন্ত্রায়ণ, স্বয়ংক্রিয়তা বা অটোমেশন, কম্পিউটার প্রযুক্তি ইত্যাদির ফলে উৎপাদনে মানবশ্রমের ভূমিকা ক্রমশ তুলনামূলকভাবে গৌণ হয়ে পড়ছে।

উৎপাদন, মোট অভ্যন্তরীণ Gross Domestic Product (GDP). কোনো দেশের এক বছরের উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেবা বা সার্ভিসেস (যেমন ব্যাংক, বীমা, পরিবহণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদিজনিত সেবা)-এর মোট পরিমাণের আর্থিক মূল্য। এর সঙ্গে বিদেশ থেকে অর্জিত আয় যোগ করা হলে, তাকে বলে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)।

উৎপাদন, মোট জাতীয় Gross National Product (GNP). কোনো দেশের উ ৎপাদিত পণ্য ও সার্ভিসের মোট বার্ষিক পরিমাণের আর্থিক মূল্য। নিম্নবর্ণিত সূত্রসমূহ থেকে লব্ধ আয়ের সমষ্টিই হল মোট জাতীয় উৎপাদন ১. কৃষি, বন, মৎস্য ইত্যাদি, ২. শিল্প, খনি, ইমারত, জনকল্যাণ, ৩. পরিবহণ, বণ্টন (Distribution) ইত্যাদি,

৪. ইনস্যুরেন্স, ব্যাংক ও অন্যান্য মুদ্রাসংক্রান্ত খাত, ৫. বসতবাড়ি, ৬. স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সার্ভিস, ৭. পরিবারের প্রতি প্রদত্ত সার্ভিস, ৮. বিদেশ থেকে অর্জিত নিট আয়, ৯. অন্যান্য সার্ভিস বা সেবা ও ১০. মওজুতের প্রবৃদ্ধি (Stock Appreciation)। মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধন বাবদ ব্যয়িত সম্পদ (আর্থিক মূল্যে) বাদ দিলে যা থাকে, তা-ই হল জাতীয় আয় (National Income)।

উৎপাদন-প্রক্রিয়া Mode of Production. খাদ্য, বস্ত্র, গৃহস্থালির সরঞ্জামাদিসহ জীবনধারণের ও উপভোগের যাবতীয় উপকরণ উৎপাদনের ইতিহাস-নির্ধারিত পদ্ধতি। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ওপরই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থার স্বরূপ। সমাজ, সমাজের প্রধান প্রধান ধ্যানধারণা, রাজনৈতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানের রূপ ইত্যাদি উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ওপরই নির্ভরশীল। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটলে গোটা সমাজব্যবস্থারই পরিবর্তন ঘটে। মানবসমাজের উষাকাল থেকে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার যে-ক'টি প্রধান রূপ দেখা গেছে তা হল, আদি সাম্যবাদী ব্যবস্থা, দাসব্যবস্থা, সামন্তবাদী ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। বর্তমান যুগটিকে সমাজতন্ত্রীরা পুঁজিবাদের অবক্ষয় ও সমাজতন্ত্রের যুগ বলে অভিহিত করলেও বাস্তবে ঘটেছে বিপরীত ঘটনা। বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে বিশ্বব্যাপী মার্কসীয়-লেনিনীয়-মাও ধারার সমাজতন্ত্রের কার্যত পতন ঘটে; অথচ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল তবিয়তে বলবৎ থাকে। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার রয়েছে দুটি অবিচ্ছেদ্য দিক, উৎপাদিকাশক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদিকাশক্তিই হল উৎপাদন-প্রক্রিয়ার নির্ধারক ও বিপ্লবী দিক। কেননা, উৎপাদিকাশক্তির পরিবর্তনের ফলেই উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। আবার, উৎপাদন-সম্পর্কও উৎপাদিকাশক্তিকে প্রভাবিত করে। উৎপাদন-সম্পর্ক যদি অনুকূল হয়, তা হলে তা উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়; আর প্রতিকূল হলে বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। বৈরী সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয় নবতর উৎপাদিকাশক্তির সঙ্গে পুরানো উৎপাদন-সম্পর্কের তীব্র দ্বন্দ্ব বেধে যায় এবং এ-দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে সমাজ পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। বর্তমান বিশ্বে সমাজতন্ত্রের পতন, অটোমেশন, কম্পিউটার প্রযুক্তি ইত্যাদির বিস্ময়কর অগ্রগতি এবং অর্থনীতির বিশ্বায়নের ফলে উ ৎপাদন-প্রক্রিয়া ও উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমনসব ফিচার দেখা দিচ্ছে যা দু-তিন দশক পূর্বেও কল্পনা করা যায়নি।

উৎপাদন ব্রিগেড : কোনো কোনো সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনকাজে নিয়োজিত সর্বনিম্ন ইউনিটকে বলা হয় উৎপাদন টিম। কয়েকটি উৎপাদন টিমের সমন্বয়ে গঠিত হয় এক-একটি উৎপাদন ব্রিগেড (Production Brigade)। মাও ঝে ডং-এর আমলে চীনে উৎপাদন টিম ও উৎপাদন ব্রিগেডকে উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে বিবেচনা করা হত।

উৎপাদনযন্ত্র যে-সকল জিনিসের সাহায্যে শ্রমিক প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর তার শ্রম প্রদান করতে পারে, সে-সকল জিনিসকেই বলে উৎপাদনযন্ত্র। যেমন, হাতুড়ি, কাস্তে, লাঙল, শাবল, স্ক্রু-ড্রাইভার ইত্যাদি থেকে শুরু করে মোটর, ডায়নামো, পাম্প, লেদ, লুম, মেশিন, কম্পিউটার ইত্যাদি যাবতীয় হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতিই হল উৎপাদনযন্ত্র।

উৎপাদন-সম্পর্ক Production Relationship. উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষের সঙ্গে মানুষের, বিশেষত, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর যে-সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাকেই বলে উৎপাদন সম্পর্ক। মার্কসীয় মতে এই সম্পর্ক সম্পত্তির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। শোষণমুক্ত সমাজে এই সম্পর্ক হয় পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সমতাভিত্তিক। কিন্তু শোষণমূলক সমাজে এ-সম্পর্ক হয় এক শ্রেণীর ওপর অন্য শ্রেণীর প্রভুত্বের। ইতিহাসে পাঁচ রকম উৎপাদন-সম্পর্কের নিদর্শন পাওয়া যায়, যথা, আদি সাম্যবাদী সমাজ, দাসসমাজ, সামন্তবাদী সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ। কিন্তু বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ, এবং অর্থনীতি ও উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিশ্বায়ন (globalization) ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে এতদসম্পর্কিত সাবেকি ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে।

উৎপাদনের উপায়সমূহ Means of Production. যে-সমস্ত প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বস্তু আছে বলে মানুষ তার শ্রম দিয়ে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়, সেগুলোকেই বলে উৎপাদনের উপায়সমূহ। যেমন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাথরের কুঠার ও অন্যান্য হাতিয়ার ছিল উৎপাদনের উপায়। আবার, আজকের যুগে, কোদাল, হাতুড়ি, যন্ত্র ইত্যাদিই উৎপাদনের উপায়। জমি, শেড, গুদাম, রাস্তা, খাল, পাইপ, জাহাজ, অন্যান্য পরিবহণব্যবস্থা ইত্যাদিও উৎপাদনের উপায়সমূহের আওতায় পড়ে। তবে, মার্কসের মতে উৎপাদনের উপায়সমূহের অস্থিমজ্জা হল যন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট হাতিয়ার। কেননা, উৎপাদনযন্ত্রের বিকাশের পর্যায়ের ওপরই নির্ভর করে উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের পর্যায়। তা ছাড়া, উৎপাদন যন্ত্রের ধরণ ও পর্যায়ই হল, কোনো সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রমিক তার শ্রম দেবে, তার সূচক। মার্কসের মতে কী কী দ্রব্য তৈরি হচ্ছে, তার ওপর নয়, বরং কীভাবে এবং কী ধরনের যন্ত্র দিয়ে তা তৈরি হচ্ছে, তারই ওপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক যুগান্তর।

উৎপাদিকাশক্তি : Forces of Production. উৎপাদনযন্ত্র এবং সেই যন্ত্র ব্যবহারকারী মানুষ, অর্থাৎ শ্রমিক, এই দুয়ের সম্মিলিত রূপই হল উৎপাদিকাশক্তি। তবে, শ্রমিককেই মৌল উৎপাদিকাশক্তি বলে বিবেচনা করা হয়।

উদারতাবাদ Liberalism. রক্ষণশীলতাবিরোধী সংস্কারপন্থি মতবাদ। এই মতবাদীরা রক্ষণশীলতার যেমন বিরোধী, তেমনি বিপ্লবেরও বিরোধী। এরা সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের নীতির অনুসরণ করে।

উদারনৈতিক দল Liberal Party. বৃটেনের এ-দলটি হল হুইগ দলেরই উত্তরাধিকারী। ১৮৭৭ সালে জাতীয় উদারনৈতিক ফেডারেশন (National Liberal Federation)-এর জন্ম। ১৮৮৬ সালে আয়ারল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসন (Home Rule)-এর প্রশ্নে এই দলে বিভক্তি আসে। বুয়র যুদ্ধের ব্যাপারেও এই দলের মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দেয়। ১৯০৬ সালের নির্বাচনে এই দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ক্যাম্পবেল-বেনারম্যান ও এসকুইথ মন্ত্রিসভা সামাজিক সংস্কারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, এসকুইথ ও লয়েড জর্জের দ্বন্দ্ব দলকে খুবই দুর্বল করে ফেলে। ১৯৩১ সালে গঠিত জাতীয় সরকারে এবং ১৯৪০-৪৫ সালে গঠিত চার্চিলের কোয়ালিশন সরকারে এই দলের কতিপয় সদস্য মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

উদীয়মান ব্যাঘ্র Emerging Tigers. সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে অনুন্নত বিশ্বের যে-সমস্ত দেশ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করে অতি দ্রুত শিল্পায়িত হচ্ছে এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, সে-সমস্ত দেশকেই বলা হয় উদীয়মান ব্যাঘ্র। সাধারণত উদীয়মান ব্যাঘ্র বলতে এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডকে বোঝানো হয়ে থাকে। অবশ্য অনেকে ভিয়েতনাম ও মায়ানমারকেও দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ বা ইমার্জিং টাইগার বলে বিবেচনা করেন।

উদ্বাস্তু পুঁজি Refugee Capital. এরূপ পুঁজিকে 'গরম টাকা' বা Hot Money-ও বলা হয়। এরূপ পুঁজির মালিকেরা অধিক মুনাফার চাইতে পুঁজির নিরাপত্তার জন্যই অধিক উৎকণ্ঠিত থাকে এবং পুঁজিকে এমনভাবে রাখে বা খাটায় যাতে যে-কোনো সময় সেটাকে স্থানান্তরিত করা যায়। এরূপ পুঁজি লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, কেননা লেনদেনের ভারসাম্য ঘাটতির দিকে মোড় নিলেই এরূপ পুঁজির মালিকরা ত্বরিতগতিতে তাদের পুঁজি অন্যদেশে সরিয়ে ফেলে, ফলে ঘাটতি আরও বেড়ে যায়। সাধারণত রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতেই উদ্বাস্তু পুঁজি বা গরম টাকার প্রকোপ দেখা যায়।

উদ্বৃত্ত মূল্য : Surplus Value. ধরা যাক, একজন শ্রমিক ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করে ৫ ডলার পরিমাণ মুনাফার সৃষ্টি করে। কিন্তু তাকে মাইনে দেওয়া হয় আড়াই ডলার, যা তার চার ঘণ্টার শ্রমের মূল্যমাত্র। বাকি যে-চার ঘণ্টা শ্রমের মূল্য থেকে সে বঞ্চিত হয়, সেটাই হল উদ্বৃত্ত মূল্য। এই উদ্বৃত্ত মূল্য মালিকের ঘরে জমা হয়। মার্কসীয় অর্থনীতি অনুযায়ী শ্রমিককে ঠকিয়ে শ্রমিকের শ্রমের এই মূল্য, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য মালিক কর্তৃক আত্মসাৎ বা শোষণই হল পুঁজিবাদী শোষণ।

উদ্বৃত্ত শ্রম : ধরা যাক, কোনো একটি কারখানার শ্রমিক ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করে পণ্য উৎপাদন করে, যার ফলে কাঁচামালের দাম, যন্ত্রের ক্ষয় ইত্যাদি খরচ বাদ গিয়ে মুনাফা দাঁড়ায় ৫ ডলার। কিন্তু মালিক শ্রমিককে দেয় মাত্র আড়াই ডলার। অর্থাৎ শ্রমিক তার চার ঘণ্টা শ্রমের মূল্য পায়, বাকি চার ঘণ্টা শ্রমের মূল্য মালিকের ঘরে জমা হয়। অর্থাৎ, শ্রমিক তার জীবিকার জন্য পরিশ্রম করে চার ঘণ্টা আর চার ঘণ্টা পরিশ্রম করে মালিকের মুনাফার জন্য। পরবর্তী এই চার ঘণ্টার শ্রম, যার মূল্য থেকে শ্রমিক বঞ্চিত হয়, সেটাকেই বলা হয় উদ্বৃত্ত শ্রম (Surplus Labour)। উদ্বৃত্ত শ্রমের ফলেই উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয়। এই উদ্বৃত্ত শ্রম ও উদ্বৃত্ত মূল্যের নিরিখেই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মার্কসবাদী বিশ্লেষণ গড়ে উঠেছে।

উন্নয়ন, সার্বিক : একটি রাষ্ট্র বা সমাজের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিকসহ সকল দিকের সমন্বিত উন্নয়নকে বলে সার্বিক উন্নয়ন (Total Development)। সার্বিক উন্নয়নের প্রবক্তারা মনে করেন যে, একটা সমাজের বিভিন্ন দিকসমূহ পরস্পর এমনই ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত যে, আলাদা আলাদাভাবে কোনো একটি দিকের উন্নয়ন চূড়ান্ত বিচারে সম্ভবপর নয়। তাই প্রকৃত উন্নয়নের জন্য সার্বিক উন্নয়ন-প্রক্রিয়াই যথার্থ।

উন্নয়নশীল দেশসমূহ Developing Countries. সাধারণত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার যে-সমস্ত দেশ একসময় কোনো-না-কোনো উপনিবেশবাদী শক্তির উপনিবেশ ছিল এবং এখনও পর্যন্ত প্রযুক্তি, শিল্পায়ন ও মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে

অনুন্নত, সে-সমস্ত দেশকেই উন্নত বিশ্বের রাজনীতিবিদ-অর্থনীতিবিদরা উন্নয়নশীল দেশ বলে অভিহিত করেন। এই দেশসমূহকেই কেউ-কেউ বলেন স্বল্পোন্নত দেশসমূহ বা Less Developed Countries (LDC), আবার কেউবা বলেন অনুন্নত দেশসমূহ (Undeveloped Countries)।

উন্মুক্তদ্বার নীতি Open-door Policy. সকল দেশ ও ব্যক্তির সঙ্গে সমান শর্তে ব্যাবসা-বাণিজ্য করা এবং কোনো দেশ বা গোষ্ঠীবিশেষকে কোনো বিশেষ বা একচেটিয়া সুবিধা না দেওয়ার নীতিই হল উন্মুক্তদ্বার নীতি।

উপগ্রহ রাষ্ট্র কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রভাবাধীন দুর্বলতর রাষ্ট্রকে বলা হয় উপগ্রহ রাষ্ট্র (Satellite State)।

উপচেপড়া সুফল Spill-over Benefit. পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমর্থক-প্রবক্তাদের মতে একটা দেশে যত বেশি পুঁজি বিনিয়োজিত হবে, যত বেশি শিল্পায়ন ঘটবে এবং যত বেশি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড চলবে, সংশ্লিষ্ট পুঁজিপতিরা তত বেশি লাভবান হবে ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দেশের আপামর জনগণও এই প্রাচুর্যের উপচেপড়া সুফল ব্যাপকভাবে লাভ করবে। এঁদের মতে একজন পুঁজিপতি তাঁর সম্পদের সামান্য অংশই নিজে ভোগ করেন এবং সিংহভাগই হয় নিজে অথবা ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করেন। ফলে, একটা দেশে যতই বিনিয়োগ বাড়ে ততই বেশিসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়, পুঁজিপতিদের লাভ যত বাড়ে, শ্রমিক-কর্মচারীদের ততই উচ্চতর বেতন ও সুবিধাদি প্রদান করা সম্ভবপর হয়; পুঁজিপতিদের তৎপরতার ফলে জাতীয় আয় ও প্রবৃদ্ধি যত বাড়ে ততই সরকারের আয়ও বৃদ্ধি পায় এবং জনকল্যাণমূলক কাজের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে, ঘটে আন্তঃকাঠামোগত উন্নয়ন; জাতীয় উৎপাদন ও আয় যত বাড়ে অভ্যন্তরীণ বাজার ততই স্থিতিশীল থাকে এবং সাধারণ মানুষের আয়ের সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের সংগতি সুনিশ্চিত থাকে। পুঁজিপতিদের প্রাচুর্যের উপচেপড়া সুফলের উদাহরণ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, সুইডেন, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

উপনিবেশ : Colony. এমন একটি অঞ্চল, যে-অঞ্চল এবং তার জনগণ অন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসনাধীন (এবং শোষণাধীনও বটে), অথচ সেই রাষ্ট্রের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। উপনিবেশে অনেক সময় স্বায়ত্তশাসন বা গণপ্রতিনিধিত্বশীল পার্লামেন্ট-মন্ত্রিসভা ইত্যাদিও থাকতে পারে। কিন্তু, উপনিবেশবাদী শক্তি উপনিবেশের পার্লামেন্ট বা সরকারের যে-কোনো সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়ে স্বীয় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ, উপনিবেশের প্রকৃত অর্থে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব থাকে না। উপনিবেশের উৎপত্তির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক জলপথসমূহ আবিষ্কারের পর তৎকালীন উন্নত দেশসমূহের ব্যবসায়ীরাই স্ব-স্ব রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বস্তুত ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকেই উপনিবেশসমূহের উদ্ভব। পরবর্তীকালে, ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট উপনিবেশের শাসনভার গ্রহণ করে। ইউরোপের ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড প্রমুখ রাষ্ট্র এবং এশিয়ার জাপান এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় স্ব-স্ব উপনিবেশ স্থাপন

করেছিল। উপনিবেশ-স্থাপনের মৌল উদ্দেশ্য ছিল, এ-সমস্ত দেশ থেকে কাঁচামাল ও অন্যান্য বহনযোগ্য সম্পদাদি লুণ্ঠন করে নেওয়া এবং উপনিবেশের পুঁজির বিকাশ ও শিল্পায়নের সম্ভাবনাকে দাবিয়ে রেখে এ-সমস্ত দেশকে নিজেদের শিল্পজাত পণ্যের একচেটিয়া বাজার হিসাবে ব্যবহার করা। কিন্তু, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বপরিস্থিতিতে উপনিবেশসমূহে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং একের পর এক উপনিবেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এমতাবস্থায়, শিল্পোন্নত দেশসমূহ (যাদের অধিকাংশই সাবেক উপনিবেশবাদী শক্তি), সাবেক উপনিবেশসমূহকে অর্থনৈতিকভাবে পদানত ও মুখাপেক্ষী করে রাখার নতুন কৌশল অবলম্বন করে। এই নতুন কায়দাকে বলে নয়া উপনিবেশবাদ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহ, তাদের স্বদেশ থেকে বহু দূরবর্তী বিপুল এলাকা ও জনগণকে পদানত করতে পেরেছিল, প্রধানত তাদের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষত কামান, আগ্নেয়াস্ত্র, গোলা-বারুদ (Gun-powder) ইত্যাদির জোরে।

উপনিবেশ, নয়া Neo-colony. সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে, বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাবেক উপনিবেশসমূহে প্রবল জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং একের পর এক উপনিবেশ স্বাধীন হয়ে যেতে থাকে। এমতাবস্থায়, সাম্রাজ্যবাদীরা, সাবেকি কায়দায় উপনিবেশসমূহ দখলে রাখা সম্ভবপর নয় বুঝতে পেরে, তাদের বাজার ও প্রভাববলয় বজায় রাখার স্বার্থে সাবেক উপনিবেশসমূহকে অর্থনৈতিকভাবে পদানত রাখার নয়া কৌশল অবলম্বন করে এবং বহুলাংশে সাফল্যও অর্জন করে। সাম্রাজ্যবাদী (বা নয়া সাম্রাজ্যবাদী)-দের নিকট অর্থনৈতিকভাবে মুখাপেক্ষী অনুন্নত অঞ্চল বা দেশসমূহকে বলে নয়া উপনিবেশ; আর এই প্রক্রিয়াকে বলে নয়া উপনিবেশবাদ।

উপনির্বাচন : কোনো পার্লামেন্ট বা সংস্থার মেয়াদকালে মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপর কোনো কারণে কোনো সদস্যের পদ শূন্য হলে, সেই পদপূরণের জন্য যে-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই বলে উপনির্বাচন (Bye-election)। উপনির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য সংশ্লিষ্ট পার্লামেন্ট বা সংস্থার অবশিষ্ট মেয়াদকালের জন্যই নির্বাচিত হন। অন্যান্য স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রেও উপনির্বাচন প্রযোজ্য হতে পারে।

উপনিষদ উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত বা বেদের অন্ত। মহর্ষি বাদরায়ন বেদান্ত দর্শনের রচয়িতা। শংকরাচার্য (৩য়-৪র্থ শতাব্দী) ও রামানুজ (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী) এর প্রধান ভাষ্যকার। ব্রহ্ম থেকে জগতের উৎপত্তি কীভাবে ঘটেছে সে-সম্পর্কে বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। শংকরাচার্য্যের মতে ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্তা আছে এ ছাড়া জগতের কোনো যথার্থ সত্তা নেই; আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন এবং জগৎ মায়ার সৃষ্টি। আত্মজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা কেটে গেলে উপলব্ধি করা যায় যে, জগতের কোনোই সত্তা নেই; (মায়ার কি কোনো সত্তা থাকে?)। কিন্তু রামানুজের মতে এ-জগৎ মিথ্যা নয়; জীব ও জগৎ উভয়েরই সত্তা আছে (তবে ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা এবং ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত, উপাদান ও কারণ)। শংকরাচার্যের মতে, আত্মা দেহ ও মন থেকে স্বতন্ত্র, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা নিত্য, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, অখণ্ড ও অনাদি। আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতই জীব নিজেকে কর্তা, ভোক্তা বা জ্ঞাতা বলে মনে করে এবং জাগতিক সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে বিবেচনা করে। বস্তুত, অহং (Ego) এবং আত্মা এক নয়। অহংকে জয় করার মধ্য দিয়েই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভবপর।

অহংকে সম্পূর্ণরূপে জয় করার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সত্যকে উপলব্ধি করে এবং অনুভব করে, "আমিই ব্রহ্ম"। এভাবেই ব্রহ্ম এবং নিজের মধ্যেকার মায়াবৃত পার্থক্য ঘুচে যায় (ইসলামি 'আনাল হক'-সম্পর্কিত ব্যাখ্যার সঙ্গে সাযুজ্য লক্ষণীয়)। রামানুজের মতে ব্রহ্মের দুই রূপ, 'চিৎ' ও 'অচিৎ'। 'চিৎ' অংশ থেকে জড়জগতের এবং 'অচিৎ' অংশ থেকে জীবজগতের উৎপত্তি। সুতরাং জড়দেহও ব্রহ্মের অংশ, তবে তা শাশ্বত নয়। আত্মা শাশ্বত এবং সূক্ষ্ম। চেতনা আত্মার অবিচ্ছেদ্য গুণ। রামানুজের মতে আত্মা ও অহং অভিন্ন।

উপযোগ : যে-জিনিসের দ্বারা মানুষের কোনো-না-কোনো প্রয়োজন মেটে, সে-জিনিসের উপযোগিতা বা উপযোগ (Utility) আছে বলে ধরা হয়। অতএব, উপযোগ হল কোনো বস্তুর সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা।

উপযোগ, প্রান্তিক : কোনো বস্তু ক্রয় বা সংগ্রহের শেষ দফা থেকে ভোক্তা কর্তৃক যে-উপযোগিতা বা উপযোগ পাওয়া যায়, তাকেই বলে প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility)। যেমন কোনো ব্যক্তি, কোনো জিনিস যদি তিন দফায় কেনে এবং তৃতীয় দফায় যদি তার প্রয়োজন মিটে যায়, তা হলে তৃতীয় দফার উপযোগিতাই হল ওই ভোক্তার জন্য ওই বস্তুর প্রান্তিক উপযোগ।

উপযোগ, সামগ্রিক : কোনো জিনিসের সামগ্রিক উপযোগ বলতে বোঝায়, সে-জিনিসের যত ইউনিট ভোক্তা কর্তৃক ব্যবহার করা হয়, তত ইউনিটের যোগফলকে। যেমন, কোনো এক ব্যক্তি তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোনো একটি জিনিস তিনবার ক্রয় করল। তা হলে ওই ব্যক্তির কাছে ওই জিনিসের সামগ্রিক উপযোগ (Total Utility) হল তিন।

উপযোগবাদ Utilitarianism. অর্থাৎ অন্য সবদিক উপেক্ষা করে, কেবল উপযোগিতার মানদণ্ডে কার্যাদির মূল্যায়ন। এটি একটি বুর্জোয়া ন্যায়তত্ত্ব। বেন্থাম এই তত্ত্বের উদ্ভাবক। তাঁর মতে নীতি হওয়া উচিত, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-পূরণের মাধমে "সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক উপকার"। তিনি আরও মনে করেন যে, কোনো কাজ নৈতিক না অনৈতিক, তা ওই কাজের দ্বারা কতজন লোকের ভালো ও কতজন লোকের মন্দ হয়েছে, সেই হিসাব থেকে গাণিতিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। জন স্টুয়ার্ট মিল উপকার এবং আনন্দের গুণগত মূল্যায়নের তত্ত্ব হাজির করেন। তাঁর মতে, দৈহিক আনন্দ বা পরিতৃপ্তির তুলনায় অন্তরের আনন্দ বা পরিতৃপ্তিই হল অধিকতর খাঁটি। এই তত্ত্ব থেকেই প্রয়োগবাদের উদ্ভব।

উপরিকাঠামো Super-structure. যে-সমস্ত বিষয় বা কাঠামো একটি মূল বিষয় বা কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল, সে-সমস্ত বিষয় বা কাঠামোকে বলে উপরিকাঠামো। আর মূল কাঠামোকে বলা হয় ভিত্তি (Basis)। সমাজের ক্ষেত্রে, সাধারণত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে (সমাজতন্ত্রীদের বিবেচনায় উৎপাদন-সম্পর্ককে) ধরা হয় ভিত্তি এবং রাজনীতি, শিল্প সাহিত্য, আইনব্যবস্থা, প্রশাসনব্যবস্থা, নীতি ও মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারা ইত্যাদিকে বলা হয় উপরি কাঠামো। কেননা, একটা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা কী, প্রধানত তার ওপরই নির্ভর করে সে-দেশের রাজনৈতিক -প্রশাসনিক-সাংস্কৃতিক-নৈতিক কাঠামো ও মানের স্বরূপ। সুতরাং, ভিত্তি বা মূল

কাঠামোর পরিবর্তন না করে, উপরিকাঠামো নিয়ে যত টানা-হ্যাঁচড়াই করা যাক-না কেন, তাতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধন কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়। অন্যদিকে, মূল কাঠামো পালটে গেলে উপরিকাঠামোসমূহও কমবেশি পালটে যেতে বাধ্য। অবশ্য একথাও সত্য যে, কাঠামো পালটানোর জন্য উপরিকাঠামোগুলোকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন, ধরা যাক, একটা দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতি কায়েম আছে। এখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাকে পুঁজিবাদী রেখে, উপরিকাঠামোগুলোর চরিত্র সমাজতন্ত্রী করা সম্ভবপর নয়। এরই পাশাপাশি একথাও সত্য যে উপরিকাঠামোগুলো, যেমন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, সশস্ত্রবাহিনী, প্রশাসন ইত্যাদির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শক্তি সৃষ্টি করা গেলে, তা দিয়েই বিপ্লব ঘটিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাকেও পালটে সমাজতান্ত্রিক করা যেতে পারে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে কাঠামো ও উপরিকাঠামোর সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক ও পরস্পরসম্পর্কযুক্ত।

উমর বিন খাত্তাব (রা), হজরত : ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা)-এর ইন্তেকালের পর, মজলিসে শূরা কঠোর সততার প্রতিমূর্তি হজরত উমর বিন খাত্তাব (রা)-কে ইসলামি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত করে। অনেকের মতে, তিনি ছিলেন পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি ছিলেন দক্ষ প্রশাসক, মহাপরাক্রম সেনানায়ক, কঠোর ন্যায়বিচারক, একনিষ্ঠ সাধক ও জ্ঞানী। তাঁর গুণাবলী এমনই নিখুঁত ছিল যে, মহানবী (স) স্বয়ং বলেছিলেন, তাঁর পরে যদি নবী আসার কোনো সুযোগ থাকত, তা হলে উমর (রা) নবী হতেন। উমর (রা) বিনয়বশত 'খলিফা' বা 'রাসুল (দঃ)-এর প্রতিনিধি'-র পরিবর্তে 'আমিরুল মুমিনিন' বা 'বিশ্বাসীদের নেতা' এই উপাধিতে ভূষিত হতেন। তিনি সমগ্র ইসলামি রাষ্ট্রকে ৮টি প্রদেশে এবং প্রতিটি প্রদেশকে কতিপয় জেলায় বিভক্ত করেন, সরকারি কর্মচারীদের জমিক্রয় ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, বিচার বিভাগকে প্রশাসনের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেন, কাজি বা বিচারকরা কোনোপ্রকার সম্পত্তি আহরণ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করেন, মজলিসে শূরাকে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন, সমগ্র রাজ্যকে ৯টি সামরিক অঞ্চল বা 'জুনদ্'-এ বিভক্ত করেন, সৈন্যদের বেতনকাঠামো ও নিয়মাবলী প্রবর্তন করেন, সুশৃঙ্খল পুলিশবিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন, কর-আদায় ও তার ব্যবস্থাপনার জন্য 'দিওয়ানুল খারাজ' নামক সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠা করেন, বাণিজ্য-শুল্কব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, জনসাধারণ যাতে বিনা ফি-তে আইনবিষয়ক পরামর্শ লাভ করতে পারে তজ্জন্য 'আল ইফতাহ্' নামক একটি বিভাগের প্রবর্তন করেন এবং ব্যাপক রাস্তাঘাট নির্মাণ, খালখনন ও জলসেচের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন পর্যায়ের শাসক নিয়োগকালে, তিনি তাঁদের সম্পত্তির হিসাব নেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং খালিদ বিন ওলিদ, আমর বিন আস, আবু হোরায়রা, আবু সুফিয়ান প্রমুখের মতো অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গসহ বিপুলসংখ্যক প্রশাসকের অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। 'সমস্ত সম্পদের মালিক আল্লাহ্' বিধায় সম্পদের ওপর সকল মানুষের সমান অধিকার, উমর (রা) এই নীতি কঠোরভাবে কার্যকর করেন এবং যারা নিজেরা জমি চাষ করতে অক্ষম, তাদের জমি ছিনিয়ে নিয়ে প্রকৃত চাষীদের মধ্যে বণ্টনের নীতি গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রত্যেক শাসকের অবশ্যকর্তব্য। তিনি প্রতিটি নাগরিককে মতামত প্রকাশ ও

সমালোচনা করার অবাধ অধিকার প্রদান করেন। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তিনি এমনই কঠোর ছিলেন যে, সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি খালিদ বিন ওলিদকে বরখাস্ত করতে কিংবা আপন পুত্রকে মদ্যপানের অপরাধে বেত্রাঘাত করতে এবং বেত্রাঘাতের ফলে পুত্রের মৃত্যু ঘটলে বাদবাকি বেত্রাঘাত তার কবরের ওপর করতেও তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি। সম্পদবণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি এমনই সাম্যের নীতি গ্রহণ করেন যে, অনেকের মতে উমর (রা)ই ছিলেন বিশ্বে যথার্থ 'সাম্যবাদ'-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দামাস্কাস, জেরুজালেম, মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া এবং অপরদিকে ইস্পাহান, আযারবাইজান, আর্মেনিয়া, কিরমান, শিস্তান, মাকরান, মার্ভ, হিরাট, বল্খ্, নিশাপুর, তাজিকিস্তান, এমনকি বর্তমান পাকিস্তানের দেবল পর্যন্ত জয় করে এক সুবিশাল মুসলিম-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী একই মুদ্রাব্যবস্থা কায়েম করেন এবং দরিদ্র, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, এতিম এবং যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের পরিবারবর্গের জন্য নিয়মিত ভাতার প্রবর্তন করেন। তাঁর সময়ে 'মসজিদুন্নবী' বা মদিনার মসজিদে মজলিসে শূরার অধিবেশন বসত, সেখানে খলিফা সকল মতামত ও সমালোচনা শ্রবণ করতেন। এ ছাড়া, হজ্বের সময়ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমবেত জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন গভর্নর ও শাসকদের কাজ ও আচরণ সম্পর্কে শোনা হত এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হত। দশ বছর (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ) শাসনকার্য পরিচালনার পর একদিন ফজরের নামাজের ইমামতিকালে আবু লুলু নামক জনৈক আততায়ী পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করলে আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর (রা) ৬০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

উরুগুয়ে রাউন্ড গ্যাট (GATT)-এর উদ্যোগে বাণিজ্য ও শুল্কের ব্যাপারে যেসব পর্যায়ক্রমিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এটি তারই একটি। গ্যাট-এর তৎকালীন মহাপরিচালক আর্থার ডাংকেল-এর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে উরুগুয়েতে এই আলোচনাপর্ব শুরু হয় এবং ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর এক চুক্তি-সম্পাদনের মাধ্যমে উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনার সমাপ্তি ঘটে। উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ ১. কৃষিজাত পণ্য রফতানির ওপর ভর্তুকি কমানো হবে মূল্যের ওপর ৩৬% এবং পরিমাণের ওপর ২১% আর আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হবে ৫০%; ২. শিল্পজাত পণ্যের ওপর শুল্ক এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হবে এবং বাণিজ্যপ্রবাহের ৪০%-এরও বেশি শুল্কমুক্ত হবে; ৩. প্রত্যেক দেশ ব্যাংকিং ও পর্যটনসহ সেবামূলক খাতের বাণিজ্যের ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখবে; ৪. টেক্সটাইল ও গার্মেন্টি-সামগ্রীতে ধনীদেশসমূহ কর্তৃক আরোপিত কোটা ১০ বছরের জন্য প্রত্যাহার করা হবে; ৫. গ্যাট একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা বিধায়, এর স্থলে বিশ্ববাণিজ্য সংগঠন (WTO) প্রতিষ্ঠা করা হবে; ৬. বুটলেগিংসহ কপিরাইট চুরি ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ফিল্ম নকলের বিরুদ্ধে কড়া আইন প্রণয়ন করা হবে এবং ৭. বাণিজ্যসংক্রান্ত বিবিধ বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে। উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তিতে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুশি হলেও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহ তেমন খুশি হয়নি।

উর্বর অর্ধচন্দ্র Fertile Crescent. ভূমধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী এলাকা, যা বর্তমানে জর্ডান, সিরিয়া ও ইরাক, তা-ই উর্বর অর্ধচন্দ্র বলে অভিহিত; কেননা ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসবিধৌত এই অঞ্চল একসময় ছিল অত্যন্ত উর্বর ও শস্যশ্যামল।

উসমান (রা), হজরত : ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা) নিহত হওয়ার পর হজরত উসমান (রা) ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। সরল ও উদারপ্রাণ উসমান (রা) খলিফা হয়েই মহানবী (সা) কর্তৃক নির্বাসিত, তাঁর নিকটতম আত্মীয় মারোয়ানকে মদিনায় আনিয়ে নেন এবং খলিফার প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেন। এতে আপামর জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হজরত আলি (রা)-এর সমর্থকরাও হজরত উসমান (রা)-এর খলিফা হওয়ার ব্যাপারটিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। জনমত ও নিকটতম সাহাবিদের মতামতকে উপেক্ষা করে তিনি তাঁর নিকট আত্মীয়গণকে কুফা, বসরা ও মিসরসহ বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং আত্মীয়দের নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে থাকেন। মুসলিম-সাম্রাজ্যের দিকে দিকে পূনরায় ধন-ঐশ্বর্য সঞ্চয়ের প্রবণতা দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। এমতাবস্থায়, কঠোর সাম্যবাদী অর্থনীতির প্রবক্তা, সর্বত্যাগী জ্ঞানী ও মহানবী (সা)-র নিকটতম সাহাবি হজরত আবু যর (রা) প্রমুখ খলিফার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং দ্রুত জনমত সৃষ্টি করতে থাকেন। কিন্তু উসমান (রা) তাঁকে নির্বাসিত করলে গণঅসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দুষ্কর্মের হোতা ও কুচক্রী মারোয়ানকে সকল মহলের মতামতের বিরুদ্ধে প্রধান পরামর্শদাতারূপে বহাল রাখার ফলশ্রুতিতে হজরত আলি (রা) প্রমুখ খলিফাকে সহায়তার পরিবর্তে নীরব ভূমিকা পালন করা শ্রেয়তর বিবেচনা করেন। চতুর্দিকে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এক পর্যায়ে বিদ্রোহীরা তাঁর গৃহ অবরোধ করে, তাঁর পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং অবশেষে তাঁকে হত্যা করে (৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর কন্যা আয়শা কোনোক্রমে তাঁর লাশের দাফনকার্য সম্পন্ন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে হজরত উসমান (রা) ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, অনাড়ম্বর, সরল, সৎ ও উদারচেতা। কিন্তু, একজন রাষ্ট্রনায়ক যদি অসৎ লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন, অসৎ লোকদের পরামর্শ মত কাজ করেন এবং জনমত ও জনস্বার্থকে উপেক্ষা করেন, তা হলে তাঁর ব্যক্তিগত সততা যে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়ে, হজরত উসমান (রা) তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ। হজরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের কাল ছিল দশ বৎসর (৬৪৬-৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ)।

॥ ঋ ॥

ঋণ, শর্তমুক্ত : যে-ঋণের সঙ্গে কোনো শর্ত যুক্ত থাকে না, অর্থাৎ যে-ঋণ নিয়ে ঋণগ্রহীতা স্বাধীনভাবে নিজের প্রয়োজন ও উপযোগিতা অনুযায়ী খাটাতে বা ব্যয় করতে পারে, তাকেই বলে শর্তমুক্ত ঋণ (Free Loan)।

ঋণ,শর্তযুক্ত : উন্নত দেশসমূহ অনুন্নত দেশসমূহকে যে-ঋণ দেয়, তা প্রধানত দুপ্রকার, যথা, শর্তমুক্ত ঋণ ও শর্তযুক্ত ঋণ (Tied Loan)। শর্তযুক্ত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতা ঋণের সঙ্গে কতগুলো শর্ত জুড়ে দেয় এবং ঋণগ্রহীতা ওই সমস্ত শর্ত মোতাবেক ঋণ ব্যবহার করতে বাধ্য থাকে। যেমন, ঋণদাতা শর্ত জুড়ে দিতে পারে যে, তাদের প্রদত্ত ঋণ শুধু অমুক অমুক জিনিস ক্রয় বাবদ ব্যয় করা যাবে, জিনিসগুলো কিনতে হবে ঋণদাতা দেশেরই কাছ থেকে, এজন্য প্রয়োজীয় কারিগরি সাহায্যও নিতে হবে সংশ্লিষ্ট ঋণদাতা দেশ থেকে ইত্যাদি। অনেক সময় শর্তযুক্ত ঋণকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা

হয়, যাতে ঋণদাতারা ঋণগ্রহীতাদের সরকার, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদিকেও নিজেদের সুবিধামতো প্রভাবিত ও পরিচালিত করতে পারে। শর্তযুক্ত ঋণের উদ্দেশ্য থাকে মোটামুটি নিম্নরূপ ১. ঋণদাতা দেশের উদ্বৃত পণ্য উচ্চমূল্যে ঋণগ্রহীতা দেশকে গছিয়ে দেওয়া, ২. ঋণগ্রহীতা দেশের শিল্পায়ন, কৃষি-উৎপাদন, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ইত্যাদিকে দাবিয়ে রাখার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান হারে ঋণদাতা দেশের মুখাপেক্ষী করে তোলা এবং ৩. ঋণদাতাদের প্রভাববলয়ে শামিল থাকতে ঋণগ্রহীতাদের বাধ্য করা।

॥ এ ॥

এককক্ষীয় ব্যবস্থা যে-শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্ট বা আইনসভার একটিমাত্র পরিষদ থাকে, সেই ব্যবস্থাকে বলে এককক্ষীয় ব্যবস্থা (Unicameral System)।

একচেটিয়া Monopoly. কোনো বিশেষ পণ্য বা কতিপয় পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর একচ্ছত্র প্রভুত্বকারী পুঁজিপতিদের সংঘ। এই সংঘবদ্ধ পুঁজিপতিরা কোনো ক্ষেত্রে পণ্যবিশেষের সমগ্র উৎপাদনের ওপর, কোনো ক্ষেত্রে তার সিংহভাগের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে পণ্যের প্রতিযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করলে, সর্বপ্রথম এরূপ সংঘের সূচনা ঘটে। প্রথম মহাযুদ্ধ(১৯১৪-১৮)-এর প্রাক্কালে একচেটিয়াসমূহ পুঁজিবাদী অর্থনীতির মৌল নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। লেনিনের মতে, অবাধ প্রতিযোগিতার স্থলে একচেটিয়াসমূহের প্রতিষ্ঠাই (নয়া) সাম্রাজ্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু।

একনায়কত্ব ল্যাটিন শব্দ Dictator (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) থেকে একনায়কত্ব (Dictatorship) কথাটির উৎপত্তি। কোনো শাসক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষ যখন শাসিতের মতামতের ধার না ধেরে একচ্ছত্রভাবে শাসনকাজ চালিয়ে যায়, তখন তাঁর বা তাঁদের শাসনকে বলে একনায়কত্ব। রোমান প্রজাতন্ত্রের সময় থেকে এর উৎপত্তি। এ-সময় জরুরি অবস্থায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসহ সাত বছরের জন্য একজন ডিক্টেটর নিয়োগের ক্ষমতা রোমান সিনেটকে প্রদান করা হয়। বর্তমান দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের একনায়কত্ব কায়েম আছে। যেমন, বুর্জোয়া একনায়কত্ব, সর্বহারা একনায়কত্ব, সামরিক একনায়কত্ব ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, একনায়কত্ব সর্বদাই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের একচ্ছত্র স্বার্থে প্রতিপক্ষের ওপর সার্বিক নিষ্পেষণ চাপিয়ে দেয়।

একনায়কত্ব, বুর্জোয়াশ্রেণীর বুর্জোয়া গণতন্ত্রকেই সমাজতন্ত্রীরা বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব বলে অভিহিত করেন। কারণ, পুঁজিবাদেরই উপরিকাঠামো হল পুঁজিবাদী গণতন্ত্র। বুর্জোয়াসমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা (যার নাম গণতন্ত্র) এমনভাবে বিন্যস্ত যে, তাতে শুধু বুর্জোয়াশ্রেণী বা তাদের প্রতিভূরাই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং এতে বুর্জোয়াশ্রেণীর একক স্বার্থই সংরক্ষিত হয়। অন্য কথায়, বুর্জোয়া গণতন্ত্র হল বুর্জোয়াদের স্বার্থে ব্যাপক জনগণকে শাসন ও শোষণের হাতিয়ার।

একনায়কত্ব, সর্বহারা শ্রেণীর এটি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের অপর নাম। একনায়কত্বের অর্থই হল সমাজের অন্যান্য অংশের ওপর একাংশের আধিপত্য। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে,

রাষ্ট্র শোষকশ্রেণীরই করায়ত্ব থাকে। তারা তাদের শ্রেণীস্বার্থে তাদেরই একাধিপত্য কায়েম রাখে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে সর্বহারা শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেও সমাজ থেকে সে-মুহূর্তেই বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের বিভিন্ন ব্যবস্থা ও শক্তিভিতসমূহ নিঃশেষিত হয়ে যায় না, এসব নিঃশেষিত হতে সময় লাগে। ফলে, যতদিন পর্যন্ত বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়াব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না ঘটছে, ততদিন পর্যন্ত শোষিতশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম রাখতে হয়, যাতে বুর্জোয়ারা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে এবং সমাজতন্ত্রায়নকে ব্যাহত করতে না পারে। স্ট্যালিনের মতে, পুঁজির প্রভুত্ব উচ্ছেদের জন্য ও সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য, শ্রমিকশ্রেণীকে চালিকাশক্তি হিসাবে মেনে নেওয়ার শর্তে, সর্বহারা শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণ, এ দুয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীমৈত্রীই হল সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব। তবে গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের মতে, বাস্তবে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব কখনোই কার্যত প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং এর নামে যা হয়েছে তা হল কমিউনিস্ট পার্টি ব্যুরোক্রেসিরই একনায়কত্ব।

এক পা সামনে, দুপা পেছনে বিপ্লবী, বিশেষত গেরিলা রণকৌশলের একটি রূপ। গেরিলাযোদ্ধারা প্রায়শই শত্রুর ওপর অতর্কিত আঘাত হেনে, শত্রুর নাগালের বাইরে পিছু হটে যায়। ফলে শত্রু নাজেহাল হয়, কিন্তু গেরিলাদের তেমন ক্ষতি করতে সমর্থ হয় না। অনুরূপভাবে, বিপ্লবী আন্দোলনের প্রক্রিয়ায়ও মাঝে মাঝে এমন একটা সময় আসে, যখন প্রচণ্ড কিছু করার মতো অবস্থা থাকে না, প্রচণ্ড কিছু করাটা হটকারী বা আত্মঘাতী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমতাবস্থায় আন্দোলনের গতিকে রাশ টেনে রাখার প্রয়োজন পড়ে। আবার কোনো সময় হটকারী কিছু হয়ে পড়লে, তাকে সামাল দেওয়ার জন্যও পিছিয়ে আসার প্রয়োজন পড়ে। প্রবলতর বেগে সামনে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সাময়িকভাবে বেশ কিছুটা পিছিয়ে আসার কৌশলকে বা একটা আঘাত হেনে, প্রত্যাঘাত এড়ানোর উদ্দেশ্যে বেশ খানিকটা পিছিয়ে আসার, কৌশলকেই বলা হয়, "এক পা সামনে, দুপা পেছনে" (One step forward, two steps backward) কৌশল।

এঙ্গেলস, ফ্রেডারিখ : (১৮২০-৯৫) মার্কসীয় মতবাদ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের যুগ্ম স্থপতি। তাঁরও জন্ম জার্মানিতে। তিনি তরুণবয়সে তরুণ হেগেলীয়দের বামপন্থি গ্রুপে যোগদান করেন এবং পিতার অমতে ইংল্যান্ডে এসে শ্রমিকশ্রেণীর সংস্পর্শে আসেন। তিনিই এটা প্রথম দেখান যে, সর্বহারারা শুধু শোষিতই নয়, মুক্তির জন্য সংগ্রামী শ্রেণীও বটে। ১৮৪৪ সালে তিনি প্যারিসে চলে আসেন এবং মার্কসের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এর পর থেকেই শুরু হয় যৌথ অবদানের এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস। ১৮৪৪-৪৮ সালে তাঁরা যুগ্মভাবে 'হলি ফ্যামিলি' ও 'জার্মান আইডিওলজি' রচনা করেন। এ-সময় তাঁরা কমিউনিস্ট লীগ সংগঠিত করার জন্যও প্রয়াস চালান। ১৮৪৭ সালে এঙ্গেলস 'সাম্যবাদের নীতিমালা' রচনা করেন। তারই ওপর ভিত্তি করে ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁদের যৌথ রচনা 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' (Communist Manifesto)। ১৮৪৮-৪৯ সালের জার্মানির বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এই আন্দোলন ব্যর্থ হলে তিনি পুনরায় ইংল্যান্ডে চলে আসেন। মার্কসও ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে চলে এসেছিলেন। এঙ্গেলস ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, প্রথম আন্তর্জাতিক গড়ে

তোলার আন্দোলনে শরিক হন এবং বিখ্যাত 'দাস ক্যাপিটাল' রচনার ব্যাপারে মার্কসকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করেন। মার্কস যখন 'ক্যাপিটাল' নিয়ে ব্যস্ত, তখন এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ওপর অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন এবং 'লুডউইগ ফয়েরবাখ ও ধ্রুপদী জার্মান দর্শনের অবসান', 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', এবং 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' রচনা করেন। তাঁর অপর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা' (Dialectics of Nature)। বস্তুত, এঙ্গেলসই মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করেন এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মার্কসবাদবিরোধীদের ও কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের সকল যুক্তি নস্যাৎ করার প্রয়াস পান।

এজেন্ট প্রোভোকেটর : Agent Provocateur. এটি একটি ফরাসি শব্দ। এর অর্থ উসকানিদানকারী এজেন্ট। এজেন্ট প্রোভোকেটর হল সেই ব্যক্তি, যে-ব্যক্তিকে কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক বা কূটনৈতিক সংকটের সময়, প্রতিপক্ষের শিবিরে বা দলে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এজেন্ট প্রোভোকেটর বিপক্ষ শিবিরে ঢুকে তাদেরই একজন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে বাহ্যিক আচরণ করে এবং বিশ্বাস অর্জন করার মাধ্যমে তাদের কার্যকলাপ ও নীতিকৌশলকে এমনভাবে পরিচালিত করার প্রয়াস পায়, যাতে তা তার আসল পক্ষের অনুকূলে যায় এবং বিরোধীশিবিরে নমনীয়তা, দোদুল্যমনতা, মতভেদ, সংকট, অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে। কোনো সরকারকে দুর্বল করার জন্য, কোনো শক্তিশালী দলকে ভেঙে দেওয়ার জন্য কিংবা কোনো বিপ্লবী আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য এজেন্ট প্রোভোকেটর ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এজেন্ট প্রোভোকেটররা বিপক্ষ দেশে গিয়ে তাদের দিয়ে এমন সব কর্মকাণ্ড ঘটায়, যাতে তার স্বপক্ষ দেশ ওই বিপক্ষ দেশকে আক্রমণের ছুতো খুঁজে পায়। অনেক সময় বিপক্ষ দল বা দেশের সদস্যদের ভেতর থেকে অর্থলোভ, পদলোভ বা মস্তক ধোলাইয়ের মাধ্যমে এরূপ এজেন্ট প্রোভোকেটর তৈরির প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

এনজিও Non-Government Organisation (NGO). অর্থাৎ বেসরকারি সংস্থা। সাধারণত বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের দরিদ্র বা পশ্চাৎপদ জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য, তাদের স্বাস্থ্য বা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য, পরিবেশ উন্নয়ন ও বনায়নের জন্য, এইডস, কুষ্ঠ, ডায়রিয়া বা অনুরূপ ভয়াবহ ব্যাধিসমূহের মোকাবেলার জন্য, সম্প্রদায় বিশেষের উন্নয়নের জন্য, দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য, মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অথবা অপর কোনো জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা কাজ করে সেসব সংস্থাকেই বলে এনজিও। অবশ্য বর্তমানে কোনো কোনো এনজিও বিভিন্ন পশ্চাৎপদ দেশে আইনের শাসন, গণতন্ত্রের বিকাশ, সুষ্ঠু নির্বাচন ইত্যাদি সুনিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনৈতিক কাজেও সম্পৃক্ত হওয়ার পক্ষপাতী। বস্তুত, অনুন্নত দেশসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন এবং পশ্চাৎপদ জনগণের উন্নয়নে যেমন এনজিওদের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, তেমনি এনজিওসমূহ ক্রমবর্ধমান হারে সংশ্লিষ্ট দেশের সমাজ ও রাজনীতির ওপরও প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। অনেকে অভিযোগ করেন যে, এনজিওরা আসলে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণকে দারিদ্র্যের একটা স্তরে বেঁধে রাখার জন্য এবং ওই দেশকে উন্নত বিশ্বের বাজার হিসাবে বজায় রাখার স্বার্থেই কাজ করে,

তাই তারা কোনো দেশের মৌলিক শিল্পায়ন, বিদ্যুতায়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, রেলওয়েসহ যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে কোনো বিনিয়োগ করে না, যদিও এরূপ বিনিয়োগই একটা জাতির সার্বিক উন্নয়নে দীর্ঘস্থায়ী অবদান রাখতে পারে।

এন.টি.বি.টি. Nuclear Test (Partial) Ban Treaty (NTBT) বা পারমাণবিক পরীক্ষা (আংশিক) নিষিদ্ধকরণ চুক্তি। ১৯৬৩ সালের ৫ আগস্ট মস্কোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই বছরের ১০ অক্টোবর চুক্তিটি জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ফ্রান্স ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ব্যতিরেকে বহু রাষ্ট্র এই চুক্তির আওতায় আসে। এই চুক্তির মূল কথা হল দুটি ১. ভূপৃষ্ঠে, মহাশূন্যে বা সমুদ্র তলদেশে কোনোপ্রকার পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা করা যাবে না এবং ২. শুধুমাত্র ভূগর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো যাবে, তবে সেক্ষেত্রেও নিশ্চিত করতে হবে যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত কোনো রেডিও-অ্যাক্টিভ রশ্মি বা অপর কোনো ক্ষতিকর উপসর্গ যেন ভূপৃষ্ঠের বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে। চুক্তিভুক্ত কোনো দেশ ইচ্ছা করলে তিন মাসের নোটিশসাপেক্ষে এই চুক্তির আওতা থেকে সরে আসতে পারে।

এন.পি.টি. Nuclear Non-proliferationTreaty. অর্থাৎ পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার প্রতিরোধ চুক্তি। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশ্বে আর পারমাণবিক অস্ত্রের উদ্ভব হতে না দেওয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৯৫ সালে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনেও ২৫ বছরের মধ্যে বিশ্বকে আণবিক অস্ত্রমুক্ত করার 'অ্যাকশন প্ল্যান' গৃহীত হয়। কিন্তু বাস্তবে তা তেমন একটা কার্যকর হচ্ছে না।

এপ্রিল থিসিস : ১৯১৭ সালের ৩ এপ্রিল লেনিন প্রবাস থেকে পেট্রোগ্রাডে ফিরে আসেন এবং ৪ এপ্রিল নিখিল রুশ সোভিয়েত কনফারেন্সে যেসব প্রস্তাবনা বা থিসিস হাজির করেন, সেগুলোই 'এপ্রিল থিসিস' নামে খ্যাত। এই থিসিসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল নিম্নরূপ : বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী অস্থায়ী রুশ সরকারের বিরোধিতা, ২. আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের (তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলমান) ধারণা প্রত্যাহার, ৩. সর্বহারা ও গরিব কৃষকদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, ৪. সোভিয়েত ধরনের সরকার গঠন, ৫. অবস্থিত পুলিশ, সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের নির্মূলীকরণ, ৬. জমি জাতীয়করণ, ৭. সমস্ত ব্যাংককে একত্রীকরণের মাধ্যমে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি ব্যাংক গঠন, ৮. উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, ৯. পার্টির নাম পালটে কমিউনিস্ট পার্টি নামকরণ (তখন পর্যন্ত পার্টির নাম ছিল রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি) এবং ১০. কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠন।

এফ. এ. আর. সি. Revolutionary Armed Forces of Columbia–FARC. এটি কলম্বিয়ার বামপন্থি গেরিলা গ্রুপসমূহের মধ্যে বৃহত্তম। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের অংশবিশেষ এফ.এ.আর.সি.-র নিয়ন্ত্রণে। কলম্বিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বামপন্থি গ্রুপ, ন্যাশনাল লিবারেল আর্মি (ELN) দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশে প্রতিপত্তিশালী। এদের বিরুদ্ধে রয়েছে ডানপন্থি গেরিলা গ্রুপ প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী। ১৯৬৪ সাল থেকে এই বাম ও ডানপন্থি গেরিলারা কলম্বিয়ায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে।

এফ. এল. এন. Front de Liberation Nationale (FLN)। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে একদল আলজিরীয় তরুণ ফরাসি উপনিবেশবাদীদের নিকট থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সংগঠন গঠন করে। প্রায় দশ বছর ব্যাপী এই রক্তাক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে ৩৫০,০০০ আলজিরীয় প্রাণ দেয় এবং সংগঠনের অধিকাংশ উদ্যোক্তাই যুদ্ধে নিহত হন। ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে স্বাধীনতা অর্জিত হলে এফ.এল.এন.-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা বেন বেল্লার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। কিন্তু ১৯৬৫ সালের জুন মাসে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বেন বেল্লাকে উৎখাত করে কর্নেল হুয়ারি বুমেদিন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন এবং বেন বেল্লাকে কারারুদ্ধ করেন। আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীরাও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং জমিলা বুইরেদসহ তিনজন জমিলা ও অসংখ্য মহিলা নেত্রী ফরাসিদের হাতে বর্বরোচিত নির্যাতনের শিকার হন। বর্তমানে ইসলামি স্যালভেশন ফ্রন্ট নামক ইসলামি দলই আলজিরিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দল এবং এ-দল সামরিক শাসকদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত।

এফ.বি.আই. Federal Bureau of Investigation (FBI). ১৯০৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট এফ.বি.আই. প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম আমেরিকার দস্যু ও পূর্ব আমেরিকার অপরাধীদের দমন করা। ১৯২৪ সালে এডলার হুভার মাত্র ২৯ বছর বয়সে এই গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হন এবং সুদীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ এই দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান কর্তৃক পার্ল হারবারের ওপর আক্রমণের গুপ্ত সংবাদ পেয়েও তা কাজে লাগাতে না পারায় মার্কিন সরকার মনে করে যে, আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরির জন্য এফ.বি.আই. তেমন উপযুক্ত নয়। ফলে, সৃষ্টি হয় সি.আই.এ.-র এবং এফ.বি.আই. কার্যত অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থায় পরিণত হয়। এই সংস্থায় প্রায় ৬০০০ স্পেশাল এজেন্ট ও ৪০০০ অন্যান্য কর্মচারী আছে। কঠোর শৃঙ্খলাসম্পন্ন এই সংস্থার প্রত্যেক এজেন্টই সুশিক্ষিত (কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট) এবং যুদ্ধ, অস্ত্রের ব্যবহার, অপরাধের কলাকৌশল পরীক্ষা, আইন, প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে কঠোর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় অনুপ্রবেশকারী নাৎসি গোয়েন্দাদের রহস্য উদ্ঘাটন ও পরবর্তীকালে সোভিয়েত গোয়েন্দাদের নির্মূল করার কৃতিত্ব এই এফ.বি.আই.-এরই। কৃষ্ণাঙ্গ মানবতাবাদী নেতা নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডঃ মার্টিন লুথার কিংকে পাঁচ বছর যাবৎ তীব্র মানসিক যন্ত্রণা দেওয়ার ঘটনা ফাঁস হলে এফ.বি.আই.-এর বদনাম হয়ে যায়। বর্তমানে এই সংস্থার ২৩০০-এরও বেশি পরিকল্পনার আওতায় লক্ষ লক্ষ মার্কিন নাগরিকের নামে ফাইল খোলা হয়েছে। এফ. বি. আই. এমনই নৃশংস যে, এর নাম শুনলেই অপরাধীরা তো বটেই, সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নাকি আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

এম.এন.এল.এফ, Moro National Liberation Front, সংক্ষেপে MNLF. ফিলিপিন্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ মিন্দানোর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণই মোরো উপজাতীয় মুসলমান। মোরো মুসলমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে আসছে। এই মুসলমানদেরই জঙ্গি সংগঠন হচ্ছে এম.এন.এল.এফ.। এর চেয়ারম্যান নুরুল্লাহজি (নুর) মিসৌরি। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট ফিডেল রামোস সরকার এম. এন. এল. এফ.-এর সঙ্গে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের

মাধ্যমে ২৪ বছর ব্যাপী সশস্ত্র গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটান। এই চুক্তির মাধ্যমে মিন্দানোকে Autonomous Region of Muslim Mindano (ARMM) ঘোষণা করা হয় এবং নুর মিসৌরিকে এর গভর্নর নিয়োগ করা হয়। এম এন এল এফ থেকেই একটা অংশ বেরিয়ে গিয়ে হালিম সালামত-এর নেতৃত্বে গঠন করে Moro Islamic Liberation Front (MILF)। এদের সঙ্গেও ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ম্যানিলা সরকারের চুক্তি হয়। কিন্তু জনগণের স্বপ্নপূরণ হয়নি এই যুক্তিতে এম.আই.এল.এফ. ও কমিউনিস্ট নিউ পিপল্‌স্ আর্মি (NPA) যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে আবার সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

এমবার্গো Embargo বা নিষিদ্ধকরণ। সাধারণত ব্যাবসার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পণ্য আমদানি বা রফতানি নিষিদ্ধকরণ করাকে বলা হয় এমবার্গো। এ ছাড়া, কর্তৃপক্ষ খবরের কাগজে কোনো বিশেষ সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো এমবার্গো আরোপ করে থাকেন। স্বৈরশাসনের ক্ষেত্রে এর প্রকোপ অধিক দেখা যায়। কোনো কোনো সরকার জনগণের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপরও এমবার্গো আরোপ করে থাকে। এমবার্গো স্থায়ী বা সাময়িক চরিত্রের হতে পারে। নিষিদ্ধকরণও দ্রষ্টব্য।

এম.বি.এফ.আর. সংলাপ Mutual and Balanced Force Reduction (MBFR) Talks বা পারস্পরিক ও সুষম শক্তিহ্রাস সংলাপ। এটিও স্টার্ট (START) বা সল্ট (SALT)-এরই মতো একটি ধারাবাহিক সংলাপ, যার ঘোষিত উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক সামরিক ধ্বংসশক্তি হ্রাস। এই আলোচনারও মূল শরিক হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।

এল. আল-আমিন-এর যুদ্ধ এল আল-আমিন আলেকজান্দ্রিয়ার প্রায় ৫০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত মিশরের এক ক্ষুদ্র শহর। ১৯৪২ সালে একদিকে ব্রিটেন ও কমনওয়েলথ দেশসমূহের সম্মিলিত বাহিনী এবং অপরদিকে জার্মানি ও ইতালির সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে এই স্থানে দুটি প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম যুদ্ধে মিত্রপক্ষের উক্ত অঞ্চলের সেনাপতি জেনারেল স্যার ক্লড অচিনলেক 'মরুভূমির শেয়াল' নামে খ্যাত বিখ্যাত জার্মান সেনাপতি মার্শাল আর উইন রোমেল (১৮৯১-১৯৪৪)-এর নীলনদের দিকে অগ্রসর হওয়াকে প্রতিহত করেন (৩০ জুন-২৫ জুলাই)। দ্বিতীয় যুদ্ধটি (২৩ অক্টোবর-৪ নভেম্বর) ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ, কেননা এই যুদ্ধের মাধ্যমেই মিত্রপক্ষ চক্রীপক্ষের ওপর পালটা আঘাত হানতে এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে তাদের বিতাড়নের প্রক্রিয়া শুরু করতে সমর্থ হয়। এই দ্বিতীয় যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সেনাপতি ছিলেন ব্রিটিশ জেনারেল স্যার (পরবর্তীকালে লর্ড) বার্নার্ড মন্টগোমারি। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ বিপুল গোলন্দাজ ও সাঁজোয়া শক্তি ব্যবহার করে। এই যুদ্ধের পরিণতিতে মিত্রপক্ষের অষ্টম বাহিনী লিবিয়া অতিক্রম করতে এবং মাত্র ১৮ সপ্তাহে ১৪০০ মাইল এলাকা দখল করতে সমর্থ হয়।

এল.টি.টি.ই. Liberation Tigers of Tamil Elam–LTTE. শ্রীলংকার তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি সংগঠন। ১৯৫৬ সালে ইংরেজির পরিবর্তে সিংহলি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হলে, শ্রীলংকার সংখ্যালঘু তামিলরা তামিল ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ক্রমশ এই আন্দোলন স্বাধিকার আন্দোলনে পরিণত হয় এবং তামিলরা ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা পেতে থাকে। ১৯৮৩ সাল থেকে তারা

তামিল এলাম বা পৃথক তামিল রাষ্ট্রের দাবিতে গৃহযুদ্ধ শুরু করে। এক পর্যায়ে শ্রীলংকা সরকার তামিলদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে রাজি হয় এবং ফলে তাদের স্বাধীনতার দাবির প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন অনেকটা হ্রাস পায়। ১৯৮৭ সালের জুন মাসে তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদের অবসানকল্পে ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ভারত এলটিটিই বাহিনীকে নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে শ্রীলংকার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন করে। বিদ্রোহীদের হাতে প্রায় ১২০০ ভারতীয় সৈন্য হতাহত হওয়ার পর, ১৯৯০ সালে ভারত সৈন্য প্রত্যাহার করে। কিন্তু ক্ষিপ্ত তামিলরা ১৯৯১ সালে ধানু নাম্নী এক আত্মঘাতী মহিলার মাধ্যমে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীকে হত্যা করে। ১৯৯৫ সালে সরকারি বাহিনীর হাতে তামিলদের ডি ফ্যাক্টো রাজধানী জাফনার পতন ঘটে। কিন্তু তার পরও এলটিটিই তার একচ্ছত্র নেতা ভিলুপিল্লাই প্রভাকরণের নেতৃত্বে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

এলিট : Elite. আভিজাত্য, ক্ষমতা, চাকুরিগত অবস্থান, আর্থিক প্রাচুর্য, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ইত্যাদির কারণে একটা দেশ বা সমাজের যে-অংশটি 'উৎকৃষ্ট', ক্ষমতাধর ও যাবতীয় সিদ্ধান্তের কারক বলে বিবেচিত, সেই অংশটিকেই বলা হয় এলিট। সাধারণত প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, পার্লামেন্টের বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ, সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের উচ্চতম পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, উচ্চতম পর্যায়ের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার ও টেকনোক্র্যাটবৃন্দ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ ও বিজ্ঞানী প্রমুখ, নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠসমূহের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদবৃন্দ, সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক ও শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ের কৌসুলিবৃন্দ, বাছাই করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO)-র সর্বোচ্চ কর্মকর্তাবৃন্দ প্রমুখকেই সমাজের এলিট বলে বিবেচনা করা হয়। প্রায়শই দেখা যায় যে, সমাজের এলিটরা যেদিকে ঝোঁকেন, সাধারণ জনমতও সেদিকেই প্রধাবিত হয়। বস্তুত এলিটরাই একটি সমাজের যাবতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত এবং জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সমাজবিপ্লব ব্যতীত একটি অবস্থিত এলিট শ্রেণী বা তাদের কায়েমি স্বার্থকে অপসারণ করা সম্ভবপর নয় বলেই অনেকে মনে করেন।

এলিট থিওরি : Elite Theory. কোনো সমাজের যে-সংখ্যালঘু শ্রেণী ঐতিহ্য-সম্পদ, পদমর্যাদা, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানের দরুন দলমতনির্বিশেষে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য ভোগ করে, সেই শ্রেণীকেই বলা হয় এলিটশ্রেণী। এলিটতত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, একটা দেশে যে-তন্ত্রই চালু থাকুক-না কেন, যে-কোনো দলের সরকারই ক্ষমতাসীন থাকুক-না কেন, কার্যত সর্বদাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই এলিটশ্রেণী। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ওই সমাজের পুঁজিপতি, আমলা, রাজনীতিবিদ প্রমুখের ইচ্ছাতেই পরিচালিত হয় এবং তাদের স্বার্থেই জনগণের ভোটাধিকারকে ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেও প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পার্টি ও রাষ্ট্রের এলিটরা। এলিট মতবাদীদের মতে, পৃথিবীতে চিরকাল প্রকৃত প্রস্তাবে এলিটদের শাসন ও প্রাধান্যই চলে এসেছে, এখনও তা-ই চলছে, ভবিষ্যতেও তা-ই চলবে। অর্থাৎ রূপ ও কাঠামো যাই হোক-না কেন, সংশ্লিষ্ট সমাজ বা রাষ্ট্রের এলিটদের ইচ্ছা ও স্বার্থ অনুসারেই সেই সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।

এলিট, প্রশাসনিক Administrative Elite. বিভিন্ন পার্লামেন্টারি ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য যে অরাজনৈতিক কর্মকর্তাদের স্তর থাকে সেটাকেই বলে প্রশাসনিক এলিট। এটা আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিসের প্রায় সমার্থক। তবে প্রশাসনিক এলিট-এর পরিধি দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন– ফ্রান্স ও জার্মানিতে পুলিশ ও স্কুল-শিক্ষকদেরও প্রশাসনিক এলিট বলে গণ্য করা হয়, অথচ ব্রিটেনে তা হয় না। অনেক দেশে আমলাতন্ত্র ক্ষমতাবান বিধায় দেশের মেধাবী মানুষরা আমলাতন্ত্রে যোগ দেয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো যেসব দেশে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়, সেসব দেশে সাধারণত মাঝারি মেধা ও বিদ্যার লোকেরাই আমলা হতে আগ্রহী হয়। ফলে দেশভেদে প্রশাসনিক এলিটদের গুণগত মান ও ক্ষমতার তারতম্য আছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক Asian Development Bank (ADB). জাতিসংঘের অর্থনৈতিক কমিশনের সুপারিশক্রমে এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের উন্নয়নকল্পে ১৯৬৬ সালে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত এলাকাবহির্ভূত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং সুইজারল্যান্ডসহ ৩৬টি দেশ এই ব্যাংক গঠনে অংশগ্রহণ করে। এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহকে সাহায্য প্রদান করা।

এশীয় যৌথ নিরাপত্তা পরিকল্পনা : সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ ১৯৬৯ সালের ৭ জুন মস্কোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের এক সম্মেলনে এই পরিকল্পনা পেশ করেন বলে, এটি ব্রেজনেভের এশীয় যৌথ নিরাপত্তা পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনার মূল কথা হল এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ; আক্রমণ, বলপ্রয়োগ ও অপরের সীমান্ত লংঘন সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা, কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করা, সাম্য ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত করা, নিতান্তই কোনো বিরোধ দেখা দিলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তার মীমাংসা করা এবং সর্বোপরি, সকল সামরিক জোটের বিলোপ সাধন করে সমগ্র এশিয়াভিত্তিক সহযোগিতা ও যৌথ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

এস. এস Schutzstaffel. সংক্ষেপে SS. এটি ছিল হিটলারের নিরাপত্তা-বাহিনীর নাম। ক্ষমতাশালী এই সংগঠন জার্মানি ও জার্মান-অধিকৃত এলাকায় গণহত্যা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য কুখ্যাত হয়ে ওঠে। উচ্চশ্রেণী থেকে আগত নাৎসিদের নিয়েই এই বাহিনী গঠন করা হয়েছিল।

এসকাপ বা Economic and Social Commission for Asia and Far East (ESCAP) অর্থাৎ এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন। এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানই এসকাপের কাজ। এটি জাতিসংঘের একটি সংস্থা।

॥ ঐ ॥

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ Historical Materialism. সমাজবিকাশের বস্তুবাদী নিয়মই হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যেমন,

সামাজিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেও তেমনি বস্তুগত কার্যকারণ ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব সমভাবে প্রযোজ্য। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দাবি করে যে, ১. সামাজিক পরিবর্তন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর পেছনে রয়েছে সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা এবং ২. সামাজিক পরিবর্তনের কারণও সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, যা সম্পূর্ণ বস্তুগত। এই তত্ত্ব বলে যে, উৎপাদিকাশক্তির সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্বই সমাজ-পরিবর্তনের মৌলসূত্র। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিকাশক্তিরও বিকাশ ঘটে। তখন পিছিয়ে-পড়া উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বেধে যায় এবং এরই ফলশ্রুতিতে সমাজ-পরিবর্তন ঘটে। এই নিয়মেই আদি সাম্যবাদী সমাজ দাসসমাজে, দাসসমাজ সামন্তবাদী সমাজে, সামন্তবাদী সমাজ পুঁজিবাদী সমাজে এবং পুঁজিবাদী সমাজ সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়ে আসছে। শোষণমূলক সমাজে এ-দ্বন্দ্বের রূপ বৈরী। কিন্তু শোষণমুক্ত সমাজে এ-দ্বন্দ্বের রূপ হয় অবৈরী। ফলে, শোষণমুক্ত সমাজে দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য কোনো বলপ্রয়োগের প্রয়োজন নেই। মার্কস-এঙ্গেলসই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উদ্গাতা। লেনিন-স্ট্যালিন-মাও ঝে ডং এর যুগোপযোগী বিকাশসাধনের প্রয়াস পান। তবে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদীদের তত্ত্বানুযায়ী সমাজতান্ত্রিক সমাজ সাম্যবাদী সমাজে রূপ পরিগ্রহ করার কথা থাকলেও, বর্তমান বিশ্বে তার উলটোটিই ঘটছে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজই পুনরায় মুক্তবাজার অর্থনীতি, তথা পুঁজিবাদে ফিরে যাচ্ছে।

ঐশ্বরিক অধিকার Divine Right. রাজারা বংশানুক্রমে রাজ্যশাসনের জন্য ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত—এই মতবাদ। বডিন (১৫৩০—৯৬), হুকার (১৫৫৪-১৬০০) প্রমুখ ছিলেন এই মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা। বস্তুত, গণতন্ত্রের উদ্ভবের সূচনায় চার্চ ও রাজতন্ত্র উভয়েই অনুভব করে যে, তাদের স্ব স্ব অস্তিত্বরক্ষার জন্যই উভয়ের মধ্যে আঁতাত খুবই জরুরি। এমতাবস্থায়, রাজারা চার্চকে, বিশেষত ক্যাথলিক চার্চকে ব্যাপকভাবে সুরক্ষা (Protection) প্রদান করেন এবং প্রতিদানে চার্চও প্রচার করে যে রাজারা বংশ-বংশানুক্রমে দেশশাসন করবে—এটাই ঈশ্বরের বিধান। অন্যান্য যেসব দেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্র ছিল, সেসব দেশের রাজারাও পুরোহিতদের মাধ্যমে এ জাতীয় তত্ত্ব প্রচার করাতেন। জাপানে তো এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হত যে, জাপানের রাজবংশ সরাসরি ঈশ্বর থেকেই উদ্ভূত। ইউরোপে অবশ্য সংস্কার আন্দোলন (Reformation) শুরু হলে এই মতবাদ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। সেন্ট অগাস্টাইন তাঁর ঈশ্বরের শহর (St. Augustine's 'City of God) গ্রন্থে রাজার ঐশ্বরিক অধিকারতত্ত্ব মূর্তরূপ দান করেন।

॥ ও ॥

ওকাস : Orginzation of Centreal American States (OCAS). এটি ODECA নামেও পরিচিত। কোস্টারিকা, এল সালভাডর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস ও নিকারাগুয়া—মধ্য আমেরিকার এই পাঁচটি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে ওকাস গঠিত। এই সংস্থা ১৯৫১ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি এবং ১৯৫২ সালে জারিকৃত চার্টার এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ ও ১৯৬৬ সালে এই চার্টারের কিছুটা সংশোধন করা হয়। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ১. পারস্পরিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা

বৃদ্ধি করা এবং ২. কোনো বিরোধ দেখা দিলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা মীমাংসার ব্যবস্থা করা। এর সদর দফতর সান সালভাডরে অবস্থিত।

ওগপু OGPU. সোভিয়েত রাশিয়ার গুপ্ত পুলিশবাহিনীরই নাম হল ওগপু।

ওপেক Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). বা পেট্রোল রফতানিকারক দেশসমূহের সংস্থা। এটি ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে ভেনিজুয়েলার রাজধানী ক্যারাকাসে গঠিত হয়। ইরাক, কুয়েত, ইরান, কাতার, সৌদি আরব ও ভেনিজুয়েলা ছিল এর উদ্যোক্তা। এই পাঁচটি তেল উৎপাদনকারী রাষ্ট্র নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১. তেল উৎপাদনকারী এবং তা ক্রয়কারী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করতে পারে, এরূপ অপ্রয়োজনীয় মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে তেলের দামকে মুক্ত রাখা; ২. উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা খুঁজে বের করা এবং ৩. কোনো তেল কোম্পানি এই সংগঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে মূল্য বৃদ্ধি বা নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত রফতানির মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে উদ্যত হলে, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

ওভারকিল Overkill. পারমাণবিক যুদ্ধসংক্রান্ত এই কথাটির দ্বারা কোনো একটি রাষ্ট্র বা কতিপয় রাষ্ট্রের এমন পারমাণবিক ক্ষমতা বোঝায়, যার ফলে সুনিশ্চিত থাকে যে, প্রতিপক্ষ দেশ বা দেশসমূহকে তো ধ্বংস করে দেওয়া যাবেই, বরং তার পরও কিছু অস্ত্র উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। এর দ্বারা এটাও বোঝানো যেতে পারে যে, প্রধান শক্তিসমূহের হাতে মোট যে- অস্ত্র আছে, তা দিয়ে গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরও উদ্বৃত্ত অস্ত্র থেকে যাবে। সাধারণত, প্রতিপক্ষকে হুমকি দিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যই এ-শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এই হুমকির বাংলা হতে পারে এই যে 'তোমাকে হত্যা, নিঃশেষ বা ধ্বংস করার চেয়েও বেশি ক্ষমতা আমার আছে'।

ওমবুডসম্যান : Ombudsman. শব্দটি সুইডিশ। ওমবুডসম্যান হলেন অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রী বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ের একজন সরকারি কর্মকর্তা, যিনি সরকার, বিশেষত প্রশাসনের যে-কোনো দফতর, বিভাগ বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের সরাসরি তদন্ত করতে পারেন। ওমবুডসম্যান সরকারি, আধা-সরকারি যে-কোনো দফতরে যে-কোনো সময় উপস্থিত হতে পারেন, যে-কোনো ফাইল বা কাগজপত্র তলব করতে ও দেখতে পারেন এবং যে-কোনো কর্মকর্তাকে জেরা করতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যায়, অবিচার বা দুর্নীতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বা ব্যবস্থার সুপারিশ করতে পারেন। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার-প্রধানসহ সকলেই তাঁকে সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকেন। ওমবুডসম্যানের বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে ন্যায়পাল।

ওয়াক আউট কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবের প্রতিবাদে পার্লামেন্টের বা অপর কোনো সংস্থার অধিবেশন বা বৈঠক থেকে চলে যাওয়াকেই বলে ওয়াক আউট। সাধারণত পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদে বিরোধীদলীয় সদস্যেরা সরকারি দলের কোনো প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ওয়াক আউট করে থাকেন। জাতিসংঘ বা অনুরূপ কোনো রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন থেকেও ওয়াক আউট (Walk-out) হতে পারে। আবার কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের বৈঠক থেকেও সংখ্যালঘিষ্ঠ ভিন্ন মতাবলম্বীরা ওয়াক

আউট করতে পারেন। বস্তুত ওয়াক আউট সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠের আপত্তি বা প্রতিবাদেরই একটি রূপ। ওয়াক আউট স্থায়ী বা সাময়িক হতে পারে।

ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি Watergate Scandal. ওয়াশিংটনের পোটোম্যাক নদীর তীরবর্তী ওয়াটারগেট নামক ভবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টির সদর দফতর অবস্থিত। ১৯৭২ সালের ১৭ জুন প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, ডেমোক্রেটিক দলের গোপন আলোচনা ও নির্বাচনী কৌশল জানার জন্য রিপাবলিকান দল ডেমোক্রেটিক দলের উক্ত সদর দফতরে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে। এ-ব্যাপারে ৫ জন হাতেনাতে ধরা পড়ে। এর সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের কেউ জড়িত নেই, জনগণকে আপাতত একথা বুঝিয়ে ১৯৭২ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দল জয়লাভ করে। কিন্তু মার্কিন পত্রপত্রিকা এর পেছনে লেগেই থাকে। এর মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল ও হোয়াইট হাউস স্টাফ চীফসহ সরকারের উচ্চতম পর্যায়ের ব্যক্তিরাই এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এঁদের মধ্য থেকে হোয়াইট হাউসের আইনবিষয়ক উপদেষ্টা জন ডিন এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ম্যাকগ্রোভার সমস্ত তথ্য ফাঁস করে দেন। ১৯৭৩ সালের ৯ নভেম্বর আদালত অভিযুক্ত সাত জনের ছয় জনকে করাদণ্ড দেয়। ১৯৭৪ সালের ২৪ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট ৬৪টি টেপ তলব করে। ১৯৭৪ সালের ২৭-২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জুডিসিয়ারি কমিটির সভায় প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির দায়ে ইম্পিচ করার জন্য সুপারিশ করা হয়। এমতাবস্থায়, ৫ আগস্ট নিক্সন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সকল দায়দায়িত্ব স্বীকার করে নেন এবং ৯ আগস্ট পদত্যাগ করেন।

ওয়াটারলুর যুদ্ধ এলবা থেকে ফিরে আসার পর এই যুদ্ধেই (১৮ জুন, ১৮১৫) নেপোলিয়ন বেনাপার্টের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। সৈন্য ও গোলন্দাজদের সংখ্যাধিক্যের জোরে ফরাসিবাহিনী ওয়েলিংটনের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশবাহিনীকে আক্রমণ করে এবং ব্রিটিশ ব্যূহ ভেদ করে ব্রাসেলসে উপনীত হওয়ার প্রয়াস পায়। ব্রিটিশ পদাতিকবাহিনী এই আক্রমণ প্রতিহত করে, সন্ধ্যার দিকে ফরাসিদের পিছু হটিয়ে দেয় এবং প্রুশীয় বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। এতে ফরাসি সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং চারদিন পর নেপোলিয়ন ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ওয়ারশ চুক্তি Warsaw Pact. ১৯৫৫ সালের মে মাসে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রোমানিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মিত্রতা, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের অঙ্গীকারে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অপর নাম পূর্ব ইউরোপীয় পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী সদস্যভুক্ত দেশসমূহের একটি ঐক্যবদ্ধ সামরিক কমান্ড গঠন করা হয় এবং সাব্যস্ত হয় যে, সদস্যভুক্ত কোনো দেশ আক্রান্ত হলে অন্য সকলে মিলে তার সর্বাত্মক সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মতভেদের কারণে আলবেনিয়া এই সংস্থার সদস্যত্ব ত্যাগ করে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর এই চুক্তির আর কোনো কার্যকারিতা নেই।

ওয়াল স্ট্রিট : নিউ ইয়র্কের স্টক এক্সচেঞ্জ এলাকা। বর্তমানে এই শব্দ মার্কিন ব্যাংক ও অর্থনৈতিক স্বার্থেরই অপর নামে পরিণত হয়েছে।

ওয়াশিংটন, জর্জ George Washington. (১৭৩২-৯৯) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট। জন্ম ভার্জিনিয়ায়। ১৭৭৫ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় বাহিনীকে পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়। তাঁর অসাধারণ সামরিক দক্ষতার দরুন ১৭৮১ সালে ইয়র্কটাউনে ব্রিটিশ সেনাপতি কর্নওয়ালিশ আত্মসমর্পণ করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান ঘটে। ১৭৮৭ সালে অনুষ্ঠিত যে-ফেডারেল কনভেনশনে মার্কিন সংবিধান গৃহীত হয়, তিনি তাতে সভাপতিত্ব করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৭৮৯ সালের ৩০ এপ্রিল নিউ ইয়র্কে তিনি প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ক্রমবর্ধমান হারে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করেন এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে হ্যামিল্টনের নীতি বাস্তবায়নের প্রয়াস পান। এতে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির অনুসারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী টমাস জেফার্সনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৭৯৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি যে-বিদায়ী ভাষণ দেন, তাতেই তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ সম্যক বিধৃত হয়। এই ভাষণে, তিনি আঞ্চলিক ভিত্তিতে দলগঠনের বিরুদ্ধে জাতির উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এবং পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চিরস্থায়ী মৈত্রী স্থাপন না করার জন্য পরামর্শ দেন।

ওয়েইমার রিপাবলিক Weimar Republic. প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এডলফ হিটলারের ক্ষমতায় আরোহণ পর্যন্ত (১৯১৯-৩৩) সময়ের জার্মানির রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন দলউপদলের। বিশেষত কমিউনিস্ট ও ফ্যাসিস্টদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-অধ্যুষিত এবং প্রায় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যবিহীন জার্মানিতে এ সময় বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা খুবই স্বল্পকালীন হলেও এর গুরুত্ব এজন্য অপরিসীম যে, ওয়েইমার রিপাবলিকের উদারতার সুযোগেই নাৎসিদের উত্থান ও হিটলারের ক্ষমতায় আরোহণ সম্ভবপর হয়েছিল। হিটলার কর্তৃক থার্ড রাইখ কায়েমের মধ্য দিয়েই ওয়েইমার রিপাবলিকের অবসান ঘটে।

ওয়েনবাদ ইংল্যান্ডের বিখ্যাত শিল্পপতি ও সমাজসংস্কারক রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) (১৭৭১-১৮৫৮)-এর মতবাদ। তিনি সমাজতান্ত্রিক সমবায়ের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা নির্মাণের রূপরেখা হাজির করেন। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় তা অসম্ভব ছিল বিধায়, তাঁর সমাজতন্ত্র কাল্পনিক সমাজতন্ত্র (Utopian Socialism) হিসাবে চিহ্নিত হয়। তাঁর সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হলেও, শ্রমিকদরদি হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনিই প্রথম শিশু-শ্রমিকদের জন্য স্কুল স্থাপন করেন। ইংল্যান্ডে কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিনিই সর্বপ্রথম সমবায় সংস্থা স্থাপন করেন। তাঁর চেষ্টাতেই ইংল্যান্ডের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। তাঁরই পাঁচ বছরের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ফ্যাক্টরি আইন তৈরি হয় এবং নারী ও শিশুদের কাজের সময় ১৪ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ১০ ঘণ্টা করা হয়। তিনি মনে করেন যে, পারিপার্শ্বিকতার চাপেই মানুষ অপরাধ করে, সুতরাং মানুষকে শাস্তি না দিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোই ন্যায়সংগত। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের জন্য তাঁর কল্পনা অনুযায়ী একটি আদর্শ কমিউনিস্ট কলোনি গঠন করতে গিয়ে ব্যর্থ ও সর্বস্বান্ত হন।

ওহাবি আন্দোলন ইসলামি চিন্তা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে আরবের আবদুল ওহাব যে সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু করেন, তা-ই ওহাবি আন্দোলন নামে খ্যাত। ঊনবিংশ

শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। রায় বেরেলির সৈয়দ আহমদ হজ্ব উপলক্ষে মক্কায় গিয়ে ওহাবি আদর্শে দীক্ষা নেন। মক্কাতেই তাঁর পরিচয় ঘটে বারাসতের মীর নিসার আলি (তিতুমীর) ও ফরিদপুরের পীর দুদু মিয়ার সঙ্গে। ১৮২০-২২ সালে ভারতবর্ষব্যাপী এই আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার কাজ চলে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এই আন্দোলনে শামিল হয়। ওহাবিরা ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব্' বা 'শত্রুর দেশ' বলে ঘোষণা করেন এবং একে 'দারুল ইসলাম' বা 'ইসলামের দেশ'-এ পরিণত করার শপথ নেন। শোষক-উৎপীড়ক ইংরেজ ও তাদের পদলেহী জমিদার-জায়গিরদার মহাজনদের বিরুদ্ধে ছিল ওহাবিদের বিদ্রোহ। প্রথম পর্যায়ে শিখ জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসলমান চাষীদের বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে এবং ১৮৩১ সালে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে স্বয়ং সৈয়দ আহমদ বেরেলভি নিহত হন। অতঃপর, এই বিদ্রোহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ থেকে বাংলা-বিহার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মূলত ওহাবি আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক হলেও, বাংলাদেশে যেহেতু জমিদারেরা ছিল প্রধানত হিন্দু এবং প্রজাদের বেশির ভাগ মুসলমান, সেহেতু প্রজাদের এই বিদ্রোহকে অনেকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার প্রয়াস পায়। বাংলায় এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন তিতুমীর ও পীর দুদু মিয়া। ১৭৭২ সালে চব্বিশ পরগনায় তিতুর জন্ম। ওহাবি আন্দোলন শুরু হলে এতদঞ্চলের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ওহাবি মতাবলম্বীদের দাড়ি রাখার ওপর মাথাপিছু আড়াই টাকা হারে খাজনা ধার্য করেন। অন্যান্য জমিদাররাও গ্রহণ করেন বিভিন্ন নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পেতে ব্যর্থ হয়ে তিতুমীর ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর প্রধান সহকারী হন মিসকিন শাহ। ১৮৩০ সালের ৬ই নভেম্বর তিতু কৃষ্ণদেব রায়ের প্রাসাদ আক্রমণ করেন এবং কয়েকদিন পর ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জমিদারদের খাজনাপ্রদানও বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্বভাবতই, জমিদার, নীলকর, কোম্পানি সবাই মিলে তিতুকে ধ্বংস করার প্রস্তুতি নেয়। তিতু নারকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা তৈরি করে এই হামলা প্রতিহত করার প্রয়াস পান। কিন্তু সম্মিলিত বাহিনীর কামানের গোলার মুখে তিতুর বাঁশের কেল্লা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ১৮৩০ সালের ১৫ নভেম্বর কেল্লার পতন ঘটে, তিতু নিহত হন, ৮০০ বিদ্রোহী বন্দি হয় এবং ওহাবি আন্দোলনের জঙ্গি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। বলাবাহুল্য, ওহাবি আন্দোলন মূলত ছিল উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী কৃষক-প্রজাদের আন্দোলন।

॥ ক ॥

কংগ্রেস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ফেডারেল আইন পরিষদ। কক্ষ দুটি হল, সিনেট এবং প্রতিনিধিসভা বা হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ্স্। মার্কিন সংবিধানের এক নম্বর ধারায় বলা আছে যে, এই সংবিধানে প্রদত্ত সকল ক্ষমতার এখতিয়ার হচ্ছে উক্ত দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কংগ্রেসের। প্রত্যেক জোড় বৎসরের প্রথম মঙ্গলবারে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কংগ্রেসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (শুধু মেইন রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেপ্টেম্বর মাসে)। সিনেটের সদস্যরা সিনেটর এবং প্রতিনিধিসভার সদস্যরা কংগ্রেসম্যান নামে পরিচিত হন।

কনকরড্যাট Concordat. সাধারণত পোপ বা ক্যাথলিক চার্চের প্রধান এবং কোনো সার্বভৌম সরকারের মধ্যে চার্চ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কবিষয়ক কোনো চুক্তি সম্পাদিত হলে, সেই চুক্তিকে বলে কনকরড্যাট।

কনডোমিনিয়াম : Condominium. কোনো এলাকাবিশেষের ওপর দুই বা ততধিক রাষ্ট্র যৌথভাবে শাসনকার্য পরিচালনা এবং সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করলে, এরূপ এলাকা বা অঞ্চলকে বলে কনডোমিনিয়াম। এরূপ শাসন বা সার্বভৌম ক্ষমতাপ্রয়োগের ব্যাপারটিকেও কনডোমিনিয়াম বলা হয়।

কনফুসিয়াস : (খ্রিস্টপূর্ব ৫৫১-৪৭৯) চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের মতে প্রতিটি মানুষের 'ভাগ্য' ও 'চরিত্র' ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত, তার পরিবর্তনের কোনো উপায় নেই। কনফুসিয়াসের অন্যতম অনুসারী মেংজু (খ্রিস্টপূর্ব ৩৭২-২৮৯)-এর মতে সামাজিক বৈষম্য ঈশ্বরের ইচ্ছারই ফলশ্রুতি। তাঁর অপর এক অনুসারী স্যুনজু (খ্রিস্টপূর্ব ২৯৮-২৩৮) বলেন যে, ঈশ্বর আসলে প্রকৃতিরই অংশ এবং ঈশ্বর চেতনারহিত। তাঁর অপর এক অনুসারী ছিলেন তুং চুং স্যু (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৭-১০৪)। কনফুসিয়াসবাদের মূল শিক্ষাই হল সুবিধাভোগী শ্রেণীর আধিপত্য কায়েম করা এবং 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'-র জয়গান করা। কনফুসিয়াস আচরণ ও শিষ্টাচারের নীতিমালাও প্রণয়ন করেন এবং এর প্রধান কথা হল, কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠের কাছে এবং অধস্তনরা উপরস্থদের কাছে বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করবে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে চুশি (১১৩০-১২০০) প্রমুখ নয়া কনফুসিয়াসবাদের প্রবর্তন করনে। এই দর্শন অনুযায়ী, সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুটি বিষয় আছে, যথা, লি, অর্থাৎ সচেতন সৃষ্টিধর্মী নীতি এবং চি, অর্থাৎ অচেতন বস্তু। লি মানুষের মধ্যে গুনের এবং চি দোষ ও পাপের জন্ম দেয়। ওয়াং ইয়াং মিং (১৪৭২-১৫২৮) এই মতবাদকে আরও বিকশিত করেন। তাও মতবাদ ও বৌদ্ধ ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে কনফুসিয়াসবাদও দীর্ঘদিন যাবৎ সামন্তবাদী চীনের প্রধান আদর্শ হিসাবে বহাল ছিল। চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর কনফুসিয়াসবাদের চর্চা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে কনফুসিয়াসের চিন্তাধারা নিয়ে ভাবনাচিন্তার পুনঃসূচনা ঘটে এবং তাঁর সমাধি জনগণের জন্য পুনরায় উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

কনফেডারেশন : Confederation. কতিপয় সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র যদি কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে একটি ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হয়, তা হলে সেই ইউনিয়নকে বলে কনফেডারেশন। কনফেডারেশনভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ সম্পূর্ণরূপে সার্বভৌম থাকে এবং কনফেডারেশনের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের জনগণের ওপর বাধ্যতামূলক হয় না। কনফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের এমন ক্ষমতা থাকে, যাতে যখনই ইচ্ছা তখনই যে-কোনো রাষ্ট্র কনফেডারেশন থেকে আলাদা বা মুক্ত হয়ে যেতে পারে। কনফেডারেশনের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কাঠামো গঠন করা হয়। বলাবাহুল্য, কনফেডারেশন কোনো অর্থেই একটি একক রাষ্ট্র নয়। কনফেডারেশন গঠিত হয় প্রধানত পারস্পরিক সহযোগিতা এবং প্রতিরক্ষার স্বার্থে। উদাহরণস্বরূপ, নেদারল্যান্ডস (১৫৮০-১৭৯৫), যুক্তরাষ্ট্র (১৭৭৮-১৭৮৭), সুইজারল্যান্ড (১৭৯১-১৭৯৮), জার্মানি (১৮১৫-১৮৬৬) ইত্যাদি কনফেডারেশনের কথা উল্লেখ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর পর কনফেডারেশন প্রকৃত প্রস্তাবে আর দেখা যায়নি। পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের মধ্যে গঠিত আর.সি.ডি.

(উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা) বা অনুরূপ অন্যান্য ঐক্যসংস্থা প্রকৃত অর্থে কনফেডারেশন ছিল না।

কনভয় Convoy. সাধারণত এক বা একাধিক যুদ্ধজাহাজ বা সশস্ত্র জাহাজ যদি অন্য একটি বা কতিপয় যাত্রীবাহী বা বাণিজ্যিক জাহাজকে পাহারা দিয়ে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে ও নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে, তা হলে সেই জাহাজ বা জাহাজসমষ্টিকে বলে কনভয়। আবার পুরো বহরটিকেও কনভয় বলা যায়।

কনমিং ঘোষণা : চীন, ভারত, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের প্রতিনিধিরা চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কনমিং-এ তিনদিনব্যাপী আলোচনা শেষে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার যে-ঘোষণা দেন, সেটাই কনমিং ঘোষণা (Kunming Declearation) নামে অভিহিত। ১৯৯৮ সালের ১৭ আগস্ট স্বাক্ষরিত এই ঘোষণায় চার দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং সড়ক, নৌ ও রেলযোগাযোগ স্থাপনের অপরিহার্যতার কথা প্রকাশ করা হয়।

কনসাল Consul. ভিন্ন রাষ্ট্রে বা ভিন্ন রাষ্ট্রের কোনো প্রদেশে বা অঞ্চলে অবস্থানকারী স্বদেশের নাগরিকদের স্বার্থরক্ষা এবং সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নসাধনের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তাকেই বলে কনসাল। পদমর্যাদার দিক থেকে রাষ্ট্রদূতের নিচেই কনসালের স্থান। অনেক সময় পদটির মর্যাদা বৃদ্ধি করে 'কনসাল জেনারলে'ও নিযুক্ত করা হয়।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প : Concentration Camp. ১৯০০-১৯০২ সালে লর্ড কিচেনার দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বপ্রথম কনসেনট্রেশন ক্যাম্প স্থাপন করেন এবং বুয়র নাগরিকদের এখানে আবদ্ধ করে রাখেন, যাতে তারা গেরিলাদের সহায়তা করতে না পারে। বাজে প্রশাসন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও নির্যাতনের জন্য এসব ক্যাম্প অচিরেই কুখ্যাত হয়ে ওঠে। ১৯৩৩ সালে নাৎসিরাও জার্মানিতে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প স্থাপন করে। এসব ক্যাম্পে বন্দিদের ওপর পৈশাচিক নিপীড়ন চালানো হত, যার ফলে অনেকেই মৃত্যুবরণ করত। এসব ক্যাম্প থেকেই জার্মান যুদ্ধসরঞ্জাম তৈরির কারখানাসমূহে দাসশ্রমিক সরবরাহ করা হত। এদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ছিল বুচেনওয়াল্ড ক্যাম্প; এখানে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে দুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার বন্দিকে আটকে রাখা হয়। পোল্যান্ডের বেলসেন ও অসুইজ নামক স্থানেও নাৎসিরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প স্থাপন করে। হাঙ্গেরি ও রুমানিয়ায়ও এরূপ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পসমূহে লক্ষ লক্ষ ইহুদির মৃত্যু ঘটে। বস্তুত এই ক্যাম্প হল রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর বর্বরতম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত স্বৈরাচারী সরকারের রাজনৈতিক কারাগার।

কনসোর্টিয়াম Consortium. কোনো জটিল প্রকল্প বা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাস্তবায়িত করা দুরূহ, এমন প্রকল্প বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠান গ্রুপবদ্ধ হয়ে কাজ করলে এরূপ গ্রুপকে বলে কনসোর্টিয়াম। শুধু কতিপয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই নয়, কোনো বিশেষ প্রকল্প বা কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য কতিপয় রাষ্ট্রকে নিয়েও কনসোর্টিয়াম গঠিত হতে পারে।

কনস্টিটিউআন্ট অ্যাসেম্বলি : Constituent Asssembly. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সেই পরিষদ, যেই পরিষদের একমাত্র দায়িত্ব জাতির জন্য

একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। বলাবাহুল্য, শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই এর কার্যকারিতাও সমাপ্ত হয়ে যায়। বাংলায় একে বলা যেতে পারে, 'শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদ' (গণপরিষদ দ্রষ্টব্য)।

কন্‌স্‌ক্রিপশন Conscription. অর্থাৎ সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে লোক ভর্তি। কোনো জাতীয় জরুরি অবস্থার সময়, বিশেষ বয়সের সকল সক্ষম নাগরিককে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করাকে বলে কন্‌স্‌ক্রিপশন।

কন্টাডোরা গ্রুপ : ল্যাটিন আমেরিকার একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংস্থা। মেক্সিকো, ভেনিজুয়েলা, পানামা এবং কলম্বিয়াকে নিয়ে কন্টাডোরা গ্রুপ (Contadora Group) গঠিত। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল বিদেশী শক্তির প্রভাব হ্রাস করাই কন্টাডোরা গ্রুপের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

কন্ডিশান্‌ড্‌ রিফ্লেক্সেস Conditioned Reflexes. শরীরের বিভিন্ন গ্রাহকযন্ত্র ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুর মাধ্যমে মানুষ ও জীবজন্তু যে-সমস্ত বিষয় বা প্রতিক্রিয়া আত্মস্থ করে, সেগুলোকেই বলা হয় কন্ডিশান্‌ড্‌ রিফ্লেক্সেস। অপরদিকে জীবসত্ত্বা (Organism) জন্মগতভাবে যে-সমস্ত চেতনা, অনুভূতি বা প্রবণতা লাভ করে, সেগুলোকে বলা হয় আনকন্ডিশান্‌ড্‌ রিফ্লেক্সেস (Unconditioned Reflexes)। আনকন্ডিশান্‌ড্‌ রিফ্লেক্সেসকে অপর কথায় বলা যায় জন্মগত প্রবৃত্তি, যা যে-কোনো প্রাণীর সকল সদস্যের মধ্যে প্রায় সমভাবে বিদ্যমান; যেমন, খাদ্য গ্রহণের প্রবৃত্তি, যৌনমিলনের প্রবৃত্তি, সন্তানের প্রতি মমতা, ভীতি, মৌমাছির মৌচাক তৈরির দক্ষতা, হায়েনার হিংস্রতা, পাখির বাসা তৈরির জ্ঞান ইত্যাদি। এই জন্মগত প্রবৃত্তিসমূহ প্রধানত মস্তিষ্কের নিম্নাংশে ধারণকৃত থাকে। আর কন্ডিশান্‌ড্‌ রিফ্লেক্সেস বা অভিজ্ঞতাগত চেতনা বা প্রবণতা মানুষ ও অন্যান্য উচ্চতর স্তরের জীব অর্জন করে স্ব স্ব জীবনধারার মধ্য দিয়ে। কন্ডিশান্‌ড্‌ রিফ্লেক্সেস একই প্রাণীর সকল সদস্যের মধ্যে একইভাবে বিরাজ করে না। কন্ডিশান্‌ড্‌ রিফ্লেক্সেস ধারণকৃত হয় মস্তিষ্কের উপরাংশে (Cerebral cortex-এ)। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, কন্ডিশান্‌ড্‌ রিফ্লেক্সেস-এর মাধ্যমে মস্তিষ্কে শুধু তথ্যই সঞ্চিত হয় না, বরং সেসব তথ্যের যাচাই ও প্রসেসিংও হয় এবং তা আনকন্ডিশান্‌ড্‌ রিফ্লেক্সেস বা জন্মগত প্রবৃত্তিকেও প্রভাবিত করে। মানুষ ও উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে কন্ডিশান্‌ড্‌ ও আনকন্ডিশান্‌ড্‌ রিফ্লেক্সেসের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই চেতনা, অনুভূতি ইত্যাদি যথার্থ রূপালাভ করে, বিবর্তিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কর্মকাণ্ডে এসবের প্রকাশ ঘটে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও কন্ডিশান্‌ড্‌ রিফ্লেক্সেস-এর প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

কমনওয়েলথ যে-সমস্ত রাষ্ট্র একসময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু বর্তমানে স্বাধীন, সে-সমস্ত রাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যকে নিয়েই কমনওয়েলথ (Commonwealth) গঠিত। সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সুষম উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যেই কমনওয়েলথ গঠিত। কমনওয়েলথ-এর সদস্যেরা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীন; শুধু ঐক্যের প্রতীক হিসাবে তারা ব্রিটেনের রাজা বা রানির প্রতি নামে মাত্র আনুগত্য প্রদর্শন করে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে উপনিবেশসমূহে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে ১৮৮৭ সাল

থেকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন সরকারদের বৈঠক ও আলোচনার রেওয়াজ চালু করা হয়। এই বৈঠকসমূহকে বলা হত ইম্পেরিয়াল কনফারেন্স। ১৯২৩ সালে এরূপ এক কনফারেন্সে বিভিন্ন অঞ্চল বা ডোমিনিয়নকে ব্রিটিশ রাজ্যের নামে আলাদাভাবে চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদন করার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালে স্ট্যাচুট অব ওয়েস্টমিনস্টার (Statute of Westminster) মোতাবেক কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের স্ব-স্ব সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯২৬ সালের ইম্পেরিয়াল কনফারেন্সেই বলা হয় যে, কমনওয়েলথের সদস্যদের প্রত্যেকেরই মর্যাদা হবে সমান, কেউ কোনোক্রমেই কারও অধীন হবে না, তা অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক-না কেন। কমনওয়েলথের যে-কোনো সদস্য যে-কোনো সময় ইচ্ছা করলেই কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

কমন ল Common Law. ইংল্যাড, ওয়েলস্ কানাডাসহ সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে কমন ল বা সাধারণ আইন প্রচলিত আছে। সামাজিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কসহ বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে আদালত যেসব রায় ও ব্যাখ্যা (Interpretation) প্রদান করে, সেগুলোকেই সমন্বিতভাবে বলা হয় কমন ল। সিভিল ল-এর সঙ্গে কমন ল-এর পার্থক্য এই যে, সিভিল ল কোনো পার্লামেন্ট বা আইনসভা কর্তৃক প্রণীত এবং একসঙ্গে বিধিবদ্ধ (Codified)। অথচ কমন ল বিক্ষিপ্ত। কিন্তু, বর্তমানে একজন ব্যক্তি—বিচারকের রায় বা ব্যাখ্যাকেই চূড়ান্ত আইন বলে মেনে নেওয়া যায় কি না এ-ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশেও ক্রমশ বিধিবদ্ধ আইনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কমান্ডো Commondo. বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেইসব ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যারা এককভাবে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে শত্রুপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে (যেমন, যুদ্ধজাহাজে, বিমানবন্দরে, অস্ত্রাগারে, সেনা ছাউনিতে, অর্থনৈতিক, সামরিক বা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য স্থাপনায় কিংবা কোনো বিশেষ ব্যক্তির অবস্থানস্থলে) অতর্কিত আঘাত হানতে এবং পালটা হামলার আগেই সরে পড়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষতসম্পন্ন। কমান্ডোদের কাজ সর্বদাই ঝুঁকিপূর্ণ।

কমিউন ফরাসি Commune শব্দের অর্থ হল সংঘ বা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের বিপ্লবীরা প্যারি কমিউন গঠন করে। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটসমূহকেও বলা হয় কমিউন। কমিউনের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, কমিউনের সকল সদস্যের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কমিউন পরিচালিত হয়। বস্তুত কমিউনের সকল সদস্যের ইচ্ছার ভিত্তিতেই সেখানকার উৎপাদন, বণ্টন, উন্নয়ন, প্রশাসন ইত্যাদি পরিচালনা করা হয়। চীনে আশির দশকে কমিউনসমূহের নাম পরিবর্তন করে উৎপাদন কোম্পানি রাখা হয়। একটি স্বায়ত্তশাসিত কৃষি বা শিল্পঅঞ্চলে কমিউন গঠিত হতে পারে। বলাবাহুল্য, কমিউন শব্দ থেকেই 'কমিউনিজম' ও 'কমিউনিস্ট' শব্দের উৎপত্তি।

কমিউনিজম, যুদ্ধকালীন War Communism. যুদ্ধবিধ্বস্ত, জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য লেনিন যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের প্রবর্তন করেন। গৃহযুদ্ধের দরুন এই অবস্থা প্রলম্বিত হয়। বস্তুত ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে ১৯২১ সালের বসন্তকাল

পর্যন্ত যুদ্ধকালীন কমিউনিজম বলবৎ থাকে। এই সময়কার নীতি অনুসারে খাদ্যশস্যের দাম বেঁধে দেওয়া হয় (প্রধানত সশস্ত্র বাহিনীসমূহের প্রয়োজন মেটানোর স্বার্থে) এবং উদ্বৃত শস্য নির্ধারিত মূল্যে সরকারের নিকট হস্তান্তর বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯১৮ সালের ২৮ জুন এক ডিক্রির মাধ্যমে ৩৭০০টি বৃহৎ শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রয়োজনে সেনাবাহিনীতে যোগদানের বাধ্যবাধ্যকতা (Conscription) সকল শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা হয়। এই সময় ব্যাংক ও ব্যাবসা-বাণিজ্য জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয় এবং পরিণামে চার কোটি মানুষ অপুষ্টির এবং পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যুর শিকার হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২১ সালে যুদ্ধকালীন কমিউনিজম বাদ দিয়ে নয়া অর্থনৈতিক নীতি (NEP) গ্রহণ করা হয়।

কমিউনিস্ট বিশ্বে ধস : বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকেই শুরু হয় কমিউনিজমের উচ্ছেদপ্রক্রিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভ তাঁর প্রেসত্রয়কা ও গ্লাসনস্ট তত্ত্বের মাধ্যমে কমিউনিজমকে খোলাখুলি বিতর্কে নিয়ে আসেন। পরিণামে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিজম পরিত্যক্ত হয়, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের পুস্তকাদি ভস্মীভূত করা হয়, ধ্বংস করা হয় তাঁদের সমস্ত ছবি ও মূর্তি। অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। একই সময়ে পূর্ব-ইউরোপীয় কমিউনিস্ট দেশসমূহও আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিজম পরিত্যাগ করে পুঁজিবাদের পথ গ্রহণ করে। যুগোস্লাভিয়াও ভেঙে যায়। পূর্বজার্মানি পুনরায় পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়ে। দেং জিয়াও পিং-এর নেতৃত্বে চীনও গ্রহণ করে খোলাবাজার অর্থনীতি। একই পথ অনুসরণ করে ভিয়েতনাম। উত্তর কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও কিউবাও ক্রমশ এগুতে থাকে পুঁজিবাদের দিকে। বস্তুবাদী তত্ত্বানুযায়ী কমিউনিস্ট দেশসমূহে একদা যে-ধর্ম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, সেই ধর্মই আবার পূর্ণোদ্যমে ফিরে আসে। সমাজতন্ত্রের এই নাটকীয় ধসের কারণ হিসাবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, প্রথমত বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশেষত পারমাণবিক তত্ত্ব, আপেক্ষিককতার তত্ত্ব, ইলেক্ট্রনিক্স, জেনেটিকস, সাইবারনেটিকস ইত্যাদির বিস্ময়কর বিকাশের ফলে মার্কস-এঙ্গেলসের ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনেকাংশেই অচল বা অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে; দ্বিতীয়ত শিল্পোন্নত দেশসমূহেই শ্রেণীসংগ্রাম তীক্ষ্ণ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবে বলে যে-তত্ত্ব প্রদান করা হয়েছিল, তাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, তৃতীয়ত সমাজতন্ত্র জনগণের মধ্যে কর্মোদ্যোগের সৃষ্টি ও উৎপাদনবৃদ্ধিতেও ব্যর্থ হয়; চতুর্থত উৎপাদিকাশক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নিরসনেও সমাজতন্ত্র বিফল হয় এবং পঞ্চমত তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের জনগণ মুক্তবিশ্বের সংস্পর্শে আসে এবং গণতন্ত্রহীন-ব্যক্তিস্বাধীনতাহীন পরিস্থিতি মেনে নিতে অস্বীকার করে।

কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো Communist Manifesto. মার্কস ও এঙ্গেলস প্রণীত কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো বা কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালে। এটাই ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রথম কর্মসূচিগত দলিল। এর 'বুর্জোয়া ও সর্বহারা' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে সমাজ বিকাশের অব্যর্থ নিয়মসমূহ ব্যাখ্যা করা হয় এবং প্রমাণ

করা হয় যে, এযাবৎকালীন মানবসমাজের ইতিহাস আসলে শ্রেণীসংগ্রামেরই ইতিহাস। এই অধ্যায়ে তাঁরা আরও ঘোষণা করেন যে, পুঁজিবাদের ধ্বংস এবং সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী, আর শ্রমিক বা সর্বহারা শ্রেণীই হবে এই বিপ্লবী পরিবর্তনের মূল শক্তি। 'সর্বহারা ও কমিউনিস্ট' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক ভূমিকার বিশ্লেষণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, কমিউনিস্টদের আশু কর্তব্য হচ্ছে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে সর্বহারা-রাজ কায়েম করা। এই অধ্যায়ে তাঁরা সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্ব হাজির করেন এবং ক্ষমতায় গিয়ে সর্বহারারা কী কী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেবে, তার বিবরণ দেন। তৃতীয় অধ্যায় হল 'সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী বই পুস্তক' শীর্ষক। এই অধ্যায়ে সমাজতন্ত্রের আবরণে বুর্জোয় ও পেটি বুর্জোয়া ঝোঁকের বিষয় আলোচনা করা হয়। 'অবস্থিত বিরোধীদলসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্টদের অবস্থান' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁরা বিরোধী শক্তিসমূহের মোকাবেলায় কমিউনিস্টদের কৌশলের বিষয়ে আলোচনা করেন। এই ইশতেহারেই ঘোষণা করা হয়, "সর্বহারা শ্রেণীর শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর আর কিছুই নেই"। এই ইশতেহারেই স্লোগান তোলা হয়, "দুনিয়ার মজদুর এক হও"। এই ইশতেহারকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দলিল বলে বিবেচনা করা হয়।

কমিউনিস্ট লীগ, তরুণ ১৯২১ সালে রাশিয়ার কমবয়সী কমিউনিস্ট ছেলেমেয়েদের এই সংগঠনটি গঠন করা হয়। ১৮ বা তার কমবয়সী ছেলেমেয়েরা সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টিতে না গিয়ে, তরুণ কমিউনিস্ট লীগে সংঘবদ্ধ হত। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, এর যোগ্যতর সদস্যেরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করত। লেনিন তরুণ কমিউনিস্ট লীগকে পার্টির সদস্য তৈরির স্কুল বলে অভিহিত করেন।

কমিনটার্ন : Comintern. এটি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল কথাটিরই সংক্ষেপিত রূপ। বস্তুত এটি তৃতীয় আন্তর্জাতিকেরই অন্য নাম। গঠনের কাল থেকে কমিনটার্ন পুঁজিবাদী দেশসমূহের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য উৎসাহ যোগাত। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অসমাজতন্ত্রী মিত্রদের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ কমিনটার্ন ভেঙে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এর কিছু-কিছু দায়িত্ব কমিনফর্ম গ্রহণ করে।

কমিনফর্ম Cminform. ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে বেলগ্রেডে কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো (সংক্ষেপে কমিনফর্ম) গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, ইতালি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও তথ্য বিনিময় করা। ১৯৪৮ সালে যুগোস্লাভিয়াকে কমিনফর্ম থেকে বহিষ্কার করা হলে, এর প্রধান কার্যালয় বুখারেস্টে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৫৬ সালে পুনরায় যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে সমঝোতা হলে, শর্ত মোতাবেক কমিনফর্ম ভেঙে দেওয়া হয়। যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যেই কমিনফর্ম ভেঙে দেওয়া হল।

কমেকন Comecon. এটি কাউন্সিল ফর মিউচুয়্যাল ইকনমিক অ্যাসিসটেন্স-এরই সংক্ষেপিত রূপ। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে যে-অর্থনৈতিক

সহযোগিতা (EEC) গড়ে ওঠে, তারই বিপরীতে পূর্ব ইউরাপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যেও একটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা-কাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালে আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে কমেকন গঠন করা হয়। কমেকনের লক্ষ্য ছিল, সদস্য দেশসমূহের মধ্যে এমন একটি অর্থনৈতিক সমন্বয় সাধন করা, যাতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন, কাঁচামালের পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নয়নে সহযোগিতা সুনিশ্চিত হয়। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর্যায়ে কমেকনও অবলুপ্ত হয়ে যায়।

কম্পিয়েনির রেলওয়ে কোচ প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তিতে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর জার্মানির কম্পিয়েনিতে একটি রেলওয়ে কোচ বা বগিতে বসে জার্মানি এবং মিত্রপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়। অবশ্য ইতঃপূর্বে, ২৯ সেপ্টেম্বর স্যালোনিকায় বুলগেরিয়ার সঙ্গে, ৩০ অক্টোবর মাদ্রোসে তুরস্কের সঙ্গে এবং ৩রা নভেম্বর পাদুয়ায় অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ১৯৪০ সালের ২২ জুন এডলফ হিটলার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে একই স্থানের একই রেলওয়ে কোচে বসে ফ্রান্সকে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন।

কর, পরোক্ষ : Indirect Tax. যে-সমস্ত কর কোনো দেশের আপমার জনগণ সরাসরি প্রদান করে না বরং ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মূল্যের সঙ্গে পরোক্ষভাবে প্রদান করে, সে-সমস্ত করকে বলে পরোক্ষ কর। আধুনিক রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ করের তুলনায় পরোক্ষ করের পরিমাণই সমধিক। যেমন, আমদানি শুল্ক (Import Duties), আবগারি শুল্ক (Excise Duties), বিক্রয় কর (Sales Tax) ইত্যাদি, যা একটা দেশের মোট করের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি, তা সাধারণ মানুষ সরাসরি প্রদান করে না; অথচ চূড়ান্ত বিচারে এ-সমস্ত করের পুরো বোঝাটাই ভোক্তা বা খুচরা ক্রেতাদেরই বহন করতে হয়। যেমন, একজন আমদানিকারক যে-দ্রব্য আমদানি করে, সে-দ্রব্য পাইকার, ডিস্ট্রিউবিটর বা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করার সময় প্রদত্ত আমদানি শুল্কও পড়তায় ধরে দেয়। অনুরূপভাবে শিল্পপতিও তার ওপর ধার্যকৃত সমস্ত কর ধরেই তার পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। মধ্যস্বত্বভোগীদের সবাই সেই মূল্যের সঙ্গে নিজ নিজ লভ্যাংশ যোগ করে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ভোক্তা বা খুচরা ক্রয়কারীকেই উপরোক্ত যাবতীয় কর ও শুল্কসহ সমগ্র মূল্য বহন করতে হয়। সরকার এ-সমস্ত কর বাড়ালেও আমদানিকারক, শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীরা নিজের গাঁট থেকে কখনোই এই কর দেয় না, বরং দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিয়ে ওই অতিরিক্ত কর ভোক্তা বা খুচরা ক্রেতার কাছ থেকেই আদায় করে নেয়। প্রকৃত করদাতা ভোক্তা প্রায়শ বুঝতেই পারে না যে সে-ই আসলে কর পরিশোধ করছে। এ ছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার পরোক্ষ কর বা শুল্কের প্রচলন রয়েছে।

কর, প্রত্যক্ষ Direct Tax. একজন নাগরিক যে-সমস্ত কর নিজেই সরকারি খাতে সরাসরি জমা করে, সে-সমস্ত করকে বলে প্রত্যক্ষ কর। যেমন, আয়কর, ভূমি খাজনা, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, বিদ্যুত রেট, পানির রেট, ভ্যাট ইত্যাদি হল প্রত্যক্ষ কর।

করনীড় Tax Haven. বিদেশী পুঁজি বা ফান্ডকে প্রলুব্ধ করার জন্য যে-সমস্ত দেশ শুল্ক ও করের হার নিম্নতম পর্যায়ে রাখে, সে-সমস্ত দেশকে বলে করনীড়। অনুন্নত ও উন্নত

উভয় প্রকার দেশেই করনীড়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। বার্মুডা, বাহামাস, পানামা, লাইবেরিয়া, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতিই হল এরূপ দেশের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কর্তৃত্ববাদী সরকার Authoritarian Government. যে-সরকারি ব্যবস্থায় জনগণের নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত নয় এবং যে-সরকার সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যাপারে জনমতের কোনো তোয়াক্কা করে না, সেইরূপ সরকারকে বলে কর্তৃত্ববাদী সরকার।

কর্পোরেট রাষ্ট্র : Corporate State. এমন একটি রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর ভিত্তি হল বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশনসমূহ। এরূপ রাষ্ট্রে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্ব করে মালিক ও শ্রমিকদের বিভিন্ন কর্পোরেশন। এরূপ রাষ্ট্রে, পার্লামেন্টের সদস্যরাও এলাকার জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আসে না, বরং বিভিন্ন সমিতি ও কর্পোরেশনের প্রতিনিধি হয়ে আসেন। এ-ধরনের রাষ্ট্রের প্রবক্তারা দাবি করেন যে, এরূপ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলাদলি থাকে না এবং ফলে জনগণ বাস্তবতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর প্রবক্তারা আরও দাবি করেন যে, এই ব্যবস্থায় মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব বহুলাংশে প্রশমিত হয় এবং ফলে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পর্তুগাল ও ফ্যাসিবাদী ইতালিতে সর্বপ্রথম এরূপ রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থার সমালোচকদের মতে কর্পোরেট রাষ্ট্র আসলে একধরনের একনায়কত্বেরই নামান্তর।

কর্পোরেশন বিভিন্ন মনোপলি, ব্যক্তিগত শিল্প ও আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মিলিত বিরাটকায় সংস্থা। এরূপ সংস্থার আওতায় যে শুধু একই প্রকারের শিল্পসমূহই থাকে তা নয়, বিভিন্ন প্রকারের, অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে যোগসম্পর্কহীন বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান (যেমন, কয়লাখনি, তৈলখনি, জাহাজ কারখানা, অন্যান্য যানবাহন কারখানা, কাপড়ের কল, রসায়ন শিল্প, ঔষধশিল্প, অন্যকোন শিল্প, সংবাদপত্র, ব্যাংক, বীমা, ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) একত্রে মিলিত হয়ে কর্পোরেশন গঠন করতে পারে। উ ৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সকল পর্যায়ে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই কর্পোরেশন গঠনের উদ্দেশ্য। শেয়ার বাজারের বিকাশ ও প্রায় সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলেই বিশাল কর্পোরেশনসমূহ সৃষ্টি হয়েছে। জাপানের মিৎসুবিশি, হিটাচি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কর্পোরেশন, বহুজাতিক Multi-national Corporation. যে-সমস্ত শিল্প ও ব্যাবসাসমষ্টির বা কর্পোরেশনের শাখাপ্রশাখা একাধিক দেশে বিস্তৃত, সে-সমস্ত কর্পোরেশনকেই বলা হয় বহুজাতিক কর্পোরেশন। এরূপ কর্পোরেশনসমূহ হল সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের একচেটিয়া বা মনোপলি। এসব কর্পোরশেনের মাধ্যমে নয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ অন্যান্য দেশে তাদের লগ্নি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং বিভিন্ন দেশের বাজারের ওপর, এমনকি বিশ্ববাজারের ওপর একচেটিয়া প্রভাব খাটানোর প্রয়াস পায়। এসব কর্পোরেশনের মাধ্যমেই চলে নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং এগুলোর মাধ্যমেই প্রতিযোগীদের বাজার থেকে হঠানো হয়। শুধু তা-ই নয়, এরূপ কর্পোরেশনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাবও বিস্তার করা হয়। বুটস, বায়ার ইত্যাদি ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, ফোর্ড, টয়োটা ফিয়াট ইত্যাদি মোটর প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান; মাৎসুসিতা, ফিলিপস্ ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, মিৎসুবিশি,

মিৎসুই, হিটাচি, ইউনিগেট, ইউনিলিভার প্রমুখ বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিই হল বহুজাতিক কর্পোরেশনের উদাহরণ।

কলব্যাক Call Back. যদি কোনো নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি জনগণের স্বার্থবিরোধী বা দুষ্কৃতিমূলক কোনো কাজে লিপ্ত হন, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা দিয়ে তাঁর প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহারের অধিকার যদি সংশ্লিষ্ট জনগণের থাকে, তা হলে সেই অধিকারকেই বলে 'কলব্যাক' করার বা ফিরিয়ে আনার অধিকার।

কলম্বো পরিকল্পনা Colombo Plan. ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোয় অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সমন্বিত উন্নয়নের যে-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, সেটাই কলম্বো পরিকল্পনা নামে খ্যাত। যে-সমস্ত দেশের উন্নয়ন এই পরিকল্পনার আওতাভুক্ত ছিল, সে-সমস্ত দেশ হল, পাকিস্তান, ভারত, বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার), শ্রীলংকা, নেপাল, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ফিলিপিনস, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া ও বোর্নিও (বর্তমানে বোর্নিও ইন্দোনেশিয়ারই অন্তর্ভুক্ত)। বলাবাহুল্য, এ-সমস্ত এলাকায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশের বাস। প্রথমে ছয় বছর (১৯৫১-১৯৫৭) মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও, পরে তা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বর্ধিত কর হয়। এ-সমস্ত দেশ বিশ্বের প্রায় ১০০% পাট, ১০০% প্রাকৃতিক রাবার, ৪০% চা, ও ৬৬% টিন উৎপাদন করে। কতিপয় কমনওয়েলথ দেশ (কানাডা, যুক্তরাজ্য, ভারত, শ্রীলংকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড) এই পরিকল্পনার আওতাভুক্ত দেশসমূহের গণপ্রশাসন, স্বাস্থ্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কৃষি ও শিল্পসংক্রান্ত অগ্রগতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'কারিগরি সহযোগিতা কাউন্সিল' গঠন করে। এই কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় কলম্বোয়। কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংক এই পরিকল্পনায় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবে বলেও সাব্যস্ত হয়।

কল্যাণরাষ্ট্র : Welfare State. যে-রাষ্ট্রে সরকার শুধু প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, আইন, বিচার, মুদ্রা ইত্যাদি সম্পর্কিত রুটিন দায়িত্বই পালন করে না, বরং জনগণের সামাজিক নিরাপত্তার জন্যও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেই রাষ্ট্রকেই বলে কল্যাণরাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সামাজিক বীমা, পারিবারিক ভাতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধান; খাদ্য, বাসস্থান শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, দুগ্ধ ইত্যাদির ওপর উদার ভর্তুকিপ্রদান, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থান এবং কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বেকারভাতা প্রদান ইত্যাদি কল্যাণরাষ্ট্রের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড প্রমুখ দেশকে যথার্থ কল্যাণরাষ্ট্র বলে বিবেচনা করা হয়। অবশ্য, সম্ভাব্য সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রতিহত করা এবং অভ্যন্তরীণ গণঅসন্তোষকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রায় সকল উন্নত পুঁজিবাদী দেশই উপরোক্ত জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের পরিধি ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর বিস্তৃত করে চলেছে।

কাউটস্কি, কার্ল (১৮৫৪-১৯৩৮)। জার্মান ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক তাত্ত্বিক। মার্কসবাদের প্রবক্তা হলেও তাঁর

শ্রেণীবিশ্লেষণে ভ্রান্তি ও কৌশলগত দিক থেকে সুবিধাবাদিতার জন্য এঙ্গেলস তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন। লেনিনের মতে, "কাউটস্কি বিপ্লবের কথা বললেও, প্রতিটি বিপ্লবী সুযোগের বিপ্লবী ব্যবহার সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি"। সর্বহারা বিপ্লবের কথা বললেও কাউটস্কি বুর্জোয়া রাষ্ট্রতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করে সেক্ষেত্রে সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটিকে এড়িয়ে যান। ১৯১০ সালে তিনি জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অভ্যন্তরে একটি মধ্যপন্থি গ্রুপ সৃষ্টি করেন এবং প্রকাশ্যে বিপ্লবী মার্কসবাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। মার্কসবাদীদের মতে, তিনি সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি এবং বস্তুবাদের সঙ্গে ভাববাদকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর ১৯২৭-২৯ সালের রচনাসমূহে দেখা যায় যে, তিনি দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকেও বিকৃত করে ফেলেছেন। তাঁর সমালোচকদের মতে, তিনি এভাবেই পর্যায়ক্রমে সুবিধাবাদ ও বিচ্যুতির পঙ্কে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হন।

কাউন্সিল অব ইউরোপ ইউরোপ মহাদেশীয় রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা কাউন্সিল অব ইউরোপ (Council of Europe) ১৯৪৯ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, আয়ারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি, তুরস্ক, গ্রিস, সাইপ্রাস, আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম প্রমুখ এর সদস্য। এর সদর দফতর ফ্রান্সের স্টর্সবার্গে অবস্থিত। সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরামর্শ-প্রদানই এই কাউন্সিলের মৌল উদ্দেশ্য। এর একটি সেক্রেটারিয়েট জেনারেল, একটি কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স এবং একটি কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলি রয়েছে।

কান্ট, ইমান্যুয়েল (১৭২৪-১৮০৪), জার্মান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক; জার্মান ধ্রুপদী ভাববাদের প্রবর্তক। কান্ট ছিলেন অজ্ঞেয়তাবাদী। তাঁর মতে বস্তুর স্বরূপ মানুষের জ্ঞানের অগম্য। মানুষ শুধু ততটুকুই জানতে পারে, বস্তুর যতটুকু ইন্দ্রিয়ের আওতায় ধরা পড়ে। সত্যিকার তাত্ত্বিক জ্ঞান একমাত্র গণিতশাস্ত্র এবং অন্যান্য প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সম্ভবপর। তাঁর মতে, জগৎ একাধারে সসীম ও অসীম, ধ্রুপদী সত্তা একাধারে অস্তিত্বশীল এবং অস্তিত্বহীন; অনুরূপভাবে বিশ্বের সকল কিছুই দ্বৈতসত্তাসম্পন্ন। এই প্রহেলিকার সমাধান হিসাবে, কান্ট জ্ঞানকে বিশ্বাসের পরিধিতে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে এবং সত্তাধীন বস্তু যে অজ্ঞেয়, তা স্বীকার করে নেওয়ার পক্ষে অভিমত প্রদান করেন। সমাজজীবনের ঐতিহাসিক গতিধারায় বিরোধের ভূমিকা এবং শাশ্বত শান্তির গুরুত্বের প্রশ্নে যে-মতবাদ তিনি প্রদান করনে, তার চরিত্র ছিল প্রগতিশীল। তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও চুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থকে এমনভাবে বিন্যস্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে তা স্থায়ী শান্তি সুনিশ্চিত করতে পারে। 'আত্মসত্তাহীন বস্তু'র অলীক তত্ত্বই কান্টের দর্শনকে স্ববিরোধিতা, ধারবাহিকতাহীনতা এবং প্রহেলিকার শিকারে পরিণত করেছে বলে, মার্কসবাদীরা সমালোচনা করেন।

কামাল আতাতুর্ক পুরো নাম মুস্তাফা কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮)। ১৯২৩ সালে তিনি তাঁর সহযোগী ইসমত ইনোনু, খালেদা এদিব প্রমুখের সহায়তায় তুর্কি খেলাফতের উচ্ছেদসাধন করেন এবং প্রজাতন্ত্রী তুরস্ক কায়েম করে তার প্রথম প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দলের নাম পিপলস রিপাবলিকান পার্টি। তিনি কার্যত একনায়কে পরিণত হন এবং তুরস্ককে পাশ্চাত্য ভাবধারায় অভিষিক্ত

করেন। তিনি ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক করেন, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেন, মহিলাদের বোরকা ও ঘোমটা এবং পুরুষদের ফেজটুপি ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, তুর্কিদের পাশ্চাত্য পোশাক পরার নির্দেশ দেন, সামন্তবাদী খেতাবাদির বিলোপসাধন করেন, তুর্কি ভাষার জন্য আরবি হরফ উচ্ছেদ করে ল্যাটিন হরফের প্রবর্তন করেন, শিল্পের বিকাশসাধন করেন, কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করেন, দেশে প্রথম আদমশুমারির ব্যবস্থা করেন এবং বামপন্থি আন্দোলনকে কঠোরভাবে অবদমিত করেন। তিনি জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির প্রবক্তা ছিলেন। তুরস্কের চেহারার আমূল পরিবর্তন করেছিলেন বলেই তাঁকে বলা হত আতাতুর্ক।

কায়রো ঘোষণা ১৯৪৩ সালের পয়লা ডিসেম্বর চীনের চিয়াং কাইশেক, ব্রিটেনের উইনস্টন চার্চিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট-এর মধ্যে কায়রোয় অনুষ্ঠিত বৈঠকে ঘোষণা করা হয় যে, এই ত্রিশক্তির অন্য কারও এলাকা দখলের কোনো দুরভিসন্ধি নেই, ১৯১৪ সালের পর থেকে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের যে-সমস্ত দ্বীপ দখল করেছে, সে-সমস্ত দ্বীপ থেকে জাপানকে উচ্ছেদ করতে হবে, জাপান চীনের কাছ থেকে মাঞ্চুরিয়া, ফরমোজা ও পেস্কাডোরস ছিনিয়ে নিয়েছে বিধায়, সেসব অঞ্চল চীনকে ফিরিয়ে দিতে হবে, জাপান কর্তৃক অধিকৃত কোরিয়াকে মুক্ত স্বাধীন দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং শত্রুকে (চক্রীপক্ষকে) বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই ঘোষণাই কায়রো ঘোষণা নামে খ্যাত।

কায়েমি স্বার্থবাদী Vested Interest. কোনো দেশের অবস্থিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মধ্যে যাদের একচ্ছত্র স্বার্থ নিহিত এবং সেই কারণে যারা অবস্থিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাসমূহকে যে-কোনো মূল্যে টিকিয়ে রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাদেরকেই বলে কায়েমি স্বার্থবাদী।

কার্টেল Cartel. কিছুসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য যৌথভাবে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংঘবদ্ধ হলে সেই সংঘকে বলে কার্টেল। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে একচেটিয়া স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই কার্টেল গঠন করা হয়।

কার্বোনারি Carbonary. অর্থ চারকোল প্রজ্বলনকারী। ইতালির গুপ্তসংস্থাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এই সংস্থাটি গঠিত হয় ১৮১৫ সালে, নেপলসের বুরবন শাসকদের ক্ষমতা পুনর্দখলের পরপরই। কার্বোনারির সদস্যরা ছিল প্রজাতন্ত্রী এবং তাদের লক্ষ্য ছিল জাতীয় একতা সৃষ্টি ও বুরবন সরকারের উৎখাত। খ্রিস্টীয় মতবাদ এদের চিন্তার ভিত্তি হলেও, এরা ম্যাসনীয় প্রতীক এবং আচারাদি গ্রহণ করে। এরা ১৮২০ সালে নেপলসে, ১৮২১ সালে পিডমন্টে এবং ১৮৩১ সালে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ব্যর্থ বিদ্রোহ সংঘটিত করে। কার্বোনারি দলের কোনো সুস্পস্ট নেতৃত্ব না থাকায় এবং এরা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহের পদ্ধতি গ্রহণ করায়, এদের সহজেই দমন করা সম্ভবপর হয়। ১৮৩১ সালের পরাজয়ের পর হতাশাগ্রস্ত কার্বোনারি সদস্যদের অধিকাংশই ম্যাজিনির নেতৃত্বাধীন 'ইয়ং ইতালি' নামক ভ্রাতৃসংঘে যোগ দেয়। ১৮১৬-২০ সালে ফ্রান্সেও কার্বোনারি আন্দোলনের সূচনা ঘটে।

কার্লাইল, টমাস (১৭৯৫-১৮৮১) একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক। ১৮৩৪ সালে তাঁর 'দ্যা ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন' প্রকাশিত হলে একজন পণ্ডিত হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর চিন্তাধারা সমকালীন উদারনৈতিক সংস্কারবাদীদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত পুস্তক হচ্ছে, 'হিরোজ, হিরো ওয়ার্শিপ অ্যান্ড দ্যা হিরোইক ইন হিষ্ট্রি' (১৮৪১), 'পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' (১৮৪৩) ইত্যাদি। তাঁর প্রথম দিকের চিন্তাধারার সঙ্গে শেষের দিকের চিন্তাধারার অনেকখানি ব্যত্যয় দেখা যায়।

কার্লোস দ্য জ্যাকেল Carlos, the Jackel. ভেনিজুয়েলার এক আইনজীবীর পুত্র কার্লোস কিউবায় ও মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পর প্যালেস্টাইন লিবারেশন গ্রুপের কাছে তালিম নেন গেরিলাযুদ্ধ বিষয়ে। তিনি নিজেকে একজন পেশাদার বিপ্লবী বলে দাবি করেন এবং ৭০ ও ৮০-র দশকে গোটা ইউরোপ জুড়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। তিনি ছিলেন পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন-এর নেতা জর্জ হাবাশের বন্ধু। জার্মানির বাদের-মেইনহফ গ্রুপ এবং জাপানি রেড আর্মির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। ১৯৭৫ সালে ভিয়েনা সম্মেলন থেকে ১১ জন ওপেক তেলমন্ত্রীকে কিডন্যাপ, ফ্রান্সে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে ১৫ জনকে হত্যা, লন্ডনের বিখ্যাত মার্ক অ্যান্ড স্পেনসার গ্রুপের মালিক ধনকুবের এডওয়ার্ড সিয়েফকে গুলি করা, ফ্রান্সের প্রতিরক্ষামন্ত্রী গাস্টন ডফেয়ারকে হত্যার চেষ্টা এবং অন্তত ৮৩ জন ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ১৯৯৪ সালে সুদানের রাজধানী খার্তুমে কার্লোস গ্রেফতার হন এবং তাঁর বর্ণময় ক্যারিয়ারের অবসান ঘটে। কার্লোসের প্রকৃত নাম ইলিচ রামিরেস সানচেজ।

কাশ্মীর সমস্যা : ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং জম্মু ও কাশ্মীরকে এই শর্তে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে সম্মত হন যে, প্রথমত, ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমন করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, গণভোটের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ দিতে হবে। ভারত সরকার মহারাজার প্রথম দাবিটি ঠিকই মেনে নেন ; কিন্তু দ্বিতীয় দাবিটি কখনোই মানেন না। পরিণামে শুরু হয় পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাত। ১৯৪৯ সালে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের ফলে যুদ্ধবিরতি হলে দেখা যায় যে, কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ ভারতের দখলে রয়েছে এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাকিস্তান প্রভাবিত আজাদ কাশ্মীর। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৭২ সালে সম্পাদিত সিমলা চুক্তি মোতাবেক উভয় দেশ শান্তিপূর্ণভাবে কাশ্মীরসমস্যার সমাধান করবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও, বাস্তবে তা কার্যকর হয় না। এমতাবস্থার ১৯৮৮ সাল থেকে জম্মু-কাশ্মীর মুক্তিফ্রন্ট সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম শুরু করে। ১৯৯৭ সালে পুনরায় পাকিস্তান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে কাশ্মীরসমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মতৈক্য হলেও কার্যত কোনো সমাধান হয় না। জাতিসংঘ ১৯৪৭ সাল থেকে এযাবৎ কাশ্মীরের ব্যাপারে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত তার কোনোটিই মানতে রাজি হয়নি। বরং ভারতীয় সৈন্যরা ১৯৪৭ সাল থেকেই বিরতিহীনভাবে কাশ্মীরে গণহত্যা, গণনির্যাতন, নারীধর্ষণ ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ১৯৯৯ সালে কারগিলে পুনরায় পাক-ভারত সংঘর্ষ ঘটে। ওই বছরের ২৪ ডিসেম্বর ৫ জন সশস্ত্র ছিনতাইকারী ১৮৯ জন আরোহীসহ কাঠমণ্ডু থেকে দিল্লীগামী একটি ভারতীয়

বিমানকে ছিনতাই করে আফগানিস্তানের কান্দাহার নিয়ে যায় এবং কাশ্মীরের মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা হরকাতুল মুজাহেদিনের নেতা মাওলানা মাসুদ আজহার, মোশতাক আহমদ জারগার ও আহমদ ওমর সায়িদীকে ভারত সরকার কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার পর ৩১ ডিসেম্বর বিমান ও আরোহীদের মুক্তিপ্রদান করে। গণভোট ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে কাশ্মীরসমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয় বলেই অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

কাস্টিং ভোট বা নির্ধারক ভোট। কোনো সভা বা বৈঠকে, কোনো বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোট পড়লে, উক্ত সভা বা বৈঠকের চেয়ারম্যান যে-কোনো একদিকে ভোট দিয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভবপর করতে পারেন। এরূপ ভোটকেই বলা হয় কাস্টিং ভোট (Casting Vote)।

কিউবান সংকট Cuban Crisis. ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রোর সম্মতিক্রমে কিউবায় সামরিক মিজাইল স্থাপন করে। এটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চূড়ান্ত এক হুমকিস্বরূপ। এমতাবস্থায়, ২৪ অক্টোবর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডি ঘোষণা করেন যে, কালবিলম্ব না করে এই মিজাইল সরানো না হলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরু করবে। এ-সময়ে আনুমানিক ২৫টি সোভিয়েত জাহাজ কিউবা অভিমুখে যাত্রারত ছিল। কেনেডির এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পরপর ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত জাহাজসমূহকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। স্থাপিত মিজাইলসমূহও সরিয়ে নেওয়া হয়। এই ঘটনার ফলে প্রেসিডেন্ট কেনেডির ভাবমূর্তি অনেকখানি বৃদ্ধি পায়।

'কিছুই জানি না'-র দল এই স্বল্পায়ু (১৮৫৪-৫৯) দলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের শহরএলাকায় গড়ে ওঠে। এরা ছিল বহিরাগত (বিশেষত, ক্যাথলিক বহিরাগত)-বিরোধী এবং দাসব্যবস্থার সমর্থক। এদের দলের প্রকৃত নাম ছিল 'অ্যামেরিকান পার্টি'। কিন্তু এর সদস্যেরা যে-কোনো অপরিচিত বা উৎসুক ব্যক্তির যে-কোনো প্রশ্নের জবাবে, দলীয় নীতি অনুসারে, 'আমি কিছুই জানি না'—এই কথা বলত বলে, এরা 'কিছুই জানি না'-র দল (Know-nothings) নামে অভিহিত হয়। ১৮৫৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর দ্রুত এ-দলের অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু, এদের দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘকাল যাবৎ মার্কিন রাজনীতিকে কমবেশি প্রভাবিত করে রাখে।

কিবুজ Kibutz. ১৯০৯ সাল থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে, বিশেষত রাশিয়া ও পোল্যান্ড থেকে যেসব ইহুদি প্যালেস্টাইনে এসে বসবাস করতে শুরু করে, তারা বিভিন্ন এলাকায় কৃষিভিত্তিক যৌথখামার গড়ে তুলতে আরম্ভ করে। এই যৌথ সমবায় আন্দোলনেরই নাম হল কিবুজ। বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে, এরূপ সমবায়ের সংখ্যা ২৫০ ছাড়িয়ে যায়। প্রথম দিকে কিবুজের অনুসারীরা ব্যাবসা ও উচ্চশিক্ষাকে পরিহার করত। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, ব্যাবসা ও উচ্চশিক্ষাই ইহুদিদের শিকড়হীন হয়ে পড়ার প্রধান কারণ। প্রথম দিকে, কিবুজ আন্দোলন দারুণ সফলতা অর্জন করে। পঞ্চাশের দশকে ডেভিড বেনগুইরন ইসরাইয়েলের প্রধানমন্ত্রী হলে, তাঁর আবেদনক্রমে শিল্পায়নও কিবুজ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিবুজ-এর মৌল দর্শন হল, "প্রত্যেকে তার সাধ্যানুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজনানুযায়ী পাবে"। বলাবাহুল্য, এই মতবাদ

সাম্যবাদী মতবাদেরই অনুরূপ। কিন্তু, কালক্রমে এই আন্দোলন গতি ও তাৎপর্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। কারণ, যে যা-ই কাজ করুক-না কেন, খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রাপ্তি যেহেতু সুনিশ্চিত, সেহেতু অনেকের মধ্যেই অলসতা ও কাজে গাফেলতি দেখা দেয়। আগের ধারণাও ধীরে ধীরে পালটে যেতে শুরু করে। তরুণরা উচ্চশিক্ষা, ব্যাবসা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে ক্রমবর্ধমান হারে ঝুঁকে পড়তে থাকে। বর্তমানে কিবুজের গতি কিছুটা স্তিমিত হলেও, একসময় কিবুজ যৌথতার, বিশেষত কায়িক শ্রমের মর্যাদার এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে, বিভিন্ন বড় বড় ব্যক্তিত্বও একসময় কিবুজে সাধারণ শ্রমিক হয়ে কাজ করেছিলেন। যেমন, ইসরায়েলের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিশিষ্ট জেনারেল ইগাল এলন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর স্বেচ্ছায় কিবুজের আওতায় এসে একজন সাধারণ লেদ-মেশিন অপারেটরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

কিয়াস কুরআন বা হাদিসে সরাসরি উল্লেখ নেই, এমন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়লে, নিজের বুদ্ধিবৃত্তি এবং কুরআন ও হাদিসে অনুরূপ বিষয়ে বর্ণিত বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়ার নামই হল 'কিয়াস'। স্বয়ং হজরত মুহাম্মদ (সা)-ও প্রয়োজনমতো এরূপ সিদ্ধান্তগ্রহণকে উৎসাহিত করে গেছেন। অবশ্য, এ-পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মনে রাখতে হবে যে, ইসলামি আইন কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং এর একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং, 'কিয়াস' এই মৌল নীতিমালা ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফা (র)-র মতে, কিয়াস শুধু সেসব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যেসব ক্ষেত্র সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় কোনো উল্লেখ নেই। 'কিয়াস'-এর ব্যবস্থা থাকার ফলে, আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করে সঠিক সমাধান খুঁজে পাওয়া সহজতর হয় এবং কোনো অবস্থাতেই সমাধানহীন পরিস্থিতিতে আটকে থাকতে হয় না। ইসলামি আইনের ক্ষেত্রে, কুরআন, হাদিস ও ইজমার পরই কিয়াস-এর স্থান।

কুইসলিং : সেই বিশ্বাসঘাতক, যে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে, নিজ দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে। শব্দটি এসেছে নরওয়ের ডিভকুন কুইসলিং নামক জনৈক ব্যক্তির নাম থেকে। কুইসলিং (১৮৮৭-১৯৪৫), ১৯৩১-৩৩ সালে নরওয়ের সমরমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এবং এ-সময়ে একটি নরওয়েজীয় নাৎসি পার্টি গঠন করে অসলোস্থ জার্মান নৌ-অ্যাটাশের মাধ্যমে জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯৩৯ সালে কুইসলিং বার্লিনে গিয়ে হিটলারকে বুঝিয়ে দেন, কেমন করে জার্মান সাহায্য নিয়ে অসলোতে নাৎসি সরকার কায়েম করা সম্ভব। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানি নরওয়ে দখল করলে কুইসলিংকে প্রশাসক করে জার্মানির অনুগত একটি পুতুল সরকার গঠন করা হয়। ১৯৪৫ সালে নরওয়ে জার্মানির কবলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। পতনের পর ১৯৪৫ সালে তাঁকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। বর্তমানে, শত্রুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের নেতা বা জাতীয় বিশ্বাসঘাতককে কুইসলিং বলে অভিহিত করা হয়।

কু ক্লাক্স ক্ল্যান Ku Klux Klan. এটি ইহুদিবাদ ও কৃষ্ণাঙ্গবিরোধী একটি গোপন সন্ত্রাসবাদী সংস্থা। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্যসমূহ

ফেডারেল সরকারের নিকট পরাজিত হলে, শ্বেতাঙ্গ প্রতিপত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে এই সংস্থা গঠন করা হয়। ১৮৬৯ সালে এটি ভেঙে দেওয়া হলেও, ১৯১৫ সালে কু ক্লাক্স ক্ল্যান পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্যসমূহে এটি বেশ প্রবল হয়ে ওঠে ও রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কানাডায়ও এই সংস্থা বিস্তার লাভ করে। কিন্তু ত্রিশের দশকেই এর শক্তি অনেকখানি স্তিমিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে নরহত্যাসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালালেও এই সংস্থা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয় এবং অসংখ্য উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮২ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে আলাবামার ক্ল্যান নেতা ২৮ বছর বয়স্ক ডন ব্ল্যাক ক্ল্যানের মহাযাদুকর বা গ্র্যান্ড উইজার্ড (Grand Wizard) নির্বাচিত হন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ৭টি উপদলকে ঐক্যবদ্ধ করে পুনরায় একটি শক্তিশালী সংস্থা হিসাবে ক্ল্যানকে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। ক্ল্যানের জাতীয় সদস্যদের বলা হয় ন্যাশনাল নাইটস (National Knights)। এর সদস্যেরা আগুন নিয়ে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে এবং শপথগ্রহণ এবং তৎপরতা চালানোর সময় মাথা-মুখ ইত্যাদি কালো পোশাকে আবৃত করে নেয়।

কু দ্যতা Coup d'etat. আকস্মিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন ঘটানোকে বলে কু দ্যতা। সাধারণত যাদের হাতে কোনো সরকারি বা সামরিক ক্ষমতা আছে, তারাই কু দ্যতা ঘটিয়ে থাকে। বিপ্লবের সঙ্গে এই কু দ্যতা বা আকস্মিক অভ্যুত্থানের পার্থক্য হল এই যে, এটা ঘটে থাকে ওপর থেকে, কিন্তু বিপ্লব ঘটে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার অন্তর্গত অনুন্নত দেশসমূহে প্রায়শই কু দ্যতার মাধ্যমে ক্ষমতার পটপরিবর্তন ঘটে থাকে। শিল্পোন্নত দেশসমূহে কু দ্যতা ঘটে না বললেই চলে। বলাবাহুল্য, কু দ্যতা সে-সমস্ত দেশেই বেশি ঘটে, যে-সমস্ত দেশে দৃঢ় সামাজিক শিকড়সম্পন্ন আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামো অনুপস্থিত। ১৮৫১ সালে ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ন, ১৯২৫ সালে ইতালির মুসোলিনি থেকে শুরু করে এযাবৎকালের বহু সরকারই কু দ্যতার মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন এবং ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছেন।

কুয়েবেক স্বাধীনতা আন্দোলন ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসি নাবিক জ্যাকুয়িস কার্টিয়ারই সর্বপ্রথম ইউরাপীয় যিনি কানাডায় পদার্পণ করেন। ১৬০৮ সালে ফরাসিরা কুয়েবেক সিটির পত্তন করে। ১৬৬৩ সালে তারা সমগ্র কানাডাকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করে। ৫৪ বছর পর ইংরেজরা ফরাসিদের পিছু হটিয়ে কানাডায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৭৫৯ সালে তারা কুয়েবেকও দখল করে নেয়। বস্তুত সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই কানাডায় ইংরেজ ও ফরাসিরা স্ব-স্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে বসবাস করে আসছে। ফরাসিদের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৮০ ও ১৯৮৫ সালে কুয়েবেকের স্বাধীনতা প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে দুবারই স্বাধীনতাপন্থিরা পরাজিত হয়, কিন্তু প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয়বারে ব্যবধান কমে আসে। তবে, লুসিয়েন বুশার্ড, জ্যাঁ পারিজা প্রমুখের নেতৃত্বে কুয়েবেকের স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার জন্য কুয়েবেকের ফরাসিদের কোনো বিপ্লব বা সশস্ত্র আন্দোলনের প্রয়োজন নেই; কেননা ১৮৮২ সালে প্রণীত কানাডা ফেডারেশনের শাসনতন্ত্রেই বলা আছে যে, জনগণ চাইলে কানাডার যে-কোনো প্রদেশ বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যে-কোনো সময় ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হয়ে যেতে পারবে।

কুয়োমিনতাং Kuomintang (KMT). এই চীনা কথাটির অর্থ 'জাতীয় জনদল'। চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াৎ সেন ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১১ সালে মাঞ্চু সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে এই বিপ্লবী গোষ্ঠীরও রূপান্তর ঘটে এবং ১৯১২ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে গড়ে ওঠে। সান ইয়াৎ সেনের পর তাঁরই নিকট আত্মীয় চিয়াং কাইশেক কুয়োমিনতাং-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত কুয়োমিনতাং সমগ্র চীনের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। ১৯৪৯ সালে চীনে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হলে চিয়াং কাইশেক মূল ভূখণ্ড ছেড়ে তাইওয়ানে এসে আশ্রয় নেন। তাইওয়ানে আজও কুয়োমিনতাং রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে।

কুরআন মুসলমানদের মতে কুরআন হল স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ, সর্বোৎকৃষ্ট ও চূড়ান্ত গ্রন্থ। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, মূল কুরআন 'লউহ মাহফুজ' বা সংরক্ষিত শূন্যে অবিনশ্বরভাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং ফিরিশতা জীবরাইলের মাধ্যমে তা হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে প্রেরিত হয়েছে। অবশ্য, শাহ ওয়ালিউল্লাহ প্রমুখ মনে করেন যে, "হুজ্জাতুল্লাহ্-আল-বালেগা" বা গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় এমন একটা পর্যায় আসে, যখন চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়, দৃষ্টিতে বিভিন্ন রঙের সমারোহ ঘটে, সাধারণ শ্রবণশক্তি লোপ পায় এবং আবছা শব্দের মতো কথা ভেসে আসছে বলে মনে হয়। তাঁদের মতে এই অবস্থাতেই হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট কুরআন দিব্য হয়ে ওঠে। ইমাম গাজ্জালির (র) মতে, কোনো মানুষের পবিত্র অন্তরাত্মা যখন কোনো বিষয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তখন তাঁর পবিত্র সত্তার সঙ্গে স্বর্গীয় বা পরম সত্তার সম্মিলন ঘটে এবং তখনই ভেসে ওঠে অপরূপ চেহারা, যে বাণী প্রদান করে। অবশ্য, ইমাম গাজ্জালি (র)-র মতে, প্রেরিত পুরুষ ব্যতীত অন্য কারও ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। হজরত আয়েশা (রা)-র মতে নবুয়াতের প্রথম দিকে হজরত মুহাম্মদ (সা) স্বপ্ন দেখতেন যেন সূর্যোদয় হচ্ছে এবং এই অবস্থাতেই তাঁর কাছে আসতো সংবাদ বা ওহি। কুরআনে সর্বমোট ১১৪টি সুরা বা অধ্যায় আছে। এর নব্বইটি মক্কায় এবং বাকিগুলি মদিনায় নাজিল হয়। সমগ্র কুরআন ৩০টি সমান বিভাগ বা কিতাবে বিভক্ত। কুরআনের মৌল প্রতিপাদ্যকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—ইমান বা বিশ্বাস-সম্পর্কিত, ইবাদত বা উপাসনা-সম্পর্কিত এবং এহসান বা সৎকর্ম-সম্পর্কিত। হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর ৪০ বছর বয়স থেকে পরবর্তী ২৩ বছর যাবৎ কুরআন নাজিল হলেও, তা তখন ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এ-সময়ে হজরত আলি (রা), হজরত জায়েদ বিন সাবিথ (রা), হজরত উবায়েদ বিন কা'ফ (রা), হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসুদ (রা) প্রমুখ হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছ থেকে শুনে মুখস্ত বা লিপিবদ্ধ করতেন। হজরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতের সময় হজরত উমর (রা)-এর অনুরোধক্রমে হজরত জায়েদ বিন সাবিথ (রা) কুরআনকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে নেন। হজরত উসমান (রা)-এর আমলে হজরত জায়েদ বিন সাবিথ (রা)-এর নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট কমিশন কুরআনকে বর্তমান রূপ প্রদান করেন এবং হেজাজি কথ্য ভাষার পরিবর্তে কুরাইশদের কথ্য ভাষাই বহাল করেন। কুরআনে শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ই নয়, জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। মুসলামনদের কাছে কুরআন জীবনের সকল দিক সম্পর্কে অভ্রান্ত আজ্ঞা ও শিক্ষার উৎস। অনেকের মতে কুরআনের ভাষা ও ছন্দ কালজয়ী ও অননুকরণীয়।

কুলাক ১৯০৬ সালে রুশ প্রধানমন্ত্রী পিটার স্টোলিপিন-এর কৃষিসংস্কারের ফলে সৃষ্ট মাঝারি কৃষক (মাঝারি খামারের মালিক-কৃষক)। কুলাক সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল, বিত্তবান কৃষকদের নিয়ে একটি স্থিতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তোলা, যারা সমাজের রক্ষণশীল অংশ হিসাবে বিপ্লবী পরিবর্তনকে প্রতিহত করবে। ১৯১৪ সাল নাগাদ রাশিয়ার শতকরা ১৫ ভাগ কৃষক কুলাকে রূপান্তরিত হয়। বলশেভিক বিপ্লব (১৯১৭)-এর পর লেনিন-স্ট্যালিন প্রমুখ এই কুলাকদের নিয়ে যথার্থই সমস্যায় পড়েন। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত কুলাকরা যৌথ-মালিকানার বিরোধিতা করে। কিন্তু ওই বছর 'প্রথম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা' শুরু করার সময় স্ট্যালিন শ্রেণী হিসাবে কুলাকদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে দেন।

কুসিদ : Usuary. সামন্তবাদী যুগে মহাজনরা ঋণ দিয়ে হতভাগ্য খাতকদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে যে মাত্রাতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করত সেটাই হল কুসীদ। এই কুসীদ প্রায়শই ঋণগ্রহণকারীকে সর্বস্বান্ত করে দিত। বর্তমান কালেও কোনো কোন অনুন্নত দেশে সামন্তবাদের অবশেষ হিসাবে কুসিদজীবীদের অস্তিত্ব বজায় আছে। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সুদ (Interest) এবং কুসিদ (Usuary) ঠিক এক জিনিস নয়। সুদ হচ্ছে মূলত ঋণ গ্রহণকারী ঋণ নিয়ে যে-মুনাফা করছে তারই একটা অংশ। চরিত্রগত বিচারে কুসিদ সামন্তবাদী, অথচ সুদ পুঁজিবাদী।

কূটনীতি Diplomacy. দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ প্রতিনিধি মারফত যে-সম্পর্ক রক্ষা করা বা আলোচনা চালানো হয়, তাকেই বলে কূটনীতি। এই বিশেষ প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রদূত বা রাষ্ট্রপ্রতিনিধি বলা হয় এবং ক্ষমতানুযায়ী তাঁদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এ ছাড়াও কোনো দেশের সরকার আপন দেশের স্বার্থে অন্য দেশের সরকারের সঙ্গে যেসব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামরিক ও বিবিধ তৎপরতা চালায়, সেগুলোও কূটনীতির অন্তর্ভুক্ত। যেমন, ডলার কূটনীতি, পিংপং কূটনীতি ইত্যাদি। জোট গঠন ও জোটের স্বার্থে পরিচালিত তৎপরতাও কূটনীতির আওতাভুক্ত।

কূটনৈতিক অসুস্থতা যখন কোনো রাষ্ট্র বা সরকারের কোনো কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি, কোনো সফরে যেতে বা কোনো সভা, অনুষ্ঠান বা বৈঠকে উপস্থিত থাকতে অনিচ্ছুক হন, তখন তিনি সাধারণত শারীরিক অসুস্থতারই অজুহাত দেখান, যাতে তাঁর অনুপস্থিতি কোনো অনাহূত সন্দেহ বা জল্পনা-কল্পনার জন্ম না দেয়। অনেক সময় মন্ত্রী বা দলীয় কোনো কর্মকর্তাও একই কারণে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। প্রায়শ সরকার বা দল থেকে কাউকে বহিষ্কারের সময়ও এই কৌশল অবলম্বন করা হয়।

কূটনৈতিক সুবিধা কূটনীতিবিদ ও তাঁদের পরিবারের সদস্যেরা বিদেশে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কতিপয় বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন, যেমন ১. তাঁরা যে-রাষ্ট্রে কাজ করেন, তাঁদের ওপর সে-রাষ্ট্রের আদালতের কোনো এখতিয়ার থাকে না; ২. তাঁদের স্বদেশে প্রেরিত এবং তাঁদের কাছে স্বদেশ থেকে আগত কোনো চিঠিপত্র-দলিল ইত্যাদি কর্মরত রাষ্ট্রের কারও খোলার বা পরীক্ষা করার কোনো অধিকার থাকে না; ৩. তাঁদের বাসভবনে বা দফতরে কোনোপ্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি, আড়িপাতা বা তল্লাশি চালানো যায় না ইত্যাদি। এজন্যই, যখন কোনো বিদেশী কূটনীতিবিদের বিরুদ্ধে কোনো রাষ্ট্রের কোনো গুরুতর অভিযোগ থাকে, তখন তাঁর বিচার করার পরিবর্তে, তাঁকে সরাসরি উক্ত রাষ্ট্র ত্যাগ করতে বলা হয়ে থাকে।

কৃষি শ্রমিক যে-শ্রমিক কৃষির সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ, যে-কৃষকের নিজস্ব কোনো জমি নেই বা থাকলেও তা এত নগণ্য যে, অন্যের জমিতে দিনমজুর হিসাবে কাজ করা ছাড়া তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের অন্য কোনো উপায় নেই, সেই কৃষকই হল কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুর। (ক্ষেতমজুরও দ্রষ্টব্য)।

কেইনস, জন মেনার্ড (১৮৮৩-১৯৪৬) ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ কেইনস (John Maynard Keynes) কেমব্রিজের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৯ সালে 'শান্তির অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া' (Economic Consequences of Peace) শীর্ষক থিসিসের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে তিনি প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্বের সমালোচনা করে, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে সমন্বয়কারী এক তত্ত্ব হাজির করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে, পুঁজিমূলক দ্রব্য (Capital Goods)-এর উৎপাদন, সস্তা মুদ্রানীতি গ্রহণ এবং সরকারি বিনিয়োগ-কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভবপর। তাঁর এ-তত্ত্ব আরও স্পষ্টতা লাভ করে 'কর্মসংস্থান, সুদ ও অর্থের তত্ত্ব' (Theory of Employment, Interest and Money) নামক থিসিসে (১৯৩৬ সালে প্রকাশিত)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তিনি একটি 'বিশ্ব ব্যাংক' গঠনেরও পক্ষপাতী ছিলেন।

কেইনস পরিকল্পনা ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনসের আন্তর্জাতিক মুদ্রা পরিকল্পনাই কেইনস পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এর লক্ষ্য ছিল, সহজে অন্য মুদ্রায় পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা এবং স্থিতিশীল বিনিময়হারের মাধ্যমে বহুমুখী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল অনেকটা তাঁর চিন্তারই ফলশ্রুতি। অবশ্য, এই তহবিল গঠনের ব্যাপারে মার্কিন পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁর চিন্তার আপোস ঘটাতে হয়েছে। তিনি যে-তহবিলের চিন্তা করেছিলেন, তাতে তহবিলের সদস্যেরা যে-কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো ওভারড্রাফট নিতে পারত। বস্তুত প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং অন্তর্বর্তীকালীন মন্দা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে-সংকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তা থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে রক্ষা করাই ছিল কেইনস পরিকল্পনার মৌল উদ্দেশ্য।

কে. জি. বি. Komitet Gosudarstvennoy Bespusnosti (KGB). সোভিয়েত ইউনিয়নের এই গুপ্তচর সংস্থার সদর দফতর মস্কোর দুই নম্বর জেরিজিনস্কি স্কোয়ারে অবস্থিত। এই সংস্থা দেশবিদেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে গোপন তথ্য ও সংবাদাদি সংগ্রহসহ যাবতীয় গুপ্তচরবৃত্তির দায়িত্বে নিয়োজিত। জার-এর আমলে এই সংস্থাকে স্বরাষ্ট্র বিভাগের তৃতীয় শাখা বা থার্ড সেকশন বলে অভিহিত করা হত। বর্তমানেও কেজিবি রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা হিসাবে একই কর্মে রত।

কেন্দ্রিকতা, গণতান্ত্রিক Democratic Centralism. একক কাঠামো ও কঠোর শৃঙ্খলার আওতায় প্রদত্ত গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা একটি সংগঠনের বা রাষ্ট্রের সকল সদস্যের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয় এবং সে-মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনেরও অঙ্গীকার করে। কিন্তু, পালটা সংগঠন বা পালটা রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের কিংবা মতভেদের অজুহাতে গ্রুপসৃষ্টির কিংবা পার্টি বা রাষ্ট্রের শৃঙ্খলাভঙ্গের ব্যাপারকে বরদাস্ত

করে না। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাসম্পন্ন সংগঠনে ব্যক্তিসমষ্টির, সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠের, নিম্নতর কমিটি উচ্চতর কমিটির এবং সমগ্র সংগঠন কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকে। সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো সদস্যের কোনো দ্বিমত থাকলে তিনি তা তাঁর সংশ্লিষ্ট স্তরের ফোরামে উত্থাপন করতে পারেন, এমনকি উচ্চতর ফোরামের গোচরীভূতও করতে পারেন, কিন্তু সে-সঙ্গে গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে চলতেও বাধ্য থাকেন।

কেন্দ্রিকতাবাদ Centralism. এটি একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যে-প্রক্রিয়ায় সমগ্র দেশ শাসিত হয় একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতা মোতাবেক। এই প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণের বিপরীত, কেননা বিকেন্দ্রিক প্রক্রিয়ায় দেশের এক-একটি অঞ্চল বা প্রদেশের কমবেশি স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা থাকে, যা কেন্দ্রিক প্রক্রিয়ায় থাকে না। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল, উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণের ঝোঁক প্রায়শই লক্ষ করা যায়।

কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক : কেন্দ্রীয় সরকার (বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়)-এর আওতাধীন সেই ব্যাংক যেই ব্যাংক সমগ্র দেশের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের সমগ্র মুদ্রা প্রচলন কেন্দ্রীভূত করে শিল্পব্যবসায়ে লগ্নি, ঋণ, কারেন্সি-সরবরাহ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। এই রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে মুদ্রাসংক্রান্ত প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, যাতে এই ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকের কার্যাদি, লেনদেন, লগ্নি ইত্যাদি তদারক করতে পারে। অন্যান্য ব্যাংক, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকে। ১৯১৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এই রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক রয়েছে। বস্তুত, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক হচ্ছে অন্যান্য ব্যাংকসমূহের ব্যাংকার।

কোকাকোলা সংস্কৃতি কোকাকোলা নামক এই হালকা পানীয়ের আবিষ্কার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আবিষ্কারের পরপরই এই পানীয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং তরুণসমাজকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। অনুরূপভাবে, হালকা মেজাজের পপজাতীয় সংগীত, চা-চা জাতীয় নৃত্য, হিপ্পি জীবনপদ্ধতি, মারিজুয়ানা-হাসিস ইত্যাদি মাদকদ্রব্যের আসক্তি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যুবসমাজকে, বিশেষত হতাশাগ্রস্ত যুবসমাজকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বলাবাহুল্য, এসব জিনিষ মানুষের চেতনাকে জীবন ও সমাজের গভীরতর দিক থেকে ফিরিয়ে রাখে, জীবনসংগ্রামকে ভোঁতা করে দেয় এবং হালকা মেজাজ'ও উদ্দেশ্যহীনতার আবর্তে মানুষকে আচ্ছন্ন করে তোলে। এরূপ আচ্ছন্ন মানুষেরা, বিশেষত তরুণরা অন্যায়-বৈষম্য-শোষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে বিরত থাকে। হালকা ও উদ্দেশ্যহীন এই মানসিকতা, জীবনপদ্ধতি ও মূল্যবোধের সংস্কৃতিকে কোকাকোলা সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

কোটারি Coterie. একটি দল বা সংগঠনের মধ্যেকার কতিপয় ব্যক্তির গ্রুপ বা উপদলকে বলে কোটারি। কোটারি কথাটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যারা কোটারি গঠন করে, তারা তা করে নিজেদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত স্বার্থে, সমগ্র সংগঠন বা আদর্শের স্বার্থে নয়।

কোবরা মিলিশিয়া : কঙ্গোর জেনারেল ডেনিস সাসু এন' গেসো (Denis Sassou Nguesso)-র বাহিনীই কোবরা মিলিশিয়া নামে খ্যাত। ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে

জেনারেল ডেনিস এই বাহিনীর সাহায্যে কঙ্গোর নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট প্যাস্কেল লিসুবাকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতা দখলের এ-লড়াই শুরু হয় ৫ জুন থেকে এবং জেনারেল ডেনিস কর্তৃক ক্ষমতাদখলের পরও ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্টের বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বেশ ক'মাস যাবৎ অব্যাহত থাকে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স্ Quantum Mechanics. এটি হল পদার্থবিদ্যার সেই শাখা, যেই শাখা সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের গতিবিধি পর্যালোচনা করে। এই বিজ্ঞান প্রমাণ করে যে, সূক্ষ্মতম পর্যায়ের বস্তুকণার গতিবিধি হচ্ছে উর্মিমালার মতো এবং তা সংখ্যাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী পরিমাপযোগ্য। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (Max Planck) প্রমাণ করেন যে, এই গতি সর্ব সময়ে সমপরিমাণ এবং তা হচ্ছে ৬.৫৫×১০$^{-২৭}$ আর্গ/সেক (Erg/Sec)। বিজ্ঞানের এই শাখার উন্নয়নের ফলে অণুর গঠন (Atomic Structure), রেডিও অ্যাকটিভিটি (Radio-activity) ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা সম্ভবপর হয়। আনুবীক্ষণিক পর্যায়ের বস্তু (Microscopic Particles)-এর আচরণ-সম্পর্কিত এই জ্ঞানের ফলে সাবেকি পদার্থবিদ্যার বস্তু-সম্পর্কিত মৌল ধারণাই পালটে যায়। সবচেয়ে বড় কথা, কোয়ান্টাম মেকানিক্স্ ধারণা ও বাস্তব সত্য, সম্ভাব্যতা ও অবশ্যম্ভাবিকতা, নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তা (Determinism and Indeterminism) ইত্যাদির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজিত করে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স্ বস্তুর সঙ্গে শূন্যতার অনিবার্য সম্পর্ক এবং দ্বান্দ্বিকভাবে পরস্পরবিরোধী (Dialectically Contradictory) ও পারস্পরিক বাতিলশীল (Mutually Exclusive) বৈশিষ্ট্যের অব্যর্থ নিয়ম ও স্বরূপের ব্যাখ্যা প্রদান করে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স্-এর তত্ত্ব, ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ডের তত্ত্ব, জিনেটিক্স্সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন নবতর আবিষ্কার একথাই প্রমাণ করে যে মার্কস-এঙ্গেলস যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপাত্তের ওপর তাঁদের সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ভিত্তি নির্মাণ করেন, তার অধিকাংশই ছিল অপর্যাপ্ত বা অসঠিক।

কোয়ালিশন সরকার : দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল মিলিত হয়ে যে-সরকার গঠন করে, তাকেই বলে কোয়ালিশন সরকার (Coalition Government)। সাধারণত কোনো জাতীয় জরুরি পরিস্থিতিতে কিংবা পার্লামেন্টে কোনো দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে, এরূপ সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

কোরাম কোনো আইনসভা, প্রতিষ্ঠান বা কমিটির সভা শুরু করতে হলে আইনগত বা সংবিধানগতভাবে ন্যূনতম যতজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়, ততজন সদস্যের সমষ্টিকে বলে কোরাম (Chorum)। কোনো সংস্থা, সংগঠন বা পার্লামেন্টে কত সদস্যে কোরাম হবে, সংশ্লিষ্ট গঠনতন্ত্র বা শাসনতন্ত্রে তা উল্লেখিত থাকে। কোম্পানির ক্ষেত্রে কোরামের উল্লেখ থাকে তার আর্টিকল্স্ অব অ্যাসোসিয়েশনে।

কোরিয়ার যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত কোরিয়া ছিল জাপানের উপনিবেশ। ১৯৪৫ সালে মিত্রশক্তির হাতে জাপানের পরাজয় ঘটলে, সাব্যস্ত হয় যে, কোরিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে জাপানিদের উচ্ছেদ করবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং দক্ষিণাঞ্চলে এ-দায়িত্ব পালন করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আরও সাব্যস্ত হয় যে, এই দায়িত্বপালনের পরপরই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই কোরিয়ার জনগণের হাতে সর্বময়

ক্ষমতা অর্পণ করে ফিরে আসবে। ৩৮ অক্ষরেখার উত্তরাঞ্চলে রাশিয়া তার দায়িত্ব পালন করে ফিরে যায়। কিন্তু, দক্ষিণাঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন অজুহাতে জাপানিদের উৎখাতের পরও থেকে যায় এবং তাদের অনুগত ব্যক্তি সিংম্যান রি-এর নেতৃত্বে একটি পুতুল সরকার কায়েম করে। স্বভাবতই, কোরীয় জনগণ দাবি করে যে, মার্কিনিদের হটিয়ে উভয় কোরিয়াকে একত্রিত করা হোক। জনগণের এ-দাবিকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব রণাঙ্গণে মার্কিন সহায়তাপুষ্ট পুতুল সরকারের সেনারা ৩৮ অক্ষরেখা অতিক্রম করে, আর পশ্চিম রণাঙ্গণে খোদ মার্কিন সৈন্যেরাই উক্ত রেখা পার হয়ে উত্তরাঞ্চলে হানা দেয় (৭ অক্টোবর)। উত্তর কোরিয়া এই হামলার বিরুদ্ধে গড়ে তোলে তীব্র প্রতিরোধ। ফলে, শুরু হয় রক্তক্ষয়ী কোরিয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার লক্ষ লক্ষ নরনারী নিহত হয়, ৭৮টি শহর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং বিপুল সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়। আর, অন্যপক্ষে, চার লক্ষ মার্কিন সৈন্যসহ প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ নিহত হয়, কয়েক হাজার জঙ্গি বিমান ভূপাতিত হয়, প্রায় চারশো যুদ্ধজাহাজ জলমগ্ন হয় এবং প্রায় তিন হাজার ট্যাংক ধ্বংস হয় (উত্তর কোরিয়ার হিসাব অনুযায়ী)। ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই সীমান্তঘাঁটি (৩৮ অক্ষরেখার ওপর অবস্থিত) পানমুনজম নামক স্থানে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ কোরীয় ও মার্কিন বাহিনী ৩৮ অক্ষরেখার দক্ষিণে সরে যায়।

কোর্ট অব জাস্টিস, ইউরোপীয়ান European court of Justice. এই আদালত হচ্ছে ইউরোপীয় সম্প্রদায় (European Community)-এর বিচার বিভাগ। এই আদালত ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় (European Economic Community), ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত সম্প্রদায় (European Coal and Steel Community) এবং ইউরোপীয় আণবিক শক্তি সম্প্রদায় (European Atomic Energy Community)-র সম্মতিক্রমে গঠিত। এই আদালতের ১৯ জন বিচারক রয়েছেন (প্রত্যেক দেশ থেকে একজন ও বড় দেশ থেকে দুজন করে)। এ ছাড়া রয়েছেন ৬ জন অ্যাডভোকেট জেনারেল। আদালতের ৬টি চেম্বার রয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে পূর্ণ বেঞ্চ বসেই মামলার শুনানী করেন। মূলত ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের কোনো সদস্য রাষ্ট্র সম্প্রদায়ের কোনো বিধি বা নিয়মনীতি ভঙ্গ করলে সেই মামলাই এই আদালতে আসে। ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিও এই আদালতে মামলা করতে পারে। আবার কোনো দেশের আদালতও প্রয়োজনে এই আদালতে মামলা পাঠাতে পারে। এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের কোনো সুযোগ নেই এবং এই আদালতের রায় মেনে চলা প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক।

কোর্টমার্শাল Court Martial, বাংলায় সামরিক আদালত। সাধারণত সশস্ত্রবাহিনীসমূহের অভ্যন্তরে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে, তার বিচার করা হয় সামরিক আদালতে। কিন্তু যুদ্ধকালে বা কোনো দেশে সামরিক আইন জারি থাকলে, বেসামরিক অপরাধীদের বিচারও সামরিক আদালতে হতে পারে। সামরিক আদালত প্রধানত সশস্ত্র-বাহিনীসমূহের কর্মকর্তাদের নিয়েই গঠিত হয়।

কৃষ্ণহস্ত ১৯১১ সালের মে মাসে বেলগ্রেডে গঠিত হয় এই সার্বীয় গুপ্ত সমিতি। এর সদস্যদের অধিকাংশই ছিল তরুণ সামরিক অফিসার। এদের মূলমন্ত্র ছিল, "ঐক্য অথবা মৃত্যু"। অস্ট্রিয় ও তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সার্বীয়দের মূল সার্বিয়ার সঙ্গে যুক্ত

করাই ছিল কৃষ্ণহস্ত (Black Hands)-দের উদ্দেশ্য। বলকান যুদ্ধের সময়, এরা সার্বীয় সরকারের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু তুর্কিদের কাছ থেকে দখল করা এলাকার শাসন নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব বাধে। কৃষ্ণহস্তদের নেতা কর্নেল 'এপিস' দিমেত্রিভিক একদল তরুণ বোসনীয় (Bosnian)-কে সন্ত্রাসবাদী ট্রেনিং দিয়ে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ও তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করার জন্য সারাজাভোতে পাঠান (২৮ জুন, ১৯১৪) এবং তারা দুজনকেই হত্যা করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রবাসী সার্বীয় সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুনরায় খারাপ হয়ে যায়, দিমেত্রিভিক ও তাঁর মূল সঙ্গীরা ধরা পড়েন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সার্বিয়ার যুবরাজকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। ১৯১৭ সালের জুন মাসে স্যালোনিকায় তড়িঘড়ি বিচার করে দিমেত্রিভিক ও তাঁর দুজন সঙ্গীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। অতঃপর কৃষ্ণ হস্ত সংগঠন ভেঙে যায়। ১৯৫৩ সালে যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট সরকার স্যালোনিকা মামলার রায় পালটে দিয়ে কৃষ্ণহস্তদের সম্মান দেওয়ার প্রয়াস পায়।

কৌটিল্য : ভারতের মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধান উপদেষ্টা কৌটিল্য (যিনি চাণক্য নামেও পরিচিত) খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, তার ওপর তাঁর রচিত 'অর্থশাস্ত্র' প্লেটোর 'রিপাবলিক' এবং ম্যাকিয়াভেলির 'প্রিন্স'-এর সঙ্গে অনেকটা তুলনীয়। 'অর্থশাস্ত্র'-র মৌল বক্তব্য নিম্নরূপ
১. রাজনীতিই রাষ্ট্রের অপর সকল বিষয়ের নির্ধারক, ২. রাষ্ট্র যুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং রাষ্ট্রের আকৃতি যথাসম্ভব বৃহৎ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, ৩. রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও বিস্তারের জন্য সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ এবং শত্রুনিধন সম্পূর্ণরূপে বৈধ, ৪. রাজার ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং যোগ্যতাই যথার্থ রাজ্যশাসনের পূর্বশর্ত, ৫. যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্য শাসনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রকমণ্ডলী ও সর্বব্যাপী আমলাতন্ত্র গড়ে তোলা এবং এদের সঙ্গে পরামর্শ করা রাজার কর্তব্য, ৬. রাজা মূলত প্রজাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবেন; কিন্তু কোনো প্রজা অবাধ্য হলে তাকে হত্যা করতেও কোনো দ্বিধা করা উচিত নয় এবং ৭. রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতার স্থান গৌণ। রাজার ক্ষমতাকে একদিকে দৈব অধিকার এবং অপরদিকে সামাজিক অধিকার বলে কৌটিল্য বিশ্বাস করতেন। 'অর্থশাস্ত্র' বহু শতাব্দী যাবৎ নিখোঁজ থাকার পর ১৯০৫ সালে পুনঃআবিষ্কৃত হয়।

কৌশলগত পশ্চাদপসরণ Tactical Retreat. অর্থাৎ শত্রু যখন প্রবলতর অবস্থায়, তখন শত্রুর সরাসরি মোকাবেলা না করে এমনভাবে পিছু হটে যাওয়া, যাতে প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করে শত্রুর ওপর পুনরায় যথোপযুক্ত আঘাত হানা সম্ভবপর হয়। আবার, পিছু হঠার কৌশলের মাধ্যমে শত্রুকে এমন জায়গায় নিয়ে আসা, যাতে তার ওপর আঘাত হেনে সহজেই ঘায়েল করা যায়—এরূপ পিছুহটাকেও কৌশলগত পশ্চাদপসরণ বলা হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কৌশলগত পশ্চাদপসরণ হতে পারে।

ক্যাঙারু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যখন বহুসংখ্যক সদস্য কোনো বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব আনেন, তখন রিপোর্ট পর্যায়ে স্পিকার এবং কমিটি পর্যায়ে চেয়ারম্যান বা ডেপুটি চেয়ারম্যান নিজ বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী গুরুত্বের ভিত্তিতে কিছু প্রস্তাবকে আলোচনা ও বিতর্কের জন্য গ্রহণ করে বাদবাকি প্রস্তাবসমূহকে বাতিল করে দিতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এড়ানো এবং সীমিত সময়কে যথাসম্ভব ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে স্পিকার বা চেয়ারম্যান এভাবে এক সংশোধনী প্রস্তাব থেকে অপর

সংশোধনী প্রস্তাবে লাফিয়ে যেতে পারেন বিধায়, এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ক্যাঙারু (Kangaroo)। এই প্রক্রিয়া ১৯০৯ সালে শুরু করা হয় এবং ১৯১৯ সালে স্ট্যান্ডিং অর্ডারে পরিণত হয়।

ক্যাচ-অল পার্টি Catch-All Party বা 'যাকে পাও তাকে নাও দল'। এরূপ পার্টি বলতে সেসব রাজনৈতিক দলকেই বোঝায়, যেসব দলের কোনো দৃঢ় নীতি বা আদর্শ নেই, বরং যেনতেন প্রকারে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এরূপ দলসমূহ অধিক সমর্থক ও ভোট পাওয়ার আশায় আদর্শ, মতবাদ, চরিত্র, অতীত কর্মকাণ্ড, মানসিকতা ইত্যাদির কোনোরূপ বাছবিচার না করে যাকে পায় তাকেই দলে নিয়ে নেয়। ফলে এরূপ দলে বিভিন্ন ধরনের, এমনকি পরস্পরবিরোধী চিন্তার লোকদেরও সমাগম ঘটে। ১৯৫০-এর দশক থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা গদী লোভী নীতি আদর্শহীন দলসমূহকে বোঝানোর জন্যই এই শব্দটির প্রয়োগ করে আসছেন।

ক্যাডার : Cadre. এর শাব্দিক অর্থ 'কাঠামো'। কিন্তু শব্দটি ব্যবহার করা হয়, কোনো দল বা আদর্শের মূল কর্মীদের বোঝানোর জন্য। যে-কোনো রাজনৈতিক দলের কাঠামো এর মূল কর্মীদের নিয়েই গঠিত। দলের আদর্শকে সফল করে তোলার জন্য মূল কর্মীরাই হল নিয়ামক। ক্যাডারদের বলা হয় আদর্শের সৈনিক। যারা সম্পূর্ণরূপে আদর্শে উদ্বুদ্ধ, আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অকুতোভয় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যাদের চরিত্র ও জীবনপদ্ধতি আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থ, তারাই ক্যাডার শ্রেণীভুক্ত। ক্যাডার গড়ে তোলা হয় একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যে-কোনো বিপ্লবী সংগঠনের সাফল্য এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য 'ক্যাডার' অপরিহার্য।

ক্যাপিটল যে-ভবনটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস বা আইনসভার অধিবেশন বসে, সেই ভবনটিরই নাম ক্যাপিটল (Capitol)। অনেক সময় ক্যাপিটল বলতে মার্কিন কংগ্রেসকেও বোঝায়।

ক্যাপিটাল, দাস 'Das Kapital', অর্থাৎ 'The Capital' বাংলায় 'পুঁজি'। কার্ল মার্কসের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে এবং সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করে। ১৮৪০ সালে এই গ্রন্থের কাজ শুরু হয় এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এর কাজ চলে। ১৮৬৭ সালে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অপর দুই খণ্ড এবং ক্যাপিটাল-এর চতুর্থ খণ্ড বলে পরিচিত, 'উদ্ধৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' (Theory of Surplus Value) প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে রয়েছে পুঁজির উৎপত্তির ব্যাখ্যা ও ইতিবৃত্ত; দ্বিতীয় খণ্ডে পুঁজির পরিক্রমণ পদ্ধতি এবং তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ। মার্কস দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদ একটি বিকাশমান ঘটনা, একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ের উৎপাদন-প্রক্রিয়া, যার পরিমাণগত পরিবর্তনই তার গুণগত ও বিপ্লবী পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। এই গুণগত পরিবর্তনেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। মার্কস আরও দেখিয়েছেন কীভাবে পুঁজিবাদের জন্ম থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থাকে, যার ফলশ্রুতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ে "শোষকদেরই শোষণ করা হবে।" উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব হল মার্কসীয় রাজনৈতিক দর্শনের মৌলসূত্র। মার্কস উৎপাদিকাশক্তি এবং উ ৎপাদনসম্পর্কের ঐক্য ও দ্বন্দ্বের দিক ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেন যে, এর চূড়ান্ত পরিণতিতে বুর্জোয়াসমাজ সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। পরবর্তীকালে,

লেনিন সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে মার্কসীয় তত্ত্বের আরও বিকাশসাধন করেন।

ক্যাবিনেট কোনো সরকারের মন্ত্রিমণ্ডলী বা মন্ত্রিসভাকেই সমষ্টিগতভাবে বলে ক্যাবিনেট (Cabinet)।

ক্যাবিনেট একনায়কত্ব কোনো ব্যবস্থায় যদি ক্যাবিনেট আইনসভার নিকট দায়ী থাকার বদলে কার্যত আইনসভার ওপর কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে এবং কেবিনেটের ইচ্ছানুযায়ীই সরকার পরিচালিত হয় ও আইনসভা আইন পাশ করতে বাধ্য থাকে, তা হলে এরূপ ব্যবস্থাকে বলে ক্যাবিনেট একনায়কত্ব (Cabinet Dictatorship)। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা প্রভৃতি দেশের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রায়শই এরূপ একনায়কত্বের অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা Cabinet Mission Plan. ১৯৪৬ সালের ১৬ মে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্স্, লর্ড প্যাথিক লরেন্স এবং এ.ভি. আলেকজান্ডার ভারতে এসে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের যে-পরিকল্পনা প্রদান করেন, সেটাই ইতিহাসে ক্যাবিনেট পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনার মৌল দিকসমূহ ছিল নিম্নরূপ; ১. ব্রিটিশ শাসিত ভারত ও ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের সমন্বয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হবে; ২. পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ হবে কেন্দ্রীয় বিষয়, অন্যান্য সকল বিষয়ে প্রদেশ ও রাজ্যসমূহই হবে সর্বেসর্বা; ৩. অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইকে নিয়ে 'ক' অঞ্চল, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশকে নিয়ে 'খ' অঞ্চল এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ও আসামকে নিয়ে 'গ' অঞ্চল গঠিত হবে; ৪. নতুন সংবিধান প্রণীত ও বলবৎ না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রধান দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা মুসলিম লীগ গ্রহণ করলেও নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যাপারেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। পরিণামে এই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়।

ক্যামু, অ্যালবার্ট (১৯১৩-১৯৬০)। Albert Camus. এই ফরাসি দার্শনিক অনীশ্বর (ঈশ্বরহীন) অস্তিত্ববাদের প্রবক্তা। তিনি ১৯৫৭ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর ওপর শোপেনহাওয়ার, নিৎসে ও জার্মান অস্তিত্ববাদীদের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁর মতে একমাত্র দার্শনিক সমস্যা হল 'আত্মহত্যার সমস্যা'। তাঁর নৈতিক মতবাদ চূড়ান্ত হতাশাবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন। তাঁর মতানুযায়ী, মানুষ সর্বদাই 'বিরূপ পরিস্থিতি'র মধ্যে রয়েছে; প্রতিনিয়ত হিংসা, উচ্চাশা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে মানুষ এবং অর্থহীন-উদ্দেশ্যহীন কর্মকাণ্ডের কারাগারে আটকে থাকছে। চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদ ও আত্মমুখিতা তাঁর দর্শনের মৌল প্রতিপাদ্য।

ক্যামোফ্লাজ : Camouflage. সাধারণ অর্থে, কোনো জিনিসকে লুকিয়ে বা আড়াল করে রাখাকেই বলে ক্যামোফ্লাজ। সামরিক ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে, ডালপালা, পাতা, রং ইত্যাদির মাধ্যমে সৈন্যদল, অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাংক, বিমান ইত্যাদিকে শত্রুর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখা।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ১৯৭৭ সালের শেষের দিকে ব্রিটেনে মিশররে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদত আকস্মিকভাবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরই সূত্র ধরে ১৯৭৮ সালের ৫-১৭ সেপ্টেম্বর সময়ে ওয়াশিংটন থেকে ৬৭ মাইল দূরবর্তী ক্যাম্প ডেভিড নামক স্থানে অবস্থিত বার্চ লজ (Birch Lodge) ও ডগউড লজ (Dogwood Lodge) নামক মার্কিন প্রেসিডেন্টের অবকাশযাপনের জন্য নির্মিত প্রাসাদদ্বয়ে প্রেসিডেন্ট কার্টার, প্রেসিডেন্ট সাদত ও প্রধানমন্ত্রী বেগিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে সাব্যস্ত হয় যে, ১. সিনাই এলাকা মিশর ফিরে পাবে, খ. গাজা ও জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর পাঁচ বছরের জন্য স্বায়ত্তশাসন পাবে এবং গ. পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সৈন্য বহাল থাকবে। এই চুক্তিতে পি.এল.ও.-র ব্যাপারে কোনো উল্লেখই ছিল না, যদিও পি.এল.ও.-ই প্যালেস্টাইনি জনগণের জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। এই চুক্তিতে গোলান উপত্যকার ব্যাপারেও কোনো উল্লেখ না থাকায় সিরিয়ার সমস্যাও পূর্ববৎ থেকে যায়। সর্বোপরি, বিতাড়িত প্যালেস্টাইনিদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের প্রশ্ন, প্যালেস্টাইনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্ন এবং ১৯৬৭ সালে অধিকৃত বায়তুল মুকাদ্দাস ও অন্যান্য এলাকা প্রত্যর্পণের প্রশ্নও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থাকে। এই চুক্তির ফলে, আরব বিশ্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ইহুদিরা আরও বেপরোয়াভাবে তাদের তৎপরতা চালানোর সুযোগ পায়। অবশ্য এই চুক্তির দরুন, মিশর তার হারানো এলাকা ফিরে পায়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে সমস্যা ও উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সমস্যা ও উত্তেজনাই ১৯৮২ সালের জুন-জুলাই মাসে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রূপ পরিগ্রহ করে।

কারামাতিয়া নবম শতাব্দীর শেষের দিকে 'সাবিয়া' সম্প্রদায়ের দলপতি হামদান কারামাত এই শিয়া উগ্রপন্থি দলের গোড়াপত্তন করেন। কৃষক সন্তান হামদান কারামত কৃষকদের নিয়ে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু করেন এবং ইরাকের কাছাকাছি দারুল হিজরায় একটি সুরক্ষিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষক ও কারিগরদের নিয়ে তিনি একধরনের কমিউনিজমের প্রবর্তন করেন এবং তাঁর কমিউনসমূহে গণপত্নীরও ব্যবস্থা রাখেন। 'ইসলামি বলশেভিক' বলে কথিত কারামাতিয়ারা বণিকসংঘও (Guild) গঠন করে এবং গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদিতার চর্চা করে। এরা গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাস, প্লেটো প্রমুখকেও নবী বলে মনে করত। কারামতিয়াদের চিন্তাধারা পরবর্তী মুসলিম দার্শনিক ও কোনো কোনো ঘরানার সুফিবাদীদেরও প্রভাবিত করে। কারামাতিয়া ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তিউনিসিয়ার ওবায়দুল্লাহ আল মেহদি ফাতেমি বংশের নামে নতুন রাজবংশ কায়েম করলে, কারামাতিয়া নেতা জানজাবি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং আলআকসা এলাকায় স্বীয় রাজ্য স্থাপন করেন (৯১৪ খ্রিঃ)। তাঁর পুত্র তাহির সুলেমান ৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বহুসংখ্যক হাজিকে হত্যা করে মক্কা দখল করেন এবং কাবা শরিফের কৃষ্ণ পাথর বা হাজরে আসওয়াদ আল আহসায় নিয়ে চলে যান। ২১ বছর পর খলিফা আল মনসুর পাথরটি আবার কাবা শরিফে ফেরত দেন। কারামাতিয়ারা সমগ্র আরববিশ্ব জুড়ে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। খলিফা মুতাজিদ বিল্লাহ কারামাতিয়াদের মূলোৎপাটন করেন। কারামাতিয়াদের ধ্বংসের পর তাদের সপ্তবাদী বা সাত ইমামতত্ত্বের সূত্র ধরে অ্যাসাসিন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। মোঙ্গল হালাকু খান ও মামলুক সুলতান

বাইবার এসাসিনদের ধ্বংস করে দিলেও এদের ভাবধারা ও অনুসারীরা থেকে যায়। বর্তমান খোজা ও ইসমাইলিরাও এদেরই উত্তরসূরি।

ক্যারিজমা Charisma. কর্মী ও জনগণকে আকৃষ্ট বা মোহিত করার মত যাদুকরী ভাবমূর্তি। এটা কোনো নেতা-বিশেষের সেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, যার দ্বারা তিনি মানুষকে পতঙ্গের মতো আকর্ষণ করতে এবং কর্মী ও সমর্থকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে সমর্থ হন। ক্যারিজমা-র ফলে প্রায়শই কর্মী-সমর্থকরা সংশ্লিষ্ট নেতার ভুল-ত্রুটি, দুর্বলতা-স্খলন ইত্যাদিকে আদৌ দেখতেই পান না, দেখলেও ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। আর কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনলেও নেতার বিশাল ভাবমূর্তি ও ব্যক্তিত্বের ভয়ে প্রতিবাদ করার সাহস পান না। নেপোলিয়ন, লেনিন, হিটলার, মাও সেতুং, চার্চিল প্রমুখ এরূপ ক্যারিজমার অধিকারী ছিলেন বলে মনে করা হয়।

ক্যালোরি মজুরি : ১৯৪৬ সালে হাঙ্গেরিতে অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে শ্রমিকদের মূল মজুরির অতিরিক্ত বিশেষ মজুরি প্রদান করা হয়, যাতে তারা প্রতি সপ্তাহে ১৪০০ থেকে ১৬০০ ইউনিট ক্যালোরি মানের খাদ্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যেরা অন্তত ৫০০ ক্যালোরি মানের খাদ্য গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

ক্রস ভোটিং : Cross Voting. কোনো আইনসভার সরকারদলীয় সদস্যেরা যদি দলীয় নির্দেশ শৃঙ্খলা অমান্য করে বিরোধী দলের পক্ষে ভোট দিয়ে বসে, অথবা অনুরূপভাবে বিরোধীদলীয় সদস্যেরাও যদি নিজদলের নির্দেশ অমান্য করে সরকারি দলের পক্ষে ভোটদান করেন, তা হলে এরূপ ভোটকে বলে ক্রস ভোটিং।

ক্রিপ্টো-কমিউনিস্ট Crypto-Communist. যারা গোপনভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন কিংবা গোপনভাবে কমিউনিজম বা কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাঁদেরকে বলা হয় ক্রিপ্টো কমিউনিস্ট।

ক্রীড়াতত্ত্ব Game Theory. একশ্রেণীর আর্থ-সমাজবিদ মনে করেন যে, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমরনীতিও একধরনের ক্রীড়াবিশেষ এবং এসব ক্ষেত্রেও সাফল্য নির্ভর করে নিজের শক্তি, সামর্থ্য, টেকনিক, স্ট্র্যাটেজি ইত্যাদির সঠিক উপলব্ধি, প্রতিপক্ষের শক্তি, সামর্থ্য, টেকনিক ও স্ট্র্যাটেজির যথার্থ মূল্যায়ন এবং এই তুলনামূলক বিচারের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার ওপর। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে এই তত্ত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। বস্তুত এই তত্ত্বের প্রয়োগ করার রীতি হচ্ছে আঙ্কিক সমীকরণের মাধ্যমে। ফরাসি অঙ্কশাস্ত্রবিদ এমিল বোরেল ১৯২১ সালে সর্বপ্রথম এতত্ত্বের কথা বলেন। পরবর্তীকালে জন ফন নিউম্যান (হাঙ্গেরি), অস্কার মর্সেনস্টার্ন (জার্মানি) প্রমুখ এ-তত্ত্বের আরও বিকাশসাধন করেন।

ক্রুশ্চেভ : Nikita Sergeyevich Khrushchev. ১৯৩৬ সালে তিনি মস্কোর আঞ্চলিক প্রথম সম্পাদক পদে উন্নীত হন। স্ট্যালিনের মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যেই তিনি সমগ্র পার্টির প্রথম সম্পাদক পদ লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যর্থ ক্যু-এর পর তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন এবং প্রধানমন্ত্রী পদেও অধিষ্ঠিত হন, সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী নিকোলাই বুলগানিন, জর্জি মেলেস্কভ্ প্রমুখকে উৎখাত করেন। কিউবার মিজাইল সংকটের সময় তিনি কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করায় কিউবা মার্কিন আক্রমণের হাত থেকে বেঁচে যায়। ১৯৬৪ সালে তিনি নিজেই উৎখাত হয়ে যান এবং আলেক্সিকোসিনিন ও

লিওনিদ ব্রেজনেভ যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও প্রথম সম্পাদক হন। অবশ্য পরে ব্রেজনেভও একচ্ছত্র নেতায় পরিণত হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ক্রুশ্চেভ খানিকটা উদারীকরণের পক্ষপাতী এবং স্ট্যালিনীয় কৌশলের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট দেশসমূহের উদারীকরণের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তিনি পোল্যান্ডের উদারীকরণ হতে দেননি এবং ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরির বিদ্রোহকে কঠোরভাবে দাবিয়ে দিয়েছিলেন।

ক্রুসেড Crusade. বাংলায় ধর্মযুদ্ধ। মুসলমানদের হাত থেকে প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার জন্য খ্রিস্টানরা ১০৯৫ সাল থেকে ১২৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে বারংবার যে-অভিযান চালায়, তা-ই ইতিহাসে ক্রুসেড নামে খ্যাত। মোট আটবার পরিচালিত, ক্রুসেড অভিযানের প্রথম অভিযান পরিচালনা করেন গডফ্রে। প্রধানত, ইউরোপ থেকেই ক্রুসেড অভিযানসমূহ প্রেরণ করা হয়।

ক্রেমলিন রুশ Kremlin শব্দের অর্থ দুর্গ। কিন্তু, এখন ক্রেমলিন বলতে বোঝায় মস্কোয় সেই দুর্গ, যেটা এককালে ছিল রাশিয়ার জারদের রাজপ্রাসাদ এবং পরে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশাসনিক সদর দফতর। বর্তমানে এটি রুশ সরকারের সদর দফতর।

ক্রোপটকিন, প্রিন্স পিটার (১৮৪২-১৯২১)। 'নৈরাজ্যবাদী সাম্যবাদ'-এর প্রবক্তা ক্রোপটকিন মনে করতেন যে, বৃহৎ শিল্পসমূহ নৈরাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থার অন্তরায়, সুতরাং এগুলো উচ্ছেদ করে হস্তশিল্পের ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠন করা উচিত। তাঁর মতে সমাজের সাধারণ সম্পত্তি কমিউনসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে এবং প্রত্যেক কমিউন তার সদস্যদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করার মাধ্যমে স্বনির্ভর হবে। তিনি শ্রমবিভাগের বিরোধী ছিলেন, তাঁর মতে শ্রমিকের কাজের সময় হবে দৈনিক ৪/৫ ঘণ্টা মাত্র, শ্রমিকের কোনো নির্দিষ্ট মজুরি থাকবে না, সে তার প্রয়োজনমতো সকল দ্রব্যসামগ্রী এমনিই পেয়ে যাবে।। তিনি শেষ জীবনে অনেকটা নরমপন্থি হয়ে যান, প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষকে সমর্থন করেন এবং রুশ বিপ্লবের সময় প্রতিক্রিয়াশীল ক্রেনস্কি সরকারের পক্ষ অবলম্বন করেন।

ক্লারিকালিজম Clericalism. রোমান ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা ও প্রভাব বজায় রাখা এবং তা আরও সম্প্রসারণ করার নীতি। রোমান ক্যাথলিসিজমের অনুসারী রাজনৈতিক দলসমূহই এই নীতির প্রবক্তা।

ক্লোজার কোনো আইনসভায় সংখ্যালঘু সদস্যেরা পরিকল্পিত ও দীর্ঘায়িত বিতর্ক চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে কোনো বিলের ওপর ভোট গ্রহণ না করতে দেওয়ার যে-কৌশল অবলম্বন করেন, সেই কৌশলকে নস্যাৎ করে দিয়ে আলোচনা বা বক্তৃতার সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়ার এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভোট গ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিলটি পাশ করিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে ক্লোজার (Closure)। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও মার্কিন কংগ্রেসসহ পৃথিবীর বিভিন্ন আইনসভায় ক্লোজার পদ্ধতি চালু আছে। নির্দিষ্টসংখ্যক সদস্যের প্রস্তাবক্রমে, নির্দিষ্টসংখ্যক সদস্যের ভোটে ক্লোজার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিলের ওপর ভোট গ্রহণ করা হয়।

ক্ষমতার পৃথকীকরণ : Seperation of powers. ক্ষমতার পৃথকীকরণের প্রবক্তাদের মতে আইন প্রণয়নকারী সংস্থা (আইনসভা বা Legislature), আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (প্রশাসন বা Executive বিভাগ/ Bureaucracy) এবং আইন ভঙ্গকারীর বিচারকারী সংস্থা (বিচার বিভাগ বা Judiciary)-কে যদি এমন কঠোরভাবে একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করে রাখা যায় যাতে একটি কোনোক্রমেই অন্যটির ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার বা হস্তক্ষেপ করতে না পারে, তা হলেই একদিকে ভারসাম্য (Check and balance) রক্ষিত হবে এবং অন্যদিকে তিনটি বিভাগই স্বাধীনভাবে কাজ করতে সমর্থ হবে। লক্ ও মন্টেস্ক্ ক্ষমতার পৃথকীকরণের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। যাঁরা আইনের শাসনের প্রবক্তা তাঁরা মনে করেন যে, অন্তত বিচার বিভাগ সম্পূর্ণরূপে প্রশাসন বিভাগ থকে পৃথক থাকা দরকার। বলা বাহুল্য, প্রকৃত গণতান্ত্রিক কয়েকটি দেশে ক্ষমতার পৃথকীকরণ অনেকটা থাকলেও স্বৈরাচারী, একদলীয় বা সামরিক সরকারসমূহ তিন বিভাগের ওপরই তাদের খেয়ালখুশি ও কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়।

ক্ষেতমজুর অর্থাৎ ভূমিকৃষক বা কৃষিশ্রমিক। যাদের নিজস্ব জমি নেই বলে অন্যের জমিতে মজুরি খেটে জীবিকা অর্জন করে, তাদেরকেই বলে ক্ষেতমজুর। যাদের সামান্য বাস্তুভিটা আছে অথবা অতি সামান্য জমি আছে, যার আয়ে সংবৎসরের চাহিদার একটি ক্ষুদ্রাংশ পূরণ করতেও কষ্ট হয়, ফলে অন্যের জমিতে দিনমজুরিই হয় জীবিকার মৌল উপায়, তাদেরকেও ক্ষেতমজুর বলে গণ্য করা হয়। (কৃষিশ্রমিকও দ্রষ্টব্য)।

॥ খ ॥

খলিফা : এর শাব্দিক অর্থ উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি। এই শব্দ মহানবী (সা)-র প্রতিনিধি অর্থে মুসলমানদের রাষ্ট্রনেতার পদবীরূপেও ব্যবহৃত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা)-এর তিরোধানের পর হজরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর পর, হজরত উমর (রা) বিনয়বশত নিজেকে রাসুলুল্লাহ (সা)-র যথার্থ প্রতিনিধি হওয়ার অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন এবং খলিফার বদলে 'আমিরুল মুমেনিন' বা 'বিশ্বাসীদের নেতা'—এই পদবি ব্যবহার করেন। অবশ্য, এ সত্ত্বেও, হজরত আবু বকর (রা), হজরত উমর (রা), হজরত উসমান (রা) ও হজরত আলি (রা) সত্যিকার চার খলিফা বা খুলাফায়ে রাশেদা নামে খ্যাত। পরবর্তীকালে, আব্বাসীয় ও অন্যান্য শাসকরাও এই উপাধি ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন পির-মাশায়েখদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীদেরও 'খলিফা' বলে অভিহিত করা হয়।

খাজনা, জমির রিকার্ডো প্রমুখ পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর গুণের জন্য জমিদারকে উৎপন্ন ফসলের যে-অংশ প্রদান করা হয়, সেটাই খাজনা। পরবর্তীকালে, খাজনা মুদ্রায়ও পরিশোধ করা শুরু হয়। জমিদারদের পরিবর্তে, সরকারকে দেয় অংশও জমির খাজনা হিসাবে বিবেচিত।

খাদি আন্দোলন খাদি বা খদ্দর আন্দোলন ছিল মহাত্মা গান্ধীর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনেরই একটি রূপ। এই আন্দোলনের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী বিলাতি কাপড় বর্জন এবং সর্বত্র চরকা স্থাপন করে খাদি কাপড় উৎপাদন ও পরার হিড়িক পড়ে যায়। এই আন্দোলন গ্রামীণ কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণ ও জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটায়।

এ-ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর প্রধান সহযোগী ছিলেন জে. সি. কুমারাপ্পা। চরকার সংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে গঠন করা হয় 'অখিল ভারত চরকা সংঘ'। সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফফার খান, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জমনলাল বাজাজ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরাও এই আন্দোলনে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধীসহ এই আন্দোলনের সকল নেতারই চরকায় সুতো কাটা ছিল দৈনন্দিন অবশ্যকর্তব্য।

খাদ্য ও কৃষিসংস্থা Food and Agricultural Organisation (FAO). ১৯৪৫ সালের ১৬ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের এই সংস্থাটির কাজ বিভিন্ন। যেমন, ১. বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সরকারদের পুষ্টি, কৃষি, বন, মৎস্যসম্পদ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ এবং কৃষি-উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে পূর্বাভাস দান করা, ২. কৃষিঋণ প্রদান, সম্পদ সংরক্ষণ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও বণ্টনের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন ও উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং ৩. সদস্যদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করা, যাতে অনাবাদি জমি আবাদ, ফলনবৃদ্ধি, উৎপাদনব্যয় হ্রাস, বণ্টনব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ জীবনব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি সম্ভবপর হয়। সকল সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কনফারেন্সই হল এই সংস্থার নীতিনির্ধারণী সংসদ এবং প্রতি দুবছর অন্তর একবার এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্স কর্তৃক নির্বাচিত ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিল কনফারেন্সের পক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন সকল কার্যাদি সম্পাদন করে। সংস্থার একজন ডিরেক্টর জেনারেল ও স্থায়ী কর্মকর্তামণ্ডলী রয়েছে। সংস্থার প্রধান কার্যালয় ইতালির রাজধানী রোমে অবস্থিত।

খারিজি এর শাব্দিক অর্থ বাতিল বা দলত্যাগী। হজরত উসমান (রা)-এর শাসনকালে, বিরোধী রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে, যারা খলিফার পক্ষ ত্যাগ করে চলে যায়, তারাই ইতিহাসে খারিজি বলে পরিচিত। এই খারিজিরাই হজরত উসমান (রা)-কে হত্যা করে বলে মনে করা হয়। অতঃপর, হজরত আলি (রা) খলিফা হয়ে যখন আমির মুআবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন খারিজিরা হজরত আলি (রা)-র পক্ষ নেয়। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের সময় হজরত আলি (রা) যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হলে ১২,০০০ খারিজি এর প্রতিবাদে, "লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ্" বা আল্লাহ ছাড়া কোনো আদেশদাতা নাই, এই স্লোগান দিতে দিতে শিবির ত্যাগ করে চলে যায়। দলত্যাগ করার জন্যই তাদের নাম হয় খারিজি। ক্ষিপ্ত খারিজিরা হজরত আলি (রা)-কে উৎখাত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং হজরত আলি (রা)-র বহুসংখ্যক অনুসারী এই শান্তিচুক্তিকে কুরআনবিরোধী আখ্যা দিয়ে খারিজিদের সঙ্গে যোগ দেয়। খারিজিরা হজরত আলি (রা), মুআবিয়া ও আমর বিন আস্ তিনজনকেই ইসলামের শত্রু বলে চিহ্নিত করে এবং তিনজনকেই হত্যার পরিকল্পনা করে। হজরত আলি (রা) এদের হাতে নিহত হন, কিন্তু অপর দুজন বেঁচে যান। এদের মতে, উমাইয়াদের খলিফা হওয়ার কোনো অধিকার ছিল না। সুতরাং এরা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খারিজিদের সাময়িকভাবে দমিয়ে দিতে সমর্থ হলেও শিগ্‌গিরই তারা নতুন নেতা জাহাক-এর নেতৃত্বে গোটা ইরাক দখল করে নেয়। খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান জাহাককে পরাজিত ও হত্যা করেন। জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে খারিজিরা দশম শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল এবং আব্বাসীয় ও ফাতেমিদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছিল। পরবর্তীকালে খরিজীরা রাজনৈতিক

চরিত্র হারিয়ে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। খারিজিদের মতে, খলিফার পদটি গণতান্ত্রিক এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনযোগ্য। তাদের মতে. জাতি-গোত্র-বর্ণ-নির্বিশেষে যে-কোনো ব্যক্তি,এমনকি অকুরাইশীরাও খলিফাপদের প্রার্থী হতে পারেন। তারা মনে করে যে, খলিফা হওয়ার প্রধান গুণ তিনটি, যথা—চরিত্রবান, ন্যায়বিচারক ও ধর্মপরায়ণ হওয়া। মুসলমান হলে একজন নিগ্রো, এমনকি একজন মহিলাও খলিফা নির্বাচিত হতে পারেন। যোগ্যতর লোক পাওয়া গেলে খলিফাকে অপসারণও করা যায় বলে খারিজিরা মনে করে। হজরত আবু বকর (রা) ও হজরত উমর (রা)-এর নির্বাচন যথার্থ ছিল বলে তারা বিশ্বাস করত। উগ্রপন্থী খারিজিদের মতে, মুসলমানেরা নিজেরাই নিজেদের শাসন করতে পারে বিধায় খলিফার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। রাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী খারিজিরা সেকালে গেরিলাপদ্ধতির যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করে। বিপ্লবী গুণাবলী ও বুদ্ধিবৃত্তির জন্যও তাদের খ্যাতি ছিল। অতিশুদ্ধাচারী খারিজিরা কুরআন ও ইসলামের ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত গোঁড়া। তাদের মতে একজন মুসলমান কোনো বড় রকমের পাপ করলে, এমনকি নামাজ-রোজা খেলাফ করলেও কাফেরে পরিণত হয়। আর কাফেরদের দেখামাত্র হত্যা করাকেও তারা ন্যায়সংগত বলে মনে করত। তারা পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের জন্য ছিল বদ্ধপরিকর। খারিজিদের সুসংগঠিত একক কোনো মতবাদ ছিল না। তারা আজরাকি, এবাদি, নাক্কারি, আজরাদি, সুফ্রি ও জিয়াদি—এই ছয়টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল।

খিলাফত : ইসলাম ধর্মানুযায়ী আল্লাহই যেহেতু সার্বভৌমত্ব ও আদেশ-নির্দেশের একমাত্র মালিক, সেহেতু কোনো মানুষ প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম শাসক হতে পারে না। মানুষ শুধু পারে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশকে কার্যকর করতে। সুতরাং, খিলাফত হচ্ছে আল্লাহ-রাসুল (সা)-এর প্রতিনিধিত্ব করা এবং এর মূল কথা হচ্ছে ১. খলিফা আল্লাহ-রাসুল (সা)-এর প্রতিনিধিমাত্র, ২. খলিফার কাজ হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহয় বিধৃত আদেশ-নির্দেশকে কার্যকর করা, ৩. খলিফা হবেন নির্বাচিত, বংশানুক্রমিক নয়, ৪. খলিফা আল্লাহর রবুবিয়াত বা প্রতিপালকত্বের ভিত্তিতে সমগ্র জনগণের সুষ্ঠু ও সুষম প্রতিপালন সুনিশ্চিত করবেন এবং ৫. খলিফা আল্লাহ-রাসুল (সা)-এর পক্ষে বিশ্বাসীদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সুষ্ঠু নেতৃত্বের নিশ্চয়তা বিধান করবেন। বস্তুত, খিলাফত আল্লাহর 'তৌহিদ'-এরই ফলশ্রুতি মাত্র।

খিলাফত আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তুরস্কের সুলতান 'খলিফা' উপাধি ধারণ করলে মুসলমানেরা এই খিলাফতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শুরু করে। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে, বিভিন্ন কারণে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগ দেয়। ফলে, ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি হয় এক বিব্রতকর পরিস্থিতি। তারা একদিকে ভারতের স্বাধীনতার দাবিদার এবং অন্যদিকে খলিফার প্রতি আনুগত্যশীল বিধায় ইংরেজরা মুসলমানদের অবিশ্বাস করতে শুরু করে। এ-সময় মাওলানা মোহাম্মদ আলি, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতার করলে খিলাফত আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে এবং ভারতের মুসলমানেরা শুধু খলিফার প্রতি সমর্থনই দেয় না, সশরীরে গিয়ে খিলাফতরক্ষার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করারও দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধশেষে ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে এবং তুরস্কের কোনো ক্ষতি করা হবে না। কিন্তু ১৯১৮ সালে

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, ১৯১৯ সালে সম্পাদিত 'সেভার্স চুক্তি' তুরস্কের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে তুরস্ককে ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপারেও ব্রিটেন ঐকমত্য প্রকাশ করে। তদনুযায়ী, স্মার্না, থ্রেস, আনাতোলিয়া ইত্যাদি এলাকা বণ্টিত হয়ে যায়। স্বভাবতই, ক্ষুব্ধ মুসলমানেরা এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯১৯ সালে আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও মাওলানা আজাদ জেল থেকে বেরিয়ে এসে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে আন্দোলনে বিপুল গতির সঞ্চার হয়। বস্তুত খিলাফত আন্দোলন ছিল মুসলমানদের সম্মান রক্ষার লড়াই। রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, স্বরাজের প্রতি অবহেলা ইত্যাদির দরুন এ-সময় কংগ্রেসও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং গান্ধীজির নেতৃত্বে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এ-সময় হিন্দু-মুসলিম উভয়েই ঐক্যের তাগিদ অনুভব করে এবং গান্ধীজি স্বরাজ ও খিলাফত উভয় আন্দোলনেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন অকস্মাৎ গান্ধীজি এই বলে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান যে, আন্দোলন সহিংসতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। গান্ধীজির এই আকস্মিক ভূমিকায় মুসলমানেরা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং আন্দোলনে বিভিন্ন দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বিধার সুযোগে ব্রিটিশ সরকার আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও স্বয়ং গান্ধীজিকেও গ্রেফতার করে। ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন এবং খিলাফত বাতিল করে দেন। এমতাবস্থায়, স্বভাবতই, খিলাফত আন্দোলন নিঃশেষিত হয়ে যায়।

খুন-সা আফিমসম্রাট খুন-সা নিজেকে দাবি করতেন মায়ানমারের শান প্রদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হিসাবে। কিন্তু মায়ানমার কর্তৃপক্ষের মতে তিনি ছিলেন এক মাদক-সন্ত্রাসী মাত্র। ইয়াংগন থেকে ৪০০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে হোমং-এ ছিল খুন-সার হেড কোয়ার্টার্স। তাঁর সামরিক বাহিনীর নাম ছিল মং তাই আর্মি (MTA)। এক পর্যায়ে সমগ্র স্বর্ণ ত্রিভুজ (Golden Triangle) এলাকায় খুন-সার কাহিনী ত্রাসের রাজত্ব ও একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছিল। কিন্তু সরকারি বাহিনীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এঁটে ওঠা সম্ভবপর নয় বুঝতে পেরে খুন-সা তাঁর ৪৪৩১ জন সদস্যসহ ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে আত্মসমর্পন করেন এবং মিজাইল, রকেট, মর্টার, মেশিনগানসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র জমা দেন। কিন্তু খুন-সার প্রায় ২০,০০০ অনুসারী আত্মসমর্পণে বিরত থাকে এবং খুন-সার প্রতিদ্বন্দ্বী শান নেতার দলে যোগ দেয়। এই নেতাও শান প্রদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে যতটা না উৎসাহী, আফিম ব্যবসার ব্যাপারে তার চেয়ে বেশি উৎসাহী বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা।

খেমার রুজ Khemer Rouge. অর্থ লাল ফৌজ বা রেড আর্মি। কম্বোডিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র গেরিলা উইং খেমার রুজ গঠিত হয় বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। ১৯৬৭ সাল থেকে পলপটের নেতৃত্বে খেমার রুজ গেরিলারা প্রিন্স নরোদম সিহানুকের সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৭০ সালে এক ডানপন্থি অভ্যুত্থানে সিহানুক সরকারের পতন ঘটে এবং সীমান্ত থেকে ভিয়েতনামি মুক্তিযোদ্ধাদের বিতাড়িত করতে মার্কিন সৈন্যরাই কম্বোডিয়ায় ঢুকে পড়ে। ভিয়েতনামি গেরিলারা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে খেমার রুজের সঙ্গে যোগ দেয়। ১৯৭৫ সালের ১৭ এপ্রিল রাজধানী নমপেনের পতন ঘটে এবং খেমার রুজরা কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সময়ে খেমার রুজরা মাও ঝে ডং-এর

কায়দায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালাতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। ১৯৭৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া আক্রমণ করে এবং ১৯৭৯ সালের গোড়াতেই পলপট সরকারের পতন ঘটে। খেমার রুজের দলত্যাগী নেতা হুন সেনের নেতৃত্বে গঠিত হয় এক পুতুল সরকার। শুরু হয় এক দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ। ১৯৯১ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে খেমার রুজসহ বিভিন্ন দল-উপদল এক শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ১৯৯৩ সালে খেমার রুজ জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বয়কট করে এবং ফলে ক্ষমতাসীন হন প্রিন্স নরোদম রনভিদ ও হুনসেনের নেতৃত্বে এক যৌথ সরকার। ১৯৯৬ সালের আগস্টে পলপটের শ্যালক ইয়েং সেরি প্রায় ১০ হাজার খেমার রুজ গেরিলাসহ সরকারি বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৯৭ সালে পলপট তাঁরই এককালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী সন সেন, তাঁর স্ত্রী ও ৯ সন্তানকে হত্যার নির্দেশ দিলে 'কসাই' বলে কুখ্যাত খেমার রুজ নেতা জেনারেল তা মোক পলপটকে বন্দি করেন। ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে পলপটের মৃত্যু হয়। খেমার রুজ এখন বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

খোতবা খতিব কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা। জুমআ বা ঈদের নামাজের সময় খোতবাদানের প্রথা প্রচলিত। খোতবা-সম্পর্কিত হাদিস থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ১. স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা) ও খলিফারা সমসাময়িক সমস্যাদি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য খোতবা দিতেন, ২. মুসলিমগণ তাঁদের খোতবা অনুযায়ী কাজ করতেন এবং ৩. সে-সময়কার মুসলিমবিশ্ব যেহেতু আরবি ভাষাভাষী ছিল, সেহেতু তখন আরবিতেই খোতবা প্রদান করা হত। বলাবাহুল্য, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও সামরিক পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে মুসলমানদের অবহিত করাই ছিল খোতবার মৌল উদ্দেশ্য।

খোলা-দরজা নীতি Open-door Policy. এর অর্থ হল এমন একটি অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করা, যার ফলে সংশ্লিষ্ট দেশে বিশ্বের যে-কেউ বিনাশর্তে যে-কোনো খাতে যে-কোনো পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করতে সমর্থ হবে এবং এরূপ শিল্পকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যলব্ধ মুনাফা পুনর্বিনিয়োগ করতে বা ইচ্ছামতো অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারবে। সিঙ্গাপুর, হংকং ইত্যাদিই হল বর্তমান শতাব্দীতে খোলা-দরজা নীতির অনুসারী। এ ছাড়া বহু দেশই এখন কমবেশি খোলা-দরজা নীতির অনুসরণ করে।

খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্র খ্রিস্টধর্মের অনুশাসন অনুসারে সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের জন্য ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের একাংশ এই মতবাদ প্রচার করেন। তাঁরা খ্রিস্টধর্মের উপদেশের সঙ্গে কিছু-কিছু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটান এবং ক্যাথলিক শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

॥ গ ॥

গডফাদার : God-father. সাধারণভাবে এর অর্থ হচ্ছে ধর্মপিতা। কিন্তু এখন গডফাদার বলতে বোঝানো হয় এমন প্রবল প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে যে পর্দার আড়ালে থেকে কোনো চোরাচালানি দল, মাদকদ্রব্য পাচারকারী দল, সন্ত্রাসী বা গুণ্ডাবাহিনী, গণিকাচক্র বা অনুরূপ কোনো অপরাধীচক্র বা মাফিয়াকে পরিচালনা করে। পর্দার অন্তরালবর্তী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক (খারাপ অর্থে)-কেও গডফাদার বলা হয়ে থাকে।

গণঅভ্যুত্থান Mass Upsurge. কোনো উপনিবেশবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, কিংবা কোনো শোষক ও গণবিরোধী সরকার অথবা কোনো তাঁবেদার সরকারের বিরুদ্ধে আপামর জনগণের বিদ্রোহকেই বলে গণঅভ্যুত্থান। গণঅভ্যুত্থান কোনো ধর্মঘট বা হরতালমাত্র নয়, বরং জাতীয়তা-বিরোধী গণবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের ধারাবাহিক আক্রোশের সার্বিক প্রকাশ। তবে, ধর্মঘট, হরতাল, বিক্ষোভ ইত্যাদির মাধ্যমেও এর প্রকাশ ঘটে থাকে। গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য, মজুরিবৃদ্ধি বা অনুরূপ কোনো সাময়িক দাবি নয়, বরং রাষ্ট্রীয় বা সরকারি কাঠামোর ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন। সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদী শক্তি বা তাদের তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে গড়ে-ওঠা গণঅভ্যুত্থানে আপামর জনগণ অংশগ্রহণ করে; আর দেশীয় শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে গড়ে-ওঠা গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেয় মূলত সমগ্র শোষিত বা অধিকারবঞ্চিত জনগণ।

গণতন্ত্র : Democracy. গ্রিক শব্দ Demos (জনগণ) এবং Kratos (ক্ষমতা) থেকে ইংরেজি Democracy অর্থাৎ গণতন্ত্র শব্দটির উৎপত্তি। গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের মতে, জনগণের ইচ্ছানুযায়ী দেশশাসনের নামই হল গণতন্ত্র। তত্ত্বগতভাবে, গণতন্ত্রে জনগণের মতামত ও সংগঠনের অবাধ অধিকারকে স্বীকার করা হয়। আব্রাহাম লিংকনের মতে, গণতান্ত্রিক সরকার হল সেই সরকার, যে সরকার জনগণেরই সরকার, জনগণের দ্বারাই নির্বাচিত সরকার এবং জনগণের জন্যই গঠিত সরকার। কিন্তু গণতন্ত্রের সমালোচকদের মতে, পশ্চিমা গণতন্ত্র আসলে ধনী ও অভিজাতদেরই নিরঙ্কুশ স্বার্থরক্ষার তন্ত্র। গ্রিক সভ্যতার যুগে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রিক নগররাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, তখন সেসব রাষ্ট্রের নাগরিকরা সরাসরি মতামতদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করত বটে; কিন্তু নাগরিক বলতে তখন বোঝানো হত শুধুমাত্র দাস-মালিক (Patrician)-দের, যারা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশ। আর জনসংখ্যার বাকি ৯৪ শতংশ অর্থাৎ ক্রীতদাস (Plebian)-দের নাগরিক অধিকার তো দূরের কথা, ন্যূনতম মানবিক অধিকারটুকুও ছিল না। অর্থাৎ গ্রিক গণতন্ত্র ছিল সমাজের মাত্র ৬ শতাংশ মানুষের গণতন্ত্র। এর পরবর্তী সামন্তসমাজ ব্যবস্থায় তো গণতন্ত্রের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আধুনিক গণতন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন—সামন্তবাদের ভাঙন ও পুঁজিবাদের উদ্ভবের যুগের উঠতি-পুঁজিপতি বা বুর্জোয়ারা এবং বুর্জোয়া দার্শনিকেরা। বংশ-বংশানুক্রমে ক্ষমতা ও আভিজাত্যের একচ্ছত্র অধিকারী সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে শিল্পবিপ্লবের ফলে উদ্ভূত নব্য ধনিকশ্রেণী বা বুর্জোয়ারা তাদের ক্ষমতা ও আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে-প্রক্রিয়া হাজির করে, তারই নাম দেওয়া হয় গণতন্ত্র। বুর্জোয়া বা নব্যধনীরা ব্যাপক জনগণের ধুয়া তোলে, কারণ বংশবংশানুক্রমে সামন্তবাদী শাসন-শোষণের চাপে নিষ্পেষিত ভূমিদাসদের পক্ষে টানা, বুর্জোয়াদের বিজয়ের জন্য ছিল অপরিহার্য। বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্য সফল হয়। তাদের নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণের সমর্থনে সামন্তবাদের পতন ঘটে। কিন্তু বাস্তবতা হল এই যে, পুঁজিবাদী গণতন্ত্র আসলে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোরই উপরিকাঠামো মাত্র। ফলে, যে-সমস্ত দেশে পর্যাপ্ত শিল্পায়ন ও পুঁজির বিকাশ ঘটেছে, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা প্রবল সামাজিক শক্তি হিসাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে, শুধু সে-সমস্ত দেশেই কোনো-না-কোনো ধরনে বা ফরমে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রয়েছে। আর যে-সমস্ত দেশে শিল্পায়ন ও পুঁজিবাদ পশ্চাৎপদ, সে-সমস্ত দেশে গণতন্ত্রও কার্যত পশ্চাৎপদ বা অনুপস্থিত। এশিয়া, আফ্রিকা

ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহই তার প্রমাণ। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমালোচকদের মতে, এই গণতন্ত্র আসলে ব্যাপক জনগণের নামে, ব্যাপক জনগণকে ব্যবহার করে, ব্যাপক জনগণের ভোট নিয়ে, মুষ্টিমেয় ধনীদেরই একচেটিয়া স্বার্থরক্ষার তন্ত্র।

গণতন্ত্র, উদার Liberal Democracy. ব্রিটেনের ওয়েস্টমিনস্টার গণতন্ত্রের ধাঁচে গড়ে-ওঠা ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের গণতন্ত্রকেই উদার গণতন্ত্র বলে দাবি করা হয় । এটাও দাবি করা হয় যে, এই সমস্ত দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এবং এসব দেশের জনগণ সর্বাধিক নাগরিক ও মানবিক অধিকার ভোগ করে। অবশ্য সমালোচকদের মত হল এই যে, এসমস্ত দেশেও একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে জনপ্রতিনিধিরা পার্লামেন্টে কোনো আইন পাশ করানোর সময় আর জনগণের মতামতের কোনো তোয়াক্কাই করেন না।

গণতন্ত্র, খ্রিস্টীয় : Christian Democracy. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইতালি, জার্মানি এবং ফ্রান্সে খ্রীষ্টীয় গণতান্ত্রিক দলের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী কালে ল্যাটিন আমেরিকা ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও এরূপ দলের আবির্ভাব হয়। কমিউনিজম ও ইউরো-কমিউনিজমের বিরোধিতা করতে গিয়ে এসব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দল খ্রিস্টীয় লেবেল গ্রহণ করে এবং মনে করে যে, চার্চ তাদের পক্ষে থাকলে তাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে। কিন্তু ইউরোপ জুড়ে ধর্মের রাজনৈতিক প্রভাব কমে যাওয়ার ফলে এখন খ্রিস্টীয় গণতান্ত্রিক দল নামে কিছু কিছু দল থাকলেও 'খ্রিস্টীয়' বিশেষণটির এখন আর তেমন কোনো তাৎপর্য নেই। এসব দলের অধিকাংশই এখন মিশ্র অর্থনীতি, মাঝারি ধরনের সামাজিক উদারতা, মৌলিক জনকল্যাণ ইত্যাদিরই প্রবক্তা হিসাবে কাজ করে।

গণতন্ত্র, নয়া Neo-Democracy. প্রচলিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের তুলনায় নতুন চরিত্রের গণতন্ত্র, যার মূলকথা হল, সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে সকল শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদের ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই গণতন্ত্রকে নয়া গণতন্ত্র বলার কারণ এই যে, প্রচলিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রে একমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণীই রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে পারে এবং এর মাধ্যমে গঠিত পার্লামেন্ট, মন্ত্রিসভা ইত্যাদি কার্যত বুর্জোয়াদের স্বার্থই রক্ষা করে; কিন্তু নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতায় যায় সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের নিপীড়িত অংশ। নয়া গণতন্ত্র আসলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠারই পূর্বস্তর। বলা হয়ে থাকে যে, নয়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোনো চীনের প্রাচীর নেই; কেননা নয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও সর্বহারা শ্রেণীই মূলত রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকে বিধায়, বিবর্তনমূলক পদ্ধতিতেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটানো যায়, এর জন্য কোনো আলাদা বিপ্লবের প্রয়োজন পড়ে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীতে পূর্ব ইউরোপের পাঁচটি দেশে, উত্তর কোরিয়ায় এবং চীনে নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মাও ঝে ডং-এর মতে, বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনের যুক্তফ্রন্ট ও মৈত্রীর ওপরই নয়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। তিনি আরও বলেন যে, এই ব্যবস্থা একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও কেন্দ্রবদ্ধ, অর্থাৎ জনগণের প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত রূপ। অবশ্য, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমর্থকদের মতে, নয়া গণতন্ত্র আসলে কমিউনিস্ট একনায়কত্বেরই একটি রূপ।

গণতন্ত্র, নিয়ন্ত্রিত Controlled Democracy. বিরূপ পরিস্থিতিতে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার এটি একটি ফ্যাসিবাদী অপকৌশল। যখন কোনো ফ্যাসিবাদী বা স্বৈরাচারী শাসক দেখে যে জনগণের মধ্যেকার গণতন্ত্রের দাবিকে আর দাবিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়, তখন তারা গণবিক্ষোভকে প্রশমিত করার লক্ষ্যে এরূপ গণতন্ত্রের আশ্রয় নেয়। যুক্তি হিসাবে তারা বলে যে, জনগণের শিক্ষাহীনতা, রাজনৈতিক অসচেতনতা, বৈদেশিক হুমকি ইত্যাদির মুখে জাতীয় ঐক্যের অপরিহার্যতার দরুন ওই মুহূর্তেই পূর্ণ গণতন্ত্র প্রদান করা সম্ভবপর হচ্ছে না বলেই, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র প্রদান করা হচ্ছে। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র ঠিক গণতন্ত্র নয়। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচন, পার্লামেন্ট ইত্যাদির অস্তিত্ব থাকলেও, মূল ক্ষমতাটি থাকে ওই স্বৈরাচারী শাসক ব্যক্তি বা গোষ্ঠিরই হাতে। পঞ্চাশের দশকে ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণ, ষাটের দশকে পাকিস্তানের আইয়ুব খান প্রমুখ এরূপ গণতন্ত্র প্রদান করেন।

গণতন্ত্র, পরিচালিত Guided or Directed Democracy. ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানি একনায়ক ফিল্ড মার্শাল আইউব খানই প্রথম এ-ধরনের গণতন্ত্রের কথা বলেন। তৃতীয় বিশ্বে যাঁরা এ-ধরনের গণতন্ত্রের কথা বলেন, তাঁদের যুক্তি হল এই যে, এসব দেশের জনসাধারণ শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাৎপদ, অনুন্নত যোগাযোগ ও তথ্য সরবরাহ্ ব্যবস্থার শিকার এবং ঔপনিবেশিক যুগের চিন্তাচেতনায় কমবেশি আচ্ছন্ন বিধায় পশ্চিমা উদার গণতন্ত্র এদের জন্য উপযুক্ত নয়। পরিচালিত গণতন্ত্র আসলে গণতন্ত্রের নামে একব্যক্তি বা একদলেরই স্বৈরাচার। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহও দাবি করত যে, তারা যে-ব্যবস্থা কায়েম করেছে, সেটাই আসলে গণতন্ত্র এবং সুনিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বকেও এরূপ গণতন্ত্র বলে দাবি করা হত। এরূপ পরিচালিত গণতন্ত্রসম্পন্ন কোনো কোনো দেশে নামমাত্র একাধিক দলও থাকতে পারে। যেমন—কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানিতে টেকনিক্যালি একাধিক দল ছিল ; কিন্তু সমগ্র ব্যবস্থা এমনভাবেই নিয়ন্ত্রিত ছিল যাতে কমিউনিস্ট পার্টির হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। পরিচালিত গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রেরই সমার্থক।

গণতন্ত্র, মৌলিক পাকিস্তানের শাসক আইয়ুব খান ষাটের দশকে মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracy) প্রবর্তন করেন। জনগণই শেকড় বা মূল, সুতরাং ভিত্তিমূলেই অর্থাৎ গ্রাম, মহল্লা ও ইউনিয়ন পর্যায়েই শুধু জনগণ সরাসরি ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে, অন্যান্য উচ্চতর স্তরের নির্বাচনে জনগণের সরাসরি ভোটের কোনোই প্রয়োজন নেই, এটাই ছিল মৌলিক গণতন্ত্রের তত্ত্ব। এই ব্যবস্থার সমালোচকদের মতে, এটা ছিল গণআন্দোলনকে অবদমিত রেখে একটি বশংবদ পার্লামেন্ট সৃষ্টির এবং একনায়কত্ব কায়েম রাখারই অপকৌশল মাত্র।

গণতন্ত্র, শিল্পীয় : Industrial Democracy, শিল্পীয় গণতন্ত্র বা শিল্পক্ষেত্রে গণতন্ত্র বা শিল্পে অংশীদারিত্বের এই ধারণাটি বনেদি পুঁজিবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা,—উভয়েরই বিরোধী। ব্রিটেনে জি.ডি. কোল (G.D. Cole, 1889-1959) এই তত্ত্ব হাজির করেন যে, শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই নয়, শিল্পক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপনা হবে শ্রমিক-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত এবং শ্রমিক-কর্মচারীরাই স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করবে কীভাবে উৎপাদন হবে, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য কী হবে, শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা কী হবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়। ব্রিটেনে ১৯৭৬ সালে

প্রণীত বুলক রিপোর্ট (Bullock Report)-এ শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিলেই শ্রমিক -মালিকে দূরত্ব ও বৈষম্য কমে আসবে। আবার কার কার মতে শিল্পীয় গণতন্ত্র হল শ্রমিকদেরকে সংশ্লিষ্ট শিল্পের শেয়ার কিংবা লভ্যাংশ প্রদান করা। যুগোস্লাভিয়ায়ও একসময় এ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছিল। অনেকের মতে শিল্পীয় গণতন্ত্র শিল্পক্ষেত্রে শুধু নৈরাজ্যেরই জন্ম দেবে।

গণতন্ত্র, সামরিক Military Democracy. সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে যতটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করে, সেটাকেই বলে সামরিক গণতন্ত্র। কোনো কোনো সময়, সামরিক বাহিনী পরোক্ষভাবে সর্বময় বা মূল ক্ষমতা হাতে রেখে তাদের নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন দেয়, পার্লামেন্ট-মন্ত্রিসভা ইত্যাদি গঠন করায়। প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক, সামরিক গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে সামরিক বাহিনীর হাতেই মূল ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখা।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা Democratic Centralism. কঠোর এককেন্দ্রিক শৃঙ্খলার আওতায়, সংশ্লিষ্ট জনগণ বা সদস্যদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকেই বলা হয় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। এরূপ ব্যবস্থায়, মূলত একই মতবাদ বা আদর্শে বিশ্বাসী সদস্য বা ব্যক্তিবর্গ স্ব-স্ব ফোরামে অবাধে নিজ নিজ মতামত প্রদান করতে পারেন বটে, কিন্তু একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেলে প্রত্যেকেই তা মানতে ও কার্যকর করতে বাধ্য থাকেন। অন্যকথায়, একটি আদর্শ বা মতবাদকে দ্বিধা ও ভাঙনের কবল থেকে মুক্ত রাখা, আদর্শবিরোধীদের অবদমিত রাখা এবং রাষ্ট্র বা সংগঠনের শৃঙ্খলাকে মজবুত রাখার লক্ষ্যেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অনুশীলিত হয়। সাধারণত কোনো সমাজতান্ত্রিক বা বিপ্লবী সংগঠনেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অনুশীলিত হতে দেখা যায়।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র Democratic Socialism. ১৯৫১ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর কংগ্রেসে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও কাজসমূহ' নির্ধারণ করা হয়। বলাবাহুল্য, এই মতবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিপন্থী এবং বনেদি মার্কসবাদীদের মতে, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আসলে সংস্কারবাদীদেরই আদর্শ। এই মতবাদ শ্রেণীসংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সর্বহারার একনায়কত্বের অপরিহার্যতা স্বীকার করে না। এই মতবাদীদের মতে, বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্য থেকেই সংস্কৃতি শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিমাণ ও গুণগত পরিবর্তন সাধন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদির মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। ইউরো-কমিউনিজম বা ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারাও এই মতবাদেরই অন্তর্গত।

গণপরিষদ Constituent Assembly. কোনো দেশ নতুন স্বাধীনতা লাভ করলে কিংবা কোনো দেশে কোনো নতুন আদর্শবাদী সরকার ক্ষমতা দখল করলে, নতুন সংবিধান-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে-পরিষদ গঠন করা হয়, তাকেই বলে গণপরিষদ। (কন্সটিটিউআন্ট অ্যাসেম্বলী দ্রষ্টব্য)।

গণফৌজ People's Army. যে ফৌজ বা বাহিনী মুক্তিকামী শোষিত-নিপীড়িত জনগণের পক্ষে গণবিরাধী শাসক-শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র গণযুদ্ধ পরিচালনা করে, সেই ফৌজকেই বলা হয় গণফৌজ। যেমন, মার্কিন দখলদার বাহিনী ও তাদের

তাঁবেদার সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ভিয়েতনামের খেমার রুজ বাহিনী কিংবা চীনের চিয়াং কাইশেকের কুয়োমিনতাং বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইকারী লালফৌজ ইত্যাদিই হল গণফৌজের উদাহরণ।

গণবিদ্যালয় আন্দোলন Folk High School Movement. উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ধর্মযাজক গ্রুন্ডভিগ ডেনমার্কে এই আন্দোলনের সূচনা করেন এবং দেশব্যাপী গণবিদ্যালয় গড়ে তুলতে শুরু করেন। এই আন্দোলনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত তিনটি, যথা—১. জনগণকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের এবং জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব কী, সে-সম্পর্কে জনগণকে সম্যক অবহিত করা, ২. নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং ৩. জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণকে সমবায়ের আওতায় ঐক্যবদ্ধ করা। এই আন্দোলন সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলন না হলেও, এই আন্দোলনের সদস্যেরা সরকারের অন্যায় ও গণবিরোধী ব্যবস্থাসমূহের বিরোধিতা করত। সুশৃঙ্খল চার্চব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র ডেনমার্ক গণবিদ্যালয়ে ছেয়ে যায় এবং দেখা যায় যে ক্রমশ গণবিদ্যালয়ের আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিরাই ক্রমবর্ধমান হারে আইনসভায় নির্বাচিত হয়ে চলেছে। জনগণের গণতান্ত্রিক, তথা রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমবায়ও গড়ে উঠতে থাকে এবং একপর্যায়ে দেখা যায় যে, দেশের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি সম্পদ সমবায়ের আওতায় এসে গেছে। এভাবে সম্পদের সিংহভাগ জনগণের সমবায়ের আওতায় এসে যাওয়ার ফলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যও অনেকখানি লোপ পায়; গড়ে ওঠে কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। ক্রমশ নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশও কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করে।

গণভোট Plebicite. Plebian. বা 'জনসাধারণ' এই শব্দ থেকে উদ্ভূত 'গণভোট'কথাটির অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভোটের মাধ্যমে সমগ্র জনগণের মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়া। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সর্বপ্রথম ফ্রান্সে এই প্রথার প্রচলন করেন।

গণমাধ্যম Mass Media. সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন—এই তিনটি তথ্য ও বিনোদনমাধ্যম জনগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় বলে এই তিনটিকেই বলা হত গণমাধ্যম। যেমন, ইউরোপের ৯৫% গৃহেই টেলিভিশন রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দু-দশকে আরও একটি মাধ্যমের উদ্ভব ঘটে। সেটি হল কমপিউটার মাধ্যম। এই মাধ্যমটি ইতিমধ্যেই অন্য সকল মাধ্যমকে সমৃদ্ধতার দিক থেকে অতিক্রম করে গেছে। কমপিউটার নিয়ন্ত্রিত তথ্য প্রবাহের ধারাকে বলা হয় তথ্য মহাসড়ক (Information Superhight way)। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে কমপিউটারও এখন অধিকাংশ গৃহে পৌঁছে গেছে এবং গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বেও এর দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। বর্তমান বিশ্বে গণমাধ্যম সৎ ও নিরপেক্ষ হলে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারে, পারে শাসকদের বিবেক হিসাবে কাজ করতে। স্বাধীন ও শক্তিশালী গণমাধ্যম যে-কোনো সরকারের উত্থান-পতন ঘটাতে পারে। অর্থনীতিকে গড়তে পারে। পারে জাতিকে দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করতে।

গণযুদ্ধ গণবিরোধী শাসক-শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শোষিত নিপীড়িত জনগণের যুদ্ধই হল গণযুদ্ধ (People's War)। দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিকামী জনগণের যুদ্ধও গণযুদ্ধ।

গণলাইন শোষিত-নিপীড়িত জনগণের মুক্তির সপক্ষে গৃহীত নীতি বা লাইনকে বলে গণলাইন।

গণহত্যা : Genocide. কোনো বিশেষ ধর্মমত, রাজনৈতিক মতবাদ বা কৃষ্টিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে নির্মূল বা হীনবল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সুপরিকল্পিত ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলার এরূপ গণহত্যার মাধ্যমে ইহুদি জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

গতি Motion. সাধারণভাবে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন। চূড়ান্ত বিচারে, বস্তুর গতিই হচ্ছে ধ্রুব, স্থিতাবস্থা আপেক্ষিক। যেসব বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে স্থির বলে মনে হয়, আসলে তা পৃথিবীর সঙ্গে পৃথিবীরই গতিতে সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান। আবার প্রত্যেক বস্তুকে ভেঙে পরমাণু পর্যায়ে নিয়ে গেলে দেখা যাবে যে, সেখানে নিউট্রনকে কেন্দ্র করে ইলেক্ট্রন ও প্রোটন (বা পজিট্রন) সদা ঘূর্ণায়মান, অর্থাৎ গতিশীল। সুতরাং, বস্তুর স্থিরতা এদিক থেকেও স্থূল ও বাহ্যিক রূপমাত্র। আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণ করে যে, গতির যে-কোনো পরিমাণবৃদ্ধি বস্তুর ভরের বৃদ্ধি ঘটায়। কোনো বস্তু আলোর গতি (প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল)-লাভের দিকে অগ্রসর হলে তার ইলেক্ট্রন কণাসমূহ ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক কোয়ানটা (Electro-Magnetic Quanta) বিকিরণ করতে শুরু করে। বস্তুত কোনো গতিই একটি ক্রিয়া নয়; প্রত্যেক গতিই অন্যান্য গতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল মাত্র। প্রত্যেক গতির মধ্যেই বিপরীত সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন, ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক, নিউক্লিয়ার ও গ্র্যাভিটেশনাল গতির ভিত্তি হচ্ছে স্ব-স্ব ক্ষেত্রের মাইক্রো পার্টিক্যালস্-এর কোয়ান্টা-এর বিধৃতি ও বিকিরণ-এর দুই বিপরীত সত্তার অন্তর্মিলন।

গতিতত্ত্ব : জার্মান দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) কর্তৃক প্রবর্তিত মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির ক্রিয়ার ফলেই যাবতীয় পদার্থের উদ্ভব ঘটেছে।

গরিবি হটাও : সত্তরের দশকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক সূচিত আন্দোলন। এই আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল, অধিকতর সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

গর্বাচেভ, মিখাইল মার্গেভিচ : Mikhail Sergeivich Gorbachev. জন্ম ককেসাসে, ১৯৩১ সালে। একটি যৌথ খামারে মেশিন অপারেটর হিসাবে জীবন শুরু। পরে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে স্নাতক। ১৯৮০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। কনস্টানটিন শেরলেনকোর পর ১৯৮৫ সালে পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালে সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। তাই তিনি শ্রমিকদের প্রেরণা (incentive) প্রথা চালু করেন, পার্টি আমলাতান্ত্রিকতার ভার লাঘব করেন এবং স্বচ্ছতা ও খোলামেলা

নীতি (পেরেসত্রয়কা ও গ্লাসনস্ট) প্রবর্তন করেন। সংস্কারে বিশ্বাসী হলেও তিনি মূলত ছিলেন কমিউনিস্ট। ১৯৯১ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ক্যু-এর উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। ওই বছরই সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫টি সোভিয়েত রিপাবলিকের ১১টিই ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম হয়ে যায় এবং কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপিন্ডেন্ট স্টেটস্ (সিআইএস) গঠন করে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৯১ সালের ২৬ ডিসেম্বর গর্বাচেভ পদত্যাগ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার জন্য অনেকে তাঁকেই দায়ী করেন। আবার অনেকের মতে ওই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওই পরিণতি ছিল অবশ্যম্ভাবী। গর্বাচেভের জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও এইই হত।

গাজ্জালি, ইমাম : (১০৫৮-১১১৯) ইরানে জন্মগ্রহণকারী ইমাম গাজ্জালি (র) ছিলেন একাধারে দার্শনিক, আইনবিদ ও ধর্মবিদ। আল ফারাবি প্রমুখ প্লেটোবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে তিনি বলেন যে, ধর্মের অবক্ষয়ের জন্য একশ্রেণীর দার্শনিকের অপযুক্তিই দায়ী। তিনি ঘোষণা করেন যে, সুন্নাহই সকল রীতিনীতির ভিত্তি, ধর্মের সঙ্গে সংগতিহীন তর্কশাস্ত্র নিরর্থক এবং ইসলামি সমাজে কোনো বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ইয়াহইয়ায়ে উলুমিদ্দিন' ও 'তাহফাতুল ফালাসিয়া'।

গানবোট ডিপ্লোম্যাসি : Gunboat Diplomacy. শক্তিপ্রয়োগের ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, বৈরী দেশ বা শক্তিকে হটে যেতে বা দমে যেতে বাধ্য করার কৌশলকেই বলে গানবোট ডিপ্লোম্যাসি।

গান্ধী, মহাত্মা : পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬১-১৯৪৮)। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের নেতা গান্ধী ১৮৯১ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৮৯৩ সালে বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন এবং সুদীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ সেখানকার অশ্বেতাঙ্গদের বিশেষত ভারতীয়দের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেন। ১৯১৫ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিবর্তনমূলক রাওলাট আইন পাশ ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৩০ সাল থেকে তাঁর আন্দোলন হয় ব্রিটিশবিরোধী 'ভারত ছাড়ো' বা 'Quit India' আন্দোলন। এইসব আন্দোলনের ফলে গান্ধী ভারত ও আফ্রিকায় বারংবার কারাবরণ করেন। মহাত্মা গান্ধীর লক্ষ্য ছিল ভারতের 'স্বরাজ' বা স্বাধীনতা; তাঁর নীতি ছিল 'সত্যাগ্রহ' বা ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যের প্রতি দৃঢ়তা ও কৃচ্ছ্র সাধনের মানসিকতা এবং তাঁর প্রধান রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ছিল 'অসহযোগ-অহিংসা আন্দোলন' (Non-co-operation, non-violence movement)। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে নাথুরাম গডসে নামক জনৈক উগ্রপন্থী হিন্দু মহাত্মা গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করে।

গায়েরে তাশরীয়ী ইসলামি বিশেষজ্ঞগণ হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদেশ-নিষেধসমূহকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—১. তাশরীয়ী ও ২. গায়েরে তাশরীয়ী। তাশরীয়ী হল ধর্ম ও শরিয়ত-সম্পর্কিত আদেশ-নিষেধসমূহ, যা অপরিবর্তনীয় এবং সর্বকালে, সর্বস্থলে সর্বাবস্থায় সমভাবে প্রযোজ্য। আর গায়েরে তাশরীয়ী হল জাগতিক ব্যাপার ও কাজ-কর্ম-সম্পর্কিত আদেশ-নিষেধাদি, যেগুলো স্থানকাল পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য। ইসলাম উপলব্ধি করে যে, মানবসমাজ চিরগতিশীল, চিরপরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে জাগতিক

ব্যাপারটিকে বিন্যস্ত করতে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সা) সদা তৎপর ছিলেন। অবশ্য, কিছুসংখ্যক গোঁড়া মুসলমান গায়েরে তাশরীয়ীকে স্বীকার করেন না এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের স্তর, বিশ্বপরিস্থিতি, জাতীয় পরিস্থিতি ইত্যাদির ধার না ধেরে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের সকল জাগতিক কর্মপদ্ধতিকেই তাঁরা সকল সময়ে হুবহু প্রয়োগ করার পক্ষপাতী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামি মতে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনোকিছুই অপরিবর্তনীয় বা চিরস্থায়ী নয়।

গিল্ড মধ্যযুগের (সামন্ত যুগের) কারিগরদের সংঘগুলোকেই বলা হত গিল্ড (Guild)। সামন্ত যুগে নগরে নগরে হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ীরা সামন্তবাদীদের বাধা ও হামলা থেকে নিজেদের সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এ-সমস্ত সংঘ বা গিল্ড গড়ে তোলে।

গিল্ড সমাজতন্ত্র ১৯০৬ সালে ইংল্যান্ডে এই মতবাদের উদ্ভব হয়। মধ্যযুগীয় গিল্ডব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ও তার ভিত্তিতে সমাজগঠনই এই মতবাদের মূল কথা। এই মতবাদ অনুযায়ী শিল্পপরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ওপর। গিল্ড সমাজতন্ত্রীরা শিল্পকারখানার ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। ১৯১৫ সালে ইংল্যান্ডে এই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে জাতীয় গিল্ড লীগ গঠিত হয়। কিন্তু তা ১৯২৫ সালেই ভেঙে যায়। তবে আজও ইংল্যান্ডে এই মতবাদের অনেক সমর্থক রয়েছে।

গীতা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনকে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-সম্পর্কিত যেসব তত্ত্ব ও উপদেশ প্রদান করেন, সেগুলোর সমন্বয়ই হল গীতা বা ভগবদ্গীতা।,গীতার সারমর্ম হল; ধর্মে উদারতা, কর্মে নিষ্কামতা, জ্ঞানে ব্রহ্মসদ্ভাব ও ভক্তিতে ভগবৎ শরণাগতি। গীতা অনুযায়ী 'ধ্যান' হল ভগবানে চিত্তসংযোগ, 'উপাসনা' হল ভগবৎকর্ম ও স্বধর্ম পালন এবং 'সাধনা' হল ত্যাগের অনুশীলন। সে-সময় দুটি আদর্শ প্রচলিত ছিল, যথা, নিবৃত্তি মার্গ ও প্রবৃত্তি মার্গ। সামাজিক জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে সমস্ত কর্ম প্রত্যাহার ও তত্ত্বজ্ঞান অনুসন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করা হল নিবৃত্তি মার্গ। আর সমাজের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে থেকে কর্ম করে যাওয়াই হল প্রবৃত্তি মার্গ। গীতায় এ-দুয়ের সমন্বয়সাধন করে বলা হয়েছে, কর্মের জন্যই কর্ম এবং সে-কর্ম নিষ্কাম। গীতায় বলা হয়েছে, "তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে কর্ম সম্পাদন করে যাওয়া, ফল লাভ নয়"। নিষ্কাম কর্মের তিনটি লক্ষণ আছে, যথা, সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ। গীতা অনুযায়ী, যার ফলে সর্বভূত এবং স্বীয় আত্মা অভিন্ন বোধ হয় এবং আত্মাকে ভগবানের সত্তায় সত্তাবান বলে বোধ হয়, তাই-ই জ্ঞান। জ্ঞানযোগই হল পরম সত্তাকে লাভ করার একমাত্র পথ। কর্মযোগের সিদ্ধাবস্থায় এই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানলাভের উপায় দুটি, বহিরঙ্গ সাধন ও অন্তরঙ্গ সাধন। প্রথমটি হল গুরুকে প্রণাম, প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা জ্ঞান লাভ করা এবং দ্বিতীয়টি হল শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠতা ও আত্মসংযম। ঈশ্বরকে সাকার বিবেচনা করে যে-উপাসনা, তা সগুণ উপাসনা। আর, ঈশ্বরকে নিরাকার বিবেচনা করে যে উপাসনা তা নির্গুণ উপাসনা। প্রথমটি সাধারণ মানুষের জন্য এবং দ্বিতীয়টি তাঁদের জন্য যাঁরা জ্ঞানমার্গে উপনীত হয়েছেন। আত্মা অবিনশ্বর। সম্যক জ্ঞানের উদয় হলে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন ঘটে।

গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সীমিতকরণ আলোচনা : Strategic Arms Limitation Talks (SALT). তৎকালীন দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে

১৯৬৯ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখ থেকে হেলসিংকি ও ভিয়েনাতে অত্যাধুনিক ও অতি মারাত্মক মারণাস্ত্র সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে যে-ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, সেটাই হল গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সীমিতকরণ আলোচনা বা সল্ট। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন মস্কো সফরে গেলে দুই দেশের মধ্যে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (ICBM) নির্মাণ বন্ধ ও অন্যান্য আক্রমণমূলক অস্ত্রনির্মাণ পাঁচ বছরের জন্য মুলতবি রাখার অঙ্গীকারসম্পন্ন একটি চুক্তি উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি আংশিক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি (Partial Arms Limitation Treaty) নামে পরিচিত। ১৯৭৬ সালের ২৮ মে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পোদগর্নি ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ সীমিতকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

গৃহবন্দি House Arrest বা Intern. সাধারণত রাজনৈতিক বা কূটনৈতিকভাবে দোষী বা বিপজ্জনক বলে বিবেচিত ব্যক্তিকে সাধারণ কারাগারে আটকে রাখার বদলে তাঁর স্বগৃহ বা অপর কোনো নির্দিষ্ট গৃহ থেকে বাইরে এসে চলাফেরা করতে বা বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না দেওয়াকেই বলে গৃহবন্দি করে রাখা।

গৃহযুদ্ধ : Civil War. কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক বা সামরিক শক্তি কিংবা জাতিসত্তার মধ্যেকার সশস্ত্র যুদ্ধই হল গৃহযুদ্ধ। এই যুদ্ধ হতে পারে সরকারের সঙ্গে সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক, সামরিক বা জাতিসত্তাভিত্তিক শক্তির যুদ্ধ; হতে পারে সামরিক শক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তির যুদ্ধ; হতে পারে রাজনৈতিক বা সামরিক কাঠামোর একাংশের সঙ্গে অপরাংশের যুদ্ধ কিংবা মূল জনগণের সঙ্গে কোনো জাতিসত্তাবিশেষের যুদ্ধ। শ্রীলংকা সরকারের সঙ্গে তামিলদের যুদ্ধ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গেটিসবার্গের ভাষণ Gettysburg Address. গেটিসবার্গ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পেনসিলভানিয়ার একটি শহর। জেনারেল লী-এর নেতৃত্বাধীন কনফেডারেট বাহিনী পটোম্যাক অতিক্রম করে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে চাইলে জেনারেল জর্জ সি. মিড বিদ্রোহীদের বাধা দেন এবং তিনদিনব্যাপী (জুলাই ১-৩, ১৮৬৩) গৃহযুদ্ধের পর গেটিসবার্গকে রক্ষা করেন। এই যুদ্ধে মিডের প্রায় ৩০০০ এবং লী'র প্রায় ৪০০০ লোক নিহত হয়। এই বিজয়ের ফলে মার্কিন গৃহযুদ্ধের ফলাফল ফেডারেল সরকারের সম্পূর্ণ পক্ষে এসে যায়। এই বছরেরই নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গেটিসবার্গের সামরিক গোরস্থানের উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন এবং 'স্বাধীনতার নবজন্ম' বিষয়ের ওপর তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি যথার্থ গণতান্ত্রিক সরকারের রূপরেখা তুলে ধরেন এবং ঘোষণা করেন যে, গণতান্ত্রিক সরকার হবে, জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য গঠিত সরকার। তাঁর এই ভাষণ গেটিসবার্গের ভাষণ নামে ইতিহাসখ্যাত।

গেরিলা যুদ্ধ Guerilla Warfare. গেরিলা (Guerilla) কথাটি এসেছে স্প্যানিশ 'Guerra' শব্দ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে এক বিশেষ কায়দার যুদ্ধ। গেরিলা যুদ্ধের মূল কথা হচ্ছে, বৃহৎ ও নিয়মিত শত্রুবাহিনীর ওপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনিয়মিত বাহিনীর মাধ্যমে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে, বৃহত্তর বাহিনীকে হয়রানি, নাজেহাল এবং সম্ভবস্থলে নির্মূল করে দেওয়া। গেরিলা যোদ্ধারা সম্মুখযুদ্ধ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। এরূপ যুদ্ধ সাধারণত

পরিচালিত হয় কোনো স্বৈরাচারী সরকারি শক্তির কিংবা কোনো বিদেশী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং মুক্তিকামী জনগণের সপক্ষে। প্রায়শই, পেশাদার সেনাবাহিনীর বদলে জনগণের সদস্যদের নিয়েই গেরিলাবাহিনী গঠিত হয়। গেরিলা যোদ্ধাদের অনেকে এক ঝাঁক ভীমরুলের সঙ্গে তুলনা করেন, যারা একটি বড় জানোয়ারকেও নাজেহাল ও পর্যুদস্ত করে দিতে পারে। গেরিলা যোদ্ধারা সাধারণত তাদের আশ্রয়, খাদ্য, পানীয় সরবরাহ ইত্যাদির জন্য জনগণের ওপরই নির্ভর করে। এজন্য বলা হয় যে, গেরিলাদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক হল, মাছের সঙ্গে পানির সম্পর্কের মতো। পানি ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, তেমনি জনগণের সমর্থন ছাড়া গেরিলারা টিকে থাকতে পারে না। গেরিলারা তাদের জনসমর্থনপুষ্ট পশ্চাৎভূমি থেকে শত্রুবাহিনীর ওপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাদের সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, পানি ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ কেটে দেয়, যাতায়াতের পথ রুদ্ধ করে, অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয় কিংবা তাদের দৃষ্টিকে ভুল দিকে আকৃষ্ট করে ফাঁদে ফেলে। গেরিলারা সাধারণত এমন সময় এমন দিক থেকে হামলা চালায়, যা শত্রুর কাছে নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। বৃহৎ নিয়মিত বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ বিশেষ ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত।

গেলাপ নির্বাচন গেলাপ নির্বাচন (Gallup Poll) হল ড. গেলাপ নামক জনৈক মার্কিন ব্যক্তি কর্তৃক আবিষ্কৃত জনমত যাচাইয়ের একটি পদ্ধতি। কোনো বিষয়ে জনসাধারণের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বমূলক সদস্যদের প্রশ্ন করে উত্তর সংগ্রহের মাধ্যমে ফলাফল বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই হল এই পদ্ধতির মূল কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার উদ্দেশ্যেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রায়শই এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে বাস্তব ফলাফল-এর খুব একটা গরমিল হয় না।

গেস্টাপো জার্মান Geheime Staatspolizei-এরই সংক্ষিপ্ত রূপ হলে গেস্টাপো (Gestapo)। ১৯৩৩ সালে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসিরা জার্মানির রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে গেস্টাপো নামের এই গুপ্ত পুলিশবাহিনী গঠন করা হয়। এর প্রধান কাজ ছিল নাৎসিবাদের বিরোধীদের খুঁজে বের করে শায়েস্তা করা। গেস্টাপো এজেন্টরা বিভিন্ন নাৎসিবিরোধী প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করে সেগুলোকে ধ্বংস করে দিত। ১৯৪৫ সালে হিটলারের পতন ঘটলে গেস্টাপোবাহিনীও উঠে যায়। কিন্তু আজও কোনো গুপ্ত পুলিশ বাহিনী বা মূল গেস্টাপোদের অনুরূপ কার্যকলাপকে বোঝানোর জন্য গেস্টাপো শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

গোঁড়া : Fanatic বা Dogmatic. যে-ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক নিয়ম বা যুক্তির কোনো ধার না ধেরে কোনো একটি চিন্তা বা বিশ্বাসকে অন্ধভাবে ও একগুঁয়েমির সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকে, তাকেই বলে গোঁড়া। প্রধানত ধর্মের ক্ষেত্রে এরূপ গোঁড়া বা অন্ধবিশ্বাসীদের দেখা যায়, যারা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসের বিরোধী কোনোকিছুই বিবেচনা বা বরদাস্ত করতে রাজি হয় না। অনুরূপভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও গোঁড়াদের অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। এমনকি, বস্তুবাদী বলে কথিত সমাজতন্ত্রীদের মধ্যেও প্রচুর গোঁড়া বা অন্ধবিশ্বাসীর সাক্ষাৎ মেলে, যারা মুখে বিজ্ঞানের কথা বললেও, কার্যত তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের মতোই অনড় ও অপরিবর্তনীয় বলে বিবেচনা করে এবং বিরোধী কোনো যুক্তিই শুনতে বা গ্রহণ করতে রাজি হয় না।

গোঁড়ামিবাদ Dogmatism. বৈজ্ঞানিক যুক্তির ধার না ধেরে কোনো বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাসকেই বলে গোঁড়ামিবাদ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলশ্রুতিতে প্রতিনিয়ত উৎপাদন, উৎপাদন-সম্পর্ক, সামাজিক কাঠামো ও পরিস্থিতি, রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি, এমনকি বিশ্বপরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটে চলেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমস্যার বৈশিষ্ট্য ও সমাধানের রূপরেখাও ভিন্নতর হতে বাধ্য। এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে কার্যত উপেক্ষা করে, পূর্ববর্তী বা ভিন্ন পরিস্থিতির কোনো মতবাদ, চিন্তাধারা বা কৌশলকে আঁকড়ে থাকা এবং স্থানকালের ভিন্নতাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে সেটাকেই প্রয়োগ করতে উদ্যত হওয়াকেই বলে গোঁড়ামিবাদ। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই গোঁড়ামিবাদের দর্শন মেলে। হিটলারের 'আর্য আভিজাত্য'ও ছিল একধরনের গোঁড়ামি। পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে-পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে এশিয়া-আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহে ওই গণতন্ত্র হুবহু কায়েমের চিন্তাকেও অনেকে গোঁড়ামি বলে মনে করেন। অনুরূপভাবে, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও ঝে ডং প্রমুখের বক্তব্যকে ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যের মতো অপরিবর্তনীয় বিবেচনা করে সকল স্থানকালে একইভাবে তা প্রয়োগের প্রবণতাও একধরনের গোঁড়ামি।

গোয়েন্দা সংস্থা Intelligence Service. গোয়েন্দা সংস্থা বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন– গোপন বা আধাগোপন কিংবা অভ্যন্তরীণ কাজে নিয়োজিত বা আন্তর্জাতিক কাজে নিয়োজিত গোয়েন্দা সংস্থা। সোভিয়েত ইউনিয়নের গোয়েন্দা সংস্থা কে.জি.বি. (Committee for state security) গড়ে উঠেছিল লেনিন কর্তৃক গঠিত চেকা (Cheka) নামক গোপন পুলিশের উত্তরসূরি হিসাবে। ১৯৯১ সালে এই মহাশক্তিশালী সংস্থা গর্বাচেভের বিরুদ্ধে ক্যু করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর সংস্থাটি ভেঙে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলে সিআইএ (Central Intelligence Agency)। বিশ্বের অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনারই মূলে রয়েছে এই সিআইএ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা হচ্ছে এফবিআই (Federal Bureau of Investigation)। ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার নাম Service Documentation Exterieure Contre Espionage (SDECE), জার্মান গোয়েন্দা সংস্থার নাম Bundes Nachrishen Dienst (BND), ইজরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার নাম মোসাদ (Mossad), ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার নাম Research and Analytical Wing (RAW) ইত্যাদি।

গোয়েবল্‌স্, জোসেফ (১৮৯৭-১৯৪৫), হিটলারের আদি অনুসারীদের অন্যতম গোয়েবল্‌স্-এর জন্ম হয় রাইনল্যান্ডে। তিনি ১৯২০ সালে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি বার্লিনের অন্যতম নাৎসি নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন এবং ১৯২৯ সালে তাঁর ওপর দলের প্রচারবিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৩০ সালে তিনি রাইখস্ট্যাগের সদস্য হন। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন নাৎসি সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে,আপামর জনতার চরিত্র এমনই যে, একটা মিথ্যা কথাকেও বারংবার বলা হলে, তারা সেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তিনি তাঁর এই ধারণা অনুযায়ী জার্মান প্রচারযন্ত্রকে পরিচালিত

করেন। বার্লিনের পতনের সময় হিটলারের এই বিশ্বস্ত সহচর হিটলারের সঙ্গেই তাঁর বাঙ্কারে ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেন এবং এভাবে শত্রুর হাতে বন্দি হওয়ার গ্লানি থেকে মুক্ত হন। তাঁর কৌশল থেকে এখনও মিথ্যাপ্রচারকে গোয়েবলসীয় প্রচার বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

গোয়েরিং, হারম্যান (১৮৯৩-১৯৪৬), প্রথম মহাযুদ্ধে বিমান বাহিনীর সদস্য হিসাবে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী নাৎসি নেতা। ১৯২৩ সালে মিউনিখ পুশে তিনি আহত হন। ১৯৩৩ সালে হিটলার তাঁকে এয়ার মার্শাল পদে উন্নীত করেন। জার্মান বিমানবাহিনী (Luftwaffe) মূলত তাঁরই সৃষ্টি। ১৯৪০ সালে তাঁর জন্য রাইখ মার্শাল পদ সৃষ্টি করা হয়। তাঁর ব্যক্তিগত দম্ভ ও শেষের দিকের পরাজয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে নাৎসিদের মধ্যেই তাঁর প্রচুর শত্রু সৃষ্টি হয়। ১৯৪৬ সালে নুরেমবার্গের বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়, কিন্তু সে-দণ্ড কার্যকর করার পূর্বেই তিনি আত্মহত্যা করেন।

গোয়ের্নিকা : স্পেনীয় কালজয়ী শিল্পী পাবলো পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩)-র বিশ্ববিখ্যাত ম্যুরাল শিল্পকর্ম। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে নাৎসিবাদী জার্মানরা স্পেনের বাস্ক প্রদেশের গোয়ের্নিকা শহরে ঢুকে পড়ে প্রায় দশ হাজার নিরীহ নগরবাসীকে হত্যা করে এবং বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এই নৃশংসতা ও ভয়াবহতারই শিল্পরূপ হল পিকাসোর 'গোয়ের্নিকা'। এতে ফুটে উঠেছে বর্বরতার অসহায় শিকারদের বিকৃত দেহ ও করুণ আর্তনাদ, মানুষ ও পশুর মিলিত হাহাকার এবং ঠিকরে-পড়া চোখে প্রতিবাদের ঝড়। এই চিত্রটিকে বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে বিবেচনা করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পিকাসোর শিল্পকর্ম বিধৃত হয়েছে প্রায় দেড় হাজার ক্যানভাসে, প্রায় দশ হাজার লিথো প্রিন্টে, বইয়ের জন্য আঁকা প্রায় চৌত্রিশ হাজার ছোট বড় ছবিতে এবং প্রায় তিনশত ভাস্কর্য ও সিরামিকে। সমালোচকদের উদ্দেশ্যে একবার পিকাসো বলেছিলেন, "তোমরা আর যা খুশি বলতে পার, কিন্তু একথা কোনোদিনই বলতে পারবে না যে, পিকাসো কাজ করেনি।"

গোলটেবিল বৈঠক Round Table Conference. এটা হল পরস্পরবিরোধী দল বা শক্তির প্রতিনিধিদের এক টেবিলে বৈঠক, যাতে মুখোমুখি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যায়। সাধারণত সরকার ও সরকার-বিরোধী শক্তিসমূহ কিংবা বিবাদমান বিভিন্ন রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক গ্রুপের মধ্যে এরূপ গোলটেবিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আজকাল যে-কোনো বিতর্কিত বা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্যও গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের চল হয়েছে।

গোল্ড রাশ ১৮৪৮ সালের ২৪ জানুয়ারি জেমস মার্শাল নামক জনৈক ব্যক্তি আকস্মিকভাবে ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বর্ণের সন্ধান লাভ করেন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি ধনী হওয়ার উদ্দেশ্যে দলেদলে লোক নবআবিষ্কৃত স্বর্ণখনিসমূহের দিকে ছুটতে থাকে। স্বর্ণের লোভে দলেদলে মানুষের এই ছোটাকেই বলা হয় গোল্ড রাশ (Gold Rush)। বর্তমান সময়ে, যখন কোনো দেশের মুদ্রামান কমে যেতে থাকে বা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে, তখন সেই দেশের মানুষের মধ্যে স্বর্ণ কিনে সঞ্চয় করে রাখার প্রবল প্রবণতা দেখা দেয়। এই প্রবণতাকেও গোল্ড রাশ বলে অভিহিত করা হয়।

গ্যাট GATT. এটি হল শুল্ক ও বাণিজ্য বিষয়ে সাধারণ চুক্তি বা General Agreement on Tariff and Trade-এরই সংক্ষিপ্ত রূপ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থার প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে জেনিভায় এই চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৪৭ সালে। এটি কার্যকর হয় ১৯৪৮ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে। প্রথমদিকে কিছু সাফল্য অর্জিত হলেও অল্পদিন পরেই, যুক্তরাজ্যের রাজকীয় সুবিধা পরিহারের ব্যাপারে অনীহা, মার্কিন শুল্কপ্রতিবন্ধকতা, নিম্নহারের শুল্ক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশসমূহের দরকষাকষির তুলনামূলক অক্ষমতা ইত্যাদির দরুন সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে নীতিগত বৈষম্য দেখা দেয় এবং দুর্বলতর রাষ্ট্রসমূহের লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। যাই হোক, ১৯৫৫ সালের দিকে সংস্থাকে জোরদার করার প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং বাণিজ্য সহযোগিতা সংস্থা গঠন করা হয়। তা ছাড়া, এই চুক্তির মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়, যাতে অন্য কোনো উপায়ে শুল্ক রেয়াতের সুবিধা বানচাল হয়ে না যায়। প্রসঙ্গত আমদানি ও রফতানির ভারসাম্যসংক্রান্ত বিধি-নিষেধ, অভ্যন্তরীণ ট্যাক্স, কাস্টমস্ প্রশাসন, পারস্পরিক আলোচনা, মতদ্বৈততা নিরসনের উদ্যোগ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্যাট-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যের পরিমাণ বিশ্বের মোট বাণিজ্যের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ।

গ্রামসি, অ্যানটোনিও : Antonio Gramsci (১৮৯১-১৯৩৭)। ১৯২১ সালে তিনি ইতালিয় সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে আলাদা হয়ে ইতালিয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্যাসিবাদী আমলে গ্রামসি দীর্ঘ কারাভোগ করেন এবং কারাগারেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর প্রধান গ্রন্থ জেলখানার নোটবই (Prison Notebooks)-ই ছিল কার্যত ইউরো-কমিউনিজমের ভিত্তি ও প্রেরণার উৎস। গ্রামসি ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে অভ্রান্ত মনে করতেন, কিন্তু তিনি সহিংস সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্বপরিহার করেন। সর্বহারা বিপ্লবের স্থলে তিনি ঐতিহাসিক আপোস (Historical Compromise)-এর তত্ত্ব উপস্থাপন করে বলেন যে, সর্বহারা শ্রেণীর মিত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে, এমনকি যেসব বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সমাজের ওপর বীতশ্রদ্ধ তাদেরকেও পক্ষে নিয়ে এসে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব। তিনি নির্বাচন ও ক্ষমতাসীন অন্যান্য সরকারের সংঙ্গে কোয়ালিশনকেও সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ বলে বিবেচনা করতেন। গ্রামসি কাঠামোর সঙ্গে উপরি কাঠামো ও সর্বহারার সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, সমাজবিকাশে আদর্শের ভূমিকা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, সৌন্দর্যতত্ত্ব (Aesthetics), সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান অবদান রাখেন। ১৯২৮ সালে ফ্যাসিবাদী আদালত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে গ্রামসিকে ২০ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে।

গ্রুপ-৭৭ : এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমরিকার অনুন্নত দেশসমূহের একটি অর্থনৈতিক জোট। যদিও নাম গ্রুপ—৭৭, আসলে এর বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১২৭। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষাই এই জোটের মৌল উদ্দেশ্য। জোটের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর একটি মহাদেশ থেকে একজন জোটের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

গ্রেট ট্রেক : (১৮৩৬-৩৭) ব্রিটিশরাজের কর্তৃত্বমুক্ত স্বাধীন এলাকা গঠনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় দশ হাজার বুয়র (ওলন্দাজ বংশোদ্ভব শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দা) কেপ

কলোনি ত্যাগ করে উত্তর দিকে চলে যায়। বুয়রদের অভিযোগ ছিল এই যে, তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতি নির্মমতার যে-অভিযোগ আনা হয়েছিল, তা অন্যায় এবং ১৮৩৪ সালে দাসপ্রথা রহিত করে যে-ক্ষতিপূরণ তদের দেওয়া হয়েছিল, তা অপর্যাপ্ত। তাদের আরও অভিযোগ ছিল এই যে, ব্রিটিশ সরকার কাফির (কাফ্রি)দের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বুয়রদের যথেষ্ট সহায়তা দিচ্ছে না। কিছুসংখ্যক বুয়র অরেঞ্জ নদীর উত্তরে বসতি স্থাপন করে, দ্বিতীয় অংশ ভাল্ নদীর অপর তীরে চলে যায়, এক্ আঁদ্রিয়াস্ প্রিটোরিয়াস-এর নেতৃত্বে তৃতীয় দলটি নাটালে গিয়ে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৪৩ সালে ব্রিটিশরা নাটাল দখল করলে তারা অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে চলে যায়। কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে ব্রিটিশরা তাদের সেখান থেকেও তাড়িয়ে ভাল্ নদী পার করে দেয়। ১৮৫২ সালে স্যান্ড রিভার কনভেনশন্-এর শর্তানুযায়ী তারা ট্রান্সভালে চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি লাভ করে। নেতার নামানুসারে এদেশের রাজধানীর নাম হয় প্রিটোরিয়া। গ্রেট ট্রেক (Great Trek)-এর সময় বুয়রদের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট পল ক্রুগার ১১ বছরের বালক ছিলেন।

গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড Great Leap Forward, অর্থাৎ সম্মুখপানে বিরাট উল্লম্ফন। ১৯৫৮ সালে মাও ঝে ডং চীনের শিল্প ও কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সাম্যবাদের পথে দ্রুত অগ্রগতির লক্ষ্যে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচি অনুযায়ী ক. খনিজ সম্পদসহ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, খ. হালকা শিল্পসহ সর্বপ্রকার শিল্পায়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, গ.কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদিসহ বৃহদায়তন কমিউনসমূহ গঠন করা হয়, ঘ. বিবিধ নির্মাণকার্য ও আন্তঃকাঠামোগত বিকাশের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, ঙ. বিপুল কর্মসংস্থানের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়, চ. অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে জনগণকে কৃচ্ছ্রতাসাধনের জন্য আহ্বান জানানো হয় এবং ছ. পার্টি ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন চিন্তা ও মতবাদের দ্বন্দ্ব পার্টিকে দুর্বল ও অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারে বিধায় এককেন্দ্রিকতার ওপর সর্বাত্মক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই কর্মসূচির প্রবক্তারা বিশ্বাস করেন যে, প্রযুক্তি নয়, বরং মানবসম্পদই যে-কোনো উন্নয়নের মূলকথা এবং সংগঠিত মানুষের দৃঢ় ইচ্ছা যে-কোনো বাধাকে অতিক্রম করতে সক্ষম। কিন্তু এই কর্মসূচি আশানুরূপ সুফল বয়ে না আনায় পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়।

গ্রেশামের তত্ত্ব অর্থনীতিবিদ স্যার টমাস গ্রেশাম (Sir Thomas Gresham) কর্তৃক প্রণীত এই তত্ত্বের মূলকথা হল নিকৃষ্ট মুদ্রা বাজার থেকে উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বিতাড়িত করে (Bad money drives away good money)। একই সময়ে বাজারে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুদ্রা চালু থাকলে, উৎকৃষ্ট মুদ্রা বিদেশে রফতানি বা পাচার হয়ে যেতে থাকে এবং লোকে তা সঞ্চয় করে রাখতে থাকে বিধায়, বাজারে বস্তুত নিকৃষ্ট মুদ্রাটিই চালু থাকে।

গ্লাসনস্ট : Glasnost বা খোলানীতি (Openness)। সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচভ এই নীতির প্রবর্তক। ১৯১৭ সালে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কার্যত কমিউনিস্ট ব্যবস্থার বা পার্টি ও রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন নেতাদের কাজের বিরোধিতা বা সমালোচনার কোনো অবকাশই থাকে না। কিন্তু গোর্বাচভ ক্ষমতায় এসেই অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় উভয় ক্ষেত্রেই নাটকীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে ঘোষণা করেন যে,

অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ নির্ভয়ে খোলাখুলিভাবে তাঁদের মতামতাদি প্রকাশ করতে পারবেন, পারবেন পার্টি ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের কর্মকাণ্ডেরও সমালোচনা করতে। গোর্বাচভ নিজেই তাঁর এই নীতিকে গ্লাসনষ্ট বলে অভিহিত করেন এবং এই নীতি অনুসরণ করার জন্য পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট দেশসমূহের প্রতিও আহ্বান জানান। অনেকটা এই গ্লাসনস্টের পরিণতিতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায় এবং সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটে।

॥ ঘ ॥

ঘেরাও শ্রমিকবৃন্দ, জনগণের কোনো অংশ বা কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের দ্বারা কোনো কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের দফতর ঘেরাও করে রাখা, যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মকর্তারা প্রবেশ করতে বা বেরুতে না পারেন। বর্তমানে ঘেরাও একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসাবে স্বীকৃত। ঘেরাও শব্দটি বাংলা হলেও বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত। পশ্চিম বাংলা ও ভারতে এর নাম ধরনা। ঘেরাও, অবস্থান ধর্মঘটের মতোই দাবি-আদায়ের একটি অহিংসাত্মক পন্থা।

॥ চ ॥

চতুরাশ্রম চতুরাশ্রম বা জীবনের চার পর্যায় হিন্দু ধর্মের তিন উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। চতুরাশ্রম বা চার আশ্রম হল; ১. ব্রহ্মচর্য, অর্থাৎ জীবনের প্রথম দিক; এ-সময়ে আর্য শিশু ও তরুণরা গুরুগৃহে অতিবাহিত করত এবং গুরুসেবা ও বিদ্যার্জন করত; ২. গার্হস্থ্য; জীবনের এই পর্যায়ে আর্য তরুণ ও যুবকরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হত এবং সংসার ধর্ম পালন করত; ৩. বাণপ্রস্থ; এই পর্যায়ে আর্যরা সংসারজীবন থেকে অবসর নিয়ে বনে চলে যেত এবং ধর্মীয় চিন্তায় রত হত এবং ৪. যতি বা সন্ন্যাস; এই পর্যায়ে আর্যরা সংসারের সকল মায়াবন্ধন ছিন্ন করে আমৃত্যু পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন থাকত।

চতুর্থ বিশ্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার যে-সমস্ত দেশের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত নিম্ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষত মূল্যবান সম্পদের দিক থেকে যেসব দেশ খুবই দরিদ্র, সে-সমস্ত দেশকেই সাধারণভাবে চতুর্থ বিশ্ব বলে অভিহিত করা হয়। চতুর্থ বিশ্বের দেশসমূহ বর্তমানেও চরম দরিদ্র এবং অদূর ভবিষ্যতেও তাদের দারিদ্র্যমুক্তির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

চতুর্বেদ 'বেদ' আর্যদের ধর্মগ্রন্থ এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহের অন্যতম। 'বেদ' শব্দের মূল অর্থ জ্ঞান। বেদ আর্যদের জীবন ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদ কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়; বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মুনিঋষি বেদ রচনা করেন। এর একাংশের নাম শ্রুতি; কেননা দীর্ঘদিন যাবৎ এটি বংশবংশানুক্রমে শ্রুতি বা শোনার মাধ্যমে পরবর্তীদের হাতে এসে পৌছেছে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে বেদ 'নিত্য' অর্থাৎ কালাতীত এবং 'আপৌরুষেয়' অর্থাৎ কোনো মানুষ কর্তৃক নয় বরং স্বয়ং

ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। আর্যদের ধর্ম, সমাজ, দর্শন, আচার-বিধি সবই ছিল বেদভিত্তিক। বেদ চারটি ঋক,যজু, সাম ও অথর্ব। প্রত্যেকটি বেদ আবার চার ভাগে বিভক্ত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা পদ্যে এবং ব্রাহ্মণ প্রধানত গদ্যে রচিত। সংহিতায় রয়েছে দেবদেবীদের স্তুতিগান, ব্রাহ্মণ অংশে যাগযজ্ঞের বিধি, আরণ্যক অংশে অরণ্যচারী সন্ন্যাসীদের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় উপদেশ এবং উপনিষদ অংশে ব্রহ্মের ওপর সুগভীর ধর্মীয় তত্ত্ব। ঋগ্বেদ সর্বপ্রাচীন, এতে ১০১৮টি ঋক বা স্তোত্র রয়েছে। এতে ঊষা, অগ্নি, ইন্দ্র, আকাশ, সূর্য প্রভৃতি দেবদেবীর স্তুতি এবং সুখলাভ ও শত্রুবিনাশের প্রার্থনাদিও সন্নিবেশিত আছে। সর্বশেষ বেদ অথর্ব। এতে অন্যান্য দিক ছাড়াও মারণ, বশীকরণ, উচাটন প্রভৃতি মন্ত্র রয়েছে।

চরমপত্র Ultimatum. সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট দাবি মেনে নেওয়ার জন্য চূড়ান্ত আহ্বান জানিয়ে এবং ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দাবি মানা না হলে চরম ব্যবস্থা (যেমন, ধর্মঘট, হরতাল, অসহযোগ, বিদ্রোহ বা যুদ্ধ) গ্রহণের হুমকি দিয়ে যে-পত্র প্রদান করা হয়, তাকেই বলে চরমপত্র। এক রাষ্ট্রও অপর রাষ্ট্রের কাছে চরমপত্র দিতে পারে।

চরিত্র : কোনো ব্যক্তির মন-মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার-আচরণের সামগ্রিক রূপই হচ্ছে তার চরিত্র। এতদিন মনে করা হত যে, কোনো ব্যক্তির চরিত্র কী হবে, তা সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করে তার সামাজিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতার ওপর। কিন্তু জিনতত্ত্ব (Genetics) ইত্যাদির বিকাশের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ মূলত তার জিনের মধ্যেই সূত্রবদ্ধ (Codified) থাকে। পারিপার্শ্বিকতা মূল চরিত্রকে ভোঁতা বা শাণিত করে; সুপ্ত রাখে অথবা প্রকাশ করে মাত্র। জিনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিকতা যদি পরস্পরবিরোধী হয়, তা হলে যেটার প্রভাব বেশি সেটারই অধিকতর প্রতিফলন ঘটে এবং ব্যক্তির মধ্যে সংশ্লিষ্ট মাত্রায় স্ববিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে, এই দুয়ের সমন্বয় ঘটলে, ব্যক্তির প্রকৃত চরিত্রের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। এই কারণেই দেখা যায় যে, একই উৎসসম্পন্ন ব্যক্তিরাও বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন চরিত্রের হয়ে পড়েছে। আবার এটাও দেখা যায় যে, জন্ম থেকে একই পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও জিনগত পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণে ভিন্নতা থেকে গেছে। ব্যক্তির মতো, সমাজেরও চরিত্র থাকে। সংশ্লিষ্ট সমাজের ব্যক্তিবর্গের চরিত্রের গড় রূপই হল সেই সমাজের চরিত্র। আবার একই সমাজের মধ্যেও এর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন রকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে।

চরিত্রহনন Character Assassination. স্বীয় ও স্বদলীয় বা নিজ সরকারের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিপক্ষীয় কোনো ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তিকে বা কোনো সংগঠনকে জনগণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করাকেই বলে চরিত্রহনন। চরিত্রহননের ক্ষেত্রে প্রায়শই এমনসব অভিযোগ ও কলঙ্ক উত্থাপন করা হয়, যেগুলো আদপেই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। একই স্বার্থে বিভিন্ন লোভ-লালসা বা কৌশলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের চরিত্র নষ্ট করে দেওয়াকেও চরিত্র হনন বলে।

চার কুচক্রী : মাও ঝে ডং-এর মৃত্যুর পর, চীনের নতুন নেতৃত্ব মাওয়ের আমলের সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বাড়াবাড়িমূলক, পশ্চাৎমুখী ও গোষ্ঠীস্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ারস্বরূপ বলে

চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব-এর ফলে জননিরাপত্তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়, অর্থনৈতিক বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যায় এবং চীন কার্যত আন্তর্জাতিক বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নয়া নেতৃত্ব আরও মনে করেন যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে এই চক্রান্তের মূল হোতা ছিলেন চারজন, যথা, ১. মাও ঝে ডং-এর পত্নী ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান নেত্রী ম্যাডাম জিয়াং জিং, ২. সাবেক শ্রমিকনেতা ও পলিট ব্যুরোর অন্যতম প্রভাবশালী তরুণ সদস্য ওয়াং হুং ওয়েন, ৩. চীনা কমিউনিস্ট প্যার্টির সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল জ্যাং ঝুন জিয়াও এবং ৪. পার্টির বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ইয়াও ওয়েন য়ুয়ান। এই চার ব্যক্তি 'চার কুচক্রী' বলে চিহ্নিত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সাংস্কৃতিক বিপ্লব-বিরোধীরা আরও মনে করেন যে, এই 'চার কুচক্রী'ই মাওকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিলেন।

চার স্বাধীনতা চার স্বাধীনতা হল ১. বক্তব্যের স্বাধীনতা, ২. ধর্মের স্বাধীনতা, ৩. দারিদ্র্য থেকে স্বাধীনতা অর্থাৎ দারিদ্র্যমুক্তি এবং ৪. ভয় থেকে স্বাধীনতা।

চার্চিল, উইনস্টন Winston Churchill. জন্ম ৩০ নভেম্বর, ১৮৭৪। মার্লবরোর সপ্তম ডিউক ও মার্কিন মাতার ঘরে জন্মগ্রহণকারী চার্চিল হ্যারো ও স্যান্ডহার্স্টে শিক্ষালাভের পর ১৮৯৫ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং কিউবা, মালাকান্দ ও তিরাহ-য় কাজ করেন। ১৮৯৯ সালে তিনি রক্ষণশীল দল থেকে পার্লামেন্টে আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৮৮৯-৯০ সাল যাবৎ তিনি ছিলেন 'মর্নিং পোস্ট' পত্রিকার দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ যুদ্ধপ্রতিনিধি। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দফতরের আন্ডার-সেক্রেটারি, পার্লামেন্ট-সদস্য, বাণিজ্য বোর্ডের সভাপতি, নৌবাহিনীর ফার্স্ট লর্ড, লেফটেন্যান্ট কর্নেল, সমর মন্ত্রী (প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের মন্ত্রিসভায়), চ্যান্সেলর অব দি এক্সচেকার (প্রধানমন্ত্রী বল্ডউইনের মন্ত্রিসভায়) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের প্রবল বিরোধিতা করেন। জার্মানিতে নাৎসিবাদের উদ্ভব ঘটলে তিনি ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর, বিশেষত বিমানবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির সপক্ষে সোচ্চার হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে, তিনি প্রথমে নৌবাহিনীর ফার্স্ট লর্ড (দ্বিতীয় দফায়), এবং পরে (১৯৪০-৪৫) কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বস্তুত তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয় ও মিত্রশক্তির জয়লাভের অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হয়। ১৯৪৫ সালে তাঁর রক্ষণশীল দল নির্বাচনে পরাজিত হলে তিনি বিরোধীদলীয় নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অতঃপর, ১৯৫১-৫২ সালে তিনি ব্রিটেনের সমরমন্ত্রী এবং এর পর থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ব্রিটিশ কলোনিসমূহের স্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। একবার তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি কোনোক্রমেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পৌরহিত্য করতে পারেন না। ১৯৬৫ সালে চার্চিল মারা যান।

চার্টার ফর এ ফ্রি প্রেস : Charter for a free Press. ১৯৯৮ সালের ১৬ অক্টোবর জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান ও ওয়ার্লড প্রেস ফ্রিডম কমিটির চেয়ারম্যান জেমস এইচ. অটাওয়ে জুনিয়র এই সনদে স্বাক্ষর করেন। মুক্ত-সংবাদপত্র সম্পর্কিত এই সনদে বলা হয় ১. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো সেন্সরশিপই গ্রহণযোগ্য নয় কোনো সাংবাদিক বা সংবাদ সংস্থা যে কোনো খবর সংগ্রহ ও ছাপাতে চাইলে

সেটাকে কোনো সরকার বা অন্য কেউ কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না; ২. প্রত্যেক দেশকেই ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টেড মিডিয়া প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে হবে ; ৩. কোনো সরকার সরকারি ও বেসরকারি মিডিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক বা অন্য কোনোরূপ বৈষম্য করতে পারবে না ৪. সংবাদপত্র বা ব্রডকাস্টিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণপ্রাপ্তির ব্যাপারে কোনো সরকার কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না; ৫. সংবাদপ্রবাহকে যা-কিছুই বাধাগ্রস্ত করে তা-ই নিন্দনীয় বলে গণ্য হবে, ৬. সরকারি মিডিয়ারও সম্পাদকীয় স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে হবে ; ৭. প্রত্যেক সংবাদপত্র ও সংস্থারই দেশের বাইরে থেকে সংবাদ সংগ্রহের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে ; ৮. সাংবাদিকদের জন্য সকল দেশের সকল সীমান্ত উন্মুক্ত রাখতে হবে ; ৯. সাংবাদিকতার ব্যাপারে সকল বিধিনিষেধ বাতিল করতে হবে এবং ১০. সাংবাদিকদের পূর্ণ আইনগত নিরাপত্তা দিতে হবে যুদ্ধ-এলাকায় কর্মরত সাংবাদিকদের সিভিলিয়নদের সমকক্ষ সকল অধিকার দিতে হবে।

চাহিদা Demand. মানুষের অন্তরের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন নয়; বরং একটা নির্ধারিত মূল্যে কোনো ব্যক্তি বা সমাজ কর্তৃক যে-পরিমাণ পণ্য বাস্তবিকই ক্রয় করা হয়ে থাকে, অর্থনীতির ভাষায় সেটাই হল ওই পণ্যের ব্যক্তিগত বা সামাজিক চাহিদা।

চিয়াং কাইশেক জন্ম ৩১ অক্টোবর, ১৮৮৬। চীনের এই জাতীয়তাবাদী নেতা, কুয়োমিনতাং-এর প্রতিষ্ঠাতা সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ১৯১১ সালের বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন, সান ইয়াৎ সেনের শ্যালিকাকে বিয়ে করেন এবং কুয়োমিনতাং বাহিনীর চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সালে তিনি মস্কো থেকে রুশ সামরিক পদ্ধতি শিখে এসে তা চীনা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন এবং ১৯২৮ সালে সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যু হলে চীনের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যদিও তিনি কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তবু জাপানি আক্রমণের সময় কমিউনিস্টরা তাঁর নেতৃত্বে জাপানি হানাদারদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করে। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্টদের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটলে, তিনি চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে পালিয়ে ফরমোজা চলে আসেন এবং সরকার গঠন করেন। সত্তরের দশক পর্যন্ত জাতিসংঘ তাঁর নেতৃত্বাধীন এলাকাকেই চীন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে আসে। তিনি আমৃত্যু ফরমোজার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারত উপমহাদেশে, বিশেষত বৃহত্তর বাংলাদেশ অঞ্চলে 'কৌম' সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বিধায়, এখানে বনেদি বা Classical অর্থে কোনো সামন্তপ্রভু বা জমিদারের অস্তিত্ব ছিল না। অথচ, সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ বজায় রাখার জন্য একদল বশংবদ জমিদার বা সামন্তপ্রভুর অস্তিত্ব ছিল অপরিহার্য। ১৭৬৪ সালে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা ও বিহারের দেওয়ানি লাভ করে এবং বর্ধিত কর আদায়ের জন্য 'সুপারভাইজার' নিয়োগ করে। ওয়ারেন হেস্টিংস সুপারভাইজারদের স্থলে 'কালেক্টর'দের নিয়োগ করেন। বর্ধিত কর কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ইংরেজরা প্রথমে কিছু খয়ের খাঁ ব্যক্তিদের নিকট পাঁচশালা ভিত্তিতে জমি বন্দোবস্তি দেয় এবং জমিকে ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীতে পরিণত করে। কিন্তু, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে কর আদায় আশানুরূপ না হওয়াতে ১৭৯০ সালে পাঁচসালার পরিবর্তে দশসালা বন্দোবস্তি প্রদান করা হয়। অতঃপর, ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তের মাধ্যমে এদেশের জনগণের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেন একদল ইংরেজসৃষ্ট, ইংরেজেরই বশংবদ এবং ইংরেজেরই তল্পিবাহক জমিদার শ্রেণী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ছিল ১. একটি বশংবদ পদলেহী শ্রেণী সৃষ্টি, এবং ২. অধিক পরিমাণ কর আদায়। বলাবাহুল্য, ইংরেজদের এই দুই উদ্দেশ্যই সফল হয়েছিল। এই জমিদারেরা দেড়শো বছরেরও বেশি সময় যাবৎ ইংরেজদের শাসন-শোষণের অন্যতম ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল। ১৯৩৫ সালে, যখন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে, তখনও জমিদারসংঘের সভাপতি, ময়মনসিংহের মহারাজা ঘোষণা করেছিলেন, "আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই ইংরেজদের শক্তিশালী করা অবশ্যকর্তব্য"। বলাবাহুল্য, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদারদের চরিত্র ইউরোপের বনেদি সামন্ত প্রভুদের অনুরূপ ছিল না; এদের চরিত্রের প্রধান দিক ছিল, এদের স্রষ্টা ও রক্ষক উপনিবেশবাদী ইংরেজদের দালালি ও আনুগত্য।

চিরস্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্ব এই তত্ত্বের প্রবক্তা লিঁও ট্রটস্কি। চিরস্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্ব (Theory of Permanent Revolution)-র মূলকথা হল এই যে, উন্নত ইউরোপীয় দেশসমূহে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত না হলে, শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখা যাবে না। ট্রটস্কি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাদি প্রবর্তিত হলে বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী ও গ্রামীণ জনগণের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থায়, ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ সহায়তার হস্ত প্রসারিত না করলে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী এই দ্বন্দ্বে পরাজিত হতে বাধ্য। তিনি আরও মনে করতেন যে, রুশ বিপ্লব যেমন অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহের বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবে, তেমনি ইউরোপীয় দেশসমূহের সফল বিপ্লবও রুশ বিপ্লবের স্থায়িত্বের কারক হবে। তাঁর মতে, বিপ্লবকে স্থায়ী করার জন্য গ্রামীণ জনগণের ওপর শহুরে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। বলাবাহুল্য, ট্রটস্কির এ-তত্ত্ব স্ট্যালিন গ্রহণ করেননি। মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে ট্রটস্কি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন এবং দেশ ছাড়তে বাধ্য হন।

চু তে, মার্শাল ১৮৮৬ সালে চীনের এক ভূস্বামী পরিবারে তাঁর জন্ম। ইউনান সামরিক অ্যাকাডেমি থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি মাঞ্চু বংশের বিরুদ্ধে পরিচালিত ১৯১১ সালের বিপ্লবে অংশ নেন। ১৯২২ সালে বার্লিনে অবস্থানকালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯২৭ সালে কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক ভেঙে গেলে তিনি নানচিং বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন এবং মাও ঝে ডং-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে লাল ফৌজ গঠন করেন। কিয়াংসি থেকে ইয়েনান পর্যন্ত দীর্ঘ লংমার্চেও তিনি অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন। কুয়োমিনতাং-এর পতন ঘটানোর ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল মুখ্য। তিনি আমৃত্যু কমিউনিস্ট চীনের শীর্ষতম নেতাদের একজন ছিলেন। তিনি গণচীনের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, জাতীয় গণকংগ্রেস (পার্লামেন্ট)-এর স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

চে গুয়েভারা, আর্নেস্টো (১৯২৮-৬৭), জন্ম আর্জেন্টিনায়। ১৯৫৩ সালে বুয়েন্স্ আইরেস মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন এবং চিলির বামপন্থি কবি পাবলো নেরুদার দ্বারা প্রভাবিত হন। কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রো যখন মেক্সিকোয় বিপ্লবী দল গঠনে ব্যস্ত, তখন তাঁর সঙ্গে চে'র পরিচয় ঘটে এবং তিনি কিউবার বিপ্লবের সঙ্গে

জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫৯ সালের পয়লা জানুয়ারি বাতিস্তাকে পরাজিত করে কিউবায় বিপ্লবী সরকার গঠিত হলে চে কিউবার শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অর্থনীতির, বিশেষত কৃষির সমাজতান্ত্রিকীকরণে অসামান্য অবদান রাখেন। কিন্তু তাঁর রক্তে ছিল সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকাকে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন। তাই তিনি কিউবার মন্ত্রিত্ব ছেড়ে পুনরায় কার্বাইন হাতে তুলে নেন এবং ল্যাটিন আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে এসে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন। হাঁপানি ও শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে তিনি যখন ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবকে এগিয়ে নিতে ব্যস্ত, তখনই (১৯৬৭ সালে) বলিভিয়ার জঙ্গলে সরকারি বাহিনীর হাতে তিনি নিহত হন। শিগ্‌গিরই চে বিশ্বের তাবৎ বিপ্লবী তরুণসমাজের কাছে এক রূপকথার পুরুষে পরিণত হন। তাঁর রচিত 'গেরিলা যুদ্ধ' (Guerilla Warfare) শীর্ষক পুস্তক বিশ্বব্যাপী বহুলপঠিত। সম্প্রতি তাঁর দেহাবশেষ বলিভিয়া থেকে কিউবায় নিয়ে আসা হয়েছে।

চেন তু সিউ ১৯১৯ সালের ৪ মে আন্দোলনের সময় চেন তু সিউ একজন বিপ্লবী গণতন্ত্রী হিসাবে পরিচিত হন এবং রুশ অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করেন। ছয় বছর যাবৎ তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান নেতা ছিলেন। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের সময় তাঁর ভূমিকা ডান বিচ্যুতিপূর্ণ ও আপোসবাদী বলে চিহ্নিত হয়। এর ফলে, পার্টি আপামর কৃষিজীবী, শহুরে পেটি বুর্জোয়া ও সৈন্যদের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয় এবং পরিণামে বিপ্লবের সাময়িক পরাজয় ঘটে। এই পরাজয়ের ফলশ্রুতিতে চেন তু সিউ ও তাঁর অনুসারীরা বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন এবং বিলোপবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁরা পার্টির মধ্যে ট্রটস্কিবাদী চক্রের জন্ম দেন। ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪২ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সমিতি। এরূপ চেম্বার বা সমিতির উদ্দেশ্য হল, এর সদস্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে দেন-দরবার, সুপারিশ, যোগাযোগ, প্রতিনিধি প্রেরণ, প্রতিবাদ জ্ঞাপন ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা এবং সদস্যদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা।

চোলিমা আন্দোলন ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী কোরিয়ার যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়, ৭৮টি শহর প্রায় পুরোপুরি ধূলিস্মাৎ হয় এবং অর্থনীতি দারুণভাবে ভেঙে পড়ে। এই ধ্বংসাবশেষের ওপর দাঁড়িয়েই প্রেসিডেন্ট কিম ইল স্যুং-এর নেতৃত্বে উত্তর কোরিয়ার জনগণ শুরু করে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ। ১৯৫৬ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার মাধ্যমে অনুধাবন করে যে, প্রয়োজনের তুলনায় তৎকালীন অগ্রগতির হার সন্তোষজনক নয়। এই পটভূমিতে কিম ইল স্যুং জাতির প্রতি আহ্বান জানান, "সর্বাধিক কৃচ্ছ্রতার মাধ্যমে সর্বাধিক উৎপাদন" সুনিশ্চিত করার জন্য। তিনি ক্যাংসন স্টীল ওয়ার্কসে গিয়ে শ্রমিকদের নিকট জাতীয় প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন। যদিও মনে করা হত যে,এই কারখানার পক্ষে কোনোক্রমেই বার্ষিক ৬০ হাজার টনের বেশি ইস্পাতের বিলেট উৎপাদন করা সম্ভব নয়, তবু উদ্বুদ্ধ শ্রমিকরা ৯০ হাজার টন বিলেট উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বৎসরান্তে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখা যায় যে, উৎপাদন ১২০ হাজার টনে গিয়ে পৌঁছেছে। অনুরূপভাবে, কিম চায়েক আয়রন ওয়ার্কসসহ অন্যান্য শিল্পের

শ্রমিকরাও লক্ষ্যমাত্রার চাইতে অনেক বেশি উৎপাদন করতে সমর্থ হয়। কৃষিতেও উৎপাদন আশাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায়। উৎপাদনের এই গতিময় আন্দোলনের নামই হল চোলিমা আন্দোলন। শব্দগতভাবে, 'চোলিমা' হল কোরীয় রূপকথার এক অতিশয় গতিসম্পন্ন অশ্ববিশেষ, যে একদিনে এক হাজার রী দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম। বস্তুত চোলিমা আন্দোলনের ফলেই যুদ্ধবিধ্বস্ত উত্তর কোরিয়া অল্প সময়ের মধ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়।

চৌঠা মে আন্দোলন ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী এই আন্দোলনের সূচনা ঘটে। এই বছরের শুরুতে প্রথম মহাযুদ্ধের বিজয়ীরা (অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইতালি ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি) প্যারিসে মিলিত হয়, যুদ্ধে বিজিত অঞ্চলসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করার উদ্দেশ্যে। এতে সিদ্ধান্ত হয় যে, চীনের শানটুং অঞ্চল, যা আগে জার্মানির প্রভাবাধীন ছিল, তা এখন জাপানের এক্তিয়ারে যাবে। বেজিং (তৎকালীন পিকিং)-এর ছাত্রেরা ৪ মে তারিখে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার প্রায় ৩০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করলে বেজিংসহ চীনের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ৩ থেকে ৫ জুনের মধ্যে প্রায় দুহাজার ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে সাংহাইসহ বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকরাও ধর্মঘট শুরু করে এবং ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে দেয়। বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সূচিত এই আন্দোলনে শিগ্‌গিরই ব্যাপক সর্বহারা, পেটি বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াদের সমন্বয় ঘটে এবং আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী দুর্বার রূপ পরিগ্রহ করে।

॥ ছ ॥

ছয় দফা আন্দোলন ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বর্তমান বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক শাসক-শোষকগোষ্ঠী চাপিয়ে দিয়েছিল ঔপনিবেশিক কায়দার শাসন-শোষণ ও নিপীড়ন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং শোষণ ও নিপীড়ণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ১৯৬৫ সালে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষাহীন পূর্ব পাকিস্তানের চরম অসহায় অবস্থার পটভূমিতে, ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের জন্য ৬-দফা আর্থ-প্রশাসনিক কাঠামোসংবলিত প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়। এই ৬-দফার ভিত্তিতেই ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং এর ফলশ্রুতিতেই পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক অচলাবস্থা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটে। এই ৬-দফা ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ ১. লাহোর প্রস্তাব মোতাবেক পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র; প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিবাচিত একটি পার্লামেন্টই হবে ক্ষমতার মৌল ভিত্তি, ২. শুধুমাত্র পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা ফেডারেল বিষয় বলে গণ্য হবে; অন্যান্য সকল বিষয় রাজ্য (প্রদেশ)-র এক্তিয়ারে থাকবে, ৩. হয় দু-অঞ্চলের মধ্যে সহজে বিনিময়যোগ্য দুটি মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, নতুবা দুই অঞ্চলে দুটি আলাদা রিজার্ভ ব্যাংক-এর অধীনে একই

মুদ্রাব্যবস্থা চালু থাকবে, ৪. সকল প্রকার কর, ট্যাক্স, খাজনাদি নির্ধারণ ও সংগ্রহ করবে প্রদেশ, তবে ফেডারেল কার্যাদি পরিচালনার জন্য ফেডারেল সরকার এর একটি অংশ পাবে, ৫. প্রত্যেক প্রদেশ কর্তৃক অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সংশ্লিষ্ট প্রদেশের এক্তিয়ারে থাকবে, তবে ফেডারেল সরকারের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে উভয় প্রদেশ চাঁদা প্রদান করবে; এ ছাড়া প্রত্যেক প্রদেশের বিদেশে বাণিজ্য মিশন প্রেরণ ও আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদনের পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং ৬. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা মিলিশিয়া ও প্যারামিলিটারিসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে।

ছাত্র আন্দোলন : পৃথিবীর দেশে দেশে, বিশেষত অনুন্নত বিশ্বের দেশসমূহে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী, আগ্রাসনবিরোধী, ফ্যাসিবাদবিরোধী, শোষণবৈষম্যবিরোধী বা অনুরূপ বিভিন্ন ধরনের গণআন্দোলনে সংশ্লিষ্ট দেশের ছাত্রেরাই সবচেয়ে দুঃসাহসী, অগ্রণী ও অনেক সময় নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। এর কারণ প্রধানত ৩টি। প্রথমত ছাত্রদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত বিধায়, পরিবারের দুঃখ-যন্ত্রণা তাদেরও উদ্বেলিত করে। দ্বিতীয়ত তারা লেখাপড়া জানে বলে এবং অনেকটা শ্রমিকদের মতো, ক্লাসে-হোস্টেলে-হলে একসঙ্গে থাকে বলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও ঐক্যবদ্ধতা দুইই গড়ে ওঠে। তৃতীয়ত পরিবারের সাংসারিক দায়দায়িত্ব সরাসরি তাদের ওপর থাকে না বিধায় এবং তারুণ্যের কারণে, তারাই সর্বাধিক ঝুঁকি নিতে সমর্থ হয়।

ছায়া মন্ত্রিসভা Shadow Cabinet. অনেক সময় সরকার বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দল সরকারের মন্ত্রিমণ্ডলীর অনুরূপ পদ সৃষ্টির মাধ্যমে ছায়ামন্ত্রিসভা গঠন করে। এর উদ্দেশ্য থাকে প্রধানত দুটি এক. যাতে ছায়ামন্ত্রিসভার প্রত্যেক মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সত্যিকার রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রীর কার্যাবলী পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দলকে অবহিত করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় দাবি, পরামর্শ, সমালোচনা ইত্যাদি তৈরি করতে সক্ষম হন। দুই. ছায়ামন্ত্রিসভার সদস্যদের এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়, যাতে উক্ত দল রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে, ওই ছায়ামন্ত্রিসভার সদস্যেরাই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেন। ছায়া সরকার (Shadow Government)ও একইভাবে একই উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়।

ছিটমহল Enclave. কোনো একটি রাষ্ট্রের এমন একটি এলাকা, যে-এলাকা চতুর্দিক থেকে অন্য একটি রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ছিটমহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ ও যাতায়াত সংশ্লিষ্ট ভিন্ন রাষ্ট্রটির মধ্য দিয়ে ছাড়া সম্ভবপর নয়।

॥ জ ॥

জনগণের একনায়কত্ব : অর্থাৎ সমগ্র জনগণের আধিপত্য। জনগণের একনায়কত্ব হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে একশ্রেণী অপর শ্রেণীর ওপর আধিপত্য করতে বাধ্য। শোষণমূলক সমাজে শোষকরা তাদের একনায়কত্ব শোষিতদের ওপর চাপিয়ে দেয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণী

রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেও সমাজ থেকে শোষণমূলক সমাজের বৈশিষ্ট্য ও ঝোঁকসমূহ রাতারাতি পালটে যায় না। এমতাবস্থায়, এগুলোকে হঠানোর জন্য প্রয়োজন হয় সর্বহারা শ্রেণীর বা শোষিতের একনায়কত্বের। কালক্রমে শোষণমূলক সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ লোপ পেয়ে গেলে, তখন আর কোনো শ্রেণীবিশেষের একনায়কত্বের প্রয়োজন পড়ে না। তখন সমগ্র জনগণই হয় নিজেদের একচ্ছত্র নিয়ন্তা। এই অবস্থাকেই মার্কসবাদীরা বলে জনগণের একনায়কত্ব বা প্রকৃত গণতন্ত্র।

জনতা বিমুক্তি পেরামুনা সংক্ষেপে জে.ভি.পি. (J.V.P)। শ্রীলংকার এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আন্তর্জাতিক পাদপ্রদীপের সামনে আসে ১৯৭০-৭১ সালে। এই দলের মূল নেতা রোহানা উইজেউইরা ছিলেন মস্কোয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রগতিশীল ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। এ-সময়কার নির্বাচনে এই দল শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের প্রতি সমর্থন দান করে। কিন্তু শ্রীমাভো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই জে.ভি.পি.-র সঙ্গে তাঁর মতভেদ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে জে.ভি.পি. সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রীলংকার ব্যাপক এলাকায় নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক-অসমাজতান্ত্রিক কোনো দেশই তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে না। এমতাবস্থায়, বিদেশী সাহায্যপুষ্ট শ্রীমাভো সরকার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন। জে.ভি.পি.-র অসংখ্য নেতা, কর্মী ও সমর্থক নিহত হয়। নেতা রোহানাও কারারুদ্ধ হন এবং অল্পকালের মধ্যেই জে.ভি.পি.-র কার্যক্রম স্তব্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন তুলনামূলক নিষ্ক্রিয়তার পর আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে জে.ভি.পি. পুনরায় স্বমূর্তিতে শ্রীলংকার রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়। ১৯৮৯ সালে রোহানা উইজেউইরা সরকারি বাহিনীর হাতে নিহত হন। জে.ভি.পি.-র বহু নেতা ও কর্মী মারা পড়ে। তথাপি, জে.ভি.পি. তার সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম কোনোমতে চালু রাখতে সচেষ্ট হয়।

জন বুল : John Bull. ইংরেজ লেখক আরবুথনটের 'জন বুল অ্যান্ড হিজ আইল্যান্ড' নামক ব্যাঙ্গাত্মক রচনা থেকে কথাটির উদ্ভব। জন বুল কথাটির দ্বারা এখন ব্যাঙ্গার্থে সমগ্র ব্রিটিশ জাতিকে বোঝায়, যেমন 'আঙ্কল স্যাম' বলতে বোঝায় আমেরিকানদের।

জন্মগত অধিকার Inalienable Rights of Man. ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় সর্বপ্রথম এই ধ্বনি উত্থিত হয়। সামন্তবাদবিরোধী বুর্জোয়া বিপ্লবের তিনটি বাণী ছিল, স্বাধীনতা, মৈত্রী ও সাম্য। স্বাধীনতা মানে সমাজের সকলের জন্য স্বাধীনতা। মৈত্রী মানে সমাজের সকল অংশের মধ্যে মৈত্রী এবং সাম্য মানে সমাজের সকলের সমান অধিকার।

জবাবদিহিতা Accountability. আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এর দুটি অর্থ। প্রথম অর্থ, যাঁরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি তাঁরা এবং সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন কি না এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উপরিস্থ কর্তৃপক্ষ এবং জনগণ চাওয়ামাত্রই তাঁরা তাঁদের কাজ ও অবস্থানের ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য থাকবেন। দ্বিতীয় অর্থ, দায়িত্বপ্রদানকারী ও দায়িত্ব গ্রহণকারীর আন্তঃসম্পর্ক কী হবে তা সুস্পষ্ট থাকার নামই হল জবাবদিহিতা। দ্বিতীয় অর্থটিও নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ও রাষ্ট্রের কর্মচারী,—উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

জরুরি অবস্থা State of Emergency. যুদ্ধ, যুদ্ধের আশঙ্কা, আগ্রাসন, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, অরাজকতা, ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অপর যে-কোনো গুরুতর অভাবিত সমস্যাজনিত অবস্থাকে বলে জরুরি অবস্থা। সংবিধানেই জরুরি অবস্থার মোকাবেলার জন্য ক্ষমতাসীন সরকারকে জরুরি ক্ষমতা (Emergency Powers) দেওয়া থাকে। তাই এরূপ পরিস্থিতিতে সরকার 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করতে পারেন এবং জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ সাময়িকভাবে স্থগিত বা সীমিত করে দিতে পারেন। বলাবাহুল্য, জরুরি অবস্থা একটি সাময়িক অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষ পরিস্থিতির অবসান ঘটলেই জরুরি অবস্থাও প্রত্যাহার করার কথা।

জলসীমা Territorial Waters. কোনো দেশের নিয়ন্ত্রণাধীন সেই পরিমাণ সমুদ্র-এলাকা, যে-এলাকার ওপর ওই দেশের সার্বভৌমত্ব এবং মাছধরা, তৈল উত্তোলন ইত্যাদি যাবতীয় কাজের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। দীর্ঘদিন যাবৎ মূল ভূখণ্ড থেকে তিন মাইল পর্যন্ত এলাকাকেই জলসীমা বলে ধরা হত। কিন্তু আইসল্যান্ড এক পর্যায়ে ১২ মাইল ও পরবর্তী পর্যায়ে ২০০ মাইল পর্যন্ত সমুদ্রসীমা দাবি করে। ১৯৭৭ সালে ইউরোপীয় সাধারণ বাজার (EEC)-ভুক্ত দেশসমূহ ২০০ মাইল পর্যন্তই নিজ নিজ সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করে নেয়। বর্তমানে অনেক দেশই ২০০ মাইল পর্যন্ত নিজেদের সমুদ্রসীমা বলে দাবি করে।

জাঙ্কার শ্রেণী এল্‌ব্‌-এর পূর্বাঞ্চলের বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী প্রুশীয় ভূস্বামীশ্রেণীকেই বলা হত জাঙ্কার শ্রেণী। প্রুশিয়া (বর্তমানে জার্মানি)-র উচ্চপদস্থ প্রশাসকমণ্ডলীর প্রায় সকলেই এবং অফিসারদের অধিকাংশই ছিল জাঙ্কার শ্রেণী থেকে আগত। এদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত গোঁড়া এবং নিজেদের ভূমিস্বার্থ কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে এরা সকল প্রকার উদারতাবাদের প্রাণপণে বিরোধিতা করত। জাঙ্কার (Junker) শব্দটি এসেছে জার্মান Jungherr শব্দ থেকে, যে-শব্দের দ্বারা বোঝানো হত অফিসার-ক্যাডেটভুক্ত তৎকালীন সম্ভ্রান্তদের সন্তানদের। ১৯৪৫ সালে রুশ আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত বহু জাঙ্কার জমিদারি জার্মানিতে বলবৎ ছিল।

জাতি Nation. ঐতিহাসিকভাবে সংগঠিত একটি জনগোষ্ঠী। একই এলাকা, ভাষা, নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদিকেই সাধারণভাবে জাতীয়তার ভিত্তি বলে বিবেচনা করা হয়। জাতি হচ্ছে সবচেয়ে প্রশস্ত জনগোষ্ঠী এবং আধুনিক অর্থে এর উদ্ভব ঘটেছে প্রধানত পুঁজিবাদের উদ্ভবের প্রক্রিয়ায়। কিন্তু বাস্তব অবস্থার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ভাষা, নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি জাতীয়তার মূল কথা নয়। কারণ, যদি তাইই হত, তা হলে একই ভাষাভাষী বা একই ধর্মাবলম্বী বা একই নৃতাত্ত্বিক উ ৎসসম্পন্ন জনগোষ্ঠী পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হত না এবং আলাদা রাষ্ট্র ব্যবস্থা দাবি করত না। অনেকের মতে, একই উপনিবেশবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের আওতায় নির্যাতিত জনগণের শোষণমুক্তির সংগ্রামের প্রক্রিয়াতেই এক-একটি জাতির উদ্ভব ঘটে এবং অবস্থা পালটে গেলে জাতীয়তার রূপও পালটে যেতে পারে। একসময়কার সংঘবদ্ধ জাতি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভক্তও হয়ে যেতে পারে। বস্তুত উপরোক্ত এক বা একাধিক কারণে যখন কোনো একটি জনসমষ্টি নিজেদের এক জাতি বলে মনে করে, তখনই তারা একটি জাতিতে পরিণত হয়।

জাতিগত জীবাণু অস্ত্র এর অপর নাম Ethnic Bullet. ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল এই জীবাণুবোমা আবিষ্কার করেছে আরবদের, বিশেষত ইরাকিদের ধ্বংস করার লক্ষ্যে। নেস্‌থ্‌জেনিয়ায় অবস্থিত গোপন জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র গবেষণাগারে এই অস্ত্র নির্মিত হয়েছে। ইসরাইলি বিজ্ঞানীরা এমন এক জিনি খুঁজে বের করেছেন, যা শুধুমাত্র আরবদের শরীরেই আছে। এই জিনকে একধরনের ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। জেনেটিক্যালি মোডিফাইড ভাইরাস বহনকারী এইসব ডিএনএ নিজেদের পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে ও মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। এই জীবানু অস্ত্র রোগের আকারে বাতাস বা পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। বিয়ার, ভূট্টা এমনকি প্রতিষেধকের মাধ্যমেও এই জীবাণুঅস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। বলা বাহুল্য, এই অস্ত্রের ব্যবহার হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ সালের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পিগমেনটেশন ওয়েপন (Pigmentation Weapon) নামেও এই জাতীয় অস্ত্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

জাতিগত বৈষম্য : Racism. কোনো বিশেষ জাতি বা জনগোষ্ঠী অন্য জাতি বা জনগোষ্ঠীর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর,—এরূপ চিন্তা বা বিশ্বাস থেকে নিকৃষ্টতর এর বিবেচিত জাতি বা জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্য, নিপীড়ন, ঘৃণা ইত্যাদিই হল জাতিগত বৈষম্য। হিটলারের নাৎসিবাদের মূল কথাই ছিল জার্মানরা খাঁটি আর্য, তাই তারা শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বকে শাসন করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত। এই চিন্তা থেকেই তারা শুরু করেছিল সেমেটিক ইহুদিদের পাইকারি নিধন। অন্যদিকে সাদা-চামড়ার মানুষদের ধারণা তারা কালো বা বাদামি চামড়ার মানুষদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর মানুষ। কিন্তু যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদীরা মনে করেন যে, কে আর্য, কে নিগ্রোয়াইড, কে মঙ্গোলিয়ান, কে সেমেটিক, কে দ্রাবিড় কিংবা কে সাদা, কে লালচে, কে কালো, কে বাদামি—তার ওপর মানুষের উৎকৃষ্ট হওয়া বা নিকৃষ্ট হওয়া বা ভালো হওয়া বা মন্দ হওয়া আদৌ নির্ভর করে না। গাত্রবর্ণ বা নৃতত্ত্ব বা জাতিত্বের সঙ্গে উৎকৃষ্টতা-নিকৃষ্টতার কোনো সম্পর্ক আছে,—বিজ্ঞানে তার কোনো প্রমাণ মেলে না। অবশ্য কেউ-কেউ দাবি করেন যে, সার্ভে থেকে দেখা গেছে আমেরিকার সাদাদের তুলনায় কালোদের এবং ব্রিটিশদের তুলনায় আইরিশদের বুদ্ধিমত্তা (Intelligence Quotient-1Q) কম।

জাতিভেদ বৈদিক যুগের প্রথম দিকে গৌরবর্ণ আর্য এবং কৃষ্ণবর্ণ আর্য এই দুই শ্রেণীর আর্যের অস্তিত্ব ছিল। ঋগ্বেদের শেষের দিকে চতুর্বর্ণের উদ্ভব ঘটে। যাঁরা ধর্ম ও যাগযজ্ঞের দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের বর্ণ হয় ব্রাহ্মণ; যাঁরা শাসন, যুদ্ধ ও দেশরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের বর্ণ হয় ক্ষত্রিয়; যাঁরা ব্যাবসা ও উৎপাদনাদি নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁদের বর্ণ হয় বৈশ্য এবং যাঁরা কায়িক শ্রম দিতেন ও নিম্নপর্যায়ের কাজ করতেন, তাঁদের বর্ণ হয় শূদ্র। বর্ণভেদের প্রথম দিকে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বর্ণভেদ বা জাতিভেদ কঠোর থেকে কঠোরতার আকার ধারণ করে। প্রথম তিন বর্ণকে উচ্চবর্ণ এবং শূদ্রদের সর্বনিম্ন বর্ণ বলে বিবেচনা করা হত। এক পর্যায়ে শূদ্রদের অস্পৃশ্যে পরিণত করা হয়। হিন্দুসমাজে অদ্যাবধি জাতিভেদ প্রথা কমবেশি বিদ্যমান আছে।

জাতিসংঘ : সম্মিলিত জাতিসংঘ বা United Nations Organization-UNO. যুদ্ধ, বিরোধ ও উত্তেজনা রোধ করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের পরপর ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ গঠিত হয়। বর্তমানে, তাইওয়ান ও ইসরায়েল ব্যতীত বিশ্বের সকল দেশই এর সদস্য। জাতিসংঘের একটি সাধারণ পরিষদ (General Assembly) ছাড়াও রয়েছে পাঁচটি শাখা পরিষদ, যথা —নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice), অছি পরিষদ (Trusteeship Council), সচিবালয় (Secretariat) এবং আর্থসামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council)। এ ছাড়াও জাতিসংঘের বেশ কিছুসংখ্যক অঙ্গ সংগঠন রয়েছে, যেমন, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (WHO), জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু জরুরি তহবিল (UNICEF) ইত্যাদি। জাতিসংঘের সার্বক্ষণিক প্রধান কর্মকর্তা হচ্ছেন এর মহাসচিব (Secretary General)। জাতিসংঘের পাঁচটি সদস্য (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন)-এর বিশেষ ক্ষমতা (Veto Power) রয়েছে, যে-ক্ষমতার বলে এই পাঁচ সদস্যের যে-কেউ জাতিসংঘের যে-কোনো সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দিতে পারে।

জাতীয় আয় : National Income. জাতীয় আয় দুভাবে বিবেচনা করা যায়। উৎপাদিত দ্রব্য ও সার্ভিসসমূহের মোট পরিমাণের আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় ধরা যায়। অথবা মূলধন বাবদ নির্ধারিত অর্থ বাদ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের (সাধারণত এক বছরের) যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে লব্ধ আয়ের মোট পরিমাণকেও জাতীয় আয় ধরা যায়। উভয় হিসাবেই জাতীয় আয়ের পরিমাণ একই হয়। বস্তুত জাতীয় আয় এবং জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় সমার্থক। জাতীয় আয়ের আকৃতি নির্ভর করে কতগুলো বিষয়ের ওপর, যেমন ১. দেশের বিনিয়োগকারী, পুঁজি, শ্রম, ভূমি ইত্যাদির মান ও পরিমাণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমিকের দক্ষতা, বিনিয়োগকারীদের যোগ্যতা, প্রকৃত পুঁজির মান ও পরিমাণের স্তর; ২. সংশ্লিষ্ট দেশের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের স্তর এবং ৩. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার স্তর ইত্যাদি। প্রায়শই নিম্নলিখিত কারণে জাতীয় আয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুষ্কর হয়ে পড়ে, ১. অসম্পূর্ণ তথ্য, যেমন কোনো ব্যক্তি অবসর সময়ে তার বন্ধুর বা প্রতিবেশীর কোনো কাজ করে দিল, যা হিসাবে এল না ২. একই বস্তু দুবার হিসাব করা; যেমন একই বস্তুকে একবার কাঁচামাল হিসাবে এবং দ্বিতীয়বার শিল্পজাত পণ্য হিসাবে হিসাব করা; ৩. দ্রব্যাদির ক্ষয় (Depreciation) যথাযথভাবে হিসাব না করা; ৪. যারা নিজ বাড়িতে বাস করে তাদের যে-অর্থ বেঁচে যাচ্ছে, তা হিসাবে না ধরা; ৫. গৃহবধূ, পরিচারক প্রমুখের কাজকে হিসাবে না ধরা। অনেক সময় কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে উৎপাদন কম করে দেখানো কিংবা অর্থ আত্মসাতের জন্য সার্ভিস ও উৎপাদন বেশি করে দেখানোর ফলেও হিসাবে ভ্রান্তি ও ফাঁকি থেকে যেতে পারে।

জাতীয় কংগ্রেস, নিখিল ভারত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর থেকেই ভারত উপমহাদেশের সচেতন নেতারা একটি জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়ে আসছিলেন। ১৮২৮ সালে অনেকটা এই লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৪৩ সালে বঙ্গদেশে গঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। ১৮৫১ সালে এই সোসাইটি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে একত্রীভূত হয় এবং এই একত্রীভূত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ভারত উপমহাদেশের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আইনসভা গঠনের

দাবিও উত্থাপিত হয়। ১৮৭৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' জন্মলাভ করে এবং অচিরেই ভারতবর্ষব্যাপী এর শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে। ১৮৮৩ সালে কলকাতায় এর সর্বভারতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসক-শোষকগোষ্ঠী ভারতবর্ষের বিকাশমান রাজনীতিকে নিজেদের কবজায় রাখতে সচেষ্ট হয় এবং এ-ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন অক্টেভিয়াস হিউম নামক জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষ, যিনি ১৮৮২ সাল পর্যন্ত সরকারের কৃষি দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিলেন যে, ভারতের গণবিপ্লবকে ঠেকানোর জন্যই তিনি নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অ্যানি বেসান্ট, ব্যারিস্টার পি. মিত্র প্রমুখ। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই ১৮৮৫ সালে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস-এর জন্ম হয় এবং বাস্তবিকই কংগ্রেসের অহিংস ও আপোসবাদী নীতির ফলে গণবিপ্লব অনেকখানিই অবদমিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত ও স্বাধীন হলে, কংগ্রেস ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং সত্তরের দশকের কয়েক বছর ছাড়া ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত একটানা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। বলাবাহুল্য, কংগ্রেস ভারতের পুঁজিপতি ও তাদের প্রতিভূদের সংগঠন হিসাবে পুঁজির বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

জাতীয়করণ যে-কোনো সম্পত্তি (যেমন কোনো শিল্পকারখানা, ব্যাবসা, রেলওয়ে, অন্যান্য যোগাযোগ ব্যাবস্থা বা অপর কোনো সম্পত্তি) ব্যক্তি বা গোষ্ঠীমালিকানার বদলে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসাকেই বলে জাতীয়করণ (Nationalization)। জাতীয়করণ সমাজতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী উভয় প্রকার হতে পারে। রাষ্ট্রক্ষমতায় যদি সমাজতন্ত্রীরা অধিষ্ঠিত থাকে, তা হলে জাতীয়করণের চরিত্র হয় সমাজতান্ত্রিক। আর পুঁজিবাদীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে এর চরিত্র হয় পুঁজিবাদী। সাধারণত পুঁজিবাদী জাতীয়করণকে রাষ্ট্রীয়করণ বলা হয়, কেননা এরূপ ক্ষেত্রে 'জাতীয়কৃত' সম্পত্তির ওপর আসলে সমগ্র জাতির কর্তৃত্ব থাকে না; বরং তা কার্যত পুঁজিপতি শ্রেণী, তাদের প্রতিভূ আমলাতন্ত্র ও একশ্রেণীর কায়েমি স্বার্থবাদী শ্রমিকনেতা প্রমুখেরই ভোগে লাগে।

জাতীয়করণ, জমির : রাষ্ট্রীয় মালিকানায় জমি গ্রহণ। শিল্প জাতীয়করণের মতোই জমি জাতীয়করণের চরিত্র নির্ভর করে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের চরিত্রের ওপর। পুঁজিবাদীরাও অনেক সময় অধিক পণ্য উৎপাদনের স্বার্থে বৃহৎ ভূস্বামীদের জমি রাষ্ট্রায়ত্ব করে তা প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে বিলি করে বা ইজারা দেয়।

জাতীয়করণ, শিল্পের কোনো সরকার কর্তৃক দেশের সমগ্র বা কতিপয় শিল্পের পরিচালনাভার ও মালিকানা গ্রহণ। জাতীয়করণ ঠিক সামাজিকীকরণ নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয়করণ হল সামাজিকীকরণ, আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তা হল পুঁজিবাদের স্বার্থে রাষ্ট্রীয়করণ। বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান যখন অর্থনৈতিক সংকটের চাপে পড়ে এবং পুঁজির সমস্যা দেখা দেয় কিংবা যখন অন্য কোনো কারণে ব্যক্তিমালিকদের পক্ষে শিল্প পরিচালনা দুষ্কর হয়ে পড়ে, তখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদের স্বার্থেই সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহ জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণ করতে পারে।

জাতীয় গণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের প্রক্রিয়ায় জাতীয় গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। দেশের সকল

প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক জনগণের ঐক্যই হল জাতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি। উপনিবেশ বা নয়া উপনিবেশের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ বা নয়া উপনিবেশবাদ-এর সঙ্গে সমগ্র জাতির দ্বন্দ্বই থাকে প্রধান দ্বন্দ্ব। এমতাবস্থায়, জাতীয় মুক্তির প্রশ্নই হয় প্রধান প্রশ্ন।

জাতীয়তা Nationality. জাতীয়তা ধর্মভিত্তিক (যেমন মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান), ভাষাভিত্তিক (যেমন বাঙালি, আরবি, ল্যাটিন), নৃতত্ত্বভিত্তিক (যেমন আর্য, মঙ্গোলীয়, সেমেটিক) বর্ণভিত্তিক (যেমন শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ), অঞ্চলভিত্তিক (যেমন স্ক্যান্ডিনেভীয়, মধ্যএশীয়, ল্যাটিন আমেরিকান) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। অপরদিকে নাগরিকত্ব হচ্ছে একটা রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী হওয়া। একটা রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয়তার মানুষ থাকতে পারে। যেমন ভারতে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে; আর্য আছে, দ্রাবিড় আছে, বাঙালি আছে, তামিল আছে। অপরদিকে একই জাতীয়তার মানুষও বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে। যেমন মঙ্গোলীয়রা চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক, মুসলমানদের মধ্যে আছে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের নাগরিক কিংবা বাঙালিদের কেউ বাংলাদেশের কেউ ভারতের নাগরিক। আবার প্রায়শই, একই জাতীয়তার মানুষও পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ-বৈরিতায় লিপ্ত হয় বলে অনেকে মনে করেন যে, আসলে একই আর্থসামাজিক স্বার্থ, ঐক্যবোধ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে-একাত্মবোধ গড়ে ওঠে, সেটাই প্রকৃত জাতীয়তা।

জাতীয়তাবাদ Nationalism. নিজেকে কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা, সেই জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিকাশ, অগ্রগতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে একাত্মবোধ করা এবং সংশ্লিষ্ট জাতির ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, স্বকীয়তার রক্ষা ও বিকাশে বিশ্বাসী হওয়ার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে।

জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ অনেকে মনে করেন যে জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ বা আন্তর্জাতিকতাবাদ-এর অন্তরায়স্বরূপ, সুতরাং সংকীর্ণ। অনেকের মতে, আন্তর্জাতিকতাবাদই যথার্থ এবং এরই বিকাশের মাধ্যমে জাতিতে-জাতিতে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সুখী-সুন্দর পৃথিবী গড়া সম্ভবপর। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ, এমনকি সমাজতন্ত্রীরাও মনে করেন যে, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদের আসলে কোনোই দ্বন্দ্ব নেই। বরং একে অপরের সম্পূরক। প্রত্যেক জাতিরই অবস্থান ও সমস্যার স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সুতরাং, জাতীয়তাকে বাদ দিলে নিপীড়িত জনগণের সামনে মুক্তির কোনো দৃশ্যযোগ্য নীলনকশাই থাকে না, ফলে আন্দোলন ও কার্যক্রমও বাস্তবে লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে। অপরদিকে, বর্তমান বিশ্ব যেহেতু আন্তর্জাতিক বিশ্ব, অর্থনীতি, বাজার, লেনদেন ইত্যাদির রূপ যেহেতু আন্তর্জাতিক এবং যেহেতু বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, ও নিরাপত্তার বিষয়াদিও পরস্পর-গ্রথিত, সেহেতু আন্তর্জাতিকতাবাদকে উপেক্ষা করে, শুধুমাত্র জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে থাকাও ক্ষতিকর। এঁদের মতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয়ের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

জাতীয় দেনা বা জাতীয় ঋণ National Debt. জাতীয় দেনা বা ঋণের দুটি অংশ, অভ্যন্তরীণ দেনা ও বৈদেশিক দেনা। দেশের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে সরকারের যে-দেনা থাকে, তাইই হল জাতীয় দেনা। আর বিদেশী ঋণদাতা

প্রমুখের নিকট দেনাই হল বৈদেশিক দেনা। বৈদেশিক ঋণের বোঝাটাই তুলনামূলকভাবে ভয়াবহ, কেননা এর আসল ও সুদ বাবদ পরিশোধিত অর্থ দেশের বাইরে চলে যায় এবং লেনদেনের ভারসাম্যে ঘাটতির সৃষ্টি করে। জাতীয় দেনা বৃদ্ধি পেলে, সরকার সাধারণত শুল্ক-কর ইত্যাদি বৃদ্ধির মাধ্যমেই তা পরিশোধের উদ্যোগ নেয়। মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে জাতীয় ঋণের বোঝা কিছুটা হালকা হয়, কেননা মুদ্রাস্ফীতির ফলে মুদ্রামান হ্রাস পায়।

জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ প্রায়শই রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার-প্রধান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সশস্ত্রবাহিনীসমূহের (ক্ষেত্রবিশেষে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের) সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ (National Security Council) গঠন করা হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য থাকে সম্ভাব্য বহিঃআক্রমণের কবল থেকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা। তবে অনুন্নত বিশ্বের কোথাও কোথাও সশস্ত্রবাহিনীসমূহের কর্তৃত্বে এরূপ পরিষদ গঠন করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য থাকে রাষ্ট্র, সরকার, গণপ্রতিনিধি প্রমুখের ওপর সশস্ত্রবাহিনীসমূহের কর্তৃত্ব বহাল রাখা।

জাতীয় মুক্তি National Emancipation. সাম্রাজ্যবাদ নয়া সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ বা তাদের দেশীয় এজেন্টদের কবল থেকে জাতিকে মুক্ত করাই হল জাতীয় মুক্তি এবং এর জন্য সংগ্রামই হল জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম।

জাতীয় সমাজতন্ত্র নাৎসিবাদেরই অপর নাম হল জাতীয় সমাজতন্ত্র (National Socialism)। উৎকট জাত্যাভিমান, ইহুদিবিদ্বেষ ও পররাজ্য গ্রাসের মাধ্যমে আর্য-আধিপত্য কায়েম ইত্যাদিই ছিল জাতীয় সমাজতন্ত্রের মূল কথা। ১৯২৯ সালে জার্মানি যখন তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়, তখনই হিটলারের উদ্যোগে জাতীয় সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। বিপর্যয় থেকে জার্মান পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য পুঁজিপতিদের প্ররোচনাতেই হিটলার জাতীয় সমাজতন্ত্রের ধ্বজা তুলে ধরেন। বিভিন্ন মুখরোচক আশ্বাসের ভিত্তিতে জাতীয় সমাজতন্ত্রী বা নাৎসিরা ছাত্র, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বেকারদের একটা বিরাট অংশকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। ১৯৩৩ সালে নাৎসিরা জার্মানির রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে তাদের তথাকথিত 'জাতীয় সমাজতন্ত্র' কায়েম করে। ১৯৪৫ সালে নাৎসি জার্মানির পতনের সঙ্গে সঙ্গে 'জাতীয় সমাজতন্ত্র'ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল National Socilist Party. ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানির এডলফ হিটলার সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে এসে 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিক দল' গঠন করেন। অচিরেই এ-দলের নাম বদলে রাখা হয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা নাৎসি দল (Nazi Party)। এই দলের লক্ষ্য ছিল ইহুদি ও সত্যিকার মার্কসবাদীদের নির্মূল করা। কিন্তু এ-দল ট্রাস্টসমূহ জাতীয়করণ ও ভূমি বাজেয়াপ্তকরণের বক্তব্য উত্থাপন করায় বুর্জোয়া ও উচ্চমধ্যবিত্তরাও এ-দলের বিরুদ্ধে চলে যায়। এমতাবস্থায়, হিটলার তাঁর লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঝটিকা বাহিনী (Gestapo) গঠন করেন। সামরিক বাহিনীর কিছু-কিছু সদস্য ঝটিকা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এই আশায় যে, ভবিষ্যতে এদেরকে তাঁদের স্বার্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। নামে সমাজতন্ত্রী হলেও এ-দল প্রকৃত সমাজতন্ত্রীদের সর্বাধিক ক্ষতিসাধন করে। ১৯২৪ সালের নির্বাচনে এই দল ৩২টি আসন লাভ করে। কিন্তু ১৯৩৩ সালের নির্বাচনে

এই দল ২৮৮টি আসন লাভ করে এবং সালে হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলার (বা প্রধানমন্ত্রী)-র দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এই দলকে একমাত্র আইনানুগ দল বলে ঘোষণা করা হয় এবং অন্যান্য দলকে কার্যত নির্মূল করে দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালের ২ আগস্ট হিটলার রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন এবং 'ফ্যুয়েরার' বা নেতা উপাধি ধারণ করে জার্মানির সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এই দলের জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতাদখলের মূলে ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ, জঙ্গি তারুণ্য ও ভার্সাই চুক্তির অপমানজনক শর্তাদির বিরুদ্ধে জার্মান জনগণের তীব্র বিক্ষোভ।

জান্তা Junta. স্পেনের রাষ্ট্রীয় মহাসভাকে বলা হত জান্তা। কিন্তু, বর্তমানে জান্তা বলতে বোঝায় সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মিলিত গুপ্তসভা কিংবা ক্ষমতা দখলকারীদের জোট বা চক্র। জান্তার চরিত্র হয় মূলত গণবিরোধী।

জান্তা, সামরিক : রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী সামরিক কর্মকর্তাদের জোট বা চক্রকেই বলে সামরিক জান্তা।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ১৯১৯ সালের ১০ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সম্পূর্ণ বিনা উসকানিতেই জেনারেল ডায়ার সভাস্থলে উপস্থিত হন এবং বেপরোয়া গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। ফলে ৩৭৯ জন নিরপরাধ ভারতীয় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় এবং আহত হয় ১২০০ জনেরও বেশি মানুষ। এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই ঘটনা ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে অত্যন্ত ধিকৃত করে তোলে।

জিও-পলিটিক্স : Geo-Politics, অর্থাৎ ভৌগোলিক রাজনীতি বা ভূ-রাজনীতি। কোনো রাষ্ট্রের ভৌগোলিক চাহিদা (যথা, তার সীমান্তের নিরাপত্তা, বহির্বিশ্বের দিকে বেরুবার জন্য জলপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য নয় এমন এলাকাকে স্বীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিকরণ, সামরিক কৌশল অর্থাৎ Military Strategy-র বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ এলাকার ওপর স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপন ইত্যাদি)-র ওপর ভিত্তি করে যে-রাজনীতি, বিশেষত পররাষ্ট্রীয় রাজনীতি গড়ে ওঠে, সেটাকেই বলে ভৌগোলিক রাজনীতি বা জিও-পলিটিক্স। সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রুডল্‌ফ জিলান ১৯০০ সালে এই তত্ত্বের প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তীতে ফ্রেডারিখ র‍্যাজেল (জার্মান), স্যার হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডার (ব্রিটিশ), কার্ল হশোফার (জার্মান) প্রমুখ এই তত্ত্বের বিকাশসাধন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার এই তত্ত্বকেই তাঁর আগ্রাসনের যুক্তি হিসাবে কাজে লাগান।

জি-৭ Group of 7 (G–7) এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও শিল্পায়িত ৭টি দেশের জোট। এই জোটের সদস্যেরা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও জাপান। শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ ও প্রযুক্তিগত পারস্পরিক সমস্যাদি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরসন এবং বিশ্বের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

জি-১৫ Group of 15 (G–15). ১৫টি উন্নয়নশীল দেশের সমন্বয়ে এই সংস্থা গঠিত হয় ১৯৮৯ সালে। এর সদস্য হচ্ছে জিম্বাবি, মিশর, নাইজেরিয়া, সেনেগাল,

আলজেরিয়া, ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চিলি, মেক্সিকো, পেরু, ভেনিজুয়েলা ও জ্যামাইকা। পরবর্তীকালে কেনিয়াকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি করা। স্নায়ু বা ঠাণ্ডা যুদ্ধকালীন এই ফোরাম জোটনিরপেক্ষতার ব্যাপারে অত্যন্ত সোচ্চার থাকলেও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ধস ও স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর এই ফোরামের তৎপরতা অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

জিঙ্গোবাদ Jingoism. এর অর্থ হল উগ্র স্বদেশপ্রেম। জিঙ্গোবাদীরা তাদের স্বদেশীয় ছাড়া অন্যদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা পোষণ করে এবং প্রায়শই কোনো উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকেই অন্যদের ওপর নির্যাতন চাপিয়ে দিতে বা সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে না। জিঙ্গোবাদীরা তীব্র জাত্যাভিমান, অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ ও সর্বদা যুদ্ধংদেহি ভাবের মাধ্যমে স্বদেশীয়দের ক্ষিপ্ত ও ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াস পায়।

জিনেটিক্স্ জিনতত্ত্ব (Genetics)। জিন (Gene) হচ্ছে ক্ষুদ্রতম জীবকোষ বা বংশগতির একক। জিন ক্রোমোজোম (Chromosome)-এর ধারক এবং ক্রোমোজোমের মৌল উপাদান হল ডাই অক্সিরিবো নিউক্লিয়িক অ্যাসিড (Di-oxyribo neucleic Acid), সংক্ষেপে ডি. এন. এ. (D.N.A.)। প্রাণীর ক্রোমোজোমের মধ্যেই তার বৈশিষ্ট্যসমূহ ও বংশানুক্রমের সূত্রাদি নিহিত থাকে। জিনতত্ত্ব বা জিনেটিকসের বিকাশের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মৌলরূপ ও বংশানুক্রম পূর্বনির্ধারিত। ইতঃপূর্বে ধারণা ছিল যে, প্রাণী, বিশেষত মানুষ, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ঝোঁকসমূহ অর্জন করে মূলত তার পরিবেশ থেকে। জিনেটিক্স্ এ ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করেছে। বস্তুত বংশানুক্রমের ধারায় অর্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহকে বা কতিপয় বৈশিষ্ট্যকে পরিবেশ শাণিত বা অবদমিত করতে পারে মাত্র। বর্তমানে জিনেটিক বিজ্ঞানীরা মিউটেশন (Mutation)-এর মাধ্যমে জন্মলব্ধ বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বকে পালটানো যায় কি না, তা নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত আছেন।

জিনোভিয়েভ, রাদোমিসলস্কি রুশ রাজনীতিবিদ, যিনি বারংবার বলশেভিক মতবাদ থেকে বিচ্যুত হন এবং শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পরিত্যাগ করেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে তিনি কামেনেভের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করনে এবং 'নভায়া জিজন' পত্রিকার মাধ্যমে অভ্যুত্থান পরিকল্পনা ফাঁস করে দেন। অক্টোবর বিপ্লবের পর তিনি মেনশেভিক, সোশ্যাল রিভল্যুশনারী ও জন-সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোয়ালিশন সরকারের দাবি তোলেন। ১৯২৭ সালে তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

জিয্‌আ : ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের ওপর ধার্যকৃত কর। ইসলামি রাষ্ট্র এই করের বিনিময়ে অমুসলিম নাগরিকদের জীবন ও ধনসম্পদ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তাদের দেশরক্ষার কাজ তথা সেনাবাহিনীতে যোগদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়।

জীবন সেই উপাদান, যার অনুপস্থিতি প্রাণীকে জড়পদার্থে পরিণত করে। জীবনবস্তুর একধরনের গতিময়তা। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে 'প্রোটোপ্লাজম'-এর একধরনের অবস্থাই জীবন। প্রোটোপ্লাজম বলতে বোঝায় প্রোটিন, নিউক্লিয়িক অ্যাসিড, ফসফরিক

কম্পাউন্ড ইত্যাদির এক-একটি সিরিজ। জীবন্ত সত্তার আকারে জীবনের অবস্থান; এই সত্তা তারই মতো অন্য সত্তা থেকে জন্ম নেয়, বৃদ্ধি পায়, নিজের মতো আরও সত্তার জন্ম দেয় এবং অবশেষে নিজে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা নিঃশেষিত হয়ে যায়। যান্ত্রিকতাবাদীদের মতে, জীবন হল পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার একটি জটিল অবস্থিতি। কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীদের মতে সাধারণ পদার্থিক ও রাসায়নিক নিয়মসমূহ জীবনের ব্যাপারে মুখ্য নয়, বরং জীবনের নিজস্ব জৈব নিয়মই মুখ্য। বস্তুত জীবনের সমগ্র রহস্য আজও অনাবৃত নয়।

জীবনযাত্রার ব্যয় Cost of Living. অর্থাৎ জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ইত্যাদি ক্রয় বা আহরণ বাবদ ব্যয়। সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার ব্যয় সংগতিপূর্ণ থাকে। আয়ের তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়লে সাধারণ মানুষ দুর্ভোগের শিকার হয়।

জীবনযাত্রার মান Standard of Living. কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা জাতির জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভারের লভ্যতার স্তরকেই বলে জীবনযাত্রার মান। যারা তাদের চাহিদা পুরাপুরি মেটাতে পারে না, তাদের জীবনযাত্রার মান নিম্ন বলে ধরা হয় এবং যারা তাদের প্রয়োজন বা চাহিদা অনায়াসে ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে মেটাতে পারে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত বলে বিবেচনা করা হয়। জীবনযাত্রার মান প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যথা—১. সংশ্লিষ্ট জাতির জাতীয় সম্পদ ও আয়ের পরিমাণ এবং ২. সম্পদ ও আয়ের বণ্টনব্যবস্থা। যে-সমস্ত দেশের জাতীয় সম্পদ ও আয় যত বেশি, সে-সমস্ত দেশের মানুষের গড় জীবনযাত্রার মানও তত উন্নত। আবার একটি সম্পদশালী দেশের জনগণের সকলের জীবনমান, বৈষম্যপূর্ণ বণ্টনব্যবস্থার দরুন একইরূপ উন্নত নাও হতে পারে। বৈষম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রার মান কিংবা শোষক ও শোষিতের জীবনযাত্রার মান সমান নয়।

জীবাণুযুদ্ধ Bacteria Warfare. শত্রুর ওপর বিশেষ ধরনের বোমাবর্ষণের মাধ্যমে বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় কলেরা, প্লেগ ইত্যাদি ভয়াবহ রোগের জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়াই হল জীবাণুযুদ্ধ। এ-যুদ্ধ এজন্যই অতিমাত্রায় নৃশংস যে, এরূপ যুদ্ধের ক্ষেত্রে সামরিক ব্যক্তিদের তুলনায় নিরীহ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাই নির্মম মৃত্যুর শিকার হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে এরূপ প্রক্রিয়া ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে।

জিম্মি Hostage. শত্রুপক্ষের নিকট থেকে কোনো সুবিধা বা শর্তআদায়ের লক্ষ্যে শত্রুপক্ষের এক বা একাধিক ব্যক্তিকে আটকে রাখার এই কৌশল অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। অনেক সময় এই উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের কাউকেও আটক করা হতে পারে। যেমন– ১৯৭৯ সালের নবেম্বর মাসে তেহরানস্থ মার্কিন দূতাবাসের সকল মার্কিন কর্মকর্তা-কর্মচারীকেই জিম্মি করা হয়েছিল যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামি ইরানের ওপর কোনো হামলা না চালায়। অনেক সময় কোনো দেশে মুক্তিসংগ্রামী বা গেরিলারাও শত্রুপক্ষ বা তৃতীয় কোনো পক্ষের লোকজনকে জিম্মি করে তাদের সহযোদ্ধাদের মুক্তি, অর্থ, অনাক্রমণের আশ্বাস ইত্যাদি দাবি আদায় করে নিতে চায়।

জুলিও ক্যুরি, ফ্রেডারিখ (১৯০০-১৯৫৮), তিনি ফরাসি পদার্থবিদ, সাম্যবাদী, বিশ্ব শান্তি পরিষদের চেয়ারম্যান (১৯৪৯-৫৮), প্যারি বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য এবং

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সহযোগী সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রধান আবিষ্কার কৃত্রিম রেডিও অ্যাকটিভিটি। তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অনুসারী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষত শান্তির জন্য, তাঁর নামে আন্তর্জাতিক পদক প্রবর্তিত হয়।

জুলিয়াস নায়রারে তানজানিয়ার নেতা। স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি নেওয়ার পর দারেস সালামে ফিরে আসেন এবং ১৯৫৪ সালে তানজানিয়ান আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই দলের আন্দোলনের ফলেই ১৯৬১ সালে তানজানিয়া ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের কবল থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৬২ সালে তিনি তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে তিনি আরুশা ঘোষণা জারি করেন, যাতে তানজানিয়ার লক্ষ্য নির্ধারিত হয় দুটি সমাজতন্ত্র ও স্বনির্ভরতা। তিনি দেশের অধিকাংশ শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেন এবং কৃষকদের 'উজামা' নামক খামারের আওতায় সংঘবদ্ধ করেন। নায়রারে পশ্চিমা উদার গণতন্ত্রীদের কাছে যেমন গ্রহণীয় ছিলেন, তেমনি মস্কো ও বেইজিং-এর কাছেও ছিল তাঁর গ্রহণযোগ্যতা। তিনি পূর্ব আফ্রিকার সমস্ত রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি ফেডারেশন গঠনেরও স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তাঁর সে-স্বপ্ন কখনোই সফল হয়নি। বিদেশ থেকে প্রচুর সাহায্য পেলেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে তিনি তেমন সাফল্যমণ্ডিত হননি। অসংখ্য বিরুদ্ধবাদীদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলেও, সুদীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর যাবৎ তিনি তানজানিয়াকে আফ্রিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় শান্ত ও স্থিতিশীল রাখতে সমর্থ হন। ১৯৮৫ সালে তিনি স্বেচ্ছায় প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করেন। বিদায়ী ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "আমি ব্যর্থ হয়েছি। আমাকে তা স্বীকার করতে দিন।"

জেকোবিনবাদ : এটি ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-৯৪)-এর একটি উগ্র ঝোঁক। ফরাসি বিপ্লবের প্রথম দিকে জেকোবিনবাদীরাই নেতৃত্ব প্রদান করে। বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নেতা রোবেস্পিয়ার এ-দলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই মতবাদের আদর্শ ছিল অবাধ গণতন্ত্র, সামন্তবাদের ধ্বংস এবং ইউরোপের সম্মিলিত প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলা। জেকোবিনবাদীরা প্রতিবিপ্লবীদের প্রতিহত করতে পারলেও আর্থিক সংকট, বিশেষত বেকারসমস্যা ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে এদের সামাজিক সমর্থন হ্রাস পায় এবং পরিণামে বুর্জোয়ারাই তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়।

জেনিভা কনভেনশন ১৯৪৯ সালে, যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণবিধি নির্ধারণের জন্য, জেনিভায় এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাব্যস্ত হয় যে, যুদ্ধবন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে; কোনো তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তাদের ওপর কোনোপ্রকার শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন চাপিয়ে দেওয়া যাবে না; বন্দি হওয়ার পরপরই তাদের বিপজ্জনক এলাকা থেকে সরিয়ে নিতে হবে; অসুস্থ এবং যুদ্ধাহত বন্দিদের পক্ষ, জাতীয়তা, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক বিশ্বাস ইত্যাদি নির্বিশেষে খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার সমান সুযোগ দিতে হবে, বন্দিদের প্রতি নিজপক্ষীয় সৈন্যদের অনুরূপ আচরণই করতে হবে; যে-সমস্ত যানবাহন বা উড়োজাহাজ চিকিৎসা-সরঞ্জাম বা আহতদের বহন করছে, সেসব যানবাহন, উড়োজাহাজ ইত্যাদির নিরাপত্তা বিধান করতে হবে, বন্দিকারীরা সাধারণ বন্দিদের (অফিসারদের নয়) যুদ্ধ-বহির্ভূত কাজে লাগাতে পারবেন, তবে তা অমানবিক বা মাত্রাতিরিক্ত হতে পারবে না ইত্যাদি। এতে আরও সাব্যস্ত হয় যে, যত

দ্রুত সম্ভব যুদ্ধমান উভয় পক্ষ পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করবে, যাতে যুদ্ধে নিহত ও আহতদের শনাক্ত করা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত বা নিহত সৈন্যদের সঙ্গে অবস্থিত সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়। এই কনভেনশনে এটাও সাব্যস্ত হয় যে, আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক বন্দি-প্রত্যার্পণ নির্ধারিত হলে কিংবা কোনো নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বন্দিদের আশ্রয় দিতে সম্মত হলে, বন্দিদের বন্দি দশা থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। ইতঃপূর্বে ১৮৫৮ ও ১৮৬৪ সালেও অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

জেনোফোবিয়া Xenophobia. অপরিচিত বা বিদেশী ব্যক্তি, তত্ত্ব, সংস্কৃতি, উদ্যোগ ইত্যাদির প্রতি ভীতি ও অবিশ্বাস। জেনোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা বিদেশী বা অপরিচিত কোনো তত্ত্ব বা উদ্যোগের ভালোমন্দ আদৌ যাচাই না করে তা বর্জন করার পক্ষপাতী।

জেনোসাইড কনভেনশন Genocide Convention. বস্তুত জেনোসাইড শব্দটি খুবই হালের। পোল্যান্ডের অধ্যাপক আর. ল্যামকিন কোনো জাতিগত, ধর্মীয় বা ভাষাগত কারণে পরিকল্পিত ব্যাপক নরহত্যাকে বোঝানোর জন্য এই শব্দটি তৈরি করেন। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সদস্যদেশসমূহ এ-সম্পর্কিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে সাব্যস্ত হয় যে, স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ এ-ধরনের নরহত্যায় বাধা দেবে এবং হত্যাকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জেরি ম্যান্ডার Gerry Mander. কথাটির মানে হল অবৈধভাবে কোনো নির্বাচনী অঞ্চলকে এমনভাবে ভাগ করা, যাতে নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসা সম্ভবপর হয়। ক্ষমতাসীন দল বা ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নির্বাচনে, বিশেষত পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিরোধীদল বা ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে স্বীয় দল বা ব্যক্তিবিশেষকে সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে অবৈধ ও অস্বাভাবিকভাবে নির্বাচনী অঞ্চল ভাগ করাকেই বলে জেরি ম্যান্ডারিং। একসময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলকে কাবু করার উদ্দেশ্যে এভাবে নির্বাচনী এলাকা ভাগ করে। এই সময়ে উক্ত রাজ্যের গভর্নর ছিলেন এলব্রিজ জেরি (Elbridge Gerry)। তাঁরই নামানুসারে এরূপ অন্যায় ও অস্বাভাবিকভাবে নির্বাচনী এলাকা ভাগকে এই নামে অভিহিত করা হয়।

জেহাদ : সাধারণ অর্থে জেহাদ বা জ্বিহাদ হল ধর্মযুদ্ধ বা আল্লাহ-রাসুল (সা)-এর পথে যুদ্ধ। অধিকাংশ মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদের মতে জেহাদের উদ্দেশ্য হল, সমগ্র বিশ্বব্যাপী আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা, স্বার্থপর ও অত্যাচারী মানুষের কর্তৃত্বের উচ্ছেদ করা, মানবজীবনের সকল দিককে পরিব্যাপ্ত করে আল্লাহর বিধান প্রবর্তন করা এবং সর্বোপরি মানুষের গোলামি থেকে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ইসলাম প্রতিটি মুসলমানকে কুফর শির্ক-বিদআত-উস্-সইয়া এবং সকলপ্রকার অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়। কুরআন অনুযায়ী জেহাদ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ বা অপরিহার্য্য কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (সা)-এর মতে, যে-ব্যক্তি জীবনে কোনোদিন জেহাদে অংশগ্রহণ করল না, সে মুনাফিক অবস্থাতেই মারা গেল। আর মুনাফিকদের জন্য নির্দিষ্ট আছে কাফেরদের সঙ্গে অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান।

জৈন দর্শন চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর এই দর্শনের রচয়িতা। এঁদের মধ্যে সর্বশেষ তীর্থঙ্কর হলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক, মহাবীর বর্ধমান। জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয় এবং বেদের প্রমাণ্যতাও স্বীকার করে না। জৈনদের মতে বস্তুজগৎ চারটি উপাদানে গঠিত, যথা—স্থান, কাল, ধর্ম ও অধর্ম। এদের মতে, যার গুণ ও পর্যায় আছে তা-ই দ্রব্য। দ্রব্য দুপ্রকার, অস্তিকায় এবং অনস্তিকায়। যার বিস্তৃতি আছে, তা অস্তিকায় এবং যার বিস্তৃতি নেই তা অনস্তিকায়। অস্তিকায় দ্রব্য আবার দুপ্রকার, যথা—জীব ও অজীব। জীবও দুপ্রকার, মুক্ত ও বদ্ধ। জীব ও আত্মা এক ও অভিন্ন। যত জীব তত আত্মা। কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের মাধ্যমেই আত্মা অনন্ত শক্তি ও সুখ লাভ করতে পারে। কামনা-বাসনা আত্মাকে দুর্বল করে; আর কামনা-বাসনার মূলে রয়েছে অজ্ঞানতা বা মিথ্যা জ্ঞান। সুতরাং, সম্যক জ্ঞান লাভই হল মোক্ষের উপায়। জৈনশাস্ত্রে ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, ধর্ম আছে বলেই গতিশীল পদার্থের গতি এবং অধর্ম আছে বলেই স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতি সম্ভবপর। জৈনরা স্বর্গের দেবতার বদলে পৃথিবীর মানুষকেই বড় করে দেখার প্রয়াস পায়।

জো এন লাই বা চৌ এন লাই (১৮৯৬-১৯৭৬)—চীনের এই অন্যতম প্রধান নেতা প্যারিসে অধ্যয়নকালে, বিদেশে বসবাসরত চীনা নাগরিকদের নিয়ে একটি কমিউনিস্ট সেল গঠন করেন। ১৯২৩ সালে তিনি চীনে ফিরে এসে কুয়োমিনতাং অঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টি সেক্রেটারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি হোয়ামপোয়া সামরিক অ্যাকাডেমির রাজনৈতিক বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব নেন। ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টি-কুয়োমিনতাং ঐক্যের মাধ্যমে জাপানি আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যাপারে তিনি অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কূটনৈতিক যোগ্যতা ও দূরদর্শিতার দ্বারা তিনি মৃত্যুর পূর্বেই চীনের জন্য বিশ্বস্বীকৃতি, জাতিসংঘে চীনের আসন এবং নিরাপত্তা পরিষদে চীনের স্থায়ী আসন সুনিশ্চিত করে নেন। ১৯৭৬ সালের পর চীনে মাও ঝে ডংসহ বহু নেতার সম্মানহানি ঘটলেও জো এন লাইয়ের সম্মান পূর্ববৎ অক্ষুণ্ন থাকে।

জোট Alliance. কোনো সাধারণ (Common) উদ্দেশ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে একাধিক রাষ্ট্র বা দলের ঐক্যই হল জোট। যুদ্ধাবস্থা, সামরিক প্রয়োজন বা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে জোট গড়ে উঠতে পারে। নির্বাচন বা আন্দোলনের প্রশ্নে একাধিক দলের মধ্যেও জোট গড়ে ওঠে।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন : Non-aligned Movement. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষত পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন ব্লক গঠন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং ঠাণ্ডা লড়াই ব্যাপকতা লাভ করতে শুরু করে। তারই পটভূমিতে ১৯৫৬ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের ও যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো বেলগ্রেডে মিলিত হন এবং এই আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁরা মার্কিন বা সোভিয়েত কোনো জোটেই অনুন্নত বিশ্বের কোনো সদস্যের যাওয়া উচিত নয় বলে একমত হন। ১৯৬১ সালে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রথম বৈঠকে এই আন্দোলন একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ওই বছরের জুলাই মাসে কায়রোয় ২১টি

দেশ, সেপ্টেম্বরে বেলগ্রেডে ২৩টি দেশ বৈঠকে বসে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ আসলে তৃতীয় ব্লক। এই আন্দোলনের সদস্যেরা স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও উপনিবেশবাদ বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতির নীতি গ্রহণ করে এবং কোনো সামরিক জোটে জড়াবে না বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। ১৯৬৪ সালে কায়রোয় এবং ১৯৭০ সালে লুসাকায় এর পরবর্তী বৈঠক বসে। ইতিমধ্যে, আফ্রিকার বহু দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে এবং অপরদিকে ভিয়েতনাম ও কঙ্গোসমস্যা প্রবল আকার ধারণ করে। নবগঠিত আফ্রিকান ঐক্য সংস্থাও জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে। ওপেক (OPEC) বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে পরাশক্তিসমূহের একচেটিয়া আধিপত্য অনেকখানিই খর্ব করে দেয়। ১৯৭৩ সালে আলজির্সে অনুষ্ঠিত হয় এই আন্দোলনের চতুর্থ শীর্ষ বৈঠক। অতঃপর এই আন্দোলন আরও তীব্রতা প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে এই আন্দোলন অনুন্নত বিশ্বের জন্য নয়া আর্থ-সামাজিক কাঠামো খুঁজে পেতে তৎপর, তৎপর পরাশক্তিসমূহের কবলমুক্ত হয়ে অনুন্নত বিশ্বের সমৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতা অর্জনে। বর্তমানে এই আন্দোলনের সদস্য সংখ্যা শতাধিক।

॥ ট ॥

টয়েনবি, আর্নল্ড জোসেফ ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ। বিংশ শতাব্দীর এই ঐতিহাসিকের মতে বিশ্ব-ইতিহাস কতগুলো সভ্যতার সমষ্টি এবং প্রতিটি সভ্যতারই রয়েছে জন্ম, বিকাশ, অবক্ষয় ও ধ্বংসের পর্যায়। তাঁর মতে, ইতিহাসের এরূপ পরিবর্তনের কারণ হল ঐশ্বরিক ইচ্ছা। এ ছাড়াও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একদিন মিলিত হওয়া, ইতিহাসের নিয়ামক হিসাবে ঈশ্বরের অভিলাষস্বরূপ সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব এবং সংখ্যালঘুর তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। তিনি একথাও বিশ্বাস করতেন যে, আধ্যাত্মিকতার দ্বারা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভবপর।

টাস্ক ফোর্স সামরিক অর্থে, কোনো বিশেষ অভিযানের জন্য একক কমান্ড বা নেতৃত্বাধীন স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সম্মিলিত দল। সাধারণ অর্থে, কোনো একটি সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য গঠিত একটি সুনির্দিষ্ট দলই হল টাস্ক ফোর্স (Task Force)।

টিআরসি রিপোর্ট : Truth and Reconciliation Commission (TRC)-এর রিপোর্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু ১৯৯৮ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার নিকট এই রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৯৪ সালে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (ANC)-এর নিকট বর্ণবাদী সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় এই কমিশন গঠন করা হয়। ৫ খণ্ডে প্রকাশিত এই রিপোর্টের উদ্দেশ্য ১৯৬০ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত ৩৬ বছরের বর্ণবাদী শাসনামলে সংঘটিত অন্যায়-অবিচারের চিত্র তুলে ধরা এবং সত্যপ্রকাশের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা। এই রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। এতে সাবেক শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট পি. ডব্লু. বোথা, এফ. ডব্লু. ডি. ক্লার্ক ও বিভিন্ন মন্ত্রীর বর্ণবাদী

অপকীর্তির কথাও বিধৃত আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মনে এই রিপোর্ট জাতীয় ঐক্যের বদলে জাতীয় বিভেদকেই উসকে তুলেছে।

টিকে থাকার সংগ্রাম প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণীর টিকে থাকার প্রক্রিয়া। বস্তুত প্রাণীকে প্রকৃতির জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় যারা পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে, তারাই টিকে যায়, অন্যেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াতেই ডায়নোসরসহ পৃথিবীর বহু প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই সংগ্রাম উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একধরনের প্রাণী বা উদ্ভিদের সঙ্গে অপরাপর ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্পর্কও একধরনের টিকে থাকার সংগ্রাম। নয়া ডারউইনবাদীদের মতে, মানবসমাজেও কে বা কোন শ্রেণী টিকে থাকবে, তা এই প্রাকৃতিক বিধির দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এঁদের মতে, শাসক-শোষকরা যোগ্যতর বলেই শাসক-শোষক। অনেকের মতে, এটা টিকে থাকার সংগ্রামের তত্ত্বের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যাখ্যা মাত্র।

টেনিসকোর্ট শপথ : ফরাসি বিপ্লবের প্রথম দিককার এক নাটকীয় ঘটনা। ১৭৮৯ সালের ২০ জুন তারিখে তৃতীয় স্টেট বা পার্লামেন্টের ডেপুটিরা, আকস্মিকভাবে ভার্সাইয়ের নির্ধারিত সম্মেলনস্থল বন্ধ করে দেওয়াকে তৃতীয় এস্টেট আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে দেওয়ার পূর্বলক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করেন এবং রাজপ্রাসাদের অপরপার্শ্বস্থ রাজকীয় টেনিসকোর্টে (লম্বা খোলা হলঘরে) মুলতবি বৈঠকে মিলিত হন। মি. বেইলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে ডেপুটিরা শপথ গ্রহণ করেন যে, যে-পর্যন্ত দেশের শাসনতন্ত্র শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে, সে-পর্যন্ত তাঁরা যখনই প্রয়োজন, তখনই বৈঠকে মিলিত হতে থাকবেন। স্বভাবতই, এই শপথ ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর জনগণের বিপ্লবাত্মক দাবিরই শামিল। অবশ্য এই শপথের তিনদিন পরেই ডেপুটিগণ তাঁদের স্যাবেক সম্মেলনস্থলে ফিরে যেতে সমর্থ হন।

টোকিও ট্রাইব্যুনাল International Military Tribunal at Tokyo. ১৯৪৫ সালে আণবিক বোমাবর্ষণের ফলে হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর ধ্বংস হওয়ার পর ২ সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে (আত্মসমর্পণ করে ২৬ জুলাই)। অতঃপর ন্যুরেমবার্গ বিচারের আদলে জাপানের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস্, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত, ফিলিপিনস্—এই ১১ দেশের বিচারকদের সমন্বয়ে গঠন করা হয় টোকিও ট্রাইব্যুনাল। এই ট্রাইব্যুনাল ২৮ জুন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করে। নবেম্বর মাসে প্রদত্ত রায়ে ট্রাইব্যুনাল তো জো, মুতো, মাতসুয়ী, হাগাতি, কিমুরা, হিরোতা এবং দোহিহারাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে ; তো গো ও শিগিমিতু যথাক্রমে ২০ ও ৭ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, অন্যদের হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। নামমাত্র রাজা বিধায় সম্রাট হিরোহিতোকে বিচার থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

টোটেম Totem বা পবিত্র বংশচিহ্ন। কোনো কোনো অসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতি বিশ্বাস করে যে, তাদের পূর্বপুরুষদের জন্মের উৎস হচ্ছে কোনো বস্তু, বৃক্ষ বা প্রাণীবিশেষ। ঐ বস্তু, বৃক্ষ বা প্রাণীকে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী তাদের বংশচিহ্ন হিসাবে পবিত্র জ্ঞান করে এবং এর পূজা করে।

টোটেমবাদ টোটেম বা বংশচিহ্নে বিশ্বাস করা এবং তার পূজা করা। প্রাচীনকালে ব্রিটন, হিব্রু ও গ্রিকদের মধ্যে এর প্রচলন ছিল। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আফ্রিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর ব্যাপক প্রভাব ছিল। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও এর রেশ বর্তমান আছে।

টোরি : ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের সমর্থককেই সাধারণত টোরি (Tory) নামে অভিহিত করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে আইরিশ বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে, ব্যর্থ বিদ্রোহীদের যে-সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আয়ারল্যান্ডের এখানে-সেখানে ডাকাতি করে বেড়াত, তাদেরকেই বলা হত টোরি। ১৬০০ সালে যাঁরা রাজা দ্বিতীয় চার্লস-এর ক্যাথলিক উত্তরাধিকারী নিয়োগের ব্যাপারটি অনুমোদন করেন, তাঁদেরকে তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা 'শৌখিন চোর' বলে অভিহিত করত। এই শৌখিন চোরদেরই অপর নাম ছিল টোরি। ১৬৮৯ সালের পর টোরিরা স্টুয়ার্ট রাজবংশের পক্ষে যান, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের সমর্থকে পরিণত হন। ১৮৩২ সালের পর তাঁরা নিজেরাই নিজেদের রক্ষণশীল বলে অভিহিত করেন।

ট্যাফ্‌ট্‌-হার্টলি অ্যাক্ট : প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আপত্তি সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালের ২৯ জুন, রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিন কংগ্রেস শ্রমিক ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত এই আইনটি পাশ করে। এ-আইনে ১. প্রেসিডেন্টকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়, যাতে তিনি কোনো শ্রমিক ধর্মঘটকে জনস্বার্থের পরিপন্থি বিবেচনা করলে, তার জন্য অনুসন্ধান বোর্ড গঠন করতে পারেন এবং ৭৫-৮০ দিনের জন্য ধর্মঘট বেআইনি ঘোষণা করে ইনজাংশান প্রদানের জন্য ফেডারেল জেলা আদালত কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অ্যাটর্নি জেনারেলকে নির্দেশ দিতে পারেন (অবশ্য, এ-সময়ের মধ্যে মালিকের প্রস্তাবের ওপর শ্রমিকরা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেবে এবং এতে কোনো সমঝোতা না হলে শ্রমিকরা আবার ধর্মঘটে যেতে পারবে), ২. শ্রমিকদের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের তালিকা সংবর্ধিত করা হয়, ৩. 'ক্লোজড শপ' বা 'অতঃপর আর কোনো আলাপ আলোচনা নয়' জাতীয় চুক্তি সম্পাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়, ৪. নয়া চুক্তির প্রস্তাবসংবলিত ৬০ দিনের নোটিশ না দিলে মালিক বা শ্রমিক যে-কারও পূর্বচুক্তি বাতিল নিষিদ্ধ করা হয় এবং ৫. ফেডারেল নির্বাচনে ইউনিয়ন কর্তৃক খরচ নিষিদ্ধ করা হয়। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এই চুক্তি অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি করবে এবং শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিরোধিতা করেন। সংগঠিত শ্রমিকরাও এই আইনের তীব্র বিরোধিতা করে।

ট্যাবু : Taboo, অর্থাৎ স্পর্শ নিষিদ্ধকরণ প্রথা। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে অস্পৃশ্য বা অপবিত্র বিবেচনা করে নিষিদ্ধ বা পরিহার করাই হল ট্যাবু। পৃথিবীর প্রায় সকল আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও কোনো কোনো সমাজে এই প্রথা বিদ্যমান। এই প্রথানুযায়ী অপরিচিত ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, মৃতদেহ ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। তা ছাড়া, কোনো পুরোহিত বা দলপতিও কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তির জিনিসকে সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করতে পারেন। যে-ব্যক্তি নিষিদ্ধ ব্যক্তি বা দ্রব্যকে স্পর্শ করবে, সেও নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। নিষিদ্ধকরণ অমান্যকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করাই সাধারণ বিধি। সভ্যসমাজেও এই প্রথা অর্থাৎ ট্যাবু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কমবেশি দেখা যায়।

ট্রটস্কি, লিওন (১৮৭৭-১৯৪০) রুশ বিপ্লবের নেতা লেনিনের নিকটতম দুই সহযোগীর অন্যতম। লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ট্রটস্কির সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছে। স্ট্যালিন ট্রটস্কির চিরস্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্বের ঘোরতর বিরোধিতা করেন। ১৯২৮ সালে তিনি চীন সীমান্তে নির্বাসিত হন। এরপর তিনি দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। ১৯৪০ সালে মেক্সিকোয় ট্রটস্কি গুপ্তঘাতকের হাতুড়ির আঘাতে নির্মমভাবে নিহত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে, 'হিস্ট্রি অব রাশিয়ান রিভল্যুশন', 'দি রিভল্যুশন বিট্রেড', 'মাই লাইফ' ইত্যাদিই অন্যতম। অনেকের মতে স্ট্যালিন ও ট্রটস্কির দ্বন্দ্ব ছিল মূলত ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব।

ট্রাইব্যুনাল Tribunal. ফরাসি আইনে ট্রাইব্যুনাল হল নিম্নতর আদালত, যা ইংলিশ ক্রাউন কোর্টের সমগোত্রীয়। এই ট্রাইব্যুনাল সাধারণত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের মামলার মীমাংসা করে থাকে। তবে ট্রাইব্যুনাল বলতে প্রধানত বোঝায় এমন আদালত যা একটি বিশেষ কাজ বা উদ্দেশ্যে গঠিত। যেমন– ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক-মালিক বা শ্রমিক-মালিক-সরকার-এর মধ্যে উদ্ভূত বিবাদ নিরসনের জন্য বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হল। কিংবা ব্যাপক দুর্নীতির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতিবাজদের বিচার করার জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হল। অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত মামলাসমূহের মীমাংসা করার জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হল। অনেক ক্ষেত্রে সামরিক শাসকরা ক্ষমতা দখলের পর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং তাদের ইচ্ছানুযায়ী বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও মামলার বিচার করার জন্যও সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে থাকে।

ট্রাস্ট : ট্রাস্ট (Trust) কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের একীভূত রূপ। ট্রাস্ট গঠিত হলে এরমধ্যে অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকরা ট্রাস্টের অংশীদারে পরিণত হন এবং ট্রাস্ট একটি একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানরূপে সমগ্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কার্টেলের তুলনায় সিন্ডিকেট এবং সিন্ডিকেটের তুলনায় ট্রাস্ট আরও নিবিড়ভাবে সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

ট্রিনিটি : খ্রিস্টীয় মতে ঈশ্বরের ত্রয়ীতত্ত্বই হল ট্রিনিটি (Trinity)। ঈশ্বরের এই ত্রয়ী রূপ হল পবিত্র পিতা (Holy Father), পবিত্র পুত্র (Holy Son) এবং পবিত্র আত্মা (Holy Ghost)। এখানে যিশুখ্রিস্টই পবিত্র পুত্র এবং গ্রাব্রিয়েলই পবিত্র আত্মা।

ট্রিম্‌স্‌ Trade Related Investment Measures (TRIMS). অর্থাৎ বাণিজ্য-সম্পর্কিত বিনিয়োগ-ব্যবস্থাদি। উরুগুয়ে রাউন্ডে প্রস্তাবিত ট্রিমস্‌-এর মূলকথা হচ্ছে, কোনো দেশ তার নিজের দেশের কোম্পানি ও বিদেশী কোম্পানির মধ্যে কোনো ভেদাভেদ বা বৈষম্য করতে পারবে না; বরং উভয়ের ক্ষেত্রে একইরূপ সুযোগ-সুবিধাই দিতে হবে। ট্রিমস্‌-এর পাশাপাশি ট্রিপ্‌র (Trade Related Intellectual Property Rights. (TRIPR) বা বাণিজ্য-সম্পর্কিত মেধা সম্পদ অধিকার প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

ট্রুম্যান নীতি : ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যান কর্তৃক ঘোষিত নীতিই ট্রুম্যান নীতি (Truman Doctrine) নামে খ্যাত। গ্রিস এবং তুরস্কের জন্য ৪০ কোটি ডলার জরুরি সাহায্যের অনুমোদন চেয়ে, কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলেন যে, যে-সমস্ত মুক্ত জাতি বহির্বিশ্বের চাপ বা অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা, কেননা এটা করতে ব্যর্থ হলে শুধু বিশ্বশান্তিই বিনষ্ট হবে না; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব কল্যাণও হুমকির সম্মুখীন হবে।

ট্রেড ইউনিয়ন : শ্রমিকদের সাধারণ দাবিদাওয়া আদায় ও স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতি। ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণত শ্রমিকদের উচ্চতর মজুরি, ন্যূনতর কাজের সময়, চাকরির স্থায়িত্ব, বোনাস, বিভিন্ন ভাতা, ছুটিবৃদ্ধি, চিকিৎসা, বাসস্থান, গ্রাচুয়িটি, পেনশন ইত্যাদি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবিতে মালিক বা কর্তৃপক্ষের নিকট দাবিনামা পেশ করে এবং দাবিনামার ভিত্তিতে আন্দোলন করে। দাবি আদায়ের হাতিয়ার হিসাবে ঘেরাও, অবস্থান ধর্মঘট, পূর্ণ ধর্মঘট ইত্যাদিরও আশ্রয় নেওয়া হয়। প্রথম দিকে ট্রেড ইউনিয়ন সরকার ও মালিকদের দ্বারা স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করে। বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার শ্রমজীবী মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পরিণতিতে সাধারণত দ্বিপক্ষীয় চুক্তি (শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে) বা ত্রিপক্ষীয় চুক্তি (শ্রমিক, কর্তৃপক্ষ এবং সরকার) সম্পাদিত হওয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। অনেক সময় সমস্বার্থে কতিপয় ট্রেড ইউনিয়ন মিলে ফেডারেশনও গঠন করে। সমাজতন্ত্রীদের মতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রেখে শ্রমিকদের কিছু সাময়িক সুবিধা আদায়ের আন্দোলন। তবু, সমাজতন্ত্রীরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে এজন্য সমর্থন করে যে, এরূপ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়, অধিকার ও শ্রেণীসচেতন হয়, জঙ্গি মনোভাব ও লড়াইয়ের কৌশল অর্জন করে। এজন্য অনেকে ট্রেড ইউনিয়নকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূতিকাগার বলে অভিহিত করনে। আবার অনেকে মনে করেন যে, অনুন্নত বিশ্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য কিছু না দিলেও (জাতীয় অর্থনৈতিক দৈন্য ও অস্থিতিশীলতার দরুন) উন্নত দেশসমূহে ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের জন্য এমন মজুরি ও অন্যান্য সুবিধাদি আদায় করতে সমর্থ হয়েছে, যার ফলে শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা (খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য ও বাসস্থান) বলতে গেলে মিটে গেছে এবং মার্কস-এঙ্গেলসের 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' (১৮৪৮)-তে ঘোষিত অবস্থা (যাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর আর কিছুই নেই বলে বলা হত) থেকে অনেক উন্নততর অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়নবাদ শ্রমজীবী মানুষদের ট্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধকরণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে জোরদার করার মাধ্যমেই শ্রমজীবী মানুষের সমস্যার সমাধান ও শোষণের অবসান সম্ভবপর, এই মতবাদকেই বলে ট্রেড ইউনিয়নবাদ (Trade Unionism)।

॥ ঠ ॥

ঠাণ্ডা লড়াই Cold War. ঠাণ্ডা লড়াই হল দুই দেশ বা দুই শক্তির মধ্যে এমন এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, যে-পরিস্থিতিতে তারা ঠিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধিয়ে ফেলেনি বটে, কিন্তু উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে, পরস্পরের বিরুদ্ধে

কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে এবং বিভিন্ন উপায়ে পরস্পর পরস্পরকে হীনবল ও মিত্রহীন করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছে। বস্তুত ১৯৪৭ সালের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রসমূহ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রসমূহের মধ্যেকার উত্তেজনাই হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সবচেয়ে যথার্থ উদাহরণ। এ ছাড়াও, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিস্থিতি প্রায়শই সৃষ্টি হয়। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিস্থিতিতে এক পক্ষ অপর পক্ষকে মিত্রহীন করে তোলার প্রয়াস পায়, অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এবং বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক উপায়ে শত্রুদেশের অভ্যন্তরে অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধ সৃষ্টির প্রয়াস পায়, শত্রুর অর্থনীতিকে ধ্বংস বা পঙ্গু করার প্রয়াস চালায় এবং প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করে দুর্বলতর বা তাঁবেদার সরকার কায়েমের চেষ্টা চালায়। ঠাণ্ডা লড়াই যে-কোনো সময় পূর্ণাঙ্গ বা গরম লড়াইয়ে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। দীর্ঘদিন যাবৎ দুই কোরিয়া কিংবা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও ঠাণ্ডা লড়াই বলবৎ আছে।

॥ ড ॥

ডগমা Dogma. প্রথম দিকে 'ডগমা' বলতে বোঝানো হত অন্ধ বা গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্মমতকে। বর্তমানে, যুক্তিতর্কের তোয়াক্কা না করে যে-কোনো একটি রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক দর্শন বা মতবাদে বিশ্বাস করাকেও ডগমা বলা হয়। এক কথায় ডগমা হল অন্ধ বিশ্বাস বা মতবাদ।

ডলার কূটনীতি : Dollar Diplomacy. এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিরই অপর নাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন ব্যাবসা-বাণিজ্য, তথা সমগ্র মার্কিন অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বার্থে এবং প্রভাববলয় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'আন্তর্জাতিক মৈত্রী', 'অনুন্নত বিশ্বের অর্থনীতির পুনর্গঠন', 'কমিউনিজমের আক্রমণ থেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা' ইত্যাদির নামে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে শত শত কোটি ডলার ঋণ ও সাহায্য প্রদান করে। কার্যত এই ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে মার্কিন পণ্যের একচেটিয়া বাজার বজায় রাখার প্রয়াস চালানো হয় এবং ঋণ বা সাহায্য-গ্রহীতা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ইত্যাদির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করা হয়।

ডাইরেক্ট অ্যাকশন বা প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা (Direct Action)। কোনো রাজনৈতিক দল লক্ষ্য বা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে সভা-সমিতি অনুষ্ঠান, দাবিনামা পেশ ইত্যাদির বদলে এমন কিছু সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ, যাতে সরকার বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে আর নিস্পৃহ থাকা সম্ভবপর না হয়। ধর্মঘট, হরতাল, বয়কট, ট্যাক্স বন্ধ, আইন অমান্য ইত্যাদি ডাইরেক্ট অ্যাকশনের আওতাভুক্ত।

ডাউনিং স্ট্রিট : লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টারে অবস্থিত এই রাস্তাটির ১০ নম্বর বাড়িটি হল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন। এই রাস্তারই ১১ নম্বর বাড়িতে থাকেন চ্যান্সেলর অব দি এক্সচেকার অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী। ব্রিটিশ বৈদেশিক দফতরও এই রাস্তায় অবস্থিত।

ডানকার্ক চুক্তি ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মধ্যে ডানকার্কে সম্পাদিত এই চুক্তি মোতাবেক উভয় দেশ একমত হয় যে, জার্মানি যদি এ-দুদেশের কোনো

দেশকে আক্রমণ করে, তা হলে উভয় দেশ সম্মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করবে। তা ছাড়া, অর্থনৈতিক ব্যাপারেও প্রতিনিয়ত উভয়পক্ষের মধ্যে মতবিনিময় চলতে থাকবে বলেও চুক্তিতে সাব্যস্ত হয়। এই চুক্তির ফলে ফ্রান্সের পুনরায় উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসাবে আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত হয়।

ডাম্বার্টন ওকস সম্মেলন Dumberton Oaks Conference. ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটনের ড্যাম্বার্টন ওকস-এ চীন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর শীর্ষ নেতারা এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে প্রস্তাবিত জাতিসংঘের কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই সম্মেলনেই সাব্যস্ত হয় যে, উপরোক্ত চারটি দেশ এবং ফ্রান্স জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য থাকবে। এই সম্মেলনের সূত্র ধরেই পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হয় ইয়ালটা সম্মেলন।

ডায়ালেকটিক্স্ অব নেচার Dialectics of Nature, অর্থাৎ প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা। ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এঙ্গেলসের মতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তি হতে হবে প্রকৃতিবিজ্ঞান। অপরদিকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের ফলপ্রসূ জ্ঞান সম্ভবপর নয়, যদিনা তা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। তিনি তাঁর সমকালীন প্রকৃতিবিজ্ঞানের ওপর গভীর জ্ঞান নিয়ে ইতিহাসের দার্শনিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং প্রমাণ করার প্রয়াস পান যে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী নিয়ম প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি সমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সমাজেরও বিকাশ ঘটে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী নিয়মে। তিনি এই গ্রন্থে প্রকৃতি ও সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনা করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূলসূত্র ও গতিপ্রকৃতি চিহ্নিত করেন। তাঁর এই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই মার্কস-এঙ্গেলস-বর্ণিত সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। এই গ্রন্থের সম্পূরক গ্রন্থ তাঁরই রচিত 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' বা 'ড্যুরিং-এর বিরুদ্ধে।'

ডারউইন, চার্লস রবার্ট : (১৮০৯-১৮৮২) ইনি একজন ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'The Origin of Species' সারা বিশ্বব্যাপী প্রচণ্ড হৈচৈ ফেলে দেয়। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণার ফল হিসাবে বিবর্তনের যে-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হাজির করেন, তা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। ডারউইনের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ছিল বস্তুবাদী এবং স্বভাবতই দ্বান্দ্বিকতাবাদী। তিনি 'প্রাকৃতিক বাছাই' বা Natural Selection-এর তত্ত্ব হাজির করে দেখান যে, সমগ্র প্রাণিজগৎই বিবর্তনের মধ্য দিয়েই বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং প্রাণিজগতের সদস্যদের অবলুপ্তি, টিকে থাকা ও বিবর্তনের পেছনে কাজ করছে প্রাকৃতিক বাছাই। অবশ্য, পরবর্তীকালের কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ডারউইনের অনেক তত্ত্ব বা মতামতই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। 'মানুষ বানর থেকে এসেছে' এ-তত্ত্ব ডারউইন কখনোই দেননি এবং প্রাণিজগতের যে-পরিবারবিভাগ তিনি করেছেন তাতে মানব বা অ্যানথ্রোপয়েড পরিবারের মধ্যে বানরের কোনো সদস্যত্ব নেই। তবু অনেকে অজ্ঞতাবশত এরকম একটি অদ্ভুত তত্ত্বের জন্য তাঁকে অনাহূত দায়ী করেন।

ডি-৮ Developing–8. ইসলামি সম্মেলন (OIC)-ভুক্ত ৮টি দেশ এই সংস্থা গঠন করে। ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে তুরস্কের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেকমেতিন এরবাকানের প্রস্তাব অনুসারে এই সংস্থা গঠিত হয়। এর সদস্য হচ্ছে বাংলাদেশ, তুরস্ক,

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া ও মিসর। এই সংস্থার মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দরকষাকষির জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা। জনসম্পদ, ভূমিসম্পদ ও খনিজসম্পদের দিক থেকে এই জোটকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বলে বিবেচনা করা হয়।

ডিজরেলি, বেঞ্জামিন (১৮০৪-৮১) খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণকারী জনৈক ইহুদি লেখকের পুত্র ডিজরেলি তিনবার ব্যর্থ চেষ্টার পর চতুর্থবার মেইডস্টোন থেকে ব্রিটেনের পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন (১৮৩৭)। তিনি টোরি দলভুক্ত এবং ইয়াং ইংল্যান্ড আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তিনি পিল-এর অবাধ বাণিজ্যনীতির বিরোধিতা করেন। তিনি ১৮৫২, ১৮৫৮-৫৯ এবং ১৮৬৭ সালে চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেকার (বা অর্থমন্ত্রী)-এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৬৮ সালে দশ মাস প্রধানমন্ত্রিত্ব করার পর তিনি ছয় বছর বিরোধীদলের নেতা হিসাবে কাজ করেন এবং ১৮৭৪-৮০ সাল পর্যন্ত সময়ে পুনরায় প্রধানমন্ত্রিত্ব করেন। তাঁর বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতির জন্য তাঁকে রক্ষণশীল দলের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তাঁর উদ্যোগেই ব্রিটেন সুয়েজ খালের ৪০ শতাংশ শেয়ার কেনে। 'সিবিল' (Cybil) ও 'কনিংসবি' (Coningsby) শীর্ষক দুটি রাজনৈতিক উপন্যাসও তিনি রচনা করেন।

ডিজিট্যাল গেরিলা ওয়ারফেয়ার রাজতন্ত্রবিরোধী সৌদি চিন্তাবিদ ডঃ মোহাম্মদ আল মাসারি সৌদি আরবে ইসলামিক কমিটি ফর দি ডিফেন্স অব লেজিটিমেট রাইটস (বা ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য ইসলামি কমিটি) গঠন করেন এবং সৌদি আরবে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা, সৌদি আরব থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণ ও দুর্নীতির মূলোৎপাটনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। সৌদি সরকার ১৯৯৩ সালে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে এবং পরে ইয়েমেনে নির্বাসন দেয়। ১৯৯৪ সালে ডাঃ মাসারি ব্রিটেনে চলে আসেন এবং রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করন। ব্রিটেন থেকে ডঃ মাসারি সৌদি সরকারের সমালোচনামূলক বিবৃতি, প্রবন্ধ ও অন্যান্য সামগ্রী টেলিফোন ও ফ্যাক্সযোগে সৌদি আরবের প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর এই কর্মপন্থাকে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম 'ডিজিটাল গেরিলা ওয়ারফেয়ার' নামে অভিহিত করে। রিয়াদে একটি মার্কিন সেনাছাউনিতে বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন মার্কিন সৈন্য নিহত হলে ডঃ মাসারি দায়ী ব্যক্তিদের প্রতি সমর্থন জানান। এতে কুপিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০ দিনের মধ্যে ডঃ মাসারিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলে ডোমিনিকান রিপাবলিক তাঁকে আশ্রয় দিতে সম্মত হয়।

ডি জ্যুর স্বীকৃতি Dejure Recognition কোনো একটি রাষ্ট্র বা সরকারকে এই মর্মে নিঃশর্ত স্বীকৃতি প্রদান করা যে, সেই রাষ্ট্র বা সরকার প্রকৃতই স্বাধীন, তার এলাকার ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বশীল এবং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম। বস্তুত কোনো রাষ্ট্র বা সরকারকে ডি ফ্যাক্টো স্বীকৃতি দেওয়া হল অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা; আর ডি জ্যুর স্বীকৃতি হল চূড়ান্ত কূটনৈতিক স্বীকৃতি।

ডিফারেন্সিয়াল রেন্ট Differential Rent. একই ধরনের জমিতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির দরুন মুনাফার হারের যে বৃদ্ধি ঘটে, সেটাকেই বলে ডিফারেন্সিয়াল রেন্ট। যেমন ধরা যাক, দুজন কৃষকের সমপরিমাণ ও সম উর্বরতাসম্পন্ন দুখণ্ড জমি আছে। প্রথম কৃষক তার জমিতে ২০০ টাকা পরিমাণ শ্রম ও পুঁজি বিনিয়োগ করল।

দ্বিতীয় কৃষক বিনিয়োগ করল ৩০০ টাকা পরিমাণ। ফলে, প্রথম জনের ফসল হল তিন মণ। আর দ্বিতীয় জনের ফসল হল পাঁচ মণ। বাজারের নিয়ম হল এই যে, বাজারদর নির্ধারিত হবে যার উৎপাদন-খরচ বেশি পড়ছে তারই পড়তার ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে, প্রথম জনের উৎপাদন-খরচ পড়েছে মণপ্রতি প্রায় ৬৭ টাকা, আর দ্বিতীয় জনের খরচ পড়েছে মণপ্রতি ৬০ টাকা। সুতরাং, ফসলের বাজারদর মণপ্রতি ৬৭ টাকার কম হতে পারে না। ধরা যাক, কিঞ্চিৎ লাভসহ ফসলের বাজারদর নির্ধারিত হল মণ প্রতি ৭০ টাকা। তা হলে, প্রথম কৃষকের লাভ হল (৭০×৩)—২০০=১০ টাকা। আর দ্বিতীয় কৃষকের লাভ হল (৭০×৫)-৩০০=৫০ টাকা। অর্থাৎ বিনিয়োগের ওপর প্রথম কৃষকের লাভ হল শতকরা ৫ টাকা; আর দ্বিতীয় কৃষকের লাভ হল শতকরা ১৬.৬০ টাকা। দ্বিতীয় কৃষক বিনিয়োগ বাড়িয়ে এই যে অধিক হারের মুনাফা করল, এটাই হল ডিফারেন্সিয়াল রেন্ট। এই রেন্টের কারণ হল সর্বোচ্চ উৎপাদন-খরচের ভিত্তিতে বাজারদর নির্ধারিত হওয়া। লেনিনের মতে, যে-সমাজব্যবস্থায় এই ডিফারেন্সিয়াল রেন্ট ও অ্যাবসল্যুট রেন্টের অস্তিত্ব রয়েছে, সেই সমাজ অবশ্যম্ভাবী রূপেই পুঁজিবাদী সমাজ। সামন্তবাদী সমাজে এ-দুটি রেন্ট অনুপস্থিত।

ডিফেক্টো স্বীকৃতি De Facto Recognition. এটা হল, আন্তর্জাতিক দায়িত্বপালনে পূর্ণ সক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও কোনো রাষ্ট্র বা সরকারকে কার্যত স্বাধীন এবং নিজ এলাকার ওপর কর্তৃত্বশীল বলে স্বীকার করে নেওয়া। ব্রিটিশ মতে, এরূপ স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে নমনীয় মনোভাব পোষণ করে।

ডি ভ্যালেরা, এডওয়ার্ড আইরিশ রাজনীতিবিদ। জন্ম ১৮৮২ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখে, নিউইয়র্কে। তাঁর পিতা ছিলেন স্প্যানিশ বাদ্যকর আর মা ছিলেন আইরিশ। দুবছর বয়স থেকেই তিনি আয়ারল্যান্ডে লালিত-পালিত হন। ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি আইরিশ জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন, ১৯১৬ সালের ডাবলিন ইস্টার বিদ্রোহে অংশ নেন এবং একদল স্বেচ্ছাসেবীর নেতৃত্ব দেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয় কিন্তু তিনি ১৯১৭ সালে সাধারণ ক্ষমার আওতায় কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন। ১৯১৭-২৬ সালে তিনি সিনফিন আন্দোলনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করনে। ১৯১৯ সালে তিনি আইরিশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের জন্য ৬০ লক্ষ ডলার চাঁদা তোলার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং ফিরে এসে আইন সভা (Dail Eireann)-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২২ সালে আয়ারল্যান্ডকে বিভক্ত করার প্রতিবাদে তিনি এই সদস্যত্ব ত্যাগ করেন এবং আইরিশ প্রজাতন্ত্রী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯২৬ সালে তিনি আয়ারল্যান্ডের সেনানী (Fianna Fail) নামক এক নতুন দল গঠন করেন। এই দলের লক্ষ্য ছিল, আয়ারল্যান্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা, উত্তর আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে মূল আয়ারল্যান্ডের সংযুক্তি এবং আইরিশ ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। ১৯৩২ সালে তাঁর দল 'ফায়ানা ফেইল' শ্রমিকদলের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাঁত করে এবং নির্বাচনে জয়লাভ করে। ফলে তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়েই আয়ারল্যান্ড পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে এবং ব্রিটিশ কমওয়েলথের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। ১৯৪৮ সালে আয়ারল্যান্ড গণপ্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয় এবং ফায়ানা ফেইল সংযুক্ত আয়ারল্যান্ড (Fianna Gael) দলের কাছে পরাজয় বরণ করে। কিন্তু

১৯৫১-৫৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার এবং ১৯৫৭ সালে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সালে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

ডিমাগগ Demagogue. যে-সমস্ত রাজনৈতিক নেতা কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি-আদর্শের বদলে আবেগপ্রবণ বক্তৃতা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, অসার ও অবাস্তব দাবিনামা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে উত্তেজিত করে তোলেন এবং উত্তেজিত জনতার রোষকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রয়াস পান, সেই সমস্ত রাজনৈতিক নেতাকে বলে ডিমাগগ। ডিমাগগরা সাময়িক ইস্যু, সস্তা মুখরোচক শ্লোগান ইত্যাদি নিয়েই মেতে থাকেন, কখনোই তাত্ত্বিক বিষয়ে বা সমস্যার গভীর যান না।

ডিসেম্বরবাদী : Decemberist. সমাজের সম্ভ্রান্ত স্তর থেকে আগত সেইসব রুশ বিপ্লবী, যাঁরা জারের স্বৈরতন্ত্র ও ভূমিদাসত্বের বিরুদ্ধে ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। ডিসেম্বরবাদীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয় এবং এর প্রধান নেতা ও তাত্ত্বিক পেস্টেল, রাইলিয়েব, কাখোভস্কি, এপোস্টল, রিউমিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল এই যে, সম্ভ্রান্ত বলে তাঁদের ছিল সীমাবদ্ধতা, তাঁরা জনগণ থেকে ছিলেন বিচ্ছিন্ন, গণবিপ্লব সম্পর্কে ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত এবং তাঁদের কৌশলের মধ্যে ছিল দোদুল্যমানতা। তবে, তাঁরা তৎকালীন বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং আদর্শবাদ, মরমিবাদ, ধর্মবাদ, ভূমিদাসত্ববাদ ইত্যাদির বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁদের মতে বস্তু ও পরিবেশকে বোঝার দুটি উপায়, যথা—ক. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা এবং খ. বুদ্ধিবৃত্তি। ডিসেম্বরবাদীদের আন্দোলন পরবর্তী কালের বিপ্লবীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। লেনিন এঁদের, বিশেষত এঁদের অন্যতম নেতা হেরজেন (১৮১২-৭০)-কে ওই পর্যায়ের রুশ মুক্তিসংগ্রামের অতুলনীয় নেতা বলে অভিহিত করেন।

ডুম্‌স্ ডে প্রজেক্ট : Doorn's day Project. কোনো সময়ে পারমাণবিক হামলা হয়ে সবকিছু ধ্বংসের উপক্রম হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টসহ সর্বোচ্চ পর্যায়ের ১৭ জন কর্মকর্তার নিশ্চিত জীবনরক্ষার জন্য যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সেটারই নাম দেওয়া হয়েছে ডুম্‌স্ ডে প্রজেক্ট বা মহাপ্রলয় দিবস প্রকল্প।

ডুরান্ড লাইন : পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী সীমারখোই হল ডুরান্ড লাইন।

ড্যুরিং, ইউজেন কার্ল : (১৮৩৩-১৯২১) জনৈক জার্মান সরকারি কর্মকর্তার পুত্র ড্যুরিং ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট, মেকানিকসের অধ্যাপক এবং দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ। দর্শনের ক্ষেত্রে সংমিশ্রণবাদী ড্যুরিং সরব আদর্শবাদ, আধিভৌতিক বস্তুবাদ এবং পজিটিভিজমের সংমিশ্রণের প্রয়াস পান। অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পেটি বুর্জোয়া আদর্শের ধারক। মার্কস-এঙ্গেলসের নেতৃত্বাধীন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি যখন লাসালেপন্থিসহ বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীদের পার্টির পতাকাতলে সমবেত করছিল, তখন ড্যুরিং মার্কস-এঙ্গেলস্-এর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন। সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের একাংশের মধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা স্থান করে নিতেও সমর্থ হয়। রাজনৈতিক দিক থেকে তখনও পর্যন্ত অপরিপক্ব জার্মান শ্রমিকশ্রেণীকে ড্যুরিং-এর মতবাদের বিপদ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এঙ্গেলস তাঁর সুবিখ্যাত 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' (১৮৭৮) গ্রন্থ রচনা করেন এবং ড্যুরিং-এর মতবাদের অসারতা, অবৈজ্ঞানিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা তুলে ধরার প্রয়াস পান।

ডেমোক্রেটিক পার্টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলদ্বয়ের একটি। ১৭৮৭ সালে এর জন্ম। এই দল ফেডারেল সরকারের একচ্ছত্র ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে বক্তব্য দিয়েই যাত্রা শুরু করে। এর নেতা টমাস জেফারসন ১৮০১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৮২৫ সালে এই দলের একাংশ বেরিয়ে গিয়ে রিপাবলিকান পার্টি গঠন করে। ১৮৬১-৬৫ সালের মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময় দাসপ্রথার প্রশ্নে আবার পার্টিতে ভাঙন দেখা দেয়। এই পার্টির প্রাধান্য প্রধানত দক্ষিণ অঞ্চলীয় স্টেটসমূহে। এই দল থেকে নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টদের অন্যতম হলেন উড্রো উইলসন (১৯১৩-২১), ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট (১৯৩২-৪৫), হ্যারি এস. ট্রুম্যান (১৯৪৫-৫২), জন. এফ. কেনেডি (১৯৬০-৬৩), লিনডন বি. জনসন (১৯৬৩-১৯৬৮) প্রমুখ। এই দলের প্রতীক হল গাধা।

ডোমিনিয়ন Dominion. ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত যে-সকল রাষ্ট্র পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছে, সেগুলোকেই বলা হয় ডোমিনিয়ন। বর্তমানে তিনটি ডোমিনিয়ন আছে, যথা—কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, এবং নিউজিল্যান্ড।

ড্রেফাস মামলা ১৮৯৪ সালে ফরাসি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ড্রেফাস (Dreyfus)-কে জার্মানদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে কোর্টমার্শাল করা হয় এবং শয়তানের দ্বীপ (Devil's Island)-এ কারাবন্দি করা হয়। ১৮৯৬ সালে নয়া গোয়েন্দা-প্রধান কর্নেল পিকার্ট (Picquart) আবিষ্কার করেন যে, তখনও সংবাদ পাচার হচ্ছে এবং এক্ষেত্রেও হস্তাক্ষর ড্রেফাসের কথিত হস্তাক্ষরের অনুরূপ। তিনি ড্রেফাস মামলা পুনরায় চালু করতে উদ্যত হলে তাঁকে তিউনিসিয়ায় বদলি করা হয়। ১৮৯৭ সালে ড্রেফাসের ভাইও অনুরূপ তথ্য পাচারের ঘটনা আবিষ্কার করেন এবং অপরাধীকে মেজর ইস্টারহেজি (Esterhazy) বলে চিহ্নিত করেন। কিন্তু ইস্টারহেজি সামরিক আদালতে খালাস পান। ইতিমধ্যে ফরাসি বিপ্লববাদীরা ব্যাপারটিকে প্রতিক্রিয়াশীল ও রাজতন্ত্রী অফিসারদের চক্রান্ত বলে অভিহিত করে। লেখক এমিলি জোলা প্রমুখও এ-ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এমতাবস্থায়, ১৮৯৯ সালে রেনেসে ড্রেফাসের পুনর্বিচার হয় এবং তাঁকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু তাঁর অনুরাগীরা মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিতে থাকে। ফলে ১৯০৬ সালে কোর্ট মার্শালের রায় বাতিল করে, তাঁকে পুনরায় সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হয় এবং পদোন্নতি ও 'লিজিয়ন অব অনার' প্রদান করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এই ঘটনা ফরাসিসমাজকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ড্রেফাসপন্থি (বুদ্ধিজীবী, সমাজতন্ত্রী ও চরমপন্থি প্রমুখ) এবং ড্রেফাসবিরোধী (সেনাবাহিনীর অফিসার, ধর্মযাজক প্রমুখ)রা বারংবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংবাদপত্রও ড্রেফাসের পক্ষ অবলম্বন করে।

॥ ত ॥

তথ্য মহাসড়ক Information Super-Highway. বর্তমান যুগকে বলা হয় তথ্যবিপ্লব (Information Revolution)-এর যুগ। এ-যুগে মানুষের প্রধান সম্পদই হচ্ছে তথ্য। যে-ব্যক্তি বা জাতি এই তথ্যপ্রবাহ থেকে বিযুক্ত, সেই ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে বিশ্বধারার সঙ্গে তাল রেখে অগ্রগতিসাধন প্রায় অসম্ভব। বর্তমানে কমিউনিকেশন

স্যাটেলাইট, আন্তর্জাতিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট (Internet) এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, বিশ্বের যে-কোনো দেশের যে-কোনো মানুষ কারও সহায়তা ব্যতিরেকেই বিশ্বের যে-কোনো তথ্যের উৎস বা ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগস্থাপন করতে পারে, নিজের প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করতে পারে, নিজের তথ্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারে এবং যে-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও আলাপ-আলোচনা করতে পারে। কম্পিউটার বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াযোগে যে-কোনো স্থান থেকে যে-কোনো তথ্যসূত্র বা ব্যক্তির কাছে পৌঁছার বা তথ্যপ্রবাহের যে-আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক, সেটাকেই বলে তথ্য মহাসড়ক বা ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে। অনুন্নত বিশ্বের শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশি মানুষ এখনও তথ্য মহাসড়কের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

তপস্যাবাদ বা আত্মসংযমবাদ (Ascetism)। শরীর ও মনের একধরনের প্রশিক্ষণ। উচ্ছৃঙ্খল ও খারাপ ঝোঁকসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে মহৎ গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে শরীর ও মনের ওপর কঠোর নিবর্তনমূলক শৃঙ্খলাবিধানই হল তপস্যাবাদ। তপস্যাবাদ ইহজগতকে উপেক্ষা করে পারলৌকিক সাধনাকে উৎসাহিত করে।

তরিকা বা তুরিকা সাধারণ অর্থ পথ বা রাস্তা। নবম ও দশম খ্রিস্টাব্দের দিকে তরিকা বলতে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনের পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অনুশীলিত নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রণালীসমূহকে বোঝানো হত। একাদশ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'তরিকা' আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির রূপ পরিগ্রহ করে। তরিকা অনুযায়ী, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করতে হলে ধর্মসাধক (মুরিদ)-কে পির (মুর্শিদ)-এর নিকট দীক্ষা (বায়াত) নিতে হয় এবং পিরের প্রদর্শিত পথে সাধনা করতে হয়। কালক্রমে, বিভিন্ন দেশে বহু তরিকা ও শাখা-তরিকার উদ্ভব ঘটে। কাদেরিয়া, নাকশ্‌বন্দিয়া, শাফিলিয়া, বিকতাশিয়া, তিযালিয়া, সানুসিয়া, শাত্তারিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, চিশতিয়া, খানাওয়াতিয়া, সুহরাওয়ার্দিয়া, কালান্দারিয়া, রিফাইয়া ইত্যাদি বিভিন্ন তরিকা ও শাখা-তরিকা বর্তমানে বিদ্যমান।

তরুণ তুর্কি বিপ্লব : Young Turk Movement. তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ-এর প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তরুণ সম্প্রদায়ের আন্দোলনই এই নামে অভিহিত হত। প্রধানত পশ্চিম ইউরোপে প্রবাসী তুর্কি তরুণরাই ছিল এর উদ্গাতা। এই আন্দোলনের প্রধান কার্যালয় ছিল স্যালোনিকায়। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে এই আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। এই সময় সুলতান আবদুল হামিদের কাছে নতিস্বীকারের জন্য চরমপত্র প্রদান করা হলে, সুলতান নতিস্বীকার করেন, গোয়েন্দা সংস্থার বিপুলসংখ্যক সদস্যকে ছাঁটাই করেন এবং তরুণ তুর্কিদের নেতা মুস্তাফা কামাল পাশাকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে কনস্টান্টিনোপলে নবনির্বাচিত পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তুরস্কে তরুণ তুর্কিদের একাধিপত্য চলে। উগ্র জাতীয়তাবাদী তরুণ তুর্কিরা তুর্কিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়, দেশ জুড়ে জাতীয় স্কুল স্থাপন করে এবং সকল নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণের প্রবর্তন করে। তারা সমগ্র ওসমানিয়া (Ottoman) সাম্রাজ্যেরও তুর্কিকরণ করতে উদ্যত হয়। ফলে ইউরোপের খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং এশিয়ার আরব জনগোষ্ঠী উভয়েই তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে তরুণ

তুর্কিদের আধিপত্য উচ্ছেদ করা হয়। তরুণ তুর্কি বিপ্লবের অপর দুজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন আনোয়ার পাশা ও তালাত পাশা।

তাইশো জাপানের সম্রাট ইয়োশিহিতোর রাজত্বকালই (১৯১২-২৬) তাইশো নামে পরিচিত। এই সময়ে জাপান একটি বড় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির প্রবর্তনই ছিল এই শক্তিবৃদ্ধির কারণ। এ-সময়ে জাপান বৈদেশিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহণ করে। ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে সর্বজনীন পুরুষ ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। অবশ্য, এ-সময় শ্রমিক অসন্তোষ ও কোরিয়ায় বিদ্রোহও দেখা দেয়।

তাঁবেদার রাষ্ট্র : যে-রাষ্ট্র নামেমাত্র স্বাধীন, কিন্তু যে-রাষ্ট্রের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতিসমূহ কার্যত অপর কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, সেই রাষ্ট্রকে বলে তাঁবেদার রাষ্ট্র। উপগ্রহ যেমন গ্রহের বলয়ের মধ্যেই পরিক্রমণ করে, তাঁবেদার রাষ্ট্রও অনুরূপভাবে কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রের বলয়াবদ্ধ থাকে বিধায় এরূপ রাষ্ট্রকে উপগ্রহ রাষ্ট্র (Satellite State)-ও বলা হয়ে থাকে।

তাবেঈন যে সমস্ত মুসলমান মহানবী (সা)-কে দেখেননি, কিন্তু সাহাবায়ে কেরামদের দেখেছেন এবং তাঁদের যথার্থ উত্তরাধিকারীর ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁরাই তাবেঈন নামে পরিচিত।

তাবে তাবেঈন যে-সমস্ত মুসলমান মহানবী (সা) বা সাহাবায়ে কেরামদের দেখেননি, তবে তাবেঈনদের দেখেছেন এবং তাঁদের যথার্থ উত্তরাধিকারীর ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁরাই তাবে তাবেঈন নামে অভিহিত।

তামিল বিদ্রোহ শ্রীলংকার মোট জনসংখ্যার ১৮% হল তামিল জনগোষ্ঠী। শ্রীলংকার অধিকাংশ মানুষ বৌদ্ধ, কিন্তু তামিলরা হিন্দু। পূর্বাঞ্চলীয় উপদ্বীপ জাফনায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তামিলরা প্রথমে জাফনার স্বায়ত্তশাসন ও পরে স্বাধীনতা দাবি করে। শ্রীমাভো বন্দরনায়েক ও প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে তামিলদের এই দাবিকে পাত্তা না দেওয়ায় তারা গঠন করে সশস্ত্র গেরিলাবাহিনী, তামিল মুক্তিবাহিনী (LTTE) এবং সরকারের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এলটিটিই-র প্রধান নেতা ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ। তামিল গেরিলারা তামিল টাইগার্স নামে পরিচিত। তামিল টাইগাররা প্রেসিডেন্ট প্রেমদাসাকে হত্যা করে। পরবর্তীতে চন্দ্রিকা কুমরাতুঙ্গা ক্ষমতায় এসে 'অপারেশন সানশাইন' নামে এক প্রচণ্ড সেনা অভিযানের মাধ্যমে তামিলদের ওপর এক বিরাট বিপর্যয় চাপিয়ে দেন। এরই প্রতিশোধ হিসাবে ১৯৯৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচারকালে একজন আত্মঘাতী রমণী উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বোমাসহ প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমরাতুঙ্গাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে বোমা বিস্ফোরণে ২১ জন আহত হন। অপর এক বোমাহামলায় সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধানসহ ১০ জন প্রাণ হারান এবং ৭৭ জন আহত হন। বস্তুত ১৯৯০ সাল থেকে তামিল বিদ্রোহীরা জাফনা উপদ্বীপকে তাদের স্বঘোষিত স্বাধীন রাজ্য হিসাবে শাসন করে আসছে।

তারকাযুদ্ধ বা কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ। অর্থাৎ, সম্ভাব্য সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বিরুদ্ধে মহাকাশে মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনাই হল এই উদ্যোগের মূলকথা।

১৯৯০ সালের মধ্যে এর প্রথম পর্যায়ে, ডেল্টা-১৮১ রকেটসমূহ স্থাপন করা হয়। অতঃপর মহাকাশে সোভিয়েত এসএস ক্ষেপণাস্ত্রসমূহকে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ডেল্টা ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ স্থাপন করা হয়, যাতে এসএস-১৮ (SS–18) অগ্রসর হওয়ামাত্র ডেল্টা ক্ষেপণাস্ত্র ছুটে গিয়ে এগুলোকে মহাকাশেই ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়।

তালেবান এই আরবি শব্দটির অর্থ হচ্ছে ছাত্র। কিন্তু এখন তালেবান বলতে বোঝায় আফগানিস্তানের শাসকদল। বস্তুত দীর্ঘদিন ধরে আফগানিস্তানে বলবৎ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পুতুল সরকার। মস্কোর খেয়ালখুশি অনুযায়ী একের পর এক ক্ষমতায় বসানো হয় মস্কোপন্থি নূর মোহাম্মদ তারাকি, ফয়জুল্লাহ আমিন, বারবাক কারমাল ও জেনারেল নজিবুল্লাহ প্রমুখকে। মস্কোর ইঙ্গিতেই এঁদের প্রথম তিনজন একের পর এক নিহত হন। এমতাবস্থায়, আশির দশকের শেষের দিকে জেনারেল নজিবুল্লাহকে উৎখাত করে ক্ষমতায় আসেন ইসলামপন্থি মুজাহিদরা। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা পারস্পরিক বিরোধ ও ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। সাবেক প্রেসিডেন্ট সিবগাতউল্লাহ মুজাদ্দেদির নেতৃত্বাধীন জাবহা-ই-নাজাত-ই মিল্লি পার্টি, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দিন রব্বানির জমিয়তে ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের হেজব-ই-ইসলাম, জঙ্গি নেতা আহমদ শাহ মাসুদের অনুগত বাহিনী, সামরিক নেতা রশিদ দোস্তামের অনুগত বাহিনী প্রমুখ সকলেই নিজেদের একনিষ্ঠ ইসলামপন্থি বলে দাবি করে এবং পারস্পরিক রক্তক্ষরণে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় দেশের অর্থনীতি, আইন-শৃঙ্খলা, জনজীবনের স্বস্তি সবই ভয়াবহরূপে ভেঙে পড়ে। এই পটভূমিতেই, ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে আকস্মিকভাবে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে 'তালেবান' নামে কট্টর ইসলামপন্থি এক তরুণ ছাত্রদলের উদ্ভব ঘটে। সমগ্র বিশ্বকে চমকিত করে দিয়ে মাত্র ১৫ হাজার সদস্যের এই জঙ্গি ছাত্রদল একের পর এক এলাকা দখল করে নেয়। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে রাজধানী কাবুলও তাদের দখলে চলে আসে। ১৯৯৭ সালের মধ্যেই তালেবানরা আফগানিস্তানে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি এলাকার ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে। তালেবানদের প্রধান বা আমিরুল মুমেনিনের নাম মোল্লা মোহাম্মদ ওমর। এদের অন্যান্য নেতা হচ্ছেন মীর্জা মোহাম্মদ হাসান, মোল্লা আবদুর রাজ্জাক, মৌলভি গিয়াসউদ্দিন, মোল্লা মোহাম্মদ গাউস প্রমুখ। তালেবানরা আফগানিস্তানে অত্যন্ত রক্ষণশীল কায়দায় ইসলামি বিধি-বিধান কায়েমের প্রয়াস চালায়। আফগানিস্তানের বিপুল তেল ও গ্যাসসম্পদের লোভে পাশ্চাত্য দুনিয়াও তালেবানদের অন্তত বাহ্যত মেনে নিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থউদ্ধারে সচেষ্ট হয়। অনেকে মনে করেন যে, তালেবানদের শক্তির পেছনে পাকিস্তানের ভূমিকা রয়েছে।

তিন গণনীতি : চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সান ইয়াৎ সেন-প্রস্তাবিত জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও গণজীবিকাসংক্রান্ত তিন নীতি। ১৯২৪ সালে কুয়োমিনতাং-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে সান ইয়াৎ সেন এই তিন নীতিকে নতুন তাৎপর্য প্রদান করেন। এর ফলে, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা এবং শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের বিষয়ও মৌল বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলশ্রুতিতে, তিন গণনীতির বৈশিষ্ট্য দাঁড়ায় নিম্নরূপ রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা এবং শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা। এই তিন নীতিই প্রথম বিপ্লবী জনযুদ্ধের সময় কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার রাজনৈতিক ভিত্তি প্রস্তুত করে।

তিয়েনআনমেন ট্র্যাজেডি ১৯৮৯ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে চীনের ছাত্রেরা আরও উদার ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দাবিতে আন্দোলনের পর্যায়ে রাজধানী বেইজিং-এর প্রধান চত্বর নিষিদ্ধ নগরীর সম্মুখস্থ তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। ছাত্রদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দাবিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৪ঠা জুন তারিখে সেনাবাহিনী (PLA) তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে বসে-থাকা হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ওপর ট্যাঙ্ক চালিয়ে দেয় এবং বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। ফলে অসংখ্য ছাত্র নিহত হয়, রক্তের বন্যায় তিয়েনআনমেন স্কোয়ার ভেসে যায়, অসংখ্য ছাত্রনেতা কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হয় এবং পরিণামে আন্দোলন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

তিরিশে মে আন্দোলন ১৯২৫ সালের ৩০শে ব্রিটিশ পুলিশ সাংহাইয়ের জনগণের ওপর যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, তারই প্রতিবাদে এই আন্দোলনের সূচনা ঘটে। এই মাসের প্রথম দিক থেকেই সাংহাই ও সিংতাওয়ের বস্ত্রকলসমূহে বড় ধরনের ধর্মঘট শুরু হয়। জাপানি সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের পদলেহীরা এই শ্রমিক আন্দোলনকে দাবিয়ে দিতে উদ্যত হয়। ১৫ মে তারিখে জাপানি বস্ত্রশিল্প-মালিকরা ধর্মঘটিদের ওপর গুলি চালিয়ে কু চেং হুং নামক জনৈক শ্রমিককে হত্যা করে। এতে আরও প্রায় ১২ জন শ্রমিক আহত হয়। ২৮ মে সিংতাওয়ে আরও ৮ জন শ্রমিককে হত্যা করা হয়। ৩০ মে সাংহাইয়ের প্রায় দুই হাজার ছাত্র শ্রমিকদের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করে। তারা ব্রিটিশ পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের সামনে প্রায় দশ হাজার লোককে জড়ো করে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্লোগান দেয়। ব্রিটিশ পুলিশ বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপর গুলি চালিয়ে বহু ছাত্রকে হত্যা করে। এই হত্যাযজ্ঞের ফলে দেশব্যাপী তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং ছাত্র-শ্রমিক, দোকানদার-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পয়লা জুন সাংহাইয়ে এবং ১৯ জুন হংকং-এ হরতাল পালিত হয়। সাংহাইয়ের প্রায় দুই লক্ষ এবং হংকংয়ের প্রায় আড়াই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। ব্যাপক গণসমর্থনসমৃদ্ধ হংকং-এর ধর্মঘট সুদীর্ঘ ১৬ মাস যাবৎ চালু ছিল। বিশ্বের ধর্মঘটের ইতিহাসে হংকং-এর এই ধর্মঘটই দীর্ঘতম ধর্মঘট।

তুর্কি প্রজাতন্ত্র ১৯২০ সালের ২৩ এপ্রিল আঙ্কারার অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন মুস্তাফা কামাল পাশা। ১৯২১ সালের জানুয়ারিতে আঙ্কারার আইন পরিষদ প্রেসিডেন্টের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতাদানের উদ্দেশ্যে 'মৌলিক আইন' পাশ করে। অতঃপর, স্মার্না থেকে গ্রিকদের বিতাড়িত করে। এ-সময় চানক সংকটের অবসান ঘটিয়ে মুস্তাফা কামাল আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন। ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে সালতানাত বাতিল করা হয় এবং ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের খিলাফতও বাতিল করা হয়। ১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর তুর্কি প্রজাতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। কামাল পাশা আমৃত্যু (১৯৩৮) তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

তৃতীয় বিশ্ব মাও ঝে ডং-এর আমলে চীন এই তৃতীয় বিশ্ব (Third World) তত্ত্ব হাজির করে। এই তত্ত্বানুযায়ী দুই পরাশক্তি ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহকে নিয়েই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব। আর এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহকে নিয়েই গঠিত তৃতীয় বিশ্ব। তৃতীয় বিশ্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত

পশ্চাৎপদতা এবং দারিদ্র্য। চীন নিজেকেও এই বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে। কিন্তু, কার্যত দেখা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সব দেশের অবস্থা একরকম নয়। যেমন, চীন-ভারত প্রভৃতি দেশের উন্নয়নের পর্যায় ভুটান, বাংলাদেশ বা ইথিওপিয়ার উন্নয়নের পর্যায়ের সঙ্গে তুলনীয় নয়। অন্যদিকে তৈলসমৃদ্ধ কুয়েত-ব্রুনেই প্রমুখ দেশের প্রাচুর্য তো বলতে গেলে সীমাহীন। কিছুদিন পূর্বে জাতিসংঘ বিশ্বের দরিদ্রতম ও অনুন্নত দেশসমূহকে চতুর্থ বিশ্ব বলে চিহ্নিত করেছে।

তৃতীয় রিপাবলিক Third Republic. ১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন থেকে শুরু করে ১৯৪০ সালে জার্মানির হাতে ফ্রান্সের পরাজয় পর্যন্ত—এই ৭০ বছরের শাসনামলকেই বলা হয় তৃতীয় রিপাবলিক। তৃতীয় রিপাবলিকের সময় প্রধানত মধ্যবিত্তশ্রেণী ও কৃষকদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সরকারের স্থিতিশীলতা ছিল প্রায় অনুপস্থিত। কেলেঙ্কারির পর কেলেঙ্কারি এ-সময় ফরাসি রাষ্ট্র ও সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। ড্রেফাস মামলা (Dreyfus Case) ছিল এমনি এক কেলেঙ্কারি-ঘটিত। ১৯৩০ সালের দিকেই তৃতীয় রিপাবলিকের পতন ঘটতে যাচ্ছিল। পপুলার ফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে সে-যাত্রা ঠেকানো গেলেও, ১৯৪০ সালে জার্মান আক্রমণের মুখে তৃতীয় রিপাবলিক ভেঙে পড়ে। বস্তুত তখন তৃতীয় রিপাবলিকের বৈধতা (Legitimacy) বলে তেমন কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না।

তেহরান সম্মেলন ১৯৪৩ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে পয়লা ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে তেহরানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিন-এর মধ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভিন্ন নীতি-কৌশল সম্পর্কে একমত হন এবং স্থির করেন যে যুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপ ও বাল্টিক এলাকায় রুশ প্রভাব এবং গ্রিক, তুরস্ক ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে মিত্রশক্তির অপরাপর সদস্যদের প্রভাব বজায় রাখা হবে।

তোষণনীতি আন্তর্জাতিক কোনো শক্তি বা জাতীয় ক্ষেত্রে, ক্ষমতাসীন কোনো সরকারের অন্যায় বা গণবিরোধী ভূমিকা সত্ত্বেও তাকে তোষণ করার মাধ্যমে অবস্থা পরিবর্তনের ভ্রান্ত আশামূলক নীতিই হল তোষণনীতি (Policy of Appeasement)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এই নীতি গ্রহণ করার জন্য সমালোচিত হয়। হিটলার ও মুসোলিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সম্মত হবেন, এই আশায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স ১৯৩৭ সাল থেকে তাঁদের অন্যায় দাবিসমূহ একের পর এক পূরণ করতে শুরু করে। ফলে, ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল, জার্মানির অস্ট্রিয়া দখল, হিটলার-মুসোলিনির মদদপ্রাপ্ত ফ্রাঙ্কোর হাতে স্পেনের ক্ষমতা-হস্তান্তর, মিউনিক চুক্তি এবং সর্বশেষে জার্মানি কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া দখল কার্যত ইত্যাদি ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন এবং ফরাসি প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের তোষণনীতির অভিযোগে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন।

তৌহিদ এর অর্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার একক ও অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব। ইসলামের মর্মানুযায়ী সার্বভৌমত্ব ও আদেশ-নির্দেশের একমাত্র অধিকার আল্লাহর। সুতরাং কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির কোনো অধিকার নেই অন্যের ওপর নিজের আধিপত্য চাপিয়ে দেবার। মানুষ যেহেতু আল্লাহর দাস, সেহেতু মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে

আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশসমূহই কার্যকর করা মাত্র। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তৌহিদ স্বেচ্ছাচারিতা, একনায়কত্ব, আগ্রাসন, বর্ণ বা জাতিগত বৈষম্য ইত্যাদির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। সঙ্গে সঙ্গে, তৌহিদ মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্য ইত্যাদিরও পরিপন্থি। আল্লাহর আইনে শোষণ, বৈষম্য ও নির্যাতনের কোনোই স্থান নেই। বস্তুত ইসলামি শাসনব্যবস্থার মৌল ভিত্তিই হল তৌহিদ।

ত্রিপক্ষীয় আঁতাত অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও ইতালির মধ্যে গঠিত ত্রিপক্ষীয় জোটের সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ১৯০৭ সালে সম্পাদিত চুক্তি ও সহযোগিতাই ইতিহাসে ত্রিপক্ষীয় আঁতাত (Tripple Entente) নামে খ্যাত।

ত্রিপক্ষীয় জোট : এটা হল রাশিয়া বা ফ্রান্সের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও ইতালিকে নিয়ে ১৮৮২ সালে গঠিত সামরিক জোট।

ত্রিপিটক বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ যে-সমস্ত উপদেশাদি প্রদান করেছেন, সেগুলো তিনটি পিটক বা ভাগে বিভক্ত বলে, এর সামগ্রিক নাম হল ত্রিপিটক। ত্রিপিটকের পিটকত্রয় নিম্নরূপ ১. সূত্র পিটক (এই পিটকে রয়েছে গৌতম বুদ্ধের বাণী ও কার্যাবলী) ২. বিনয় পিটক (এতে রয়েছে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আচরণবিধি) এবং ৩. অভিধর্ম পিটক (বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের ওপর আলোচনাই এই পিটকের বিষয়)। গৌতম বুদ্ধ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস না করলেও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে, কর্মফল অনুযায়ী মানুষ পুনর্জন্ম লাভ করে এবং সৎ কর্মের চূড়ান্ত পর্যায়ে লাভ করে নির্বাণ বা চিরশান্তি। বৌদ্ধ ধর্মমতে, দুঃখের মূল কারণ অজ্ঞতা। বোধি (যা থেকে বুদ্ধ, বৌদ্ধ ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি) বা জ্ঞানের মাধ্যমেই দুঃখমোচন ও নির্বাণলাভ সম্ভব। বৌদ্ধ ধর্মমতে চারটি মহান সত্য হল ১. দুঃখকষ্ট ২. দুঃখকষ্টের কারণ, ৩. দুঃখকষ্টের প্রতিকার এবং ৪. দুঃখকষ্ট প্রতিকারের উপায়।

॥ থ ॥

থার্ড রাইখ ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত স্থায়ী জার্মানির নাৎসি সাম্রাজ্যকেই বলা হত তৃতীয় বা থার্ড রাইখ (Third Reich)। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী জার্মান লেখক মোলার ভন ডেন ব্রাক তাঁর 'ডাস ড্রিটে রাইখ' শীর্ষক পুস্তকে সর্বপ্রথম 'রাইখ' শব্দটির প্রবর্তন করেন। নাৎসিদের মতে, প্রথম রাইখ ছিল পবিত্র রোমীয় সাম্রাজ্য বা Holy Roman Empire (৯৬২-১৮০৬) এবং দ্বিতীয় রাইখ ছিল ১৮৭১ সালে বিসমার্ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জার্মান সাম্রাজ্য, যা ১৯১৮ সালে কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম্-এর ক্ষমতা ত্যাগ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। নাৎসি নেতা এডলফ হিটলার আশা করেছিলেন যে, থার্ড রাইখ হাজার বছর স্থায়ী হবে।

থিওসোফিক্যাল সোসাইটি ১৮৭৫ সালে কর্নেল ওলকট, ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি ও ডব্লু. আর. জাজ নিউইয়র্ক নগরীতে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর তিনটি উদ্দেশ্য হল

:১. বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা, ২. আর্য ও অন্যান্য প্রাচ্য সাহিত্য, ধর্ম ও বিজ্ঞানের ওপর আলোচনা করা এবং ৩. প্রকৃতির অজ্ঞাত রহস্য ও মানুষের গূঢ় চরিত্র ও বৃত্তি সমূহ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। সারা বিশ্বে এর কয়েকশত শাখা ছড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এর শাখা স্থাপন করেন বিখ্যাত আইরিশ মহিলা অ্যানি বেসান্ট।

থিঙ্ক ট্যাংক Think Tank. অর্থাৎ চিন্তাকেন্দ্র বা চিন্তাশীলদের পরিষদ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত ইউরোপ এবং আমেরিকায় দেখা যায় যে, সেখানকার অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রনীতিবিদ, সমাজবিদ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের এমন আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক ফোরাম বা পরিষদ থাকে, যেখানে তাঁরা দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা, আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ বা প্রস্তাব দেন। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড, এম.আই.টি. প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়েও এরূপ চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদের ফোরাম রয়েছে। এসব ফোরাম বা থিঙ্ক ট্যাংকের পরামর্শ বা প্রস্তাবকে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। আবার অনেক সময়, সরকারও কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এইসব ফোরাম বা থিঙ্ক ট্যাংকের পরামর্শ বা সুপারিশ চাইতে পারে। অনেক সময় রাজনৈতিক দলেরও চিন্তাবিদদের ফোরাম বা থিঙ্ক ট্যাংক থাকে। থিঙ্ক ট্যাংকের সদস্যেরা অবশ্যই স্ব-স্ব বিষয়ে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন।

থিসিস যুক্তিরূপে উপস্থাপিত কোনো বিষয় কিংবা কোনো বিষয় প্রমাণ করার জন্য লিখিত প্রবন্ধকেই বলে থিসিস (Thesis)। রাজনীতির ক্ষেত্রে থিসিস হল কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, তার গতিধারা, সংগঠন ও জনগণের করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে যুক্তিরূপে উপস্থাপিত বিশ্লেষণ বা প্রস্তাবনা। থিসিস-এর বিপরীত হল অ্যান্টি-থিসিস।

থ্যাচারবাদ Thatcherism. মার্গারেট থ্যাচার ১৯৭৫ সালে ব্রিটিশ কনজারভেটিভ পার্টির নেত্রী ও ১৯৭৯ সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত উভয় পদে বহাল থাকেন। তিনি 'দৃঢ় বিশ্বাসের রাজনীতি' (Politics of Conviction)-এর নামে সকলের মতৈক্য (consensus)-ভিত্তিক রাজনীতি পরিহার করেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের ছিল দুটি মৌল বৈশিষ্ট্য। এক. কেইনসীয় গোঁড়া অর্থনীতির বিপরীতে অর্থবাদের নীতি (Policy of Monetarism) গ্রহণ এবং দুই. জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুযোগ ও দায়িত্ব সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশকে ঝাঁকিয়ে দেওয়া। এই নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রমালিকানাধীন শিল্পসমূহকে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয় ; এমনকি পানি, বিদ্যুৎ, টেলি-কমিউনিকেশন ইত্যাদি সেবার শেয়ারও জনগণের কাছে বিক্রি করা হয়। জাতীয় কর্মকাণ্ডে সরকারের ভূমিকাও হ্রাস করা হয়। জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ও স্কুলসমূহকেও স্বশাসিত করে দেওয়া হয। থ্যাচার একচেটিয়া (Monopoly)-র বিরোধী ছিলেন। তিনি ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ধর্মঘটের প্রক্রিয়ারও সীমাবদ্ধ করে দেন। তিনি আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে ছিলেন কঠোর এবং তাঁর পররাষ্ট্র নীতি ছিল মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিরই কাছাকাছি। থ্যাচারবাদের মূলকথা হল 'ব্যক্তির স্বাধীনতা ও দায়িত্ব'। থ্যাচারবাদ কার্যত কনজারভেটিভ পার্টির, 'টোরি' দর্শনের বদলে ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারতাবাদের কাছাকাছি।

॥ দ ॥

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩)। ভারতীয় আদর্শবাদী দার্শনিক ও ধর্ম-সংস্কারক দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৭৪ সালে 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল, প্রাচীন আর্যধর্মের পুনরুজ্জীবন ও বেদ-এ প্রত্যাবর্তন। তিনি মূর্তিপূজা, একাধিক দেবতার উপাসনা, পুরোহিতদের আধিপত্য, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরোধিতা করেন এবং সকল মধ্যযুগীয় কূপমণ্ডূকতা থেকে হিন্দু ধর্মকে মুক্ত করতে উদ্যোগী হন। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানকে বৈদিক সত্যের প্রকাশ বলে মনে করতেন এবং সার্বজনীন বিজ্ঞানশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি বর্ণভেদ এবং সমকালীন পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা, দুয়েরই বিরোধী ছিলেন। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রই ছিল তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ। তিনি ভারতের জন্য স্বাধীন জাতীয় উন্নয়নে বিশ্বাস করতেন এবং কার্যত ভারতীয় বুর্জোয়াদের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করতেন।

দর্শন : Philosophy. গ্রিক 'ফিলজফি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞানানুরাগ। গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাস এই শব্দটির প্রচলন করেন। সক্রেটিস বিনয়বশত নিজেকে জ্ঞানী (Sophist) না বলে জ্ঞানানুরাগী বলে অভিহিত করতেন। পূর্বে ফিলজফি বলতে বিজ্ঞান ও সাহিত্যসহ সকল বিদ্যাকেই বোঝাত। তখন এর প্রধান তিনটি দিক ছিল, যথা—১. প্রাথমিক দর্শন, ২. নৈতিক দর্শন এবং ৩. আধ্যাত্মিক দর্শন। প্লেটো কিছুটা এবং অ্যারিস্টটল আরও কিছুটা, দর্শনশাস্ত্রের পরিধিকে সীমাবদ্ধ করে দেন। অ্যারিস্টটল দর্শনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেন; যথা—নীতিশাস্ত্র (Ethics), তর্কশাস্ত্র (Logic), বিজ্ঞান (Science) ইত্যাদি। অধিবিদ্যা (Metaphysics)-কেই তিনি 'প্রথম দর্শন' বলে অভিহিত করেন। হবসের মতে, কারণ থেকে কাজে এবং কাজ থেকে কারণে পৌঁছানোর নামই দর্শন। দর্শনের বর্তমান সংজ্ঞা হল, যে-তত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে যে-কোনো বিষয়ের মূল সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তাইই দর্শন।

দর্শনের দারিদ্র্য : কার্ল মার্কসের প্রথম দিকের রচনাসমূহের অন্যতম হল দর্শনের দারিদ্র্য বা Poverty of Philosophy. ১৮৪৭ সালে ফরাসি ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে তিনি ফরাসি পেটি-বুর্জোয়া দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারার অসারতা তুলে ধরেন। এতে তিনি নৈরাজ্যবাদী প্রুধোঁর সমালোচনা করেন এবং হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিপরীতে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বকে উপস্থাপিত করেন। এই গ্রন্থে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয় এবং মার্কসীয় রাজনৈতিক-অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এখানেই তিনি প্রথম ঘোষণা করেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য অপর শ্রেণীসমূহের নির্মূলীকরণ অবশ্যম্ভাবী।

দলিত অর্থাৎ ভারত ও নেপালের নিপীড়িত অচ্ছুৎ সম্প্রদায়। ভারতে প্রায় ৪৫ লাখ দলিত রয়েছে। এরা সাধারণত মুচি, ঝাড়ুদার, মেথর, কামার, দরজি, কসাই ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত। নেপালেও দলিতদের প্রতি উচ্চবর্ণের সদস্যদের ব্যবহার অত্যন্ত নৃশংস। দলিতরা কোনো উচ্চবর্ণের মানুষের গৃহে ঢুকতে পারে না, তাদেরকে কেউ ঘর ভাড়া দেয় না। তারা পানির উৎসে যেতে পারে না। ছোঁয়াছুঁয়ির তো প্রশ্নই ওঠে না। এই দুই দেশে জনগণের গড় আয়ু যেখানে প্রায় ৫২ বছর সেখানে দলিতদের গড় আয়ু ৪২ বছর মাত্র। শিক্ষা-দীক্ষায়ও দলিতরা পশ্চাৎপদ। নেপালের প্রায় ২২ লাখ দলিত নারীর

মধ্যে মাত্র ২০-২৫ জনের কলেজ ডিগ্রি রয়েছে (১৯৯৭)। উভয় দেশেই দলিতদের সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠছে।

দাঁতাঁত : ফরাসি শব্দ দাঁতাঁত (Detente)-এর অর্থ হল দুটি দেশের মধ্যেকার বৈরী সম্পর্কের অবসান। এটা ঠিক দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক পুনঃস্থাপন নয়—বরং শত্রুতার অবসান এবং সেই অবস্থা যে-অবস্থায় সুসম্পর্কের ভিত্তি ও পরিবেশ রচিত হয়। এই শব্দের সমার্থক ইতালীয় শব্দ হল ডিসতেনশিওঁ (Distensione) এবং এই শব্দটিও দাঁতাঁতের মতোই কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন Official Secrets Act. ১৯১১ সালে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট এই আইন পাশ করে। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেও অনুরূপ আইন প্রণীত হয়। এই আইনের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষ, গোয়েন্দা বা সাংবাদিকরা যেন সরকারের কোনো দপ্তরের কোনো গোপনযোগ্য সিদ্ধান্ত, পদ্ধতি বা ফাইলের কথা জানতে না পারে। কিন্তু, ১৯৭০-এর দশক থেকে এই আইন কালো আইন হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উলটো ১৯৬৬ সালে তথ্যের স্বাধীনতা আইন (Freedom of Information Act) প্রণয়ন করে। ব্রিটেনের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যসূত্র এত বেশি উন্মুক্ত যে, ব্রিটিশ সাংবাদিকরা অনেক সময় খোদ ব্রিটিশ সরকারের কর্মকাণ্ডের তথ্যই মার্কিন সূত্র থেকে বের করে আনে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার যে-আওয়াজ উঠেছে, দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

দারিদ্র্যসীমা : প্রত্যেক মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, এই পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে এই মৌলিক প্রয়োজনের একটা ন্যূনতম পরিমাণ বা সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সীমাকে বলে দারিদ্র্যসীমা (Poverty Level বা Minimum Subsistence Level)। যারা এই সীমার নিচে বসবাস করে অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান-এর সুযোগ উপরোক্ত ন্যূনতম পরিমাণ বা সীমার চেয়েও কম পায়, তাদের জীবনকে আর মানুষের জীবন বলা যায় না; তাদের জীবন হয় মানবেতর। অনুন্নত বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত এই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে।

দারুল ইসলাম এর অর্থ ইসলামের আবাসভূমি, সার্বভৌম মুসলিম শাসক রয়েছেন এবং ইসলামি আইনকানুন বলবৎ আছে। দারুল ইসলামের বাসিন্দা মুসলিম ও অমুসলিম দুইই হতে পারে। তবে অমুসলিম নাগরিকেরা কতিপয় ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করে না, কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র তাদের জানমালের দায়দায়িত্ব আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করে।

দারুল হর্‌ব বা যুদ্ধ এলাকা, যে-এলাকা বা দেশ মুসলিম শাসনাধীনে নয়। দারুল হর্‌বকে দারুল ইসলামে পরিণত করাই জেহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই মতবাদ অনুসারে, মুসলিম জগৎ ও অমুসলিম জগতের মধ্যে মূলত যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। অবশ্য কারও কারও মতে শত্রুতামূলক কারণ ব্যতীত অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ইসলামের পরিপন্থি।

দারুস সুল্‌হ্‌ : যে-দেশ মুসলিম শাসনাধীনে নয়, অথচ যে-দেশের সঙ্গে ইসলামের করদ-সম্পর্ক বিদ্যমান, সে-দেশকে বলে দারুস সুল্‌হ্‌। হজরত মুহাম্মদ (সা) স্বয়ং

নাজারানের খ্রিস্টানদের ওপর কর ধার্য করেন এবং তাদের নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে চুক্তি সম্পাদন করেন। এরূপ অঞ্চলকে দারুল ইসলাম বা দারুল হরব কোনো নামেই অভিহিত করা যায় না বিধায় এরূপ অঞ্চলকে বলা হয় দারুস সুল্‌হ্‌। কেউ-কেউ এ-মতবাদের বিরোধিতা করে বলেন যে, যে-দেশ ইসলামি শাসনের আওতায় আনীত হয়নি, সে-দেশের সঙ্গে সুল্‌হ্‌ বা সমঝোতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

দার্শনিক নোটবই Philosophical Noteboook. এটি লেনিনের দর্শন-সম্পর্কিত নোট-এর সমষ্টি, যা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। লেনিন এ-সমস্ত নোট করেন ১৯১৪-১৬ সালে। এই নোটবইয়ে মার্কস-এঙ্গেলসের 'হলি ফ্যামিলি', ফয়েরবাখের 'ধর্মের মূল সূত্রের ওপর বক্তৃতা', হেগেলের 'যুক্তিবিদ্যার বিজ্ঞান' ও 'ইতিহাসের দর্শনের ওপর বক্তৃতা', লাসালের 'হেরাক্লিটাসের দর্শন', অ্যারিস্টটলের 'মেটাফিজিক্স' ইত্যাদির সারমর্ম রয়েছে। 'দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন' শীর্ষক অংশে তিনি সুন্দরভাবে বস্তুগত দ্বন্দ্বতত্ত্বের স্বরূপ তুলে ধরেন। বস্তুত এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্যই হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। লেনিন দ্বন্দ্বতত্ত্বের একটি সকল-দিকসংবলিত সংজ্ঞা প্রদান করেন, যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মূলনীতি চিহ্নিত করেন এবং জ্ঞানের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার চরিত্র-নিরূপণ করেন। তিনি দেখান যে, দর্শনের ইতিহাস হল বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস। এ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ের ওপর রয়েছে তাঁর মন্তব্য, টীকা, সমালোচনা ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, এই নোটবই তিনি ছাপানোর জন্য নয়, বরং ব্যক্তিগত ধারণা ও ব্যবহারের জন্যই লিখেছিলেন।

দাস সমাজব্যবস্থা Slave Society. আদি সাম্যবাদী সমাজের পরবর্তী স্তর। এই সমাজব্যবস্থার একদিকে ছিল দাস-মালিক আর অপরদিকে ছিল ক্রীতদাসদের স্তর। ক্রীতদাসদের শ্রমশক্তি নয়, বরং তারা নিজেরাই ছিল পণ্য। পালিত গবাদিপশুর ওপর মালিকের যে-রকম অধিকার, ক্রীতদাসদের ওপর দাস-মালিকদের অধিকারও ছিল হুবহু সে-রকম। ক্রীতদাসরা বংশবংশানুক্রমে দাসত্ব করত এবং দাস-মালিকেরা ইচ্ছামতো তাদের বেচাকেনা করতে পারত—এমনকি মেরে ফেললেও কোনো আইনগত বাধা ছিল না। দাস-মালিকরা একাধারে উৎপাদনের উপায়সমূহ এবং ক্রীতদাস—দুয়েরই মালিক ছিল। যুদ্ধে ধৃত বন্দিরাও দাসরূপে গণ্য হত। অনেক সময় ভরণপোষণে অসমর্থ পিতামাতাও সন্তানদের দাসরূপে বিক্রি করে দিত। গ্রিক ও রোমীয় সভ্যতাসহ প্রাচীন প্রায় সকল সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল দাস সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে। এই সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে (যেমন, খ্রিস্টপূর্ব ৭৮ সালে) স্পার্টাকাস প্রমুখ দাসনেতাদের নেতৃত্বে ক্রীতদাসরা বিদ্রোহ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে দাস সমাজব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার বিকাশ শুরু হয়। প্রাচীন দাসব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেলেও, ইউরোপীয়রা পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে এক নতুন ধরনের দাসব্যবস্থার সূচনা করে। ১৪৮১ সালে পর্তুগিজরাই এটা শুরু করে। পর্তুগিজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের ধরে নিয়ে গিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিক্রি করে দিত। এর ফলে, আধুনিক যুগেও দাসপ্রথার প্রচলন ঘটে। এই দাসপ্রথা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৮৫২ সালে মার্কিন লেখিকা হ্যারিয়েট বীচার স্টো টম চাচার কুটির (Uncle Tom's Cabin) লিখে তীব্র দাসপ্রথা বিরোধী মনোভাবের বিকাশ ঘটান। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬০ সালে নির্বাচিত হয়েই দাসপ্রথার বিলুপ্তি

ঘোষণা করেন। দাসপ্রথার ক্ষিপ্ত সমর্থকরা তাঁকে হত্যা করলেও, তাঁর পদক্ষেপের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও দাসপ্রথার অবসান ঘটে।

দিয়াগো গার্সিয়া ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপ। ভারত মহাসাগর তথা এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের ওপর কৌশলগত কর্তৃত্ব বহাল রাখার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দ্বীপে একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে। এই দ্বীপের চমৎকার পোতাশ্রয়ে বহাল রাখা হয় অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ ও পোলারিস সাবমেরিনের বহর। এই দ্বীপে নির্মিত ১২০০০ ফুট দীর্ঘ বিমানঘাঁটিতে যে-কোনো প্রকার বিমান অবতরণ করতে পারে। এখানে রয়েছে পি-৩ দূরপাল্লার বোমারু বিমান, ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান ইত্যাদির বহর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসমারা ও বাহরাইনের ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে দিয়াগো গার্সিয়াকে এতদঞ্চলের প্রধান ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তুলেছে।

দিয়েন বিয়েন ফু পঞ্চাশের দশকে হ্যানয় (ভিয়েতনাম)-এর পশ্চিমে অবস্থিত দিয়েন বিয়েন ফু নামক স্থানে ছিল ফরাসি উপনিবেশবাদীদের একটি মজবুত ঘাঁটি। ১৯৫৪ সালের মে মাসে জেনারেল গিয়াপের নেতৃত্বে ভিয়েতমিন মুক্তিসেনারা এই ঘাঁটি আক্রমণ করে এবং বিশ্বকে হতবাক করে দিয়ে ১৯৫৪ সালের ৭ মে তারিখে দুর্গসহ সমগ্র ঘাঁটিটি দখল করে নেয়। এই বিজয়ের ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়; মুক্তিসেনাদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং খোদ ফ্রান্সেই জনমত এই আত্মঘাতী যুদ্ধের বিরুদ্ধে চলে যায়। পরিণামে ফরাসিরা ভিয়েতনাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রায় সত্তর হাজার ফরাসি প্রাণ হারায়।

দীর্ঘ ছুরিকার রাত্রি Night of the Long Knives. জার্মানির হিটলার তাঁর নিজের সংগঠনের মধ্যেও কোনো-প্রকার বিরোধিতা বা তাঁর সঙ্গে মতভেদ বরদাস্ত করতে রাজি ছিলেন না। তাই পার্টি থেকে তাঁর বিরোধীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালের ৩০ জুন শনিবার-এর কালরাত্রিতে বহুসংখ্যক নাৎসি নেতাকে হত্যা করানো হয়। এই রাত্রিকেই বলা হয় দীর্ঘ ছুরিকার রাত্রি। রক্তাক্ত শনিবার (Bloody Saturday) নামেও এই দিনটিকে অভিহিত করা হয়। এই ঘটনার বীভৎসতার মধ্য দিয়ে হিটলার দলের একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁর জীবিতকালে কেউ তাঁর সামান্যতম বিরোধিতারও আর সাহস পায় নি।

দুই তলোয়ার মতবাদ Doctrine of Two Swords. এই মতবাদের মূলকথা হল এই যে, সৃষ্টিকর্তা তাঁর প্রতিনিধি—অর্থাৎ পোপ-এর হাতে দুটি ক্ষমতা বা তরবারি প্রদান করেছেন। এর একটি হল পার্থিব, অন্যটি হল আধ্যাত্মিক। ফলে, মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সকল কিছু পরিচালনা করার দায়িত্ব মূলত পোপেরই। তবে, আধ্যাত্মিক কাজে তাঁর অধিক ব্যস্ততার দরুন, তিনি পার্থিব দায়িত্ব কোনো রাজা বা শাসকের ওপর অর্পণ করতে পারেন এবং রাজা বা শাসক শুধু পোপের পক্ষেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন। স্বভাবতই, পোপ কোনো রাজা বা শাসকের কর্মকাণ্ড সঠিক বিবেচনা না করলে, প্রদত্ত ক্ষমতা ফিরিয়ে নিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে রাজা বা শাসক তাঁর পদ হারাবেন। রোমান ক্যাথলিক পোপ প্রথম গেসালিয়াস ৪৯৪ সালে এই মতবাদের গোড়াপত্তন করেন এবং ১৩০২ সালে পোপ অষ্টম বোনিফিস এই মতবাদভিত্তিক ডিক্রি

জারি করেন। বলা বাহুল্য, দুই তলোয়ার মতবাদ রাজার দৈব অধিকার মতবাদের বিপরীত।

দুই-দলীয় ব্যবস্থা Two Party System, যেখানে আইন করে দুটিমাত্র রাজনৈতিক দল রাখা হয়েছে অথবা যেখানে কার্যত দুটি দল এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেছে যে, রাষ্ট্র-ক্ষমতা শুধু এই দুই দলের মধ্যেই আবর্তিত হতে বাধ্য সেখানেই দুই-দলীয় ব্যবস্থা বলবৎ বলে ধরে নেওয়া যায়। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যার খুশি তার দল করার স্বাধীনতা আছে বটে কিন্তু বাস্তবতা হল এই যে, দীর্ঘকাল যাবৎ সেখানে ক্ষমতা শুধুমাত্র রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছে।

দুঃসাহসিকতাবাদ Adventurism. দেশব্যাপী সাংগঠনিক কাঠামো নির্মাণ এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে দলে টেনে আনার বদলে যাঁরা মনে করেন যে কিছু ঝুঁকিপূর্ণ বা দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং আদর্শ বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর—তাঁদের চিন্তাধারাকেই বলা হয় দুঃসাহসিকতাবাদ।

দুদায়েভ, জোখার জোখার দুদায়েভ ছিলেন সোভিয়েত বিমানবাহিনীর পারমাণবিক বোমারু বিমান স্কোয়াড্রনের একজন জেনারেল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনপ্রক্রিয়া শুরু হলে, দুদায়েভ ককেশীয় পার্বত্য ভূখণ্ড চেচনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার নেতৃত্ব দেন, স্বাধীন চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করেন এবং হানাদার রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে অতুলনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁর নেতৃত্বে চেচনিয়ায় ইসলাম আবার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালের এক রুশ বিমান-হামলায় জোখার দুদায়েভ নিহত হন। কিন্তু চেচেনরা তাদের স্বাধীনতারক্ষার সংগ্রাম এবং ইসলামের পুনর্জাগরণের কাজ অব্যাহত রাখে। দুদায়েভের উত্তরসূরি প্রেসিডেন্ট আসলান মাসখাদভও দুদায়েভের পদাঙ্ক অনুসরণের প্রত্যয় ঘোষণা করেন।

দেউলিয়া Bankrupt. যে-ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনো আদালত কর্তৃক দায়-দেনা পরিশোধে অসমর্থ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তাকেই বলে দেউলিয়া। এই ঘোষণা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবেদনক্রমে অথবা ঋণদাতাদের আবেদনক্রমে আদালতের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে। দেউলিয়া ঘোষণার উদ্দেশ্য হল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ঋণদাতাদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করে দিয়ে ঋণগ্রস্তকে ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া। অবশ্য কোনো সংগত কারণ থাকলে সম্পত্তি বণ্টনের পরও আদালত ঋণগ্রস্তকে অব্যাহতি না দিতে পারেন। আর ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ নামে কোনো ব্যাবসা বা লেনদেন শুরু করতে পারে না। আবার, কোনো জালিয়াতি, মিথ্যাচার বা হিসাবের গোলমাল প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট দেউলিয়া ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অন্যান্য শাস্তিও হতে পারে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আর কোনো অবদান রাখতে অক্ষম, এরূপ ব্যক্তি বা সংগঠনকেও মানুষ রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া বলে অভিহিত করে। অনুরূপভাবে, কোনো দেশের অর্থনীতি অত্যন্ত ভেঙে পড়লে, সেই অর্থনীতিকেও অর্থনীতিবিদরা দেউলিয়া অর্থনীতি বলে আখ্যায়িত করেন। অক্ষম সরকারকেও দেউলিয়া সরকার বলা হয়ে থাকে।

দেং জিয়াও পিং : চীনের সিচুয়ান প্রদেশের গুয়াঙ্গানে ১৯০৪ সালে তাঁর জন্ম। ১৯২০ সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি ফ্রান্সে যান এবং ১৯২৬ সালে যান মস্কো। ১৯২৭

সালে চীনে ফিরে এসে তিনি জিয়ান সামরিক অ্যাকাডেমির রাজনৈতিক প্রশিক্ষক হিসাবে যোগদান করনে এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ১৯৩৪ সালে লং মার্চে অংশ নেন এবং ১৯৪৫ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি নয়াচীনের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও পলিটব্যুরোর স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'-এর সময় তাঁকে 'পুঁজিবাদের দালাল' আখ্যা দিয়ে সকল পদ থেকে অপসারণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে পুনরায় তাঁকে উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় এবং ১৯৭৫ সালে কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও গণমুক্তি ফৌজের চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৯৭৬ সালে তাঁকে পুনরায় সকল দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়। মাও ঝে ডং ও জো এন লাইয়ের মৃত্যুর পর ১৯৭৭ সালে তিনি পুনরায় সকল পদে পুনর্বহাল হন এবং কার্যত চীনের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন। ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে তিনি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দাবিয়ে দেন। ১৯৮৯ সালে মিখাইল গর্বাচেভের সঙ্গে আলোচনা করে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেন। তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি শুরু করেন এবং ১৯৯২ সালে সরাসরি বাজার অর্থনীতি চালু করেন। বার্ধক্যজনিত কারণে ১৯৯০ সালে তিনি সকল পদ থেকে পদত্যাগ করলেও, কার্যত পার্টির গুরু হিসাবে বহাল থাকেন। ১৯৯৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

দৈব অধিকার তত্ত্ব Divine Right Theory. "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজাই বংশবংশানুক্রমে রাজ্য শাসন করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত"—এই তত্ত্বই হল দৈব অধিকার তত্ত্ব। বস্তুত রাজা এবং রাজ-অনুগ্রহপুষ্ট পুরোহিতরা এই তত্ত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে পোপতন্ত্রের বিপরীতে শক্তিশালী ও কায়েমি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান।

দৈব আইন Divine Law, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত আইন। ক্ষেত্রভেদে, রাষ্ট্র-পরিচালনা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত আচার-আচরণ পর্যন্ত দৈব আইন বিস্তৃত হতে পারে। দৈব আইনে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, দৈব আইন সরাসরি ঈশ্বর কর্তৃক প্রণীত এবং কোনো প্রেরিত পুরুষ বা মহামানবের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে আনীত।

দ্য গল ১৮৯০ সালের ২২ নভেম্বর ফ্রান্সের এক ধনী কৃষক পরিবারে দ্য গল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯২০ সালে পোল্যান্ডে রুশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেন। ১৯৩৯ সালে তিনি ফ্রান্সের সর্বকনিষ্ঠ জেনারেল এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি (রিনাউ-এর মন্ত্রিসভায়) নিযুক্ত হন। এর দশ দিন পর ফ্রান্স পরাজিত হলে তিনি লন্ডনে পালিয়ে যান। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি যুদ্ধরত ফরাসি বাহিনীসমূহের নেতৃত্ব দেন এবং মুক্ত ফ্রান্সের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৮ মাস পর (১৯৪৬ সালে) অবস্থার চাপে তিনি পদত্যাগ করলেও, ১৯৪৭ সালে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি এ-সময় যে-ডানপন্থি দলের নেতৃত্ব দেন, তার নাম ফরাসি জনগণের সংঘ (RPF)। ১৯৫১ সালে তিনি আবার অবসর নিয়ে আর.পি.এফ. ভেঙে দিলে এর সমর্থকরা গলপন্থি সামাজিক প্রজাতন্ত্রী দল (UARS) গঠন করে। ১৯৫৮ সালের মে মাসে আলজিরিয়ায় ফরাসি সেনাবাহিনীর অফিসাররা ক্ষমতা দখল করলে যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার ফলে প্রেসিডেন্ট কোটি তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান এবং তিনি পার্লামেন্টের ৩২৯-২২৪

ভোটে বিজয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করন। একই বছরের ২১ ডিসেম্বর তিনি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ-দায়িত্ব পালন করেন।

দ্বন্দ্ব, অপ্রধান Secondary Contradictions. একটি সমাজে বহুরকম দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। কিন্তু সবসময় সবগুলো দ্বন্দ্বের গুরুত্ব সমান থাকে না। যে-সময় যে-দ্বন্দ্বটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ থাকে, তখন তাকে বলা হয় প্রধান দ্বন্দ্ব। অন্যান্য দ্বন্দ্বের অধিকাংশই হয় প্রধান দ্বন্দ্বের অপভ্রংশস্বরূপ। এরূপ ক্ষেত্রে, প্রধান দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়ে গেলে, তার সঙ্গে অপ্রধান দ্বন্দ্বসমূহের অধিকাংশেরও মীমাংসা হয়ে যায়। বাদবাকি অপ্রধান দ্বন্দ্বের মীমাংসাও সহজ হয়। উদারণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজির সঙ্গে শ্রমের দ্বন্দ্বকেই প্রধান দ্বন্দ্ব বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এটি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। অতএব, দৃষ্টিভঙ্গিভেদে প্রধান দ্বন্দ্বও বিভিন্নভাবে চিহ্নিত হতে পারে। যেমন, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় বিপ্লবের অনুসারীদের চোখে পুঁজির সঙ্গে শ্রমের দ্বন্দ্ব প্রধান দ্বন্দ্ব বলে চিহ্নিত নাও হতে পারে।

দ্বন্দ্ব, অবৈরী : যে দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বরত দুই পক্ষের এক পক্ষকে উচ্ছেদ বা নির্মূল করার প্রয়োজন পড়ে না বরং বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যে-দ্বন্দ্বের মীমাংসা সম্ভবপর—সেই দ্বন্দ্বকে বলা হয় অবৈরী দ্বন্দ্ব (Non-antagonistic Contradiction)।

দ্বন্দ্বতত্ত্ব বা ডায়ালেকটিকস (Dialectics)। এই তত্ত্বের মূলকথা হল এই যে, সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার মধ্যেই দুই বিপরীত সত্তার অস্তিত্ব বিরাজমান। এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বের ফলেই বস্তু বা ঘটনার বিকাশ ঘটে, পরিবর্তন ঘটে। ইতিবাচক দিক ও নেতিবাচক দিক, অবক্ষয়মান দিক ও বিকাশমান দিক—এর মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম চলতেই থাকে। এক দ্বন্দ্বের অবসান হলে শুরু হয় নতুন দ্বন্দ্ব। বস্তুত দ্বন্দ্বই হল চিরন্তন এবং মীমাংসা বা স্থিতি হল আপেক্ষিক। মার্কসীয় মতে, দ্বন্দ্বতত্ত্বের তিনটি মৌলসূত্র, যথা—১. বিপরীত সত্তার অন্তর্মিলন ও দ্বন্দ্ব (Interpenetration and Contradiction of Opposites), ২. পরিমাণের গুণগত পরিবর্তন (Qualitative Change of Quantity) এবং ৩. নিরাকরণের নিরাকরণ (Negation of Negation)। বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব যখন পরিমাণে বাড়ে, তখন সংঘটিত হয় গুণগত পরিবর্তন এবং ফলে পূর্বতন সত্তার নিরাকরণ বা অবসান হয়ে নতুন সত্তার উদ্ভব ঘটে। এই দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। অণুতে যেমন রয়েছে ইলেক্ট্রন ও প্রোটন, বিদ্যুতে যেমন রয়েছে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দিক, চুম্বকে যেমন রয়েছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, সৃষ্টিতে যেমন রয়েছে নারী ও পুরুষ, সমাজেও তেমনি রয়েছে শোষক ও শোষিত, উৎপাদিকাশক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক ইত্যাদি। প্রকৃতিজগতের মতোই সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (যেমন, দাস ও দাস মালিকের দ্বন্দ্ব সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসের দ্বন্দ্ব কিংবা পুঁজিপতি ও শ্রমকে দ্বন্দ্ব, অটোমেশনের সঙ্গে মানব শ্রমের দ্বন্দ্ব)-র ফলেই এক-একটি সমাজকাঠামো ভেঙে নতুন সমাজের সৃষ্টি হয়। বস্তুত যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে সক্রেটিসই সর্বপ্রথম দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন। জার্মান দার্শনিক হেগেল একটি নতুন বিশ্লেষণ-পদ্ধতি হিসাবে এর বিকাশ সাধন করেন। কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস একে তাঁদের দর্শনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। লেনিন, স্ট্যালিন. মাও ঝে ডং প্রমুখ এর বিকাশ সাধন করেন।

দ্বন্দ্ব, প্রধান Main Contradiction. যে-কোনো সমাজে বিবিধ প্রকার দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। যেমন, একটি পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজির সঙ্গে শ্রমের দ্বন্দ্ব, পুঁজিবাদীদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ক্ষমতাহীনদের দ্বন্দ্ব, জাতীয় উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে আমদানিকৃত পণ্যের দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় শক্তির সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষীয়দের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। যেহেতু অবস্থিত সকল দ্বন্দ্বের সমাধান একই সঙ্গে সম্ভবপর নয়, সেহেতু প্রথমে প্রধান বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বটির সমাধানে সচেষ্ট হতে হয় এবং প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধেই আঘাত হানতে হয়। প্রধান শত্রুকে উৎখাত করার জন্য তুলনামূলকভাবে অপ্রধান শক্তিসমূহের সঙ্গে কৌশলগত মিত্রতাও করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য, মূল দ্বন্দ্বের সমাধান হয়ে গেলে অন্যান্য দ্বন্দ্বের মীমাংসা সহজেই হয়ে যায়। আর মূল দ্বন্দ্ব বা সমস্যাকে চিহ্নিত না করে বা তার বিরুদ্ধে আঘাত না হেনে অপ্রধান বা শাখা-দ্বন্দ্ব নিয়ে যতই ধ্বস্তাধ্বস্তি করা যাক-না কেন, তাতে কোনোক্রমেই ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভবপর হয় না।

দ্বন্দ্ব, বৈরী দ্বন্দ্বরত দুইপক্ষের একপক্ষকে উচ্ছেদ বা নির্মূল করা ছাড়া যে-দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা সম্ভবপর হয় না, সেই দ্বন্দ্বকেই বলে বৈরী দ্বন্দ্ব বা Antagonistic Contradiction. যেমন, দাস ও দাস-মালিক, কিংবা ভূমিদাস ও সামন্তপ্রভু কিংবা সর্বহারা ও বুর্জোয়া কিংবা নিপীড়িত জাতি ও ঔপনিবেশিক শক্তি প্রমুখের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে বৈরী দ্বন্দ্ব বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

দ্বান্দ্বিক নেতৃত্ব : স্বৈরাচারী বা অবতারসুলভ নেতৃত্বের বিপরীতে আদর্শ, যুক্তি ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাভিত্তিক নেতৃত্বই হল দ্বান্দ্বিক নেতৃত্ব।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ Dialectical Materialism. মার্কসীয় মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। ১৮৪০-এর দশকে মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব হাজির করেন। এই তত্ত্ব দর্শন ও চিন্তার ইতিহাসে এক বিপ্লবী অধ্যায়ের সূচনা করে। মার্কস ও এঙ্গেলস হেগেল প্রমুখ পূর্বসূরিদের নিকট থেকে এ-তত্ত্বের ধারণা লাভ করেন এবং একে ভাববাদিতামুক্ত করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদানের প্রয়াস পান। বস্তুত দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও বস্তুবাদী দর্শন, এই দুই-ই হল মার্কসবাদের ভিত্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলার কারণ হল এই যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বস্তু, ঘটনা বা অবস্থার বিশ্লেষণ পদ্ধতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষণ পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার পদ্ধতি দ্বন্দ্বমূলক ও বস্তুবাদী। এই দ্বন্দ্বতত্ত্বকে যখন প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ আর যখন সমাজ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন একে অভিহিত করা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হিসাবে।

দ্বিকক্ষীয় ব্যবস্থা যে-শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্ট বা আইনসভার দুটি পরিষদ বা কক্ষ থাকে, সেই ব্যবস্থাকে বলে দ্বিকক্ষীয় ব্যবস্থা (Bi-cameral System)। এরূপ ক্ষেত্রে একটি পরিষদকে নিম্নতর পরিষদ ও অপরটিকে উচ্চতর পরিষদ বলা হয়ে থাকে। নিম্নতর পরিষদ গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত এবং উচ্চতর পরিষদ সাধারণত অভিজাত, বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন সামাজিক অংশ, প্রতিষ্ঠান বা নিম্নতর পরিষদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। নিম্নতর পরিষদই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মৌল ভূমিকা পালন করে এবং উচ্চতর পরিষদের ভূমিকা হয় অনেকটা তদারকিমূলক বা অভিভাবকত্বমূলক।

দ্বিতীয় আঘাতের ক্ষমতা Second Strike Capacity. পারমাণবিক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দটির উদ্ভব। এর মূল কথা হল এই যে, একটা দেশের এত বিপুল পরিমাণ (বিশেষত লুক্কায়িত) পারমাণবিক অস্ত্র থাকা দরকার যাতে শত্রুপক্ষ একেবারে অতর্কিতে সম্পূর্ণ সফল পারমাণবিক হামলা চালিয়ে দেওয়ার পরও প্রথমোক্ত দেশটির হাতে এমন পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র থেকে যায়, যা দিয়ে আঘাত হেনে হামলাকারী শত্রুকে ঘায়েল করা নিশ্চিতভাবে সম্ভবপর হয়। এই চিন্তার অনুসারীদের মতে বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র এমন অজ্ঞাত স্থানে এবং পারমাণবিক সাবমেরীনে জমা রাখাই বিধেয় যা শত্রুর পথে জানা সম্ভবপর নয়। কিন্তু এর সমালোচকরা বলেন যে, শত্রুপক্ষের হাতে যদি উন্নততর সন্ধানী (Reconnaissance) প্রযুক্তি থাকে, তা হলে আজ যে-স্থানকে শত্রুর অজ্ঞাত বলে মনে করা হচ্ছে, কাল সেটা শত্রুর জানার মধ্যে এসে যেতে পারে। সমালোচকদের মতে দ্বিতীয় আঘাতের ক্ষমতা অর্জনের চিন্তা বা নীতি পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি ও এরূপ অস্ত্রের ব্যাপক বিস্তার ব্যতীত অন্য কোনো কল্যাণই সাধন করবে না।

দ্বিতীয় চেম্বার : Second Chamber. কোনো কোনো দেশের পার্লামেন্টে মূল বা প্রধান চেম্বারের পাশাপাশি ভিন্ন ভিত্তিতে নির্বাচিত অপর যে-চেম্বার বা হাউস থাকে সেটাকেই বলে দ্বিতীয় চেম্বার। যেমন– ব্রিটেনের প্রতিনিধি সভার পাশাপাশি রয়েছে হাউস অব লর্ডস। ভারতে লোকসভার পাশাপাশি রয়েছে রাজ্যসভা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিনিধি সভার পাশাপাশি রয়েছে সিনেট। জার্মানির দ্বিতীয় চেম্বার হচ্ছে Bundesrat. সাধারণত দ্বিতীয় চেম্বারটি গঠিত হয় অঙ্গরাজ্য বা অঙ্গরাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে। অবশ্য ব্রিটেনের হাউস অব লর্ডসের অধিকাংশ সদস্যই আসেন বংশপরম্পরায়। সাধারণত নিম্ন চেম্বার বা প্রতিনিধি সভার হাতে থাকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ চেম্বার বা দ্বিতীয় চেম্বার বৈদেশিক নীতি ও কোনো আইন পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

দ্বিতীয় ব্যালট Second Ballot. এটি হচ্ছে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Simple majority)-র বদলে একজন প্রার্থী প্রকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট (অর্থাৎ অন্তত ৫০% + ১) পাচ্ছে কি না তা সুনিশ্চিত করার একটি পদ্ধতি। যেমন– ফ্রান্সের জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা আছে যে, কোনো নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রার্থীই যদি মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০%-এর বেশি না পায়, তা হলে ওই নির্বাচনী এলাকায় পুনরায় ভোট হবে এবং প্রথম নির্বাচনে যারা ১২.৫%-এর কম ভোট পেয়েছিল তারা দ্বিতীয় প্রতিযোগীতা বা দ্বিতীয় ব্যালটের সময় প্রার্থী বলে গণ্য হবে না। অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যালটের ব্যবস্থা আছে, তার ফলে কোনো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীই ৫০%-এর বেশি ভোট না পেলে প্রথম নির্বাচনে শীর্ষস্থান ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীর মধ্যে আবার নির্বাচন হবে। দ্বিতীয় ব্যালটের সুফল হল এই যে, প্রথমত ব্যর্থ বা তাৎপর্যহীন প্রার্থীর ভোটাররা পুনরায় একজন যথার্থ ব্যক্তিকে ভোটদানের সুযোগ পায়, ৫০% -এর বেশি ভোট পাওয়ার জন্য সমমনারা ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয় এবং যাঁরা নির্বাচিত হন তাঁরাও দাবি করতে পারেন যে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্তৃকই নির্বাচিত।

দ্বি-ধাতুমান Bi-metalism. স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুকেই মুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণের মান হিসাবে গণ্য করাই হল দ্বি-ধাতুমান।

দ্বিপাক্ষিক চুক্তি Bi-partite Agreement. অর্থাৎ দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি। এরূপ চুক্তি দুই রাষ্ট্র বা অন্য যে-কোনো দুই পক্ষ (যেমন, মালিক ও শ্রমিক)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

দ্বৈতবাদ Dualism. ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) কর্তৃক প্রবর্তিত দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে মন এবং বস্তু বা বাহ্যজগৎ—এ দুয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। বলাবাহুল্য, এই মতবাদ বস্তুবাদ ও ভাববাদ—উভয়েরই বিরোধী।

দ্বৈতশাসন Diarchy. একই রাষ্ট্রে বা একই ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে দুই কর্তৃপক্ষের যুগপৎ শাসনকেই বলা হয় দ্বৈতশাসন। এরূপ ক্ষেত্রে দুই কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ার সাধারণত নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে। দ্বৈতশাসনের প্রবক্তারা মনে করেন যে, এর ফলে শাসন-প্রশাসনের কার্যকারিতা ও ভারসাম্য দুই-ই বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, দ্বৈতশাসনের বিরোধীরা মনে করেন যে, এতে দুই কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে কার্যকারিতা ও ভারসাম্য হ্রাস পেতে বাধ্য।

দ্রব্য যা উৎপাদনকারীর নিজের ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করা হয়, বাজারে বা অন্য কোনো উপায়ে বিক্রির জন্য নয়, তাকেই বলে দ্রব্য (Product)। আর যা বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদন করা হয় তাকে বলা হয় পণ্য (Commodity)।

॥ ধ ॥

ধনিকতন্ত্র : Plutocracy. শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Plutos ও Kratain-এর সম্মিলন থেকে। গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী প্লুটো হলেন ধনের দেবতা। ধনিকতন্ত্র বা প্লুটোক্র্যাসি বলতে বোঝায় ধনিক সম্প্রদায়ের তন্ত্র বা শাসন। ধনিকতন্ত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—দুরকমই হতে পারে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র বাস্তবিকপক্ষে ধনিক সম্প্রদায়ের নিরঙ্কুশ স্বার্থরক্ষা করে বিধায়, এটাকেও অনেকে প্রচ্ছন্ন ধনিকতন্ত্র বলেই বিবেচনা করেন। (প্লুটোক্র্যাসিও দ্রষ্টব্য)।

ধর্ম এক বা একাধিক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি বা সত্তার ধারণা এবং ওই শক্তি বা সত্তার আরাধনাই হল ধর্ম (Religion)। ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতরা মোটামুটি একমত। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার-এর মতে প্রকৃতির উপাসনা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। হার্বার্ট স্পেনসারের মতে পিতৃপুরুষদের আত্মার পূজা থেকেই ধর্মের উদ্ভব। আদিম মানুষ প্রকৃতির যেসব দিক্ বা ঘটনার ব্যাখ্যা বা প্রতিকার করতে পারত না, সেগুলোকেই অলৌকিক শক্তি বা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ বিবেচনা করে—তার পূজা করত। এভাবেই বহু দেবতার উদ্ভব। পরবর্তীকালে, চিন্তাশীল মানুষরা মনে করেন যে, আসলে চূড়ান্ত অলৌকিক শক্তি বা ঈশ্বর একজনই মাত্র—তাঁর শক্তি ও কর্মকাণ্ডের প্রকাশই বিভিন্ন। এভাবেই সৃষ্টি হয় একেশ্বরবাদ। খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মে একেশ্বরবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে। ইসলাম পরম সৃষ্টিকর্তার কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব অস্বীকার করে এবং আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডি পেরিয়ে ধর্মকে জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

পায়। বলাবাহুল্য ধর্মের প্রবক্তারা, বিশেষত ইসলাম, খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের প্রবক্তারা বিশ্বাস করেন যে ধর্ম সরাসরি সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক তাঁর প্রেরিত পুরুষের মাধ্যমে প্রেরিত।

ধর্মঘট : Strike. কোনো রাজনৈতিক দল বা দলসমূহ কিংবা কোনো শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক কোনো দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কর্মবিরতিকেই বলে ধর্মঘট। ধর্মঘটের সময় ধর্মঘটিরা নিজেরাও কর্ম থেকে বিরত থাকে, অন্যদেরও কর্ম থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করে। ধর্মঘট নির্দিষ্টকাল বা অনির্দিষ্ট কাল যাবৎ চলতে পারে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ধর্মঘট শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবিদাওয়া আদায়ের রাষ্ট্রস্বীকৃত মাধ্যম। ধর্মঘটের পদ্ধতিও অনেক রাষ্ট্রে বিধিবদ্ধ—যদিও শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রায়শই তার গণ্ডি অতিক্রম করে।

ধর্মঘট, অবস্থান যে-ধর্মঘটের সময় ধর্মঘটিরা কর্মস্থলে যায়, কিন্তু কাজ করে না তাকেই বলে অবস্থান ধর্মঘট (Sit-down Strike)।

ধর্মঘট, সাধারণ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দেশব্যাপী সকল স্তরের জনসাধারণের কর্মবিরতি। সাধারণ ধর্মঘট (General Strike)-এর মানে হল কোনোপ্রকার যানবাহন চলবে না, কোনোপ্রকার অফিস-আদালত-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি খুলবে না এবং সকল কলকারখানা ও ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠানাদি বন্ধ থাকবে। সাধারণ ধর্মঘটকে হরতাল বা বন্‌ধ্ বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

ধর্মনিরপেক্ষতা Secularism-এর শাব্দিক অর্থ হল 'ইহজগৎ সম্বন্ধীয়' বা 'ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন-বহির্ভূত'। তবে, সাধারণভাবে, ধর্মনিরপেক্ষ বা Secular রাষ্ট্র দ্বারা বোঝানো হয় এমন একটি রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থা, যে-রাষ্ট্র বা সমাজ কোনো ধর্মবিশেষের ভিত্তিতে পরিচালিত নয়। এই মতবাদীরা মনে করেন যে, মানবজীবনের পক্ষে যা-কিছুই মঙ্গলজনক, তাইই সৎনীতি এবং সৎনীতি ঈশ্বর ও ধর্মনিরপেক্ষ। ১৮৪৬ সালে ইংল্যান্ডের হোলিওক (G. J. Holyoake) সর্বপ্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন। তবে এই মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন চার্লস ব্র্যাডলাফ (Charles Bradlaugh)। এই মতবাদ প্রচারের জন্য ইংল্যান্ডে ন্যাশনাল সেক্যুলার সোসাইটি নামে একটি সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রই ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে পরিচালিত। তবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা চূড়ান্ত বিচারে সমার্থক নয় এবং অনেকের মতে ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে ধর্মহীনতারই নামান্তর, যেমন দলনিরপেক্ষতা মানে কোনো দলে না থাকা। [সেক্যুলারিজমও দ্রষ্টব্য]।

ধর্মবিপ্লব : Reformation. ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানির ধর্মযাজক মার্টিন লুথার কর্তৃক সৃষ্ট ধর্মীয় আন্দোলনই ধর্ম-বিপ্লব' বা 'ধর্মসংস্কার' নামে খ্যাত। তৎকালে ইউরোপে যে-নবজাগরণের জোয়ার সৃষ্টি হয়—তা ছিল অনেকাংশে ধর্ম-বিপ্লবেরই ফলশ্রুতি। ১৫১৭ সালে মার্টিন লুথার জার্মানির এক রোমান ক্যাথলিক গির্জার দ্বারদেশে ৯৫টি মৌলিক প্রস্তাব সংবলিত এক পোস্টার সেঁটে দেন। এই পোস্টারে তিনি ক্যাথলিক গির্জার বিপুল দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেন এবং তার আমূল সংস্কারের পথ প্রদর্শন করেন। ফলশ্রুতিতে, ১৫২০ সালে পোপ তাঁকে খ্রিস্টধর্ম থেকে বহিষ্কৃত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর বিপুলসংখ্যক সমর্থক তাঁর সমর্থনে অটল থাকেন। মার্টিন লুথার ও তাঁর সমর্থকরা ক্যাথলিক চার্চ ও পোপের দুর্নীতির প্রতিবাদ করেন বলে তাঁরা ইতিহাসে

প্রতিবাদী বা প্রোটেস্ট্যান্ট (Protestant) নামে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে এঁদের মধ্য থেকে সুইজারল্যান্ডের ধর্মযাজক ক্যালভিন বেরিয়ে গিয়ে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। অপরদিকে, এই ধর্মবিপ্লবের কবল থেকে ক্যাথলিক মতবাদকে রক্ষা করার জন্য অস্ট্রিয়ার ট্রেন্ট নামক স্থানে অনুষ্ঠিত রোমান ক্যাথলিক গির্জার এক সম্মেলনে ক্যাথলিক মতবাদেরও নানাবিধ সংস্কারসাধন করা হয়। এই ধর্মবিপ্লবের ফলে সমগ্র খ্রিস্টান জগৎ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট—এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়।

ধর্মশাস্ত্র সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে যে-শাস্ত্র আলোচনা করে তাকেই বলে ধর্মশাস্ত্র (Theology)। কারও কারও মতে ধর্মগ্রন্থে (কুরআন, বাইবেল, বেদ ইত্যাদিতে) যা বর্ণিত আছে, কেবল তাই-ই ধর্মশাস্ত্র। আবার কারও কারও মতে ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা ও অন্যান্য গ্রন্থাদি (যেমন, হাদিস, উপনিষদ ইত্যাদি)-ও ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় দলের মতে, ধর্মীয় ভাবধারার ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদিও ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মীয় মুক্তিবাহিনী ১৮৬৫ সালে ইংল্যান্ডের রেভারেন্ড উইলিয়াম বুথ নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর কাঠামো ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে ধর্মীয় মুক্তিবাহিনী বা Salvation Army গঠন করেন। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন ও খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা। বর্তমানে এই সংগঠন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পাশাপাশি জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডও করে থাকে।

ধীরে চলো কৌশল দাবি-আদায়ের কৌশল হিসাবে শ্রমিকরা অনেক সময় ধর্মঘটের পরিবর্তে কাজের গতি কমিয়ে দেওয়ার এই কৌশল গ্রহণ করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রতিপক্ষের হামলা ও দৃষ্টি এড়িয়ে সাংগঠনিক শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দল বা সরকারও অনেক সময় ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করে। ইংরেজিতে ধীরে চলো কৌশলকে বলে Go Slow Tactics.

ধ্রুব : ভাববাদী দর্শনে ধ্রুব (Absolute) হল সে-সমস্ত বিষয়, যা শাশ্বত, অনন্ত, নিঃশর্ত, নিখুঁত এবং অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ যা 'আপনার মধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ' এবং অন্যকিছুর ওপর নির্ভরশীলতামুক্ত। ধর্মমতানুযায়ী একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর বিধিবিধানই ধ্রুব। ফিখটের দর্শন অনুযায়ী, ধ্রুব হল এগো (Ego), হেগেলের মতে তা হল 'সর্বজনীন সূত্র' বা 'পরমাত্মা', শোপেনহাওয়ারের মতে ধ্রুব হল 'পরম ইচ্ছা' আর বার্গসঁর মতে অন্তরানুভূতি (Intuition) অর্থাৎ কোনো যুক্তিবিচার ছাড়াই অন্তরে যে আকস্মিক বোধ বা অনুভূতি জাগে, তাই-ই হল ধ্রুব। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ধ্রুবতত্ত্বকে অবৈজ্ঞানিক বলে বাতিল করে দেয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুযায়ী সবকিছুই আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল। তবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ একথা স্বীকার করে যে সমগ্র সৃষ্টিই একটি অখণ্ড সত্তা, সুতরাং এর অন্তর্নিহিত প্রত্যেক কিছুই পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কিছু ও শর্তের বিচারে আপেক্ষিক হলেও সবকিছু মিলে একটি সমগ্রতা বা ধ্রুবতার ভাব রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ধ্রুব এবং আপেক্ষিকতার সম্পর্কও আপেক্ষিক। অবশ্য, আইনস্টাইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ এক পরম বা মৌলিক শক্তি (Fundamental Power)-এর কথা বলেন যা ধ্রুব এবং আল্লাহর ধারণার সঙ্গে তুলনীয়।

॥ ন ॥

নকশাল আন্দোলন : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি এলাকা থেকে উদ্ভূত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ ভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। নকশালবাড়ি থেকে উদ্ভূত বলেই এই ধারার আন্দোলন নকশাল আন্দোলন নামে খ্যাত। ১৯৭০-৭১ সালে চারু মজুমদার, কানু স্যানাল, অসীম চ্যাটার্জী প্রমুখের নেতৃত্বাধীন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই.-এম.এল.) নকশালবাড়ি-খড়িবাড়ি এলাকার ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করে এবং শ্রেণীশত্রু হিসাবে চিহ্নিত জোতদার-মহাজন ও তাদের প্রতিভূ সরকারি শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের সূচনা করে। অল্প সময়ের মধ্যেই নকশালবাড়ি-খড়িবাড়ির সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই এর প্রধান নেতা চারু মজুমদার সরকারি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের ১২ দিন পর (২৮ জুলাই) পুলিশি নির্যাতনের মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করা হয়। নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সি.পি.আই-এম.এল. বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায় এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেকটা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।

নবজাগরণ Renaissance. বা পুনরুজ্জীবন। প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী বিস্তৃত এই আন্দোলন সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সকল দিকে এক অভাবনীয় বিকাশের সূচনা করে। মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই নবজাগরণ বা রেনাইসাঁ আন্দোলন ছিল সামন্তবাদ ও তার অবশেষসমূহকে উচ্ছেদ করে তৎকালীন বিচারে প্রগতিশীল বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের এক সর্বব্যাপী আন্দোলন। মানব-ইতিহাসের এই বৃহত্তম সাংস্কৃতিক আন্দোলন কূপমণ্ডূকতার প্রাচীর ভেঙে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও চিন্তাকে মুক্তি প্রদান করে। রেনাইসাঁ প্রথম শুরু হয় ইতালিতে। পরে তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ইতালির দান্তে, বোকাসিও, ম্যাকিয়াভেলি, ফ্রান্সের রেবেলাই, মন্টেঁ, স্পেনের সেরভেন্টিস, ইংল্যান্ডের চসার, স্যার টমাস মুর, ফ্রান্সিস বেকন, হল্যান্ডের ইরেসমাস প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক-প্রবন্ধকারদের সাহিত্যিক অবদান; র‌্যাফায়েল, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো প্রমুখের শিল্পকর্ম ইত্যাদিই ছিল নবজাগরণের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার। ১৪৪৩ সালে জার্মানিতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করে। রেনাইসাঁর প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত যুগান্তকারী ব্যাপারসমূহ সংঘটিত হয় ১. মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার, দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের উদ্ভাবন, ডাঃ উইলিয়াম হার্ভে কর্তৃক দেহের রক্তসঞ্চালন পদ্ধতি উদ্ঘাটন, কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার, ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার, ম্যাগিলান কর্তৃক পৃথিবী পরিভ্রমণের মাধ্যমে পৃথিবীর গোলাকৃতি প্রমাণিত হওয়াসহ বিভিন্ন আবিষ্কার বিশ্বপ্রকৃতি ও জাগতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মানুষের এযাবৎকালীন লালিত চিন্তাধারাকেই আমূল পালটে দেয়, মানুষের চিন্তার দিগন্ত লাভ করে এক অভাবিতপূর্ব বিশালত্ব; ২. রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে আধুনিক জাতীয়তার উদ্ভব ঘটে এবং প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তপ্রথার ধ্বংস ও পুঁজিবাদের বিকাশ সূচিত হয়; ৩. ধর্মের ক্ষেত্রে চার্চের সর্বব্যাপী প্রভাব ধ্বংস হয়, ব্যক্তিস্বাধীনতার উদ্ভব ঘটে এবং ধর্মের বিপুল সংস্কার সাধিত হয়; ৪. ব্যাবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আটলান্টিক মহাসাগর নয়া গুরুত্ব লাভ করে. ব্যাবসা-বাণিজ্য বিশ্বরূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে এবং পুঁজির দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে এবং ৫. সকল দিক থেকে মধ্যযুগীয়তার অবসান ও আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব

ঘটে। কালক্রমে এই নবজাগরণ বা রেনাইসাঁর ঢেউ ভারতীয় উপমহাদেশসহ বিশ্বের সকল অঞ্চল ও সকল জাতিকেই কমবেশি স্পর্শ করে।

নব-প্লেটোবাদ Neo-Platonism. প্লেটোর মৃত্যুর বহু বছর পর খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্লেটোর মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় যোগতত্ত্ব বা অতীন্দ্রয়বাদের সংমিশ্রণে এই মতবাদ গড়ে ওঠে। এই মতবাদ আলেকজান্দ্রীয় প্লেটোবাদ নামেও পরিচিত। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান এই মতবাদকে উচ্ছেদ করে দেন।

নব্য নাৎসিগণ Neo-Najis. ব্রিটেনেই উগ্র বর্ণবাদী এসব নব্য নাৎসিদের উদ্ভব এবং তাদের প্রধান লক্ষ্য ব্রিক্সটন ও ব্রিকলেন এলাকায় বসবাসরত নিগ্রো ও ইহুদিরা। এদের প্রধান অস্ত্র পেরেক বোমা। নব্য নাৎসি গ্রুপ সমূহের অন্যতম হচ্ছে : ১. ন্যাশনাল ফ্রন্ট ('৭০-এর দশকে এরা খুবই তৎপর ছিল, এখন অনেকটা স্তিমিত) ২. কমব্যাট-১৮ (এরা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এরা কৃষ্ণাঙ্গ ও ইহুদিদের বর্ণগত ও যৌন হামলা চালানোর নীতি অনুসরণ করে); ৩. দি লীগ অব সেন্ট জর্জ (এখন কিছুটা দুর্বল) এবং ৪. ইন্টারন্যাশনাল থার্ড পজিশন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইতালি ও জার্মানিতেও মুসোলিনি ও হিটলারের ভক্ত নব্য নাৎসি আবির্ভূত হচ্ছে, তবে এদের চরিত্র অনেকটা রাজনৈতিক।

নয়া অর্থনীতি Neo-Economic Policy (NEP)। ১৯১৭ সালে অনুষ্ঠিত রুশ বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি উৎপাদনের সকল উপায় থেকে ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ সাধন করে। কিন্তু সার্বিক গণমালিকানার জন্য যে-সাংগঠনিক ও আন্তঃকাঠামো প্রয়োজন, তা তখনও পর্যন্ত যথাযথরূপে গড়ে না ওঠায় আকস্মিকভাবে সার্বিক সমাজতন্ত্রীকরণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে শুরু করে, উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় এবং বহুলোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। এই পটভূমিতে ১৯২১ সালে লেনিন নয়া অর্থনীতি বা NEP প্রবর্তন করেন এবং সার্বিক গণমালিকানা থেকে পশ্চাদপসরণ করে পর্যায়ক্রমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নীতি গ্রহণ করেন। লেনিন এই অর্থনীতিকে প্রথম মহাযুদ্ধ-বিধ্বস্ত রুশ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিনির্মাণের উদ্দেশ্যে সাময়িক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন এবং ১৯২২ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির একাদশ কংগ্রেসে ঘোষণা করেন যে, পশ্চাদপসরণের পর্যায় শেষ হয়েছে এবং ব্যক্তিগত পুঁজির ওপর আক্রমণের সময় এসেছে। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে নয়া অর্থনীতির অবলুপ্তি ঘটে।

নয়া-ফ্যাসিবাদ Neo-Fascism. ১৯৯০-এর দশকে ইতালির Movimento Sociale Italiano (MSI) এবং জার্মানির Die Republikaner (REP) নয়া-ফ্যাসিবাদী দল হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বেনিটো মুসোলিনির নাতনিও নয়া ফ্যাসিবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। তবে যে বর্ণবাদ ও ইহুদি বিরোধিতাবাদ-এর ওপর ভিত্তি করে মূল ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠেছিল, সে-দুটি বিষয় নিয়ে এখন প্রকাশ্য আন্দোলন করা দুরূহ বিধায় নয়া-ফ্যাসিবাদীরা তেমন একটা সুবিধা করে উঠতে পারছে না। তা সত্ত্বেও নয়া-ফ্যাসিবাদের ভিত্তি হচ্ছে বর্ণগত খাঁটিত্বের তত্ত্ব, উগ্র জাতীয়তা, সামাজিক শৃঙ্খলা, সমরবাদ এবং কর্তৃত্ববাদ (authoritarianism)। ফ্রান্সের 'ফ্রন্ট ন্যাশনাল'-ও নয়া-ফ্যাসিবাদের সমর্থক। এই দল আফ্রিকা থেকে আগত অধিবাসীদের বিরুদ্ধে

অসন্তোষ ও বর্ণবৈষম্য ছড়ানোর মাধ্যমে শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যে, বিশেষত বেকারদের মধ্যে কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

নয়া-রক্ষণশীলতা Neo-Conservatism. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাইকেল হেরিংটন কথাটির প্রবর্তন করেন এবং Irving Kristol, Norman Podhoretg, Daniel Patrick Moynihan, Jeane Kirk Patrick, Nathan Glazer, Daniel Bell প্রমুখের মতো ব্যক্তিত্বও এই নয়া-রক্ষণশীলতার পক্ষে অবস্থান নেন। নয়া-রক্ষণশীলরা মার্কিন উদারতাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সরকার সব সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ ও অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী—এরূপ বদ্ধমূল ধারণার বিরোধিতা করে। অবশ্য নয়া-রক্ষণশীলতা কোনো সুসংহত মতবাদ নয়। মোটামুটি নয়া রক্ষণশীলরা কমিউনিজমের বিরোধী ও পশ্চিমা মূল্যবোধের সমর্থক ; মার্কিন ফেডারেল সরকারের ভূমিকার যথার্থতার ব্যাপারে সন্দিহান, যৌন-স্বাধীনতার বিরোধী ও মোরাল ম্যাজরিটির মতো পরিবার ব্যবস্থা সংরক্ষণে আগ্রহী এবং বস্তুগত সাম্যের বদলে সুযোগের সাম্যে (Equality of Opprtunity) বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্রের পতনের পর এই মতবাদীদের তৎপরতাও খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং একসময়ের প্রবল নয়া-রক্ষণশীলদের অনেকেই (যেমন– ময়নিহাম) পরবর্তীকালে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন।

নর্ডিক কাউন্সিল Nordic Council. ১৯৫২ সালে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ড—এই চারটি স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশকে নিয়ে নর্ডিক কাউন্সিল গঠিত হয়। এর অনেকগুলো স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে। এই কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হল সদস্যদেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

নাগরিক অধিকার Civil Rights. অবস্থান নির্বিশেষে একটি দেশের প্রতিটি নাগরিক আইনগত ও সংবিধানগতভাবে রক্ষিত যে-সমস্ত মৌলিক অধিকার ভোগ করে, সেসব অধিকারকেই বলা হয় নাগরিক অধিকার। এর রয়েছে দুটি ক্যাটেগরি, যথা ১. মৌলিক মানবাধিকার ও ২. রাজনৈতিক/নাগরিক অধিকার। আইনের চোখে সাম্য, সুবিচারের গ্যারান্টি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গবৈষম্যহীনতা, যদৃচ্ছ গ্রেফতার পক্ষপাতমূলক বিচার, পুলিশি নির্যাতন ইত্যাদির কবল থেকে নিষ্কৃতি ইত্যাদি হল প্রথম ক্যাটেগরির নাগরিক অধিকার। আর ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠন ও সভা সমিতির অধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোটদানের অবাধ অধিকার ইত্যাদিই দ্বিতীয় ক্যাটেগরির নাগরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। স্বৈরতান্ত্রিক ও একনায়কত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রে জনগণের নাগরিক অধিকার ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হয়। উদারগণতান্ত্রিক (Liberal Demoacratic) রাষ্ট্রেই জনগণ সর্বাধিক নাগরিক অধিকার ভোগ করে। নাগরিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা (Civil Liberties) প্রায় সমার্থক।

নাগরিকত্ব Citizenship. নাগরিকত্ব হল কোনো একটি রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী হওয়া। নাগরিকত্ব প্রধানত দু-প্রকারের ক. জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব (Jus soli Citizenship) ও খ. অর্জনসূত্রে নাগরিকত্ব (Jus sanguinis Citizenship)। নাগরিকদের সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে এবং অনুরূপভাবে রাষ্ট্রেরও নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্কের মৌল দলিল হল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সংবিধান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা হুবহু এক ব্যাপার নয়।

নাগরিকত্ব পুরোপুরিই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপার; কিন্তু জাতীয়তার ভিত্তি ও পরিধি দুইই ভিন্নতর।

নাগরিক স্বাধীনতা Civil Liberties. ভাষা-বর্ণ-অবস্থান-নির্বিশেষে জনগণের মতামত-প্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, ভোটদানের স্বাধীনতা, আন্দোলনের স্বাধীনতা, পেশার স্বাধীনতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা ইত্যাদি, যা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সংবিধানে বিধৃত, তাইই নাগরিক স্বাধীনতা বলে পরিচিত।

নাৎসিবাদ নাজিবাদ বা Nazism বা জাতীয় সমাজতন্ত্র (National Socialism)। এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন জার্মানির চ্যান্সেলর ও ফ্যুয়েরার এডলফ হিটলার। তাঁর রচিত 'মেইন কাম্ফ' (Mein Kampf)-ই হল এই মতবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক ভিত্তি। নাৎসিবাদ অনুযায়ী জার্মানরাই প্রকৃত ও নিখুঁত 'আর্য' এবং ফলত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি। এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্য জার্মানরাই বিশ্বের অন্যান্য সকল জাতির ওপর প্রভূত্ব করবে, এটাই দৈব-নির্ধারিত। নাৎসিবাদীরা মনে করে যে, তাদের এই মতবাদ কায়েমের প্রধান অন্তরায় ইহুদি সম্প্রদায়, সুতরাং ইহুদিদের নির্মূল করা এক অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। ১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মানির রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে এই উগ্র ও জঙ্গি জাতীয়তাবাদী মতবাদ কায়েমে ব্রতী হন এবং বিশ্বজয়ের জন্য জার্মান জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান। ১৯৪৫ সালে চক্রীপক্ষ (Axis Party) পরাজয় বরণ করলে এবং হিটলারের জীবনাবসান ঘটলে, এই মতবাদেরও কার্যত অবসান ঘটে। আর্যদের প্রতীক স্বস্তিকা নাৎসিদেরও প্রতীক ছিল। সম্প্রতি জার্মানি ও ইতালিতে নব্য নাৎসি (Neo-Nazis)-দের উদ্ভব ঘটছে।

নাৎসি-সোভিয়েত চুক্তি : ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট মস্কোয় মলোটোভ ও ভন রিবেনট্রপ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৩ বছর মেয়াদি এ-চুক্তির শর্ত ছিল এই যে, রাশিয়া ও জার্মানি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে না এবং একপক্ষ কারও সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেও অপরপক্ষ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। এই চুক্তির গোপন শর্ত ছিল এই যে, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড, লাটভিয়া, এস্টোনিয়া, পূর্ব পোল্যান্ড ও বেসারবিয়ায় সর্বেসর্বা থাকবে এবং জার্মানি লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ডের বাকি অংশ দখলে রাখবে। ১৯৪০ সালে জার্মানি বিভিন্ন ফ্রন্টে জয়লাভ করতে শুরু করলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক খারাপের দিকে মোড় নেয়। ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করলে, এই চুক্তির অবসান ঘটে।

নাফ্‌টা : North American Free Trade Area (NAFTA). বা উত্তর আমেরিকান মুক্ত বাণিজ্য এলাকা। নাফ্‌টার সদস্য হচ্ছে কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পরের পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবাহ সুনিশ্চিত করা।

নারীর ক্ষমতায়ন Women's Empowerment. এটা আজ বিশ্বের প্রায় সকল মহল কর্তৃক স্বীকৃত যে, এ-যাবৎ অঞ্চল ও দেশ-নির্বিশেষে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। তাদের সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং অর্থনৈতিক সামাজিক প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রধানত ক্ষমতাহীন করে রাখা হয়েছে। এই উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছে নারীর ক্ষমতায়নের আন্দোলন।

এ-ব্যাপারে বেশ ক'টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সর্বশেষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে বেজিংয়ে। নারীর ক্ষমতাহীনতার মৌল কারণ হিসাবে নারীর হাতে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রনহীনতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন আন্দোলনের দাবি হচ্ছে এই যে, নারীদের অতি অবশ্যই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে, পারিবারিক সম্পদের ওপর নারীর সমমালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে; পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীদের সমঅধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে; সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে নারীদের আনুপাতিক হারে নিয়োগ প্রদান করতে হবে, চাকুরিক্ষেত্রে বর্তমান বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে, নারীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নারীদের সমঅধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। নারী ক্ষমতায়নের ইস্যু বর্তমানে জাতিসংঘ এবং বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্র কর্তৃকই স্বীকৃত।

নারী স্বাধীনতাবাদ বা নারীবাদ : নারীদের জন্য পুরুষের সমান সামাজিক ও আইনগত অধিকার ও মর্যাদা আদায়ের উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী স্বাধীনতাবাদ (Femininism) নামধারী এই উদারপন্থি আন্দোলনের সূচনা ঘটে। এই আন্দোলনের অনুসারী ও প্রবক্তাদের বলা হয় নারী স্বাধীনতাবাদী বা নারীবাদী (Femininist)। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের একদল উদারপন্থি নারীদের জন্য সমঅধিকার ও মর্যাদা আদায়ের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন সমগ্র বিংশ শতাব্দী ব্যাপীও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত থাকে। তবে বর্তমানে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রায় পুরোপুরিই নারীদের হাতে। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নারীদের অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীভুক্ত। সমাজতন্ত্রীদের মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা সুনিশ্চিতকরণ সম্ভবপর নয়। আবার, ইসলামপন্থিদের মতে ইসলামি সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নারীর যথার্থ মর্যাদা নিহিত।

নারোদবাদ Narodism. ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভূত নারোদবাদীরা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে দাবি করত। কিন্তু তাদের ধ্যান-ধারণা ছিল অলীক। তাদের মতে ক্ষুদ্র মালিকানাই হল পুঁজিবাদের যথার্থ প্রতিষেধক। নারোদবাদীরা আরও মনে করত যে, সর্বহারা শ্রেণী নয়, বরং কৃষকরাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। তৎকালীন রাশিয়ায় মধ্যযুগীয় ভূমিদাসত্বভিত্তিক এবং প্রগতির অন্তরায়স্বরূপ যে-গ্রাম্য কমিউনপ্রথা প্রচলিত ছিল, নারোদবাদীরা সেটাকেই জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তারা ক্ষমতাদখলের পদ্ধতি হিসাবে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পথকেই বেছে নেয়। তারা বলে যে, রাজনৈতিক আন্দোলন আসলে বুর্জোয়াদেরই পক্ষে যায়। তাদের মতে, ইতিহাসের গতি কার্যত পরিচালনা করে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী ও বীরেরা; আপামর জনগণ এইসব বুদ্ধিজীবী ও বীরদের অনুসরণ করে মাত্র। এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের ভূমিকাই হল সকর্মক, বাদবাকি জনগণ নিষ্ক্রিয়। নারোদবাদীরা আরও বলে যে, পুঁজিবাদের মধ্যে কোনোই প্রগতিশীল দিক নেই। সুতরাং, কৃষকদের মধ্যযুগীয় কমিউন থেকে সরাসরি সমাজতন্ত্রে উত্তরণই বিধেয়। রাশিয়ায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নারোদবাদী সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। ১৮৭৯ সালে জেলি জালিয়াবভ, সোফিয়া পেরোভ্স্কায়া, ভেরা ফিগনার, মরোজোভ প্রমুখের নেতৃত্বে গঠিত হয় নারোদনায়া ভলিয়া বা 'জনগণের অভিপ্রায়' নামক সংগঠন। স্বভাবতই, তারা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নেয় এবং ১৮৮১ সালের পয়লা মার্চ

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যা করে। এরপর নারোদবাদীদের ওপর নেমে আসে প্রচণ্ড সরকারি নির্যাতন। কিছুদিনের মধ্যেই প্রধান নেতারা ধরা পড়ে, জালিয়াবভ প্রমুখের মৃত্যুদণ্ড হয়। বাদবাকি নারোদবাদীদের অধিকাংশ সুবিধাবাদিতার পথ গ্রহণ করে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে নারোদবাদীরা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী লড়াই বর্জন করে; কৃষকদের, বিশেষত কুলাকদের জন্য বিচ্ছিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থার দাবি তোলে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নারোদবাদীরা পুনরায় তীব্র সন্ত্রাস শুরু করে। অবশ্য ১৯০৭ সালের মধ্যেই তাদের আবার দাবিয়ে দেওয়া হয়। আবার তারা ফিরে যায় সুবিধাবাদে। রুশ বিপ্লবের পর নারোদবাদীদের প্রধান দুটি ধারাই প্রতিবিপ্লবীদের দলে যোগ দেয় এবং বিপ্লবের বিরোধিতা করে। নারোদবাদী আন্দোলনের মূল তাত্ত্বিক ও প্রবক্তা ছিলেন বাকুনিন, লাভরভ, মিখাইলভস্কি প্রমুখ দার্শনিক।

নাস্তিকতা Atheism. ঈশ্বর, ভগবান বা পরম সৃষ্টিকর্তার কোনোই অস্তিত্ব নেই—এই বিশ্বাসই হল নাস্তিকতা। মার্কসীয় বস্তুবাদীরা মনে করে যে, ধর্ম হল শাসকগোষ্ঠীর সেই হাতিয়ার, যা দিয়ে তারা শোষিত জনগণকে এমনভাবে নেশাগ্রস্ত বা মোহগ্রস্ত করে রাখার প্রয়াস পায়, যাতে তারা তাদের দুরবস্থাকে 'ভাগ্য' বা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলে মেনে নেয়, শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ পরিহার করে এবং 'পরকাল'-এর পুরস্কারের আশায় 'ইহকাল'-এর শোষণ দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতনকে মুখ বুজে সহ্য করে। বস্তুত নাস্তিকরা সৃষ্টিকর্তা, পরকাল, পুনরুত্থান, স্বর্গনরক ইত্যাদিতে আদৌ বিশ্বাস করে না এবং ধর্মকে শোষকগোষ্ঠী ও তাদের আজ্ঞাবহ ধর্মযাজকদের সৃষ্ট আফিমের সমতুল্য ব্যাপার বলে বিবেচনা করে। তাই, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ধর্মকে নির্মূল করার জন্য সুপরিকল্পিত অভিযান চালানো হয়। তবে, সম্প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সিংহভাগ ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক অবলুপ্তির পর গণতন্ত্র ও ধর্ম দুইই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহেও ধর্মকে পুনরায় মেনে নেওয়ার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

নিউক্লিয়ার ক্লাব : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন—এই পাঁচটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশকেই বলে নিউক্লিয়ার ক্লাব। কিন্তু বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তানও আণবিক অস্ত্রশক্তি অর্জন করে ফেলেছে। ইসরায়েলের কাছেও আণবিক অস্ত্র আছে বলে অনেকের ধারণা। এ ছাড়া জাপান, উত্তর কোরিয়া, কাজাকস্তান, ইরান, জার্মানি প্রভৃতি দেশের কাছেও আণবিক প্রযুক্তি আছে বলে অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু নিউক্লিয়ার ক্লাবের পাঁচ সদস্য চায় না, বিশ্বের আর কেউ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হোক এবং ক্লাবের সদস্যত্ব দাবি করুক।

নিউ ডিল : New Deal. ১৯২৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পরে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে-অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৩ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে-নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করনে, সেটাই নয়া ব্যবস্থা বা নিউ ডিল। এই ব্যবস্থা ছিল সনাতন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় ব্যতিক্রমধর্মী। এর আগে অর্থনৈতিক সংকটমুক্তির একমাত্র উপায় হিসাবে মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস (অর্থাৎ মুদ্রার মূল্যমান বৃদ্ধি)-কেই বিবেচনা করা হত, যদিও এর দ্বারা কোনো স্থায়ী ফল পাওয়া যেত না। নিউ ডিল-এর মূল কথা ছিল দুটি ১. সকল প্রকার শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ২. শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়

উদ্যোগে ব্যাপক পূর্তকার্য ইত্যাদি শুরু করা, যাতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এরই পাশাপাশি আরও কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যেমন—কম সুদে ঋণ সরবরাহ, ডলারের শতকরা ৪০ ভাগ মূল্যমান হ্রাস, বিভিন্ন সরকারি পরিকল্পনায় অর্থ যোগানের উদ্দেশ্যে ফিন্যান্স কর্পোরেশন ইত্যাদি গঠন, বেকারত্ব দূর করার জন্য কমিটি গঠন ও বেকারভাতা প্রদান, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিকদের উৎসাহপ্রদান, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য জীবনবিমার সুবিধা প্রদান, কৃষকদের পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ, কেন্দ্রীয় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা (Federal Reserve System) কায়েম করে ব্যাংকসহ বিবিধ অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনয়ন, লগ্নিপুঁজি নিয়ন্ত্রণ ইত্রাদি। বলাবাহুল্য, নিউ ডিল-এর ফলে অবাধ অর্থনীতি অনেকখানি নিয়ন্ত্রণের আওতায় এসে পড়ে। এই নীতির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন বেকারসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ থেকে কমে ৬০/৬৫ লক্ষে এসে দাঁড়ায় এবং অচল হয়ে পড়া শিল্পের শতকরা ৭৫ ভাগই আবার সচল হয়ে ওঠে। অবশ্য, নিউ ডিল পুরোপুরি সফল হতে পারেনি বৃহৎ পুঁজিপতি ও ব্যাংক-মালিকদের বিরোধিতার কারণে। মার্কিন সর্বোচ্চ আদালত নিউ ডিলের একটা বিরাট অংশকে বাতিল ঘোষণা করে দেয়।

নিখিল-জগৎ : বা নিখিল সৃষ্টি (Universe)। সৃষ্টির সকল কিছু মিলেই নিখিল-জগৎ। স্থান ও কালের বিচারে নিখিল জগৎ অসীম। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে (যে বিজ্ঞান ১২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত অনুসন্ধান করতে সমর্থ হয়েছে) অসীম মহাশূন্যে বিশাল বিশাল অজ্ঞাতসংখ্যক নক্ষত্র-গ্রহাদি ছড়িয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক টি.এইচ. হাক্সলির মতে পৃথিবীতে যতগুলো ধূলিকণা আছে নিখিল-জগতে গ্রহণক্ষত্রের সংখ্যা তার চেয়েও অনেকে বেশি। কারও কারও মতে নিখিল-জগতের সীমা হচ্ছে অসীমে (Limitation at the infinity)।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে স্যার সৈয়দ আহমদ পূর্বাহ্ণেই মুসলমানদের সতর্ক করে দেন এবং মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। তাঁর মৃত্যুর পর এ-দায়িত্ব পালনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নবাব মনসুরুল মূলক ও নবাব ভিকারুল মূলক। ভারতের অধিকাংশ মুসলমান প্রথমদিকে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেও কংগ্রেস মুসলমানদের প্রতি যে-বৈমাত্রেয়সুলভ মনোভাব গ্রহণ করে, তা মুসলমানদের মনে ক্ষোভ ও দুঃখের সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে, উত্তর প্রদেশে হিন্দি-উর্দু বিরোধ, বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক নিছক সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গো-রক্ষা সমিতি গঠন, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অসহিষ্ণু আন্দোলন ইত্যাদি মুসলমানদের মনে ক্রমশ এ-ধারণাই দৃঢ় করে তোলে যে, হিন্দু নেতৃত্ব ও কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণ কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়। এই পটভূমিতে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার শাহবাগ এলাকায় আহূত হয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন। ভারতের মুসলিম নেতারা এতে যোগদান করেন। নবাব ভিকারুল মূলক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় মুসলমানদের নিজস্ব সংগঠন হিসাবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের প্রস্তাব দেন। মাওলানা মোহাম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান, শাহ আবদুল্লাহ, মাওলানা জাফর আলি খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ-প্রস্তাব সমর্থন করেন।

ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ। ১৯১৩ সালে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং দীর্ঘদিন হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করে ব্যর্থ হন। অবশেষে, ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একটি এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে অপর একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান কায়েম হয়, যদিও এই পাকিস্তান ছিল লাহোর প্রস্তাবে কথিত রাষ্ট্রদ্বয়ের ব্যতিক্রম। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ এবং ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলি খান মারা গেলে মুসলিম লীগ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জাতীয় চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়ে ক্রমশ বহুধাবিভক্ত ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম লীগের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক অংশ ১৯৪৯ সালে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে, যা পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দিও এতে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের বামপন্থি প্রভাবাধীন অংশ কাগমারী সম্মেলনে আলাদা হয়ে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করে। অবশ্য ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবের পর পাকিস্তানে মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয় এবং এ-দল সেখানকার রাষ্ট্রক্ষমতায়ও অধিষ্ঠিত হয়।

নিতসে, ফ্রেডারিখ : Friedrich Nietzsche. (১৮৪৪-১৯০০)। নিতসে ছিলেন জার্মান ভাববাদী দার্শনিক ও ফ্যাসিবাদের অগ্রদূত। জনগণ এবং বিপ্লবের প্রতি ঘৃণা থেকেই তাঁর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। নিতসের মতে দাসপ্রথা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং শোষণ প্রতিটি জীবের মৌলিক চরিত্রেরই অনিবার্য অংশ। বিপ্লবের ধারাকে প্রতিহত করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিতসে উদার বুর্জোয়া ভাববাদ, মানবতাবাদী দর্শন, ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ, খ্রিস্টধর্ম ইত্যাদির মূল্যায়ন করেন এবং বলেন যে, ক্রমশ শক্তিসঞ্চয়কারী বিপ্লবকে ধ্বংস করার ক্ষমতা এগুলো হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং, বিপ্লবকে দমাতে হলে চাই অগণতান্ত্রিক ও অমানুষিক নীতিপ্রক্রিয়া। তাঁর মতবাদের মৌল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমজীবী জনগণের ওপর আধিপত্য করার মতো একদল প্রভু সৃষ্টি করা। তাঁর মতে, 'টিকে থাকার সংগ্রাম' যা বিকাশ লাভ করে, 'ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষায়'—তাইই হল প্রগতি বা অগ্রগতির শাশ্বত চালিকাশক্তি। তাঁর প্রধান গ্রন্থাবলী হল 'দাজ স্পেক্ জরাথুস্ত্র' (১৮৮৩-৯১), 'বিঅন্ড গুড অ্যান্ড ইভিল' (১৮৮৬) ও 'দ্য উইল টু পাওয়ার' (১৯০৬)।

নিমিত্তবাদ : এটা নিয়তিবাদ বা Determinism-এর সমার্থক। নিমিত্তবাদীরা মনে করে যে, কী ঘটবে না-ঘটবে—তা পূর্বনির্ধারিত এবং মানুষ নিমিত্তমাত্র। সুতরাং, যত চেষ্টাই করা হোক-না কেন, যা ঘটার তা ঘটবেই। বস্তুবাদীরা নিমিত্তবাদী বা নিয়তিবাদীদের ঘোর বিরোধী। আবার ইসলামসহ কোনো কোনো ধর্মাবলম্বীরাও মনে করেন যে, পূর্বনির্ধারিত নিয়তির পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তা মানুষকে ভালোমন্দ যাচাইয়ের ক্ষমতাও দিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং ভালোমন্দ বাছাই করার দায়দায়িত্ব মানুষের নিজের; কর্মফলের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। অবশ্য দুর্ঘটনার ব্যাপার ভিন্ন।

নিয়তিবাদ Fatalism বা Determinism. এই মতবাদের মূল কথা হল বিশ্ব ও মানবজীবনের সকল কিছুই ভাগ্যের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের ঔরসেই নিয়তিবাদের জন্ম। নিয়তিবাদীরা বিশ্বাস করে যে, সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন একটি চূড়ান্ত শক্তি আছে এবং এই শক্তি কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়কে এড়ানোর সাধ্য কোনো মানুষের নেই। তাই, এই মতবাদে বিশ্বাসীদের স্বকীয় উদ্যম ও আত্মপ্রত্যয় অনেকটাই গৌণ হয়ে পড়ে এবং এরা সর্বদাই এক অলৌকিক শক্তির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসর্ম্পণ করে থাকে। নিতসে প্রমুখের মতে স্বাধীন কর্মদ্যোগ ভাগ্যের উপকরণ ও পূর্বশর্ত। ইতঃপূর্বে, সেন্ট অগাস্টাইন, মার্টিন লুথার, কেলভিন প্রমুখ ধর্মীয় নেতারা অবশ্য মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন, কিন্তু পরমশক্তির ইচ্ছার সঙ্গে এর যুক্তিগ্রাহ্য সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হন। অবশ্য ইসলাম ধর্মানুযায়ী, যারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নিজেরা উদ্যোগ গ্রহণ করে না, পরম সত্তা তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। প্রগতিবাদীদের মতে, যথার্থ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবই নিয়তিবাদের চারণভূমি। আবার প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শোষক গোষ্ঠী নিপীড়িত জনগণকে সুকৌশলে নিয়তিবাদের দিকে ঠেলে দেয়, যাতে তারা শোষণ-নিষ্পেষণকে পরমসত্তা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তি বলে মেনে নেয় এবং সমাজবিপ্লব ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণের বদলে ওই পরম সত্তার কাছেই আরও বেশি আত্মনিবেদিত হয়ে পড়ে।

নিয়মতান্ত্রিক সরকার Constitutional Government. নিয়মতান্ত্রিক সরকার হল সেই সরকার, যে-সরকার যথার্থ গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে নির্বাচিত এবং এরূপ শাসনতন্ত্রের দ্বারাই পরিচালিত। নিয়মতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা দলকে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার কিংবা অপসারণের এক্তিয়ার একমাত্র জনগণের।

নিরপেক্ষতা : যুদ্ধমান বা বিবদমান কোনো পক্ষে যোগদান না করে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাকেই বলে নিরপেক্ষতা বা Neutralism. আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধমান কোনো পক্ষকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন না করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অবশ্য, যুদ্ধমান কোনো পক্ষের দ্বারা কোনো নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হলে, সেক্ষেত্রে উক্ত রাষ্ট্র সশস্ত্র প্রতিরোধের দ্বারা নিজের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে। সাধারণ অবস্থায় নিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় কোনো শিবিরে (বিশেষত কোনো পরাশক্তির নেতৃত্বাধীন শিবিরে) যোগদান না করে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা। অনেকের মতে, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি এমনই আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে এবং স্বার্থ ও সমস্যাসমূহ এমনই পারস্পরিকভাবে গ্রথিত হয়ে পড়েছে যে, এখন কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই আজ আর চূড়ান্ত বিচারে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভবপর নয়। অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষরা মিলেই একটা পক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, জোটনিরপেক্ষরা মিলেই আজ একটি জোট বা পক্ষে পরিণত হয়েছে।

নিরস্ত্রীকরণ : Disarmament. নিরস্ত্রীকরণ বস্তুত অস্ত্রের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ নয়, বরং অস্ত্র হ্রাসকরণ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর, অর্থাৎ ১৯১৮ সাল থেকে এ-যাবৎ নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু কোনো উদ্যোগই সার্বিক সাফল্য অর্জন করেনি। ১৯৪১ সালের আটলান্টিক চার্টার, ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র. যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও চীন কর্তৃক বিঘোষিত মস্কো ডিক্লারেশন, জাতিসংঘ সনদের ২৬নং

ধারা ইত্যাদির লক্ষ্য ছিল অস্ত্র হ্রাসকরণ। ১৯৪৮ সাল থেকে অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন কৌশলগতভাবে বারংবার অস্ত্র হ্রাস করার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু তাতে তেমন কোনো ফলোদয় হয় না। ১৯৫৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন জানায় যে, তারা হাইড্রোজেন বোমা আয়ত্ত করেছে। ১৯৫৪ সালের মে মাসে কানাডা, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এ-ব্যাপারে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু কোনো চুক্তি সম্পাদন সম্ভবপর হয় না। ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বলে যে, অস্ত্র হ্রাসকরণের অন্যতম শর্ত হল বিদেশী ঘাঁটিসমূহ প্রত্যাহার, যা মেনে নিলে যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্য থেকে ঘাঁটিসমূহ তুলে নিতে হয়। একই বছর যুক্তরাজ্য দাবি করে যে, বিশ্বের যেখানেই যুদ্ধের পাঁয়তারা দেখা দেবে, সেখানেই জাতিসংঘকে তদারকির অবাধ অধিকার দেওয়া হোক। ১৯৫৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের সাবকমিটিতে ব্যাপারটি প্রেরণ করা হয় এবং সাবকমিটি লন্ডনে মিলিত হয়। কিন্তু মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর (১৯৫৭) পর্যন্ত আলোচনার পর, আলোচনা পরিত্যক্ত হয়। এমতাবস্থায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন উক্ত কমিশন থেকে স্বীয় সদস্যত্ব প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে মার্শাল বুলগানিন তাঁর চার দফা প্রস্তাব আলোচনার জন্য জেনিভায় এক সম্মেলনের প্রস্তাব দেন। এই চার দফা হল ১. দু-তিন বছরের জন্য পারমাণবিক ও তাপ-পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ রাখা; ২. আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা জাতীয় অস্ত্র তৈরি পরিত্যাগ করা; ৩. ন্যাটো এবং ওয়ারশ জোটের সদস্যদের মধ্যে অনাগ্রাসন চুক্তি সম্পাদন করা এবং ৪. মধ্য ইউরোপে একটি আণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা গঠন করা, যে-এলাকার মধ্যে থাকবে সমগ্র জার্মানি, পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া। এই প্রস্তাবের জবাবে যুক্তরাষ্ট্র জানায় যে, যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের উদ্যোগের প্রতি অশ্রদ্ধা জানিয়ে অন্য কোনো আলোচনায় শরিক হতে রাজি নয়। ১৯৬০ সালে কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র এ-ব্যাপারে যে-প্রস্তাব দেয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে তা নাকচ করে দেয়। একপক্ষের প্রস্তাব অন্যপক্ষ নাকচ করার এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে এবং নিষ্ফল নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গড়ে উঠতে থাকে পরাশক্তিসমূহের বিপুল থেকে বিপুলতর মারণাস্ত্রের ভাণ্ডার।

নিরাকরণের নিরাকরণ ইংরেজিতে Negation of Negation. এটি মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের তৃতীয় সূত্র। অর্থাৎ, বিপরীত সত্তার দ্বন্দ্বের কারণে প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার অবস্থিত অবস্থার অবসান বা ধ্বংস (অর্থাৎ নিরাকরণ)হয়ে নতুন বস্তু বা ঘটনার উদ্ভব হয় এবং একইভাবে নতুন বস্তু বা ঘটনার অবসান (নিরাকরণ) হয়ে নতুনতর বস্তু বা ঘটনার সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়া আবহমান কাল ধরে চলে আসছে এবং চিরকাল চলতেই থাকবে। এই সদাচলমান প্রক্রিয়ারই নাম হল নিরাকরণের নিরাকরণ। যেমন, একটি ধান বপিত হলে ধানটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ধানগাছ হয়, ধানগাছ থেকে অনেকগুলো ধানের জন্ম হয়। এই যে একটি ধান 'নাই' হয়ে গিয়ে অনেকগুলো ধানের জন্ম দিল এবং এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকল—এরই নাম হল নিরাকরণের নিরাকরণ। অনুরূপভাবে (মার্কসীয় মতে) দাসসমাজ নাই হয়ে গিয়ে সৃষ্টি হল সামন্তবাদী সমাজ, আবার সামন্তবাদী সমাজ নাই হয়ে গিয়ে সৃষ্টি হল পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সমাজ এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এটাই হল নিরাকরণের নিরাকরণ-এর অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু, কেউ যদি ধানটিকে চাউল বানিয়ে

খেয়ে ফেলে বা অন্য কোনোভাবে ধ্বংস করে দেয়, তা হলে সেটা নিরাকরণের নিরাকরণ হবে না; কেননা ধারাবাহিকতা বাজায় রেখে ধানটি বিকাশতর ও নতুনতর সৃষ্টিতে আর সমর্থ হল না। সুতরাং নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়ার একদিকে রয়েছে ধ্বংস বা নাই হয়ে যাওয়া, অপরদিকে রয়েছে নবতর সত্তার বিকাশ। মার্কসীয় মতে এ-তত্ত্ব বস্তু ও সমাজ-জগতের বিকাশের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নিরাপত্তা পরিষদ : Security Council. জাতিসংঘের এই পরিষদটির মূল দায়িত্ব হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও চীন) সহ ১১ জন সদস্য নিয়ে এই পরিষদ গঠিত। অস্থায়ী সদস্যেরা দুই বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হয়। জাতিসংঘের সদস্যেরা জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী এই পরিষদের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য। পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে ৭ জন সদস্য একমত হলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়; কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে স্থায়ী সদস্যদের সকলেরই সমর্থন প্রয়োজন হয়। এদের কেউ দ্বিমত পোষণ করলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এদের এই ক্ষমতাই হল ভেটো ক্ষমতা। বিশ্বের কোথাও শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি হল কি না কিংবা শান্তিভঙ্গ বা আগ্রাসন সংঘটিত হল কি না—তা এই পরিষদই সাব্যস্ত করে। এই পরিষদই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে সুপারিশ প্রণয়ন করে কিংবা শক্তিপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই পরিষদ দুভাবে শক্তিপ্রয়োগের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আহ্বান জানাতে পারে ১. বেসামরিক শক্তিপ্রয়োগ (যেমন, অর্থনৈতিক অবরোধ, যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ইত্যাদি) এবং ২. সামরিক শক্তিপ্রয়োগ (অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্থল, বিমান কিংবা/এবং নৌবাহিনী ব্যবহার)। নিরাপত্তা পরিষদ সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা কতিপয় মিত্র রাষ্ট্র আত্মরক্ষার জন্য যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। পরিষদ প্রয়োজনমতো বিভিন্ন কমিশনও নিয়োগ করে; যেমন, নিরস্ত্রীকরণ কমিশন, নয়া সদস্যভুক্তি কমিশন, জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি তদারকি কমিশন ইত্যাদি।

নিরেশ্বরবাদ বা ঈশ্বর নেই এই মতবাদ (Atheism)। বস্তুবাদী দার্শনিকদের এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর বা পরম সৃষ্টিকর্তা বলে কিছুই নেই, সুতরাং পরলোকের ব্যাপারও অবান্তর। এই মতবাদ অনুযায়ী মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জীবের সবকিছুর চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি।

নির্বাচকমণ্ডলী Electorate. নির্বাচনে যাঁরা ভোট দেওয়ার অধিকারী, তাঁদেরকেই সমষ্টিগতভাবে বলা হয় নির্বাচকমণ্ডলী।

নির্বাচন, সাধারণ General Election. সাধারণত সরকার প্রধান বা পার্লামেন্টের সদস্য পদসমূহ পূরণের জন্য সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনই সাধারণ নির্বাচন।

নির্বাচনী কলেজ Electoral College. নির্বাচনী কলেজ হল এমন একদল ব্যক্তি, যাঁদেরকে নির্বাচিত, নিযুক্ত বা মনোনীত করা হয়েছে এজন্য যে, তাঁরাই রাষ্ট্রের কোনো বিশেষ বা বিভিন্ন রাজনৈতিক পদে কারা যাবেন, তা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন। এটা হচ্ছে জনসাধারণ ও চূড়ান্ত নির্বাচিতদের একটি মধ্যবর্তী স্তর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হন নির্বাচনী কলেজের মাধ্যমে। ব্যালট

পেপারে প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট-ভাইস প্রেসিডেন্ট জুটির নির্বাচকদের তালিকা থেকে। যে-স্টেটে যে-দল বা জুটির নির্বাচক পদপ্রার্থীরা নির্বাচনে জেতার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন, সেই স্টেটের সকল আসন ওই দল বা জুটির বলে গণ্য করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনগণ একদল মধ্যবর্তী স্তরের প্রতিনিধি বা নির্বাচনী কলেজকে নির্বাচিত করেন এবং এই নির্বাচনী কলেজই রাষ্ট্রপ্রধান এবং পার্লামেন্ট সদস্যদের নির্বাচন করেন। পাকিস্তানের একনায়ক ফিল্ড মার্শাল আইউব খানের 'মৌলিক গণতন্ত্র' (Basic Democracy) ছিল এরূপ নির্বাচনী কলেজভিত্তিক। ব্রিটেনের লেবার পার্টির নেতাও নির্বাচিত হন দলীয় নির্বাচনী কলেজের মাধ্যমে।

নির্বাণ Nirvana. বৌদ্ধ ধর্মানুযায়ী পুণ্যাত্মার চূড়ান্ত পরিণতিই হল নির্বাণ। নির্বাণ অর্থ চরম সুখ বা আত্মার পরিপূর্ণ মুক্তি। পরমাত্মার মধ্যে ব্যক্তিআত্মার ক্ষয়প্রাপ্তি, ব্যক্তিসত্তার অবলুপ্তি এবং পুনর্জন্মের অবসানের মাধ্যমেই ব্যক্তির নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে।

নিষিদ্ধকরণ Embargo. এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজের বন্দর ত্যাগ বা বন্দরে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারিকেই বলে Embargo বা নিষিদ্ধকরণ। সাধারণত যুদ্ধ বা উত্তেজনার সময় এরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞা অনির্দিষ্টকাল বা নির্দিষ্ট কালের জন্য হতে পারে। সংবাদপত্রে কোনো সংবাদবিশেষ, বিবৃতি বা বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রকাশের ব্যাপারেও সময়-সময় সরকারি কর্তৃপক্ষ স্থায়ী বা সাময়িক নিষেধাজ্ঞা বা Embargo আরোপ করে থাকেন।

নিশ্চিহ্নকরণ পদার্থবিদ্যায় নিশ্চিহ্নকরণ বা Annihilation-এর অর্থ হল কণা ও বিপরীত কণার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে নতুন ধরনের কণার উদ্ভব। যেমন, ইলেক্ট্রন ও পজিট্রনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ফোটন কণা নিঃসৃত হয় এবং ইলেক্ট্রন ও পজিট্রন নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে নিশ্চিহ্নকরণ হল বিরোধী মতবাদ বা শক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া, নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। নিশ্চিহ্নকরণ সাধারণত দুপ্রকার। যথা—১. বস্তুগতভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং ২. আদর্শগত বা ভাবগত ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। প্রথমটির ক্ষেত্রে শুধু বিরোধী প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও মাধ্যমসমূহকেই নিশ্চিহ্ন করা হয় না, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বদেরও হত্যা করা, দেশান্তরিত করা বা কারারুদ্ধ করার মাধ্যমে খতম করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানুষকে দৈহিকভাবে খতম করা হয় না বটে, তবে বিরোধী আদর্শ ও মতবাদের প্রচারাদি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্নকরণের সপক্ষে সংশ্লিষ্ট সরকারের যুক্তি হল এই যে, বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব ও তৎপরতা বজায় থাকলে, তার মোকাবেলাতেই অধিকাংশ সময় ও শক্তি ব্যয় হয়ে যায়, স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয় এবং সবচেয়ে বড় কথা, এমতাবস্থায় নিজেদের আদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অবকাশ পাওয়া যায় না। সুতরাং, নিরবচ্ছিন্নভাবে আদর্শ-প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্যেই বিরুদ্ধবাদীদের নিশ্চিহ্নকরণ অবশ্যম্ভাবী বলে এই মতবাদীরা মনে করেন। আর এর বিরুদ্ধবাদীদের মতে নিশ্চিহ্নকরণ হল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থবাদীদের নৃশংস ফ্যাসিবাদেরই প্রকাশ।

নিহিলিস্ট আন্দোলন : Nihilist Movement. উনবিংশ শতাব্দীতে নৈরাজ্যবাদী বা নিহিলিস্ট দার্শনিক বাকুনিন (Bakunin)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণরাই রাশিয়ায় এই আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন বাকুনিনেরই মানসপুত্র নেচায়েভ। পরবর্তীতে এর নেতৃত্বে আসেন জেলি জালিয়াবভ প্রমুখ। নিহিলিস্টরা বিশ্বাস

করত যে সন্ত্রাসের মাধ্যমে অবস্থিত সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার মধ্যেই নির্যাতিত মানবতার মুক্তি। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যা করে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই হত্যা করে প্রধানমন্ত্রী প্লেহভেকে। এ-সময় থেকে বলশেভিক আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে ওঠে এবং নিহিলিস্ট আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যেতে থাকে। নিহিলিস্টদের অন্যতম প্রধান স্লোগান, ছিল, 'শোষকের রক্তে হাত রাঙাতে পেরেছি বলেই আমরা বিপ্লবী'। বস্তুত নিহিলিস্ট তরুণরা চিহ্নিত শত্রুদের হত্যা করতে যেমন কোনোদিন পিছপা হয়নি, তেমনি পিছপা হয়নি আন্দোলনের বেদিমূলে নিজেদের প্রাণ অকাতরে বিলিয়ে দিতে। জেলি জালিয়াবভ প্রমুখ যে-দৃঢ়তার সঙ্গে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর। বলা বাহুল্য, নিহিলিস্ট আন্দোলন তার উষ্ণ রোমান্টিকতার দ্বারা তরুণসমাজকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করলেও, কোনোদিন কোনো দেশে তারা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'নিহিলিজম', শব্দটির অর্থ হচ্ছে অবস্থিত সকল প্রতিষ্ঠান, কাঠামো, প্রথা, পদ্ধতি ইত্যাদিকে অস্বীকার ও ধ্বংস করা।

নীতিশাস্ত্র : Ethics. এই শাস্ত্র নৈতিকতার সংজ্ঞা ও মান নির্ধারণ করে; অন্যায় থেকে ন্যায়কে চিহ্নিত করে এবং ভালোত্বের সংজ্ঞা প্রদান করে। ভারতের চার্বাক, চীনের ইয়াং চু এবং লাও সু, গ্রিসের ডিমোক্রিটাস, ইপিকিউরাস, অ্যারিস্টটল প্রমুখ এই শাস্ত্রের উদ্গাতা। পরবর্তীকালে স্পিনোজা, রুশো, দিদেরো, ফয়েরবাখ প্রভৃতি দার্শনিকরাও এই শাস্ত্রের বিকাশসাধনে ব্রতী হন। কিন্তু মার্কসবাদী দার্শনিকেরা এই নীতিশাস্ত্রের বিরোধিতা করেন এজন্য যে, এর মৌল ভিত্তি ছিল ধর্ম। মার্কসবাদীরা সনাতন নীতিশাস্ত্রের বদলে বস্তুবাদী নীতিশাস্ত্র হাজির করেন। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, প্লেখানভ প্রমুখ ছিলেন বস্তুবাদী নীতিশাস্ত্রের উদ্গাতা। তাঁদের মতে একটা দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ওপরই নির্ভর করে সে-দেশের জনগণের নৈতিকতার রূপ ও মাত্রা। আজকাল অবশ্য সাধারণ অর্থেও এথিকস শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, রাজনীতির এথিকস, কূটনীতির এথিকস, ব্যাবসার এথিকস ইত্যাদি। এক্ষেত্রে এথিকসকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে 'সুনীতি' অর্থে ব্যবহার করা হয়।

নীল বিদ্রোহ : ১৭৭৭ সালে লুই বন্নো নামে একজন ফরাসি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে নীলচাষ শুরু করে। ১৭৮৮ সালের দিকে এর চাষ ব্যাপক আকার ধারণ করে। নীলচাষীরা কৃষকদের দাদন দিয়ে নীল চাষ করাতো এবং প্রতি পাউন্ড গড়ে মাত্র পাঁচ সিকায় কিনে নিয়ে, তা ইংল্যান্ডে ৬/৭ টাকার সমমানে বিক্রি করত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হলে বৃহদাকার বস্ত্রকলসমূহের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিপুল থেকে বিপুলতর পরিমাণ নীলের। এমতাবস্থায় অনেক বড় বড় ইংরেজ কর্মচারীও চাকরি ছেড়ে এই অতিলাভজনক ব্যাবসায় নেমে পড়ে। নীলকর স্যাহেব বলে পরিচিত এই ইংরেজরা কৃষকদের বাধ্য করত যাতে তারা শস্য চাষ বন্ধ করে দিয়ে নীল চাষ করে। কেউ এই আদেশ অমান্য করলে তাকে ব্যক্তিগত ক্রীতদাসের মতো নীলকুঠিতে আবদ্ধ করে বর্বরোচিত শাস্তি প্রদান করা হত এবং নামমাত্র দাদনের বিনিময়ে নীল চাষ ও বিক্রি করতে বাধ্য করা হত। ১৮৫৫-৫৬-এর সাঁওতাল বিদ্রোহ, এবং ১৮৫৭-এর সিপাহি বিদ্রোহের পরপরই ব্যাপক আকারে শুরু হয় নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬১)। নদীয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, পাবনা, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি এলাকার ৬০ লক্ষাধিক কৃষক

এতে অংশগ্রহণ করে। এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা বিশ্বনাথের সর্বপ্রথম ফাঁসি হয়। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিষ্ণুচরণ, দিগম্বর বিশ্বাস প্রমুখ। কৃষক-রমণীরাও এই বিদ্রোহে সম্মুখসমরে অংশ নেয়। বিদ্রোহী কৃষকরা নিজেদের বিভিন্ন কোম্পানিতে বিভক্ত করে, গ্রাম পাহারার ব্যবস্থা করে, ঢাক-দুন্দুভির মাধ্যমে ইংরেজ সৈন্যদের আগমন ঘোষণা করে গ্রামবাসীদের সতর্ক করার ব্যবস্থা নেয়। নীলকরদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরে দীনবন্ধু মিত্র 'নীল দর্পণ' (১৮৬০) রচনা করেন। অবশ্য, রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারাকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে লিখিত স্মারকলিপির মাধ্যমে নীলচাষের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। যা-ই হোক, ১৮৬০ সালের ৩১ মার্চ গঠিত হয় 'ইন্ডিগো কমিশন' বা নীল কমিশন। এই কমিশন ১৩৬ জন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করে। কমিশন রিপোর্টে বলে যে, নীলকরদের ব্যাবসাপদ্ধতি ও উদ্দেশ্য পাপজনক, কার্যত ক্ষতিকারক ও মূলত ভ্রমসংকুল। ছোটলাট গ্রান্টও একথা স্বীকার করেন। তবু, নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো আইন পাশ করা হয় না। অবশ্য, এক ইশতেহারে ঘোষণা করা হয় যে, ১. সরকার নীলচাষের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়; ২. নীল চাষ করা বা না-করা প্রজার ইচ্ছাধীন এবং ৩. অত্যাচারী নীলকর বা বিদ্রোহী প্রজা উভয়েই শাস্তিযোগ্য। উল্লেখ্য যে, নীলবিদ্রোহে কোনো একক নেতৃত্ব ছিল না।

নৃতত্ত্ব : Anthropology. জীব হিসাবে মানুষসম্পর্কিত বিদ্যা বা বিজ্ঞান। নৃতত্ত্ব মানব-নীতির দৈহিক মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক সকল দিক নিয়ে চর্চা করে। মানুষের দেহাকৃতির কীভাবে ক্রমপরিবর্তন হল, মানব জাতির মধ্যে কীভাবে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও জাতির উৎপত্তি হল, কেন বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা আদি বাসভূমি ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করল, কেমন করে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটল, কীভাবে মানুষের মনমানস ও সংস্কৃতির বিকাশ ও বিবর্তন ঘটল এজাতীয় বিষয়াদিই হল নৃতত্ত্বের উপজীব্য। মানুষের মস্তিষ্ক ও হাত যখন একই সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে, তখন থেকেই মানবপ্রকৃতির মধ্যে এক মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়; মানুষ পরিণত হয় হাতিয়ার ও যন্ত্রাদি নির্মাণকারী জীবে। বর্বরতা বা আদি অবস্থার স্থলে সূচনা ঘটে সভ্যতার। ইংরেজি Ethnology-রও বাংলা হল নৃতত্ত্ব। Ethnology বিভিন্ন নরগোষ্ঠী বা মানব-প্রজাতি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

নৃতাত্ত্বিকতা Ethnicity. এটি হচ্ছে মানবপ্রজাতি (race), সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য এবং ভাষার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র বা সমাজের জনগণকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা। এই ভাগ প্রায়শই এক জটিল ব্যাপার। যেমন– ওয়েলশ বা স্কটিশ জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন যে তাঁরা নৃতাত্ত্বিকতার দিক থেকে ব্রিটেনদের তুলনায় স্বতন্ত্র। কানাডার ফরাসিভাষী ও ইংরেজিভাষীদের মধ্যেও এরূপ স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে। তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেই এ-সমস্যাটি প্রকট। কারণ এসব দেশ প্রায়শই নৃতাত্ত্বিক সাযুজ্য (Ethnic homogeneity)-র ভিত্তিতে গঠিত হয়নি, বরং উপনিবেশবাদীরা যে ভাবে এক একটি শাসন-এলাকা তৈরি করেছিল সেভাবেই স্বাধীনতা লাভ করেছে। রাশিয়া, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশেও বহু নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্যের জনগোষ্ঠি বসবাস করে। এই নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে ; এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সংঘাত ও গৃহযুদ্ধেরও সূচনা ঘটায়। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশেই এ-সমস্যা খুবই প্রকট।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১) কর্সিকায় জন্ম। ১৭৮৫ সালে ফরাসি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৭৯৬ সালে উত্তর ইতালিতে বিজয়ের মাধ্যমে ফরাসি প্রজাতন্ত্রী সেনাদলের প্রথম মহান জেনারেল হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। মিশর আক্রমণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে ১৭৯৯ সালে তিনি 'ডাইরেক্টরি' (ব্রুমেয়ার) উচ্ছেদ করেন এবং নিজেই প্রথম কনসাল হয়ে বসেন। ১৮০২ সালে তাঁকে আজীবন কনসাল নিয়োগ করা হয়। ফলে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত তিনি একনায়ক হিসাবে ফ্রান্স শাসন করেন। এ-সময়ে তিনি অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংস্কারসাধন করেন এবং আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেন। ইতোমধ্যে তিনি নিজেকে 'সম্রাট' বলে ঘোষণা করেন। ১৮০৫-৭ সালে অস্টারলিজ ও জেনা দখল করেন এবং টিলসিট চুক্তির বিপরীত শর্তাবলী মেনে নিতে রুশদের বাধ্য করেন। ১৮০৮ সাল থেকে তাঁর প্রতিপত্তি কমতে শুরু করে। তাঁর মহাদেশীয় নীতি ও পেনিনসুলার যুদ্ধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৮০৯ সালে ওয়াগ্রাম-এর যুদ্ধে তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৮১২ সালে তিনি রাশিয়া আক্রমণ করে মস্কোর উপকণ্ঠে পৌছান। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে পর্যুদস্ত হয়ে ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। লাইপজিগের যুদ্ধেও তিনি পরাজয় বরণ করেন। ১৮১৪ সালের ১১ এপ্রিল তিনি পদত্যাগ করে এলবা প্রদেশের শাসক হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হন। ১৮১৫ সালের ২০ মার্চ তিনি পুনরায় প্যারিস দখল করেন। কিন্তু মাত্র ১০০ দিন পরে (২২ জুন) ওয়াটারলুর যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করেন। বন্দি নেপোলিয়নকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয় এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

নৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠ Moral Majority. এটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি চাপসৃষ্টিকারী গ্রুপ (Pressure Group)-এর নাম। ১৯৭৯ সালে এর উদ্ভব। ১৯৮৬ সালে এই গ্রুপের নাম পালটে রাখা হয় লিবার্টি ফেডারেশন। এঁরা প্রধানত রক্ষণশীল এবং গর্ভপাত ও সমকামিতার বিরোধী। এঁরা বিভিন্ন গণমাধ্যমের মাধ্যমেও খ্রিষ্টীয় মৌলবাদ প্রচার করেন। দেশের প্রেসিডেন্ট, গভর্নর ও সিনেটর পদপ্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা মৌলবাদী ও রক্ষণশীল, তাঁরা এঁদের সপক্ষে প্রচারকার্য চালান। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এঁদের নেতা ছিলেন রেভারেন্ড জেরি ফালওয়েল (Rev. Jerry Falwell)। নৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠের অন্যান্য উদ্যোক্তার মধ্যে ছিলেন Paul Weyrich, Richard Viguerie, Howard Phillips প্রমুখ।

নৈরাজ্যবাদ অ্যানার্কিজম (Anarchism), নারোদবাদ (Narodism), নিহিলিজম (Nihilism) ইত্যাদি মতবাদ নৈরাজ্যবাদের বিভিন্ন ঘরানা। স্মিট, প্রুধোঁ, বাকুনিন, লাভরভ, নিতসে প্রমুখ ছিলেন নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তা। উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন বিশেষভাবে জোরদার হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। নৈরাজ্যবাদীদের মৌল বৈশিষ্ট্য হল ১. সমাজ-বিশ্লেষণের ধার না ধারা; ২. কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি বা ধারাবাহিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তোয়াক্কা না করা; ৩. বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পূর্বপ্রস্তুতির ধার না ধারা; ৪. অবস্থিত সমাজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা; ৫. ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ও অরাজকতার মাধ্যমে অবস্থিত সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার রীতিতে বিশ্বাসী হওয়া ইত্যাদি। প্রথম দিকের নৈরাজ্যবাদীরা মনে করত যে, এইরূপ নৈরাজ্যবাদী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কৃষক ও

ভবঘুরেরাই ঠিক করে নেবে, দেশের ভবিষ্যৎ ও সরকারের রূপ কী হবে। মোটকথা, সুনির্ধারিত রাজনৈতিক পদ্ধতির অনুপস্থিতি, সুস্পষ্ট লক্ষ্যহীনতা এবং সন্ত্রাস—এই তিনটিই ছিল নৈরাজ্যবাদীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আন্দোলন ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশেও বিস্তার লাভ করে। বিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন দেশে এর প্রকাশ ঘটে।

নোবেল পুরস্কার Noble Prize. ডিনামাইটসহ বিভিন্ন বিস্ফোরকের আবিষ্কারক সুইডেনের আলফ্রেড নোবেল তাঁর সঞ্চয়কৃত বিপুল পরিমাণ অর্থ একটি ফাউন্ডেশন (নোবেল ফাউন্ডেশন) গঠন করে, তার জন্য উইল করে দিয়ে যান। এই উইল অনুযায়ী ফাউন্ডেশন থেকে প্রতিবছর পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য ও বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য প্রতিক্ষেত্রে বিশ্বের সেরা ব্যক্তিত্বকে পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। এই পুরস্কারই নোবেল পুরস্কার নামে খ্যাত। পরবর্তীকালে, অর্থনীতিকেও নোবেল পুরস্কারের বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৯৬ সালে আলফ্রেড নোবেল মারা যান এবং সেই থেকে এ-যাবৎ নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়ে আসছে। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত ছ'টি ক্ষেত্রে এই পুরস্কারই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত।

ন্যাটো উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা বা North Atlantic Treaty Orgnisation (NATO)। আটলান্টিক অঞ্চলের সোভিয়েত ব্লকের শক্তি ও সম্ভাব্য হামলার মোকাবেলার উদ্দেশ্যেই ১৯৪৯ সালে এই সংস্থা গঠিত হয়। শুরুতে এর সদস্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ইতালি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, আইসল্যান্ড ও পর্তুগাল। ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে গ্রিস ও তুরস্কও এর সদস্যত্ব গ্রহণ করে। এই চুক্তি অনুযায়ী সাব্যস্ত হয় যে, সংস্থাভুক্ত কোনো দেশের ওপর হামলাকে সংস্থার সকল সদস্যের ওপর হামলা বলে গণ্য করা হবে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তদুপরি, এই চুক্তিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়, যাতে কোনো সদস্যরাষ্ট্র আক্রান্ত হলে, তিনি সরাসরি ন্যাটো সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের নির্দেশ দিতে পারেন। শুরুতে এই সংস্থা সাত বছর (১৯৫৬ সাল পর্যন্ত) স্থায়ী হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও পরে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা হয়। ন্যাটোর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় বিশাল সামরিক ধ্বংসক্ষমতা। সংশ্লিষ্ট সদস্যদেশসমূহের 'চীফ অব স্টাফ'-দের নিয়ে এর সামরিক কমিটি গঠিত হয়। এর সদর কার্যালয় প্যারিসের নিকটবর্তী রোকেনকোর্টে। স্বাধীনভাবে এই বাহিনীর পরিকল্পনা-রচনার ক্ষমতাসম্পন্ন একজন সর্বাধিনায়কেরও ব্যবস্থা থাকে। ন্যাটো চুক্তি বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব সদস্যদেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত কাউন্সিলের ওপর অর্পিত হয়।

ন্যায় : ভারতবর্ষের মহর্ষি গৌতম 'ন্যায়' দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। ন্যায় দর্শনে জ্ঞানের পথ চারটি, যথা—প্রত্যক্ষকরণ, অনুমান, তুলনা ও প্রমাণ। এই দর্শন অনুযায়ী সমগ্র বস্তুজগৎও মাটি, জল, বায়ু ও অগ্নি, এই চার পদার্থের দ্বারা গঠিত। এ-সমস্ত পদার্থ অনন্ত ও অপরিবর্তনশীল পরমাণুর দ্বারা গঠিত। নৈয়ায়িকদের মতে, আত্মা হল একটি বস্তু। আত্মার জন্ম-মৃত্যু নেই, আত্মা সর্বব্যাপী। দেহ হল আত্মার কারণ, যার মাধ্যমে আত্মা নিজ উদ্দেশ্য সাধন করে। চেতনা আত্মারই ধর্ম, আত্মা হল একাধারে জ্ঞাতা, কর্তা ও

ভোক্তা। আত্মা দুই প্রকার, যথা—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। আর পরমাত্মাই ঈশ্বর। ঈশ্বর পরমাণু, স্থান, কাল, আকাশ, মন ও আত্মার সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর এক, অসীম, শাশ্বত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও অদৃষ্টের কর্তা। নৈয়ায়িকেরা অতিবর্তী বা সৃষ্টিজগৎ থেকে সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বরবাদ (Deism)-এ বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বর জগৎ ও জীবের মধ্যে ব্যাপ্ত নন; জীব ও জগতের সম্পুর্ণ বাইরে তাঁর অবস্থান এবং জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশ বা গুণ জাতীয় কিছুই নয়। ন্যায়দর্শন অনুযায়ী কর্মফলের ভিত্তিতে জীবাত্মা—পুরনো দেহ বিনষ্ট হলে নতুন দেহে অবস্থান নেয়। জীবাত্মা কোনো মানুষ্যেতর প্রাণীদেহ ধারণ করতে পারে না।

ন্যায়পাল ওমবুডসম্যান দ্রষ্টব্য।

ন্যায়যুদ্ধ Just war. এটিও একটি বিতর্কিত বিষয় কারণ যা একপক্ষের জন্য ন্যায় যুদ্ধ, তা অপরপক্ষের জন্য ন্যায়যুদ্ধ নাও হতে পারে। গ্রোটিয়াস (Grotius), স্যামুয়েল পুফেনডর্ফ (Samuel Pufendorf) (১৬৩২-৯৪) প্রমুখের মতে আপামর জনগণের স্বার্থে যে-যুদ্ধ, সেটাই ন্যায়যুদ্ধ। এখানেও একই কথা। যেটা কোনো জাতির জন্য ন্যায় যুদ্ধ, সেটা প্রতিপক্ষ জাতির জন্য ন্যায়যুদ্ধ নাও হতে পারে। বিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্তিকে কেন্দ্র করে ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধের বিষয়টি আবার বহুল আলোচিত হয়ে ওঠে। এ-প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্ন ওঠে :কখন একটি যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ (Jus ad bellum) এ কী ধরনের যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ (jus in bello) উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করে ন্যায়যুদ্ধের অজুহাতে। অথচ কুয়েতের জনগণের বিচারে তা খানিকটা ন্যায়যুদ্ধ হলেও ইরাকের জনগণের বিচারে সেটা কতটা ন্যায়যুদ্ধ ছিল তা বলা মুশকিল। তবে অনেকে মনে করেন যে শোষণ, বৈষম্য, স্বৈরাচার ও আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধই যথার্থ ন্যায়যুদ্ধ।

ন্যাশন অব ইসলাম মুভমেন্ট মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম নেতা লুই ফারাহ খানের নেতৃত্বাধীন আন্দোলন। এই আন্দোলনই এখন ডেমোক্র্যাটিক পার্টি রিপাবলিকান পার্টির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি হিসাবে পরিগণিত।

ন্যুরেমবার্গের বিচার : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি, তথা জার্মানির আত্মসমর্পণের পরপরই ২২ জন জার্মান যুদ্ধাপরাধী ও ৭টি নাৎসি সংগঠনের বিচারের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। ব্যাভারিয়ার অন্তর্গত ন্যুরেমবার্গ নামক শহরে এই বিচার অনুষ্ঠিত হয় বলে এর নাম হয় ন্যুরেমবার্গের বিচার বা ন্যুরেমবার্গে প্রদত্ত রায় (Judgement at Nuremberg)। এই বিচার ১৯৪৬ সালেই শেষ হয়। বিচারে মার্শাল গোয়েরিং, থার্ড রাইখের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভন রিবেনট্রপ, ফিল্ড মার্শাল কাইটেল, রোজেনবার্গ ও আর্নেস্ট কাল্টেনব্রানারসহ ১২ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। কিন্তু ফাঁসি কার্যকর করার পূর্বেই মার্শাল গোয়েরিং তাঁর সেলে আত্মহত্যা করেন। মার্টিন বোরম্যান পালিয়ে যেতে সক্ষম হলে তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। অন্যান্যদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ১৯৪৬ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে। আইনমন্ত্রী আর্নেস্ট জেনিং এবং এমিল হ্যান, ফ্রেডারিখ হফ্‌সটেটর, ওয়ার্নার লেমপে প্রমুখ থার্ড রাইখের বিচারকমণ্ডলী ও অন্যান্যেরা বিভিন্ন মেয়াদি কারাদণ্ড ও বিবিধ দণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী তো জোরও ফাঁসি হয়, তবে তা ন্যুরেমবার্গের বিচারে নয়। মুসোলিনিকে ইতঃপূর্বেই তাঁর দেশবাসীই হত্যা করে। ১৯৫৮ সালে সাবেক পশ্চিম

জার্মানির লুডউইগস্‌বার্গে নাৎসি অপরাধীদের বিচারের জন্য একটি সদর দফতর স্থাপিত হয় এবং আরও বহু অপরাধীকে পাকড়াও করা হয়। পরবর্তীকালে, ন্যুরেমবার্গে বিচারকৃত অপরাধীদের সঙ্গে আরও প্রায় পাঁচ হাজার নাৎসি অপরাধীর নাম যুক্ত হয়।

॥ প ॥

পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা পাঁচ বছর ব্যাপী পরিকল্পনা। এমন কিছু প্রকল্প ও পরিকল্পনা থাকে যেগুলোর কাজ এক ধাপে এবং এক অর্থবছরের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। এসব ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, যেমন দ্বিবার্ষিকি, পঞ্চবার্ষিকি বা সপ্তবার্ষিকি পরিকল্পনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনাই গ্রহণ করতে দেখা যায়। বড় বড় কাজের জন্য ধাপে ধাপে অর্থসংস্থানও এরূপ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রী ও কল্যাণমূলক সর্ববিধ রাষ্ট্রেই এরূপ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পঞ্চম প্রজাতন্ত্র : Fifth Republic. ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ফ্রান্সের সরকারব্যবস্থা। প্রথম প্রজাতন্ত্র ছিল ১৭৯৩-১৮০৪, অর্থাৎ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কর্তৃক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ছিল ১৮৪৮-৫২ পর্যন্ত, তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ছিল ১৮৭০ অর্থাৎ সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের উৎখাতের সময় থেকে ১৯৪০ সাল অর্থাৎ জার্মানি কর্তৃক ফ্রান্স দখল পর্যন্ত এবং চতুর্থ প্রজাতন্ত্র ছিল ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত। পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র রেফারেন্ডামের মাধ্যমে গৃহীত হয়; এই রেফারেন্ডামে ৩১,০৬৬,৫০২ ভোট পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের পক্ষে এবং ৫,৪১৯,৭৪৯ ভোট এর বিপক্ষে পড়ে।

পঞ্চম বাহিনী Fifth Columnist. স্পেনের গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬-৩৯)-এর সময় যখন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীরা চতুর্দিক থেকে মাদ্রিদ আক্রমণ করে, তখন ফ্রাঙ্কোর বিশ্বস্ত অনুচরেরা ক্ষমতাসীন রিপাবলিকানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদের মধ্যে বিদ্রোহ, গুপ্তচরবৃত্তি ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারি শক্তিকে সরকারেরই অভ্যন্তর থেকে ধ্বংস করে দিতে থাকে। এই গোপন বাহিনী পঞ্চম কোলামিস্ট বা পঞ্চম বাহিনী নামে পরিচতি হয়। বর্তমানে এই শব্দটির দ্বারা সাধারণত এমন বিশ্বাসঘাতকদের বোঝানো হয়ে থাকে, যারা স্বীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রের শত্রুদের স্বার্থে কাজ করে।

পঞ্চম রিপাবলিক Fifth Republic. এটি হল ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ১৯৫৮ সালে আলজিরিয়াস্থ ফরাসি বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিলে, পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ প্রেসিডেন্ট রেনে কোটি (Rene Coty) জেনারেল দ্য গলকে আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার জন্য। দ্য গল এই শর্তে প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে রাজি হন যে তাঁকে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের এবং তা গণভোটে দেওয়ার অধিকার দিতে হবে। ফলস্বরূপ ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে দ্য গল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তৃতীয় ও চতুর্থ রিপাবলিকের দুর্বলতা দূরীকরণের নামে তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান প্রেসিডেন্ট পদ এবং দুর্বল পার্লামেন্ট ব্যবস্থা কায়েম করেন। এই ব্যবস্থার অপর নাম হচ্ছে গলবাদ

(Gaullism)। বস্তুত, নেপোলিয়নের পর দ্য গলই ফ্রান্সে একটি কার্যকর ও স্থিতিশীল শাসনকাল সুনিশ্চিত করেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ছিল গলবাদেরই একাধিপত্য। এমনকি পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রী মিতেরাঁ (Francois Mitterand) ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হলেও পঞ্চম রিপাবলিক বহাল রাখেন, যদিও ক্ষমতায় আসার আগে পঞ্চম রিপাবলিককে তিনি একনায়কতান্ত্রিক বলে সমালোচনা করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথম প্রজাতন্ত্র ছিল ১৭৯৩ থেকে ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ান কর্তৃক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র ছিল ১৮৪৮-৫২ পর্যন্ত, তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ছিল ১৮৭০ থেকে ১৯৪০ সালে জার্মান কর্তৃক ফ্রান্স দখল পর্যন্ত এবং চতুর্থ প্রজাতন্ত্র ছিল ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত।

পঞ্চশীলা বা পাঁচ নীতি। কথাটি এসেছে গৌতম বুদ্ধের পঞ্চশীলা বা পঞ্চ আচরণবিধি থেকে, যা সংঘভুক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবশ্যপালনীয় ছিল। কিন্তু এখন এটি ব্যবহৃত হয় একটি রাজনৈতিক অর্থে। ১৯৫৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, চীনের প্রধানমন্ত্রী জো এন লাই এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমদ শোয়েকার্নোর নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি দেশের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন ইতিহাসে বান্দুং সম্মেলন নামে খ্যাত। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ যে-পাঁচটি মূলনীতি মেনে চলার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, তাই-ই 'পঞ্চশীলা' রূপে প্রসিদ্ধ। এই পঞ্চশীলা বা পাঁচ মূলনীতি হল ১. পরস্পরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা; ২. পারস্পরিক অনাগ্রাসন; ৩. পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা; ৪. সমতা ও পারস্পরিক কল্যাণ এবং ৫. শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান। মূলত, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও জো এন লাইই ছিলেন আধুনিক পঞ্চশীলার উদ্গাতা।

পণ্য Commodity. যে-দ্রব্য টাকা বা অন্যকিছুর সঙ্গে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় (উৎপাদনকারীর ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নয়), সেটাকেই বলে পণ্য। পণ্য উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের শ্রমশক্তিও পণ্যরূপ গ্রহণ করে। পণ্যোৎপাদনের ফলেই উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়, মুনাফা হয় ও পুঁজির পৌনঃপুনিক বিকাশ ঘটে।

পণ্য আগ্রাসন Commodity Aggression. যদি কোনো দেশ তার অর্থনীতি ও একচেটিয়া বাজারের স্বার্থে বৈধ ও অবৈধভাবে নিজ দেশের পণ্যসামগ্রী পাঠিয়ে অন্য একটি দেশের বাজারকে এমনভাবে সয়লাব করে দেয়, যাতে দুর্বলতর দেশটির নিজস্ব পণ্য প্রবাহ বন্ধ বা শ্লথ হয়ে যায়, অবস্থিত শিল্পকারখানাও অসম প্রতিযোগিতার মুখে বন্ধ হতে শুরু করে এবং পরিণামে অনুন্নত দেশটির বাজার উন্নততর দেশটির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে—তা হলে উন্নততর দেশটির এরূপ কার্যক্রমকে বলা যেতে পারে পণ্য আগ্রাসন। একটি উন্নততর ও প্রবলতর দেশের সঙ্গে একটি তুলনামূলকভাবে অনুন্নত ও দুর্বল দেশের সাধারণ সীমান্ত থাকলে পণ্য আগ্রাসনের সম্ভাবনা সাধারণত প্রবলতর হয়।

পণ্যবিনিময় Barter মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময়ের পরিবর্তে পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের লেনদেনই হল পণ্যবিনিময় বা বার্টার। মুদ্রা আবিষ্কারের পূর্বে বার্টারই ছিল লেনদেনের

একমাত্র উপায়। যেমন, বাজারে চাউলের প্রয়োজনসম্পন্ন কাপড়ের বিক্রেতা, কাপড়ের প্রয়োজনসম্পন্ন চাউলবিক্রেতার সঙ্গে স্ব স্ব পণ্যবিনিময় করত। পরবর্তীকালে পণ্যবিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে মুদ্রা (Money)-র প্রচলন হলে পণ্যবিনিময় অনেকাংশে লোপ পেয়ে যায়। তবে বর্তমান সময়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পণ্যবিনিময় অব্যাহত রয়েছে। যেমন, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে আজও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমদানি-রফতানি হয় পণ্যবিনিময় বা বার্টারের ভিত্তিতে।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য Holy Roman Empire হল প্রধানত জার্মান ও উত্তর ইতালীয় এলাকা নিয়ে সম্রাট প্রথম অটো (Otto) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য। ৯৬২ সালে পোপ তাঁর (সম্রাট প্রথম অটোর) অভিষেক সম্পন্ন করেন। মধ্যযুগে সম্রাটরা প্রজাদের মধ্যে এই ধারণা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন যে, সম্রাটের কর্তৃত্ব বস্তুত ঈশ্বরপ্রদত্ত। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই পোপদের সঙ্গে সম্রাটদের দ্বন্দ্ব ক্রমবর্ধমান রূপ লাভ করতে থাকে এবং সম্রাট কর্তৃক ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বের তত্ত্বটি কার্যত সম্রাটদের কর্তৃত্বরক্ষার একটি আইনগত হাতিয়ারমাত্রে পরিণত হয়। ১২৭৩ সাল থেকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য শাসন করেন হ্যাপসবার্গ রাজবংশ। এঁরা মূল সাম্রাজ্যবহির্ভূত বহু এলাকাকেও নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং বংশগত আধিপত্যকে কায়েমি করার প্রয়াস চালান। পরবর্তীকালে নেপোলিয়ন যখন ফরাসি কর্তৃত্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপনে ব্রতী হন, তখন আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য বাতিল করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন (১৮০৬)। পরিণামে এই সাম্রাজ্য বিলীন হয়ে যায় এবং সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস শুধুমাত্র অস্ট্রিয়ার সম্রাট হিসাবেই রাজত্ব করেন।

পয়েন্ট অব অর্ডার Point of Order. কোনো আইনসভা বা পার্লামেন্টে কোনো সদস্য কর্তৃক কোনো প্রস্তাব বা কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্ন। বিধি অনুযায়ী, স্পীকারকে উত্থাপিত পয়েন্ট অব অর্ডারের ওপর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত বা রুলিং দিতে হয়।

পররাজ্যগ্রাস : পররাজ্যগ্রাস বা Annexation হল আগ্রাসনেরই ফলশ্রুতি। অর্থাৎ একটি দেশ কর্তৃক অপর একটি দেশ বা তার অংশবিশেষ সে-দেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদখল করে নেয়া। তবে, জাতিসংঘের সম্মতিক্রমে কোনো মহত্তর উদ্দেশ্যে কোনো দেশ বা অঞ্চলবিশেষের রক্ষণাবেক্ষণ বা শাসনকার্য পরিচালনার ভারগ্রহণ পররাজ্যগ্রাস বলে বিবেচিত হয় না।

পরার্থবাদ Altruism. দার্শনিক কোঁতে (Comte) এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। তাঁর মতে নিঃস্বার্থভাবে জনগণের সেবা এবং পরার্থে আত্ম-উৎসর্গের মধ্য দিয়েই সমাজে শান্তি ও ভারসাম্য সুনিশ্চিত করা সম্ভবপর। সমাজতন্ত্রীরা এই বলে পরার্থবাদের সমালোচনা করেন যে, শোষণমূলক সমাজে শোষক সম্প্রদায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শোষিত মানুষের জন্য আত্মোৎসর্গ করবে কিংবা নিপীড়িত মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেদের সম্পদ বিলিয়ে দেবে, এটা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়।

পরাশক্তি Super Power হল সে-সমস্ত দেশ, যে-সমস্ত দেশ শক্তির বিচারে, বিশেষত সামরিক শক্তির বিচারে অমিত ক্ষমতার অধিকারী। বর্তমানে পরাশক্তি বলতে সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়াকে বোঝানো হয়ে থাকে। কেউ-কেউ চীন, ভারত,

যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশকেও দ্বিতীয় পর্যায়ের পরাশক্তি বলে বিবেচনা করেন। এই পরাশক্তিসমূহের সামরিক শক্তি ও ধ্বংসক্ষমতার তুলনায় বিশ্বের বাকি সমস্ত দেশের সম্মিলিত সামরিক শক্তি ও প্রতিরোধ-ক্ষমতা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পরাশক্তিসমূহের হাতে বিভিন্ন ধরনের যে বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র, বিস্ফোরক, নিউক্লিয়ার সরঞ্জাম ইত্যাদি রয়েছে (১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী), তা দিয়ে সমগ্র মানবসভ্যতাকে অন্তত ৩৭ বার ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভবপর। বর্তমানে সে ক্ষমতা আরও বেড়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাজেটই আফ্রিকা মহাদেশের সম্মিলিত রাজস্ব বাজেটের প্রায় কাছাকাছি। বলা বাহুল্য, পরাশক্তিসমূহের ধ্বংসক্ষমতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং তাদের বল্গাহীন অস্ত্র প্রতিযোগিতার অসহায় শিকার হচ্ছে বিশ্বের, বিশেষত অনুন্নত বিশ্বের দেশসমূহ ও জনগণ।

পরিমাণের গুণগত পরিবর্তন : মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্র। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রকৃতি ও সমাজের প্রতিটি বস্তু ও ঘটনার অন্তর্নিহিত বিপরীত সত্তার দ্বন্দ্ব বাড়তে বাড়তে এমন একটি পর্যায়ে আসে যখন ওই বস্তু বা ঘটনার গুণগত পরিবর্তনই সাধিত হয়ে যায়। পরিমাণ যখন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে অনেক সময়েই তা নজরে আসে না, কিন্তু এ-প্রক্রিয়ায় এমন একটা পর্যায় আসে যখন গুণগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং গুণগত পরিবর্তনটি ঘটে হঠাৎ বা উল্লম্ফনের মাধ্যমে। সমাজের ক্ষেত্রে এই উল্লম্ফনের ব্যাপারটাকেই বলা হয় বিপ্লব। বস্তুত, পরিমাণ বাড়লেই গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয় না—এটা হয় একটি বিশেষ পর্যায়ে। যেমন, পানির উত্তাপ বাড়লেই তা বাষ্পীভূত হয় না, কিন্তু বাড়তে বাড়তে যেইমাত্র তা ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উপনীত হয় তখনই তা বাষ্পে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে, সমাজে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বও বাড়তে বাড়তে একটা বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হলেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে সমাজের বিপ্লবী পরিবর্তন।

পলিটব্যুরো পলিটিক্যাল ব্যুরো বা রাজনৈতিক ব্যুরোরই সংক্ষেপিত রূপ হল পলিটব্যুরো (Politbureau)। সাধারণত সমাজতান্ত্রিক দলসমূহেই পলিটব্যুরোর অস্তিত্ব দেখা যায়। কাঠামোগতভাবে, কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত করে একটি ক্ষুদ্রতর স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির মধ্য থেকে নির্ধারিত হয় আরও ক্ষুদ্রতর পলিটব্যুরো। এই পলিটব্যুরো গঠনের উদ্দেশ্য হল এই যে, বৃহত্তর কেন্দ্রীয় কমিটি বা স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষে যেহেতু সবসময় মিলিত হওয়া সম্ভবপর নয়, সেহেতু কেন্দ্রীয় কমিটি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক পলিটব্যুরোই পার্টির দৈনন্দিন যাবতীয় দায়িত্বাদি পালন ও সিদ্ধান্তাদি কার্যকর করে। কাঠামোগত দিক থেকে পলিটব্যুরো কেন্দ্রীয় কমিটি ও স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষে কাজ করার কথা হলেও, কার্যত পলিটব্যুরোই হল পার্টির সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সংস্থা। পলিটব্যুরোর সদস্যেরাই পার্টির সর্বোচ্চ নেতা বলে বিবেচিত।

পলিয়ার্কি Polyarchy বা বহুজনের শাসন (rule of the many)। এই তত্ত্বের আবিষ্কারক রবার্ট ডাল (Robert Dahl)। এই তত্ত্বানুযায়ী সমাজটা পরিচালিত হয় পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগীতাশীল বিভিন্ন গ্রুপের দ্বারা। অতএব, রাষ্ট্রের মৌল কাজ এসব গ্রুপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলও বহুজনের শাসনের তত্ত্ব দিয়েছিলেন। বহুজনের শাসন ক্ষুদ্রতর পরিসরে, যেমন একটি গ্রাম বা মহল্লায়

কার্যকর হতে পারে, যেখানে ওই গ্রাম, মহল্লার সকলে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সমাজের ক্ষমতা (Community Power)-র প্রকাশ ঘটাতে পারে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বহুজনের শাসনকাঠামো দাঁড় করানো খুবই দুরূহ বলেই অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ধারণা।

পশ্চাদ্ভূমি Hinterland. পশ্চাদ্ভূমি হল গেরিলা যোদ্ধাদের প্রভাবাধীন সেই অঞ্চল, যেখানে শত্রুর আধিপত্য নেই। এরূপ অঞ্চলে গেরিলারা অবস্থান করে, শক্তি গড়ে তোলে এবং শত্রুর ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে পুনরায় এই পশ্চাদ্ভূমিতে ফিরে আসে।

পাপারাৎসি : Paparazzi একটি ইতালীয় শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ নর্দমার কীট। ১৯৬০ সালে জগদ্বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ফেলিনির ছায়াছবি La Dolce Vita-এর এক নাছোড়বান্দা ফটোগ্রাফার, যে যত্রতত্র লুকিয়ে বরেণ্য ব্যক্তিদের, বিশেষত তাঁদের কেলেঙ্কারিমূলক কর্মকাণ্ডের ছবি তুলত পত্রিকায় ছাপিয়ে সাড়া জাগানোর উদ্দেশ্যে, তাকে পাপারাৎসি হিসাবে চিহ্নিত করায়, সারা পৃথিবীতে এরূপ স্ক্যান্ডালশিকারি নাছোড়বান্দা ফটো-সাংবাদিকদের পাপারাৎসি বলে অভিহিত করা শুরু হয়। ১৯৯৭ সালে ব্রিটেনের সাবেক প্রিন্সেস অব ওয়েলস ডায়ানা তাঁর বয়ফ্রেন্ড দোদিসহ ফ্রান্সে এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। দেখা যায় যে, গসিপ ম্যাগাজিন বা ট্যাবলয়েড পত্রিকার স্ক্যান্ডালশিকারী ফটোগ্রাফারদের কবল থেকে বাঁচার জন্য অতিদ্রুত গাড়ি চালানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এর ফলে পাপারাৎসীদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। বস্তুত পাপারাৎসিরা অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনকেই দুর্বিসহ করে তোলে।

পারমাণবিক অস্ত্র : Nuclear Warheads. অ্যাটমবোমা, হাইড্রোজেন বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদিই পারমাণবিক অস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ১০৩০টি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তার ভাণ্ডারে রয়েছে ১২০৭০টি পারমাণবিক অস্ত্র ও তার ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ১৩০০০ কিলোমিটার। অন্যান্যদের অবস্থা নিম্নরূপ

দেশ	বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে	পারমাণবিক অস্ত্রসংখ্যা	ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা (কি: মি:)
ব্রিটেন	৪৫	৩৮০	১২০০০
ফ্রান্স	২১০	৫০০	৫৩০০
রাশিয়া	৭১৫	২২,৫০০	১১০০০
চীন	৪৫	৪৫০	৬৮০০
ভারত	৫	৬৫	২৫০০
ইসরায়েল	—	১১২	১৫০০
পাকিস্তান	১	২৫	১৫০০
ইরান	—	—	৫০০
ইরাক	—	—	১৫০
উত্তর কোরিয়া	?	?	১৫০০
লিবিয়া	?	?	৩০০

এ ছাড়া আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বেলারুস, ইউক্রেন, কাজাকস্তান ও দক্ষিণ কোরিয়ার নিকটও পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এই অস্ত্র দিয়ে পৃথিবীর গোটা মানবসভ্যতাকে কয়েকবার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব।

পারমাণবিক অস্ত্র, কৌশলগত Tactical Nuclear Weapons. সাধারণত স্বল্প দূরত্বে ব্যবহার যোগ্য ও সামরিক লক্ষ্যে নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্রকেই এ-নামে চিহ্নিত করা হয় (যেমন– এক কিলোটন থেকে ১০ কিলোটন ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রকেই অনেকে এই পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন)। পূর্ব ইউরোপে ন্যাটো যেসব অস্ত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছিল সেগুলোকেও এই পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হত। এর প্রত্যুত্তরে '৭০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ওয়ারশ চুক্তির আওতার এস এস-২০ ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করে সেগুলোকে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র বলে অভিহিত করে। বস্তুত, কোনটি কৌশলগত (Tactical) অস্ত্র, আর কোনটি প্রথাগত (Conventional) অস্ত্র তা নির্ণয় করার কোনো সর্বজনগ্রাহ্য মাপকাঠি নেই।

পারমাণবিক অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তি Nuclear Non-proliferation Treaty. বিশ্বের যে-সমস্ত দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী নয়, সে-সমস্ত দেশ যাতে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি বা ক্রয় করতে না পারে, মূলত এই লক্ষ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর উদ্যোগে ১৯৭০ সালের ৫ মার্চ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মোট ৪৩টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি Neucler Test Ban Treaty (NTBT)। ১৯৬৩ সালের ৬ আগস্ট যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মর্মে এই চুক্তি স্বাক্ষর করে যে, তারা বায়ুমণ্ডলে বা মহাশূন্যে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ বা মুলতবি রাখবে। পরবর্তীকালে আরও প্রায় ১০০টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করলেও পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী চীন ও ফ্রান্স এতে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকে।

পারমাণবিক সমতা Nuclear Parity. গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সীমিতকরণ সংলাপ (SALT) এবং গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রহ্রাস সংলাপ (START)-এর পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কার কী পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র আছে, তা নিরূপণ করা জরুরি হয়ে পড়ে। যদিও এতদ্‌সম্পর্কিত গোপনীয়তার দরুন পারমাণবিক অস্ত্রের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা দুরূহ তথাপি ১৯৮০-এর দশকে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় রাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি মোটামুটি সমান-সমান। লাঞ্চার ও মিজাইলসংখ্যা, মেগাটনেজ ও থ্রোওয়েট (throw-weight) এর দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিছুটা এগিয়ে থাকলেও মোট অস্ত্রের পরিমাণ ও লক্ষ্যভেদ-ক্ষমতা (targetting)-র দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এগিয়ে। এটা জানার আগ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একথা ভেবে ভীত ছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ্যভেদ ও বিস্ফোরণক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিভিত্তিক আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (ICBM)-এর ৯০%-কেই ধ্বংস করে দিতে সমর্থ ; অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সে-ক্ষমতা নেই। এই ভীতি হ্রাস পাওয়ার ফলে ইউরোপে ন্যাটোর প্রচলিত অস্ত্র ও সামরিক শক্তিও হ্রাস করা হয়।

পার্জিং Purging. এর অর্থ হল বাতিল, ধ্বংস বা বহিষ্কার করে দেওয়া। দলের মধ্য থেকে আদর্শবিরোধী বা ক্ষতিকর সদস্যদের চিহ্নিত করে দল থেকে বহিষ্কার করার নামই হল পার্জিং। আদর্শকে সংবদ্ধ ও অটুট রাখার উদ্দেশ্যেই পার্জিং-এর প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। মাও ঝে ডং-এর মতে প্রতিটি পার্জিংই দলকে ক্রমবর্ধমান হারে শক্তিশালী করে তোলে। অবশ্য, অনেক সময় পার্জিং-এর নামে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের স্বীয় কায়েমি স্বার্থে দ্বিমত পোষণকারী বা সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের 'আদর্শবিরোধী', 'বিদেশের দালাল' ইত্যাদি নামে অভিহিত করে এবং এই অজুহাতে বহিষ্কার বা নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

পার্ল হারবারের নাটক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হাওয়াইস্থ পার্ল হারবারে ছিল অন্যতম প্রধান মার্কিন নৌঘাঁটি। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর রবিবার সকাল ৭টায় কোনোপ্রকার আনুষ্ঠানিক যুদ্ধঘোষণা ব্যাতিরেকে জাপানি বিমানবহর পার্ল হারবার আক্রমণ করে এবং 'অপারেশন টোরা টোরা' বলে কথিত এই হামলার মাধ্যমে দুই ঘণ্টারও কম সময়ে ৫টি যুদ্ধ জাহাজসহ মোট ১৯টি জাহাজ হয় ডুবিয়ে দেয়, নয় অকেজো করে ফেলে; ১২০টি বিমান ধ্বংস করে এবং এর ফলে ২৪০০ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র ৮ ডিসেম্বর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ১১ ডিসেম্বর জাপানের মিত্র জার্মানি ও ইতালি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পালটা যুদ্ধ ঘোষণা করে। পার্ল হারবারের এই নাটকীয় ঘটনা সংশ্লিষ্ট সমুদ্র এলাকায় জাপানিদের সাময়িক প্রাধান্য এনে দেয়।

পিংপং কূটনীতি ইউরোপের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা চীনা কূটনীতির একটি কৌশলকে এ-নামে অভিহিত করেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে চীনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জো এন লাই হ্যানয় সফর করেন এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ভিয়েতনামিদের সঙ্গে গভীর একাত্মতা ঘোষণা করেন। এমনকি ইন্দোচীনে মার্কিন আগ্রাসনকে খোদ চীনের প্রতিও হুমকিস্বরূপ বলে অভিহিত করেন। হ্যানয় থেকে ফিরে এসেই জো এন লাই মার্কিন সাংবাদিক ও পিংপং খেলোয়াড়দের ওই এপ্রিল মাসেই চীন সফরে আসার জন্য এবং সৌহার্দ্যমূলক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। বলাবাহুল্য, মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে এরূপ ঘটনার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। যা-ই হোক, মার্কিন খেলোয়াড় ও সাংবাদিকরা যথাসময় চীন সফর করে এবং চীনা খেলোয়াড়রাও যুক্তরাষ্ট্র সফর করে। বাস্তবে, এই সফরবিনিময় খেলাধুলা ও সংস্কৃতির আওতা ছাড়িয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিরাট অবদান রাখে। মার্কিন পিংপং দলের সফরের পরপরই যুক্তরাষ্ট্র চীনকে তেল সরবরাহ করার মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর করে। বস্তুত, চীন ষাটের দশক থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষত এশীয় দেশসমূহে পিংপং ও ব্যাডমিন্টন দল, শরীরচর্চা দল ও সাংস্কৃতিক দল প্রেরণের মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু করে।

পি. এফ. এল. পি. প্যালেস্টাইনের মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালের ১১ ডিসেম্বর পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন (PFLP) গঠন করা হয়। সোভিয়েতপন্থি, তথা বামপন্থি চিন্তাধারার অধিকারী এই সংগঠনটির মূল ব্যক্তিত্ব ও সাধারণ সম্পাদক জর্জ হাব্বাস। এই সংগঠন পি. এল. ও.-এর অন্যতম শরিক দল।

পি. কে. আই.-এর বিপর্যয় পি. কে. আই. হল 'পার্টি কমিউনিস্ ইন্দোনেশিয়া'-এর সংক্ষেপিত রূপ। এই ডাচ কথাটির অর্থ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি।

ইন্দোনেশিয়ার তৎকালীন ঝোড়ো রাজনৈতিক পটভূমিতে পি. কে. আই. খুব সহজেই বিস্তৃতি লাভ করে। সামরিক বাহিনী, বিশেষত বিমানবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে পি. কে. আই. শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। এক পর্যায়ে চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সুসম্পর্কে (বিশেষত বান্দুং সম্মেলনের পর) প্রেসিডেন্ট শোয়েকার্নো পি. কে. আই.-এর প্রতি অনেকটা সদয় হয়ে পড়েন এবং জাতীয় কাউন্সিলসহ উচ্চপর্যায়ের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থায় পি. কে. আই.-কে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসন প্রদান করেন। এমনকি, পি. কে. আই.-কে মন্ত্রিসভায়ও আসন দেয়া হয়। এ-সময় পি. কে. আই. পরিণত হয় বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টিতে। চীন ও রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পর তখন পি. কে. আই.-এর সদস্যসংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে এল ১৯৬৫ সালে। এ-সময় প্রেসিডেন্ট শোয়েকার্নোর দেহরক্ষী বাহিনী (লেফটেন্যান্ট কর্নেল উনতুং-এর নেতৃত্বাধীন), পি. কে. আই.-এর সহায়তায় জেনারেল ওমর দানিসহ সশস্ত্রবাহিনীর কতিপয় উচ্চপদস্থ অফিসারকে হত্যা করে। সশস্ত্রবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসে। শুরু হয় পি. কে. আই.-কে নির্মূল করার অধ্যায়। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে তিন লক্ষাধিক কমিউনিস্টকে হত্যা করা হয়। পি. কে. আই.-এর একচ্ছত্র নেতা ডি. এন. আইদিতকে হত্যা করা হয় প্রকাশ্য রাজপথে ধরে এনে গুলি করে। ১৯৬৫ সালের পর জেনারেল সুহার্তো (যিনি ১৯৬৭ সালে শোয়েকার্নোকে অপসারিত করে নিজেই ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট হন) ধারাবাহিকভাবে কমিউনিস্ট নির্মূলীকরণের প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে থাকেন। ফলে অচিরেই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টি একেবারেই কঙ্কালসার হয়ে পড়ে। অনেকে মনে করেন যে অতিরিক্ত লোভ, হঠকারিতা ও সুবিধাবাদের সংমিশ্রণই ছিল পি. কে. আই.-এর করুণ পরিণতির জন্য দায়ী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পি. কে. আই. একপর্যায়ে ধর্মভিত্তিক দল নাহাদাতুল উলামা ও শোয়েকার্নোর দল পি. এন. আই.-এর সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিতে পর্যন্ত দ্বিধা করেনি। অনেকের মতে এর কারণ ছিল নিতান্তই ক্ষমতালোলুপতা।

পিকেটিং Picketing. কোনো ধর্মঘট বা হরতালকালে শ্রমিক-কর্মচারী বা ছাত্ররা যাতে স্ব স্ব কলকারখানা, অফিস-আদালত বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না যায়; গাড়ির চালক মালিকরা যেন গাড়ি না চালায়, তার জন্য সংশ্লিষ্টদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিরস্ত রাখাই হল পিকেটিং। এক কথায়, কোনো রাজনৈতিক বা পেশাগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে বিরত করার কাজই হল পিকেটিং।

পিট, উইলিয়াম (১৭৫৯-১৮০৬) আর্ল অব চ্যাথাম-এর কনিষ্ঠ সন্তান উইলিয়াম পিট (বা ছোট পিট) ২১ বছর বয়সে ব্যারিস্টার হন, ২২ বছর বয়সে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন (১৭৮১), ২৩ বছর বয়সে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন (১৭৮২) এবং মাত্র ২৪ বছর বয়সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন (১৭৮৩)। ১৭৮৪ সালের নির্বাচনেও তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়ী হন। তিনি ১৮০১ সাল পর্যন্ত মোট ১৮ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং ১৮০৬ সালে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক ছিলেন। তিনি রোমান ক্যাথলিকবিরোধী আইনসমূহ বাতিল করেন, দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করেন, ভারত সরকারের প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস করেন, বিরোধীদের দমনকল্পে 'হেবিয়াস কর্পাস'

বাতিল করেন, রাষ্ট্রদ্রোহমূলক সভাসমিতি আইন (১৭৯৯) প্রবর্তন করেন এবং রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলেন।

পুঁজি Capital. মুনাফার উদ্দেশ্যে শিল্পে বা বাণিজ্যে বিনিয়োজিত অর্থই হল পুঁজি বা মূলধন। পুঁজি প্রধানত দুপ্রকার। যথা, স্থির পুঁজি (যেমন, কলকারখানা, ইমারত ইত্যাদি) এবং চলতি পুঁজি (যেমন, কাঁচামাল, শ্রমিকের মজুরি, অন্যান্য ওভারহেড ইত্যাদি বাবদ বিনিয়োজিত অর্থ)। মার্কসীয় মতে পুঁজিই হল পুঁজিবাদী শোষণের ভিত্তি। কার্ল মার্কস বলেছেন, "পুঁজি কোনো জিনিস নয়, পুঁজি হল একটা সামাজিক সম্পর্ক। বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে উৎপাদনের যেসব উপকরণ রয়েছে, সেগুলো নিজগুণে মূলধন নয়। শুধু একটা বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থাই এসব জিনিসকে শোষণের উপকরণে পরিণত করেছে।" আর-এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "চরকা কেবল সুতা কাটারই যন্ত্র। একটি বিশেষ অবস্থায় মাত্র এই যন্ত্রটি মূলধন হয়ে দাঁড়ায়। সেই অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে চরকারও মূলধন হিসেবে কোনো মূল্য থাকে না ('Wage, Labour and Capital' শীর্ষক গ্রন্থ)।" লেনিনের মতে, "মূলধন হল একটা ইতহাস-নির্দিষ্ট বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক।" মূলধন হল এমন একটি মূল্যের সমষ্টি, যার কাজই হল মূল্য সৃষ্টিকারী শক্তিকে অর্থাৎ শ্রমিককে শোষণ করা। শিল্পে বিনিয়োজিত মূলধনের দ্বারা অক্রয়কৃত শ্রম (Unpaid labour) গ্রাস করা হয় সরাসরি; আর ব্যবসায়ী, জমিদারি বা মহাজনি পুঁজির ক্ষেত্রে এই গ্রাসের কাজটি করা হয় পরোক্ষভাবে। বস্তুত, শিল্পে নিয়োজিত মূলধন অক্রয়কৃত শ্রমগ্রাসের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে এবং মুনাফা উৎপাদন করে।

পুঁজি, আদর্শ Ideal Capital. শিল্পে নিয়োজিত পুঁজিকেই বলা হয় আদর্শ পুঁজি। মার্কসীয় মতে, আদর্শ পুঁজির ওপরই সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। এই সমাজের অন্যান্য পুঁজিও কার্যত আদর্শ পুঁজিনির্ভর।

পুঁজি, জাতীয় National Capital. যে-পুঁজি অপর কোনো দেশের সরকার, পুঁজিপতি শ্রেণী বা বহুজাতিক কর্পোরেশন ইত্যাদির স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তাকেই বলে জাতীয় পুঁজি। জাতীয় পুঁজিপতিরা অন্য কোনো দেশ বা দেশের পুঁজিপতিদের এজেন্ট বা প্রিমিয়ামভোগী নয়, কিংবা তাদের স্বার্থেরও আজ্ঞাবহ নয়—বরং তারা নিজেদের শিল্পসহ জাতীয় শিল্পকারখানার বিকাশ ঘটায়। কিন্তু দালাল বা মুৎসুদ্দি পুঁজি বিদেশী পুঁজিপতি ও পণ্যের স্বার্থেই জাতীয় শিল্পকারখানার বিকাশকে প্রতিহত করে।

পুঁজি, পরিবর্তনশীল মার্কসীয় মতে পরিবর্তনশীল পুঁজি বা Variable Capital হল শ্রমিকের মজুরি বাবদ বিনিয়োজিত পুঁজি। কেননা, পুঁজিপতির মুনাফাটা আসে পুঁজির এই পরিবর্তনশীল অংশ থেকে। উৎপাদিত পণ্য যে-দামে বিক্রি হয়, সেটাই হল তার মূল্য। কিন্তু এই মূল্যের সঙ্গে উৎপাদন-মূল্যের তফাত হয় এজন্য যে পুঁজিপতি শ্রমিকের শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্য দেয় না, বরং তার অংশবিশেষের মূল্য দিয়ে বাকি অংশ আত্মসাৎ করে। উৎপাদনের পর উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের যে-অংশটি কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, জ্বালানি ইত্যাদি বাবদ সৃষ্ট সে-অংশটি অবিকৃতই থাকে। কিন্তু, শ্রমিকের মজুরি বাবদ বিনিয়োজিত অংশটিই বাজারে গিয়ে পরিমাণে বেড়ে যায়। এজন্যই পুঁজির এই অংশটিকে বলা হয় পরিবর্তনশীল পুঁজি। যেমন ধরা যাক, একটি রেডিও উৎপাদন করতে, কাঁচামাল, উৎপাদনকারী যন্ত্রের ক্ষয়, জ্বালানি ইত্যাদি বাবদ খরচ পড়ল ২০০

টাকা। আর শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হল, ধরা যাক, ১০০ টাকা। তা হলে, রেডিওটির উৎপাদন মূল্য দাঁড়াল ৩০০ টাকা। কিন্তু, বাজারে সেটি বিক্রি হল ৪৫০ টাকা। এই যে বাড়তি ১৫০ টাকা—এটা এল কোত্থেকে? শ্রমিক যদি তার শ্রমশক্তি দিয়ে কাঁচামালকে রেডিওতে রূপান্তরিত না করত, তা হলে কাঁচামালের দাম তো যা আছে, তাইই থাকত: জ্বালানির দামও আপনাআপনি বাড়তে পারত না। সুতরাং, দাম যে বাড়ল, তার কারণ শ্রমিক কর্তৃক কাঁচামালকে রেডিওতে রূপান্তর। অর্থাৎ বর্ধিত মূল্যের পুরোটাই শ্রমিকের শ্রমের ফল। কিন্তু, পুঁজিপতি শ্রমিককে তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য না দিয়ে, আত্মসাতের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। অবশ্য পুঁজিবাদী বা মুক্ত অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবর্তনীয় বা পরিবর্তনশীল পুঁজি হল সেই পুঁজি, যা স্থির থাকে না, বরং যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

পুঁজি প্রত্যাহার কোনো বিনিয়োজিত পুঁজি বা শিল্প/বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে দেওয়াই হল পুঁজি প্রত্যাহার বা Disinvestment. অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইনস এই কথাটির প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল—আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের স্বার্থে। এখন, বহু দেশেই ঘাটতি পূরণের জন্য বিনিয়োজিত পুঁজি বিক্রি করে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ব্যক্তিমালিকানায় বিক্রি করে দেওয়াকেও বলে পুঁজি প্রত্যাহার বা Disinvestment.

পুঁজি রফতানি Export of Capital. পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এক অবশ্যম্ভাবী ফসল হল পুঁজি রফতানি। পুঁজিবৃদ্ধির এক পর্যায়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, পুঁজিপতি তার মুনাফাজাত উদ্বৃত্ত আর স্বদেশে লাভজনক শর্তে বিনিয়োগ করতে পারে না। এমতাবস্থায়, তার উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য খুঁজতে হয় স্বদেশের বাইরে ক্ষেত্র, সাধারণত তুলনামূলকভাবে অনুন্নত দেশে, যেখানে মুনাফার হার হবে অধিকতর। অন্য কথায়, শিল্পোন্নত দেশসমূহের পুঁজিপতিরা অধিকতর মুনাফার উদ্দেশ্যে তাদের যে-উদ্বৃত্ত অর্থ বা পুঁজি তুলনামূলকভাবে অনুন্নত দেশে বিনিয়োগ করে, সেটাকেই বলা হয় পুঁজি রফতানি।

পুঁজি, লগ্নি : Finance Capital. ব্যাংকপুঁজি ও শিল্পপুঁজি একত্রীভূত হয়ে লগ্নিপুঁজির সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদী স্তরে প্রবেশ করে, তখন পুঁজির পুঞ্জীভবন ঘটে, বহুজাতিক কর্পোরেশন বা আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সমূহ গড়ে ওঠে এবং একচেটিয়া শিল্পপুঁজির সঙ্গে ব্যাংকপুঁজির সম্মিলন ঘটার মাধ্যমে লগ্নিপুঁজির সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ে শিল্পপতিরা ব্যাংক স্থাপন করে কিংবা ব্যাংকের শেয়ার কিনে নেয়, অথবা ব্যাংক-মালিকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। অনেক সময়, আলাদা আলাদাভাবে গড়ে ওঠা শিল্প ও ব্যাংকপুঁজিরও একত্রীকরণ ঘটে। লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' গ্রন্থে এ-সম্পর্কে বলেছেন, "একচেটিয়া অবস্থা ও লগ্নীপুঁজির জন্মের ফলে সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ার ভাগ্য বৃহৎ পুঁজিপতিদের ক্ষুদ্র একটা দলের হাতে ন্যস্ত হয়েছে ব্যাংকপুঁজি ও শিল্পপুঁজির মিলনের ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যে-অবস্থায় ব্যাংক-মালিকরাই শিল্প পরিচালনা করছে এবং শিল্পপতিদের রাখা হয়েছে ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের মধ্যে। এর ফলে, প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন ব্যাংক ও শিল্পের ওপর একচেটিয়া আধিপত্যকারীদের একটি ক্ষুদ্র দলের হাতে

ন্যস্ত হয়েছে: আর যারা অর্থনৈতিক জীবনের হর্তাকর্তা, তারা সমগ্র দেশেরও হর্তাকর্তা হয়ে বসেছে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলোতে যে-ধরনের সরকারই থাকুক না কেন, কার্যত লগ্নিপুঁজির মালিক মুষ্টিমেয় মুকুটহীন সম্রাটরাই সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ফেলে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার পুঁজি-দানবদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ফলে সকল পুঁজিবাদী দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর সমাধান বৃহত্তম পুঁজিপতিদের একটা ক্ষুদ্র দলের ওপরই নির্ভর করে।" বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী দেশ ছাড়াও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিল্পপতিরাও ব্যাংকস্থাপন এবং ব্যাংকাররাও শিল্পস্থাপনের মাধ্যমে এই দুই পুঁজির সম্মিলন ঘটিয়ে থাকে।

পুঁজি, স্থির স্থিরপুঁজি বা Constant Capital হল পুঁজির স্থির বা অপরিবর্তনশীল অংশ। জমি, কারখানা-ভবন, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জ্বালানি ইত্যাদিকে স্থির পুঁজি বলা হয় এজন্য যে, কারখানায় উৎপাদিত পণ্য যখন বিক্রির জন্য বাজারে যায়, তখন উৎপাদনমূল্য ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে যে-তফাতটি থাকে তা স্থিরপুঁজির কারণে হয় না। যেমন, ধরা যাক, একটি ঘড়ি-কারখানায় যে-ঘড়ি উৎপাদিত হল, তার উৎপাদনমূল্য বা উৎপাদন বাবদ খরচ পড়ল ১০০ টাকা। কিন্তু তা বাজারে বিক্রি হল ১৫০ টাকায়। এই যে, ৫০ টাকার পার্থক্য হল, এটি জমি, মেশিন, কাঁচামাল বা জ্বালানির দরুন নয়, বরং শ্রমিকের শ্রমশক্তির দ্বারা কাঁচামালকে ঘড়িতে পরিণত করার দরুন। অন্য কথায়, শ্রমিকের মাইনে বাবদ যে-পুঁজি বিনিয়োজিত হল, বাজারে গিয়ে সেটারই বৃদ্ধি বা পরিবর্তন ঘটল; কিন্তু কারখানা-কাঁচামাল ইত্যাদি বাবদ বিনিয়োজিত পুঁজি স্থির বা অবিকৃতই রইল।

পুঁজিবাদ Capitalism. মার্কসীয় মতে সামন্তবাদকে অপসারিত করে তার স্থলাভিষিক্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হল পুঁজিবাদ; পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি হল—ক. উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিমালিকানা এবং খ. উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ। সময় সময় সঙ্কট, বেকারত্ব, ব্যাপক জনগণের দারিদ্র্য, অবাধ প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ ইত্যাদিকেই পুঁজিবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা হয়। পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ্ব হল, সামাজিকীকৃত শ্রমরূপের সঙ্গে ভোগের পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত রূপের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে এই সমাজের দুই প্রধান শ্রেণী বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণীর দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। পুঁজিবাদের প্রবক্তারা বাহ্যত রাজনৈতিক সাম্যের কথা ঘোষণা করলেও, অর্থনৈতিক বৈষম্যের দরুন এই ঘোষণা কার্যত প্রহসনেই পরিণত হয়। পুঁজিপতি ও তাদের প্রতিভূরা রাষ্ট্রযন্ত্রসহ যাবতীয় ব্যবস্থাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে রাখে, যেন দরিদ্র্য বা মেহনতি মানুষ কখনোই পুঁজিপতিদের সমকক্ষ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা আইনগত অধিকার ভোগ করতে না পারে। যেমন, তারা নির্বাচনব্যবস্থাকে এমনই একটা ব্যয়বহুল ব্যবস্থা হিসাবে বজায় রাখে, যাতে কাগজে-কলমে যে-কেউ নির্বাচিত হতে পারে বলে বলা হলেও, কার্যত শুধু ধনী বা তাদের প্রতিনিধিরাই নির্বাচিত হতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীতে পুঁজিবাদের উদ্ভব। সামন্তবাদের পটভূমিতে এর ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল, কেননা পুঁজিবাদ তখন সামন্তবাদের তুলনায় উচ্চতর শ্রম-উৎপাদনের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ তার চূড়ান্ত স্তর সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছে যায়, স্থাপিত হয় একচেটিয়া (Monopoly) এবং কুবেরতন্ত্র (Oligarchy)-এর আধিপত্য। আরও উদ্ভব ঘটে রাষ্ট্রীয় মনোপলি পুঁজিবাদের—যা মনোপলিসমূহের শক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতার সম্মিলন ঘটায় এবং প্রচণ্ডভাবে সমরবাদকে উজ্জীবিত করে। প্রথম ও

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছিল বস্তুত এরই ফলশ্রুতি। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার উদ্ভবের ফলে পুঁজিবাদ এক নতুন সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা আঞ্চলিক যুদ্ধ, স্থানীয় উত্তেজনা সৃষ্টি, স্নায়ুযুদ্ধ, প্রভাববলয় সৃষ্টি, অর্থনৈতিক আগ্রাসন ইত্যাদির মাধ্যমে টিকে থাকার প্রয়াস পায়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও সমাজবিপ্লবকে ঠেকানোর জন্য তারা বিভিন্ন সংস্কারমূলক ও আপোসমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরিণামে, অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা ও গতিহীনতার দরুণ বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকেই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ভিত অতি দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে, অথচ পুঁজিবাদ পরিবর্তিত বিশ্ব ও জাতীয় পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে অধিকতর সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়।

পুঁজিবাদ, জনগণের People's Capitalism. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদকে অনেকে এই নামে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে, মার্কিন পুঁজিবাদ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের মুনাফার স্বার্থে পরিচালিত হয় না, বরং তা পরিচালিত হয় সমগ্র জনগণের উন্নতির জন্য। তাঁদের মতে, এই ব্যবস্থায় একদিকে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটছে এবং তারা ক্রমবর্ধমান হারে মোটরগাড়িসহ বিভিন্ন বিলাসদ্রব্যেরও মালিক হচ্ছে এবং অপরদিকে, "প্রত্যেকে সমাজকে দেবে স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী এবং নেবে স্ব স্ব প্রয়োজনানুযায়ী"—সমাজতন্ত্রের এই মৌল শর্তও বিপ্লব ব্যতিরেকেই কমবেশি কার্যকর হয়ে চলেছে। এই মতবাদের প্রবক্তারা যুক্তি দেখান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদের অংশীদারিত্ব বস্তুত জনগণের হাতেই হস্তান্তরিত হয়েছে বা হচ্ছে; বনেদি পুঁজিপতিরা উ ৎপাদনব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ও একক নিয়ন্ত্রণ থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেছে বা যাচ্ছে এবং তাদের স্থান দখল করছে বিশেষজ্ঞ ম্যানেজাররা; তদুপরি জাতীয় উৎপাদনের বণ্টনেও শ্রমিকদের অংশ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। তাঁরা আরও দাবি করেন যে, এর ফলে শ্রেণীসংগ্রাম লোপ পেয়ে শ্রেণীঐক্য ও শ্রেণীসহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মতবাদীরা বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কখনোই বনেদি সামন্তবাদ ছিল না। প্রথম থেকেই ছিল প্রাচুর্য ও শ্রমিকের উচ্চতর মজুরি। আর এর ফলেই এখানে জনগণের পুঁজিবাদের বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অনেক উন্নত পুঁজিবাদী দেশেও শিল্পকারখানা ও ব্যাংক-বিমার শেয়ার ক্রমবর্ধমান হারে শ্রমিক ও জনগণের নিকট বিক্রয়, শ্রমিক-কর্মচারীদের উচ্চতর মজুরি ও সুবিধাদান, সামাজিক নিরাপত্তাদান ইত্যাদির মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিবর্তন ঘটছে বলে দাবি করা হয়।

পুঁজিবাদ, মুমূর্ষু Moribund Capitalism. বস্তুবাদী তত্ত্বানুযায়ী প্রতিটি সমাজব্যবস্থা তার চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌছালে 'নিরাকরণের নিরাকরণ' প্রক্রিয়ায় তা অবক্ষয়িত হতে হতে এক পর্যায়ে নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের মাধ্যমে অবলুপ্ত হয়ে যায়। বস্তুবাদীরা আরও মনে করেন যে, বহুজাতিক কর্পোরেশন ইত্যাদি গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ তার চূড়ান্ত অবস্থায় পৌছে যায় এবং তার অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই অবক্ষয়কে ঠেকানোর জন্যই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা বনেদি পুঁজিবাদের পথ থেকে সরে গিয়ে শ্রমিকদের উচ্চতর মজুরি দিতে বাধ্য হচ্ছে, বাজারে ক্রমবর্ধমান হারে শেয়ার ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে এবং একের পর এক কনসেশন দিচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের আবির্ভাব ও বিকাশের ফলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় বলেও সমাজতন্ত্রীরা দাবি করতেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ধ্বংসোন্মুখ এই পুঁজিবাদকেই তাঁরা মুমূর্ষু

পুঁজিবাদ বলে অভিহিত করতেন। অপরদিকে সমাজতন্ত্রবিরোধীরা মনে করেন যে, পুঁজিবাদ আদৌ মুমূর্ষু নয়। তাঁদের মতে, যেটাকে আপোস বলে মনে করা হচ্ছে, সেটা আসলে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উৎপাদনের উন্নততর বিকাশজনিত পরিস্থিতির ও পুঁজিবাদের মানবিক ও যৌক্তিক দিকেরই অনিবার্য ফসল। তাঁরা আরও মনে করেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর এই গুণের জন্যই পুঁজিবাদ বরং দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে এবং সমাজতন্ত্রই বস্তুত এক অচল মুমূর্ষু ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

পুঁজিবাদ, ম্যানেজারীয় Managerial Capitalism. এটি হচ্ছে মিশ্রঅর্থনীতির প্রবক্তাদের মতবাদ। এঁরা ঠিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নন এবং প্রেরণা (incentive)-র স্বার্থে ভালো-মন্দ ও যোগ্য-অযোগ্যের সাম্যেও বিশ্বাসী নন। এঁরা ম্যানেজারীয় স্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতার ওপরই শিল্প ও অর্থনীতির বিকাশ নির্ভরশীল বলে বিশ্বাস করেন। এই মতবাদ কেইনসবাদ (Keynesianism) এবং সোশ্যাল ডেমোক্রেসির কাছাকাছি।

পুঁজিবাদ, রাষ্ট্রীয় State Capitalism. সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র-পরিচালিত পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই হয় শিল্পসমূহের বিনিয়োজিত সমগ্র বা আংশিক পুঁজির মালিক। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পপতিরাও শিল্পপুঁজির মালিক হতে পারেন বটে, তবে সেক্ষেত্রে মূলত রাষ্ট্রই পুঁজিপতিদের পক্ষে শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ-কেউ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্র বলে চালাতে চেষ্টা করেন। বস্তুত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। কারণ, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সমগ্র জনগণের স্বার্থে নয়, বরং পুঁজিপতি শ্রেণী ও তাদের প্রতিনিধি আমলাতন্ত্র প্রমুখের স্বার্থেই বলবৎ থাকে। তদুপরি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারাই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, সর্বহারারা বা তাদের প্রতিনিধিরা নয়। মোটকথা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদও সকল অর্থেই পুঁজিবাদ ও শোষণমূলক।

পুঁজিবাদ, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া : State Monopoly Capitalism. এটি পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটি রূপ। এই পর্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে বৃহৎ একচেটিয়াসমূহ বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, যাতে সর্বোচ্চ পুঁজিবাদী মুনাফা অর্জন করা সম্ভবপর হয়। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদী স্তরে পুঁজিবাদী কাঠামোয় উৎপাদনের সামাজিকীকরণ সর্বোচ্চ রূপ ধারণ করে। লেনিন এই স্তরকে 'সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বস্তুবাদী প্রস্তুতি' বলে অভিহিত করেছেন। যা-ই হোক, এই স্তর সকল বিচারেই সাম্রাজ্যবাদী স্তর এবং এটা কোনোক্রমেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ইঙ্গিত বহন করে না। এর ফলে, শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বেরও তেমন কোনো প্রকারভেদ ঘটে না, কেননা এই পর্যায়েও রাষ্ট্রযন্ত্র শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়াদেরই করায়ত্ব থাকে। ফলে, ক্ষমতাসীন বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের ফল ভোগ করে এবং জনগণকে শোষণ করে। লেনিনের মতে, "রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভবপর, যদি রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণটা থাকে সর্বহারা শ্রেণীর হাতে।" (রচনা সমগ্র-এর ৩৩ খণ্ডের ৪০৩-৪ পৃষ্ঠা)। তবে এ-ধরনের পুঁজিবাদের নজির বর্তমান বিশ্বে নেই বললেই চলে।

পুঁজির কেন্দ্রীকরণ Concentration of Capital. বিভিন্ন শিল্প বা ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণের ফলে পুঁজির যে একত্রীকরণ ঘটে, তাকেই বলে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ। এই

কেন্দ্রীকরণ আপোসেই হতে পারে যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঐকমত্যের ভিত্তিতে একত্রীভূত হয়ে যায়। আবার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈরী প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হলে, ফলশ্রুতিতে দুর্বলতর প্রতিষ্ঠানসমূহ অস্তিত্ব হারিয়ে বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানসমূহের উদরস্থ হয়ে গিয়েও পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ঘটাতে পারে।

পুঁজির পুঞ্জীভবন মার্কসীয় মতে উদ্বৃত্ত মূল্যের একটি অংশ পুঁজিতে পরিবর্তিত হয়ে পুঁজির বিস্তার সাধন করে। পুঁজির এই বিস্তার পুঁজিপতির ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা খেয়ালের দরুন ঘটে না, বরং তা ঘটে নতুন ও বৃহত্তর পর্যায়ের উৎপাদনের স্বার্থে। পুঁজির এই বিস্তারের প্রক্রিয়ায় শুরু হয় পুঁজির পুঞ্জীভবন বা Accumulation of Capital।

পুলিশ-রাষ্ট্র : Police State. যে-রাষ্ট্রে পুলিশ, বিশেষত গুপ্তপুলিশের সাহায্যে সরকার তার বিরোধীপক্ষকে বেপরোয়াভাবে দমন করে কিংবা যে-রাষ্ট্রে কার্যত পুলিশরাই সর্বেসর্বা, সে রাষ্ট্রকেই বলা হয় পুলিশ-রাষ্ট্র।

পূর্ণ কর্মসংস্থান লর্ড বিভারীজ তাঁর প্রণীত 'মুক্ত সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান' (Full Employment in a Free Society) নামক গ্রন্থে এই কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে এটি হল এমন একটি অবস্থা, যে-অবস্থায় বেকার মানুষের চাইতে কর্মখালির পরিমাণ অধিক থাকে। বলা বাহুল্য, এই পরিস্থিতিতে কর্মখালি এবং বেকার দুয়েরই অস্তিত্ব থাকলেও কর্মখালি থাকে অনুপাতে বেশি। এ-প্রসঙ্গে আরও ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের পরিমাণ ৩%-এর অধিক হলে তা পূর্ণ কর্মসংস্থানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে না। তাঁর সংজ্ঞানুযায়ী অক্ষম এবং অনিচ্ছুকরা যথার্থ বেকার পর্যায়ভুক্ত নয়।

পৃথিবীর বাঁটোয়ারা একচেটিয়া মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ কর্তৃক পৃথিবীর পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত দেশসমূহকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেওয়া। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহে যখন পুঁজির মাত্রাধিক্যের দরুন নবতর পুঁজি লগ্নি আর তেমন লাভজনক থাকে না, তখন এই পুঁজিপতিরা অতিরিক্ত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন পশ্চাৎপদ দেশের বাজারকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে এসে সেখানে তাদের উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগ করে কিংবা নিজেদের পণ্যের একচেটিয়া বাজার তৈরি করে এবং তাদের উন্নত শিল্পের জন্য পশ্চাৎপদ দেশের কাঁচামাল একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ ও আহরণ করে। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের পুঁজি ও সামরিক শক্তির পরিমাণ অনুসারেই তাদের মধ্যে এই বাঁটোয়ারা হয়ে থাকে। এই বাঁটোয়ারা কখনো-বা আপোসে নিষ্পন্ন হয়, আবার কখনো এর জন্য সৃষ্টি হয় সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। ঔপনিবেশিক যুগে একই ধরনের উদ্দেশ্যে উপনিবেশবাদীরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল সশরীরেই দখল করে ফেলত।

পেটিবুর্জোয়া কথাটির অর্থ হল ছোট বা ক্ষুদ্র বুর্জোয়া। পেটি বুর্জোয়া হল সর্বহারা ও বুর্জোয়ার মাঝামাঝি স্তর। পেটি বুর্জোয়ারাও উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক হয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করতে পারে; অপরদিকে এরা বুর্জোয়াদের দ্বারা শোষিতও হয়ে থাকে ফলে এদের চরিত্রের মধ্যে থাকে দ্বৈততা ও দোদুল্যমানতা। এরা বুর্জোয়াদের ওপর ক্ষুব্ধও থাকে, আবার আপোস করতেও দ্বিধা করে না। এরা নিজেরাও যৎকিঞ্চিৎ

উৎপাদনের উপায়ের মালিক বিধায় এরা ঝুঁকিপূর্ণ কোনো আন্দোলনে অংশ নিতে ভয় পায়। এজন্য সমাজতন্ত্রীরা এদের বিপ্লবী বলে বিবেচনা করে না। তবে, জাতীয় বিপ্লবে এরা সমাজতন্ত্রীদের মিত্র হতে পারে।

পেট্রিশিয়ান Patrician. দাসব্যবস্থার ওপর গড়ে ওঠা গ্রিক ও রোমীয় সভ্যতার যুগে সমাজে ছিল দুটি শ্রেণী—দাস-মালিক ও ক্রীতদাস। এদের আনুপাতিক হার ছিল প্রায় ১ ১৭। দাস মালিকরাই ছিল অভিজাত। এদের বলা হত পেট্রিশিয়ান। এরাই ছিল নাগরিক—সকল সম্পদ ও ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি। দাস বা প্লেবিয়ানদের বিবেচনা করা হত গৃহপালিত পশুর সমগোত্রীয়: তাদের কোনোপ্রকার নাগরিক বা মানবিক অধিকার ছিল না।

পেট্রোডলার Petro Dollar. সাধারণ অর্থে পেট্রোলিয়াম বিক্রয়লব্ধ ডলার। কিন্তু এর বিশেষ তাৎপর্য হল এই যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার কতিপয় দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত ও তেমন শিল্পায়িত না হওয়া সত্ত্বেও, নিজ নিজ দেশের মাটির নিচের পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পায় এবং তা উত্তোলন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ডলার বা বৈদেশিক মুদ্রার অধিকারী হয়ে পড়ে। ফলে, বিশ্বঅর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও তারা বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সুতরাং, পেট্রোডলার বলতে পেট্রোলিয়ামসমৃদ্ধ দেশসমূহের আর্থরাজনৈতিক ক্ষমতাকেও বোঝানো হয়ে থাকে। এই পেট্রোডলার শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের প্রতি এক হুমকিস্বরূপ বিধায় সাম্রাজ্যবাদীরা পেট্রোডলারের শক্তি ধ্বংস করে বিশ্ব-তৈলবাজারের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সদাতৎপর।

পেন্টাগন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সি.-এর অদূরে অবস্থিত একটি পাঁচ কোণবিশিষ্ট দালান। পাঁচটি দিক বা কোণবিশিষ্ট বলেই এর নাম পেন্টাগন। এই দালানেই মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দফতর অবস্থিত। বর্তমানে পেন্টাগন (Pantagon) বলতে শুধু এই ভবনটিকেই বোঝায় না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষকেও বোঝায়।

পেরেসত্রয়কা সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচভ-ঘোষিত অর্থনৈতিক সংস্কারনীতিই পেরেস্ত্রয়কা (Perestroika) নামে খ্যাত। তিনি বনেদি সমাজতান্ত্রিক ঘরানা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর গ্লাসনস্ত বা খোলানীতির সঙ্গে সংগতি রেখে সোভিয়েত ইউনিয়নে উদারনৈতিক অর্থনীতি প্রবর্তনের এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে, ১৯৮৭ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট দেশসমূহে নয়া অর্থনৈতিক হাওয়া বইতে শুরু করে। এরই সূত্র ধরে মার্কসবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জিত হয়, স্ট্যালিন কঠোরভাবে সমালোচিত হন, খোদ লেনিনের রচনাবলীর বহ্ন্যুৎসব করা হয়, বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়, ধর্ম, ব্যক্তিমালিকানা ইত্যাদির পুনঃপ্রচলন শুরু করা হয় এবং একদা-বর্জিত বুর্জোয়া কালচারকে আবার অবাহন জানানো হয়। এরই ফলশ্রুতিতে সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানি স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং ১৯৯১ সালে 'ইউনিয়ন অব সোস্যালিস্ট সোভিয়েত রিপাবলিকস' পরিবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন নামকরণ করা হয় 'ইউনিয়ন অব সভারিন সোভিয়েত রিপাবলিকস'। কিন্তু এটাও ছিল ক্ষণস্থায়ী। অচিরেই সোভিয়েত ইউনিয়নও ভেঙে যায়।

পেশাদার সেনাবাহিনী Mercenary Army যে-সৈনিক কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নয়, বরং নির্দিষ্ট মাসোহারার বিনিময়ে অন্যান্য পেশার মতোই সৈনিকজীবনকে একটি পেশা বা চাকুরি হিসেবে গ্রহণ করে, সেই সৈনিকই হল পেশাদার সৈনিক এবং এরূপ সৈনিকদের নিয়ে গঠিত বাহিনীই হল পেশাদার সেনাবাহিনী। পেশাদার সেনাবাহিনীর বিশেষত্ব হল এই যে, এরূপ সেনাবাহিনী রাজনৈতিক আদর্শের কোনো তোয়াক্কা করে না, যখন যে-সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন তারই আদেশ-নির্দেশ পালন করে, স্বাভাবিক নাগরিক-কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে ও নির্দেশে জনগণকে নিষ্ঠুরভাবে দাবিয়ে দিতেও পিছপা হয় না। এরই বিপরীতে কোনো কোনো দেশে, বিশেষত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে জনগণের বাহিনী বা গণফৌজ (People's Army) গঠন করতে দেখা যায়। যদিও কার্যত এ-দুয়ের আচরণগত পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই মুশকিল।

পোট্‌স্‌ডাম চুক্তি ১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই থেকে পয়লা আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সাবেক জার্মান যুবরাজের পোট্‌স্‌ডামস্থ সিসিলিয়েনহফ প্রাসাদে চার্চিল, ট্রুম্যান ও স্ট্যালিন-এর মধ্যে যে-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, তারই ফলশ্রুতিতে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই তিন শক্তি জার্মানির ব্যাপারে ইয়ালটা সম্মেলনে গৃহীত নীতির ওপর জোর দেয় এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে আপাতত কোনো কেন্দ্রীয় জার্মান সরকার গঠন করা হবে না। এতে আরও সাব্যস্ত হয় যে, জার্মান অর্থনীতিরও বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে, যাতে জার্মানি একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আর কখনো মাথা তুলতে না পারে। এই চুক্তিতে শর্ত থাকে যে, কোনিগ্‌স্‌বার্গ শহর ও তার সন্নিহিত এলাকা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং পোলিশ পশ্চিম সীমান্ত, যার ব্যাপারে ইয়ালটা সম্মেলনে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, তা ওডের নিসি লাইন বরাবর হবে। চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডে অবস্থিত জার্মানদের জার্মানিতে ফিরিয়ে আনার বিষয়ও চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়। ফ্রান্সকে ইতোপূর্বে কথা দেওয়া হয়েছিল যে, যুদ্ধশেষে ফ্রান্সকে অধিকৃত জার্মানির একটি এলাকা প্রদান করা হবে, কিন্তু ফ্রান্সকে কার্যত পোট্‌স্‌ডাম আলোচনা থেকেই বাদ দেওয়া হয়। অনেকে মনে করেন যে, এই বৈঠকেই আণবিক বোমার সাফল্যজনক পরীক্ষা সম্পর্কে মিত্রশক্তির তিন নেতাকে অবহিত করা হয় এবং এই বৈঠকেই জাপানের ওপর এই বোমা বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পোড়ামাটি নীতি কোনো যুদ্ধের সময় পশ্চাতের সকল কিছু পুড়িয়ে দেওয়ার নীতি। পোড়ামাটি নীতির উদ্দেশ্য হল শত্রুপক্ষ যেন পশ্চাৎবর্তী এলাকার কোনোকিছুকে তাদের আশ্রয়, সরবরাহের উৎস বা অপর কোনো সাহায্যরূপে ব্যবহার করতে না পারে।

পোপতন্ত্র Papacy. একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত পবিত্র রোমান সম্রাট (Holy Roman Emperor) পোপ ও অন্যান্য ধর্মযাজককে নিযুক্ত করতেন। কিন্তু ১০৫৯ সালে পোপ দ্বিতীয় নিকোলাস এই মর্মে এক ডিক্রি জারি করেন যে, এখন থেকে কার্ডিনালদের একটি পরিষদই (College of Cardinals) ধর্মযাজকদের নিয়োগপ্রদান করবে। ১০৭৩ সালে পোপ সপ্তম গ্রেগরি ঘোষণা করেন যে, পোপ শুধু চার্চেরই প্রধান নন, জাগতিক বিচারেরও প্রধান। পোপ গ্রেগরি ইউরোপের সকল রাজদরবারে দূত প্রেরণ করেন তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার জন্য। উইলিয়াম দি কঙ্কারার সঙ্গে সঙ্গেই তা

মেনে নেন। চতুর্থ হেনরী পোপের কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করলে পোপ তাঁকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা করেন এবং তাঁকে উৎখাত করার জন্য জার্মান রাজন্যবর্গের প্রতি আহ্বান জানান। চতুর্থ হেনরি ক্ষমা চেয়ে সে-যাত্রায় রক্ষা পান। এভাবে সারা ইউরোপ জুড়ে পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পোপই সমস্ত রাজরাজড়াদের নিয়োগ ও অপসারণের অধিকর্তা হয়ে দাঁড়ান। পোপের এই কর্তৃত্বই পোপতন্ত্র বা প্যাপাসি বলে পরিচিত। ১২৭৩ সালে হ্যাপসবার্গের রুডলফ সম্রাট নির্বাচিত হওয়ার প্রথা অনুযায়ী রোমে গিয়ে পোপের হাত থেকে রাজমুকুট পরতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনা থেকেই রাজতন্ত্র পোপতন্ত্র থেকে আলাদা হতে শুরু করে এবং শুরু হয় রাজতন্ত্রের সঙ্গে পোপতন্ত্রের দ্বন্দ্বের অধ্যায়। পরবর্তীতে পোপদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অবসান ঘটলেও সুদীর্ঘ ২০০ বছর যাবৎ পোপরা তাঁদের দোর্দণ্ড প্রতাপ অব্যাহত রাখেন।

প্যাকেজ ডিল কোনো চুক্তি বা কার্যক্রমের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত একাধিক বিষয় বা শর্তকে সমন্বিত করে দেওয়াকেই বলে প্যাকেজ ডিল (Package Deal)।

প্যান-আমেরিকান আন্দোলন Pan American Movement. অর্থাৎ নিখিল বা অখণ্ড আমেরিকা আন্দোলন। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ২১টি রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্যান-আমেরিকান ইউনিয়ন গঠন করা হয়। ওয়াশিংটনে এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। বাণিজ্য, যানবাহন, লোকচলাচল ইত্যাদির ওপর এই ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রায় ৪০টি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

প্যান-ইসলাম আন্দোলন এর উদ্দেশ্য হল মূলত দুটি। এক. পৃথিবীর সকল মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা এবং দুই. বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করা। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়। তৎকালীন তুরস্কের সুলতানের নেতৃত্বে এই আন্দোলন তীব্রতা লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি। ১৯১১ সালে বিশ্ব মুসলিম ঐক্য সম্মেলন আহ্বান করা হলেও তাও শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রথম মহযুদ্ধের সময় তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ মিত্রশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি আহ্বান জানান। এতে বহু মুসলমান সাড়া দেয়। কিন্তু মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু করা সম্ভবপর হয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মুস্তাফা কামাল পাশা (আতাতুর্ক) সুলতানকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন, তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং আধুনিকীকরণের নীতি গ্রহণ করেন। ফলে, প্যান-ইসলাম আন্দোলনে ভাটা পড়ে যায়, কেননা তুরস্কই ছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্র। ১৯২৬ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত নিখিল মুসলিম কংগ্রেসে এই প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত হলেও কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। পরবর্তীতে বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে প্যান-ইসলাম আন্দোলন কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

প্যান-জার্মান আন্দোলন জার্মান ভাষাভাষী সকল মানুষকে একত্র করে একটি একক সাম্রাজ্য স্থাপনের আন্দোলন। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে হের ক্লাস নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই আন্দোলন শুরু করেন। অস্ট্রিয়ার জার্মানঅধ্যুষিত প্রদেশগুলোকে জার্মানিভুক্ত করাই ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন হিটলারকে প্রভাবিত করে। তাই তিনি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তোষণনীতির সুযোগ গ্রহণ করে এই ধ্বনিকে জোরদার করেন এবং সমগ্র অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেটানল্যান্ড, পশ্চিম

ইউরোপের অ্যালসাস লোরেন ও লুক্সেমবার্গ দখল করে নেন। সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের একটা অংশ জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করাও এই আন্দোলনকারীদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

প্যারা-মিলিটারি Para-military. এটি একটি আধা বা অনিয়মিত সামরিক বাহিনী। যারা সার্বক্ষণিক, বেতনভুক্ত ও নিয়মিত সামরিক বাহিনীর সদস্য নয়—অথচ সামরিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও প্রয়োজনে দেশরক্ষার কাজে অংশ নিতে সমর্থ ও প্রস্তুত, তাদের সমন্বিত রূপই হল প্যারা-মিলিটারি বা আধা সামরিক বাহিনী।

প্যারি কমিউন প্যারি কমিউন ছিল বিশ্ব ইতিহাসের সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি। ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ প্যারির শ্রমিকশ্রেণী এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে নির্বাচনের মাধ্যমে প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্যারির সর্বহারাদের সাংগঠনিক শক্তি তখনও পরিপক্বতা লাভ করেনি। কৃষক-জনতার সঙ্গেও সর্বহারাদের আবশ্যকীয় মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিবিপ্লবীদের প্রতি কমিউন নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত নরম। ফলে, যথাসময়ে প্রতিবিপ্লবীদের ওপর সামরিক আক্রমণ চালাতেও কমিউন ব্যর্থ হয়। পরিণামে প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহ পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে পড়ে, রাষ্ট্রক্ষমতা পুনরায় দখল করে ফেলে এবং নৃশংস বর্বরতার সঙ্গে বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীদের ধ্বংস করে দেয়। মাত্র ৭২ দিন ক্ষমতায় থাকার পর ২৮ মে প্যারি কমিউনের পতন ঘটে।

প্যারি শান্তিচুক্তি ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্যারিতে (প্যারিসে) এই চুক্তিস্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রায় এক যুগ স্থায়ী রক্তক্ষয়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান ঘটে। একপক্ষে ত ৎকালীন উত্তর ভিয়েতনাম এবং অপরপক্ষে তৎকালীন দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

প্রকৃতিবাদ বিশ্বজগতের সৃষ্টি, ক্রমবিবর্তন বা এর আওতায় সংঘটিত ঘটনাবলীর পেছনে ঈশ্বর বা অনুরূপ কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির কোনো ভূমিকা নেই—এটাই হল প্রকৃতিবাদের মূল কথা। প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী বিশ্বজগতের সৃষ্টি, বিকাশ ও যাবতীয় ঘটনাবলী স্ব স্ব অন্তর্নিহিত নিয়মেই ঘটে থাকে।

প্রগতিশীল Progressive. যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বাভাবিক বিকাশ এবং তজ্জনিত কারণে সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের স্বাভাবিক বিবর্তনকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারে, তাদেরকেই বলা হয় প্রগতিশীল। তবে, সমাজতন্ত্রীদের মতে শুধু সমাজতন্ত্রীরাই প্রগতিশীল এবং যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে না বা ভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তারা প্রতিক্রিয়াশীল বা সংশোধনবাদী।

প্রজাতন্ত্র : বা সাধারণতন্ত্র বা Republic. এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত আইন পরিষদই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং সরকার পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকে। প্রজাতন্ত্রের প্রধান হন রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট, যিনি নিজেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণ কর্তৃক কিংবা পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত হন। অবশ্য. রাষ্ট্রভেদে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার তারতম্য আছে। কোনো প্রেসিডেন্ট একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার-প্রধান থাকেন, আবার কোনো ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীই হন সরকার-প্রধান, প্রেসিডেন্ট শুধুমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন।

প্রতিক্রিয়াশীল Reactionary যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ও তজ্জনিত কারণে সমাজবিবর্তনের ধারাকে মেনে নিতে পারে না, বরং পুরানো ব্যবস্থা মূল্যবোধ চিন্তাচেতনা ইত্যাদিকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, তাদেরকেই বলা হয় প্রতিক্রিয়াশীল (Reactionary)। সমাজতন্ত্রীদের বিবেচনায়, সমাজতন্ত্রবিরোধীমাত্রই প্রতিক্রিয়াশীল।

প্রতিবিপ্লবী Counter-Revolutionary যারা বিপ্লববিরোধী, অর্থাৎ যারা প্রচলিত রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায় এবং এ-কারণে বিপ্লবীদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাদেরকেই বলা হয় প্রতিবিপ্লবী।

প্রতিবেশীকে ভিক্ষুকে পরিণত করো নীতি ইংরেজিতে Beggar the Neighbour Policy ১৯৩০-এর ভয়াবহ মন্দার সময় বিভিন্ন দেশ এই নীতি গ্রহণ করে। এর সারকথা হল প্রতিবেশীর বা অন্য দেশের কী ক্ষতি হল তার তোয়াক্কা না করে নিজের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা। কঠোর মুদ্রানিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার প্রতিযোগিতামূলক অবমূল্যায়ন, আমদানির ওপর বিধিনিষেধ, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমেই এই নীতি কার্যকর করা হয়।

প্রতিযোগিতামূলক সহঅবস্থান Competitive Coexistence. ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আদর্শ ও ব্যবস্থার অনুসারী দেশ পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হওয়ার বদলে, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে,—এই নীতি।

প্রথম বিশ্ব First World. পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডই প্রথম বিশ্ব নামে পরিচিত। প্রথম বিশ্বের বৈশিষ্ট্য হল, এই সমস্ত দেশ অত্যন্ত শিল্পোন্নত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহকেই বলা হত দ্বিতীয় বিশ্ব (অবশ্য চীন নিজেকে তৃতীয় বিশ্বের সদস্য বলে দাবি করত)। আর তৃতীয় বিশ্ব বলা হত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত ও শিল্পোন্নত দেশসমূহকে, বলা বাহুল্য বিশ্বের এরূপ বিভক্তি (Categorisation) অনেকটা কৃত্রিম ও অস্থিতিশীল। উল্লেখ্য যে, ইউরোপীয় কমিউনিস্ট ব্লকের কোনো কোনো দেশ এবং সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশও শিল্পোন্নত এবং শর্তানুযায়ী প্রথম বিশ্বের সদস্য হওয়ার যোগ্য। চীনও শিল্পোন্নয়নের দিক থেকে প্রথম বিশ্বের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার পথে। কমিউনিস্ট বিশ্বে ধস নামার পর বিশ্বের এরূপ বিভাজন এখন আর তেমন তাৎপর্য বহন করে না।

প্রবৃত্তি, সহজাত Instinct. যে-সমস্ত বোধ, ভাব বা অনুভূতি জন্মগত, পরিবেশনিরপেক্ষ এবং বংশ-বংশানুক্রমে প্রবহমান, সে-সমস্ত বোধ, ভাব বা অনুভূতিকেই বলা হয় সহজাত প্রবৃত্তি। যেমন, মৌমাছি কর্তৃক মৌচাক কিংবা উইপোকা কর্তৃক ঢিবি তৈরি তাদের বুদ্ধিবৃত্তিপ্রসূত বা প্রযুক্তিগত অনুশীলনের ফল নয়, বরং সহজাত প্রবৃত্তিরই ফল। অনুরূপভাবে, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, সন্তানবাৎসল্য, সুখে আনন্দ, আঘাতে বেদনা ইত্যাদি মানুষসহ প্রায় সমগ্র প্রাণিকুলেরই সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে অন্য কোনো পশুর সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয় বটে—কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিসমূহ থেকেও মুক্ত নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরও প্রমাণ করেছে যে, নেতৃত্বের মোহ ইত্যাদিও প্রাণীর, বিশেষত উন্নততর প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি। কট্টর বস্তুবাদীরা মনে করতেন যে, নেতৃত্বের মোহ, বিদ্বেষ, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে একচ্ছত্র অধিকারে রাখার

ঝোঁক ইত্যাদি আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিজনিত মানসিকতারই ফল। কিন্তু একটি ভেড়ার পাল বা জংলি হস্তীযূথের মধ্যে না আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, না আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিজনিত কমপ্লেক্স। অথচ তাদের মধ্যেও নেতা আছে, অন্যদের ওপর প্রভাববিস্তারের প্রয়াস আছে, প্রতিহিংসা আছে, বিদ্বেষ আছে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'মন মানসের সবটাই বস্তুগত পরিস্থিতির ফসল', এ ধারণা আসলে নিতান্তই যান্ত্রিক। জিনেটিকসের বিকাশ বা জিনপ্রযুক্তি-সম্পর্কিত জ্ঞান এ-ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করেছে। তাই, যথার্থ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্পন্ন মানুষ মনে করেন যে, জ্ঞান, মেধা, আচরণ, আবেগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে জন্মগত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ভিত্তি, পরিবেশ হচ্ছে সেগুলোর প্রকাশ ও বিকাশের শর্ত। বস্তুত, জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশগত পরিস্থিতি—এ-দুয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষের মনমনন, ঝোঁক, রুচি ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এজন্যই হুবহু একই পরিবেশে, এমনকি একই পরিবারেও এক-একজনের এক-এক রকম মেধা, রুচি ও মানসিকতা দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদীরা আরও মনে করেন যে, মানুষ যেহেতু প্রাণিজগতেরই সদস্য, সেহেতু মানুষ কোনোদিনই রিপু ও আবেগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারবে না, সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারবে না হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, লালসা, মোহ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য, মননশীলতার ভিন্নতা ইত্যাদির কবল থেকে; ফলে কখনোই সম্ভব হবে না রাষ্ট্রহীন একক বিশ্বসমাজব্যবস্থা।

প্রভাববলয় Sphere of Influence. কোনো একটি বিশেষ রাষ্ট্র বা শক্তির সরাসরি শাসনাধীন নয়, অথচ প্রভাবাধীন—এমন এলাকা বা রাষ্ট্রসমূহকে প্রথমোক্ত রাষ্ট্র বা শক্তির প্রভাববলয়াধীন বলে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান বিশ্বে অংশত বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের স্বার্থে এবং অংশত স্ব স্ব রাজনৈতিক বা আদর্শিক ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার স্বার্থে প্রভাববলয় বজায় রাখা ও সম্প্রসারণের ব্যাপারটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্লক, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইছে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তার প্রভাবাধীন করে রাখতে। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নও চেয়েছিল তার প্রভাববলয় সম্প্রসারণ করতে—যদিও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পরে এখন তা অনেকটা স্তিমিত। আবার মূল প্রভাববলয়ের মধ্যেও যেমন, সাম্রাজ্যবাদী বলয়ের মধ্যেও পারস্পরিক স্বার্থগত দ্বন্দ্বের কারণে উপবলয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রভাববলয় রক্ষা ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ঋণ, সাহায্য, অনুদান, অস্ত্র সরবরাহ, বাণিজ্যিক লেনদেন, চুক্তি, জোটগঠন, সাংস্কৃতিক বিনিময় ইত্যাদিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রভাববলয়ের দ্বন্দ্বের ফলে ত্বরান্বিত হয় সমরাস্ত্র প্রতিযোগিতা, সৃষ্টি হয় স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা।

প্রযুক্তি Technology. মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত কৌশল, যা দিয়ে মানুষ প্রকৃতি বা প্রকৃতিপ্রদত্ত বিষয়কে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগাতে পারে। প্রযুক্তির ধারা কখনোই স্থবির থাকে না—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির প্রগতিশীল বিকাশ ঘটতে থাকে। বস্তুত, প্রযুক্তিগত বিকাশের ফলেই উৎপাদনব্যবস্থা, উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্কের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটে, পরিবর্তন ঘটে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার। সভ্যতার উষালগ্নের পাথরনির্মিত হাতিয়ার থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের কম্পিউটার বা মহাকাশযান পর্যন্ত সকল উদ্ভাবিত কৌশল, এমনকি ভবিষ্যতে

আবিষ্কৃতব্য অনুরূপ সকল কৌশলই বস্তুত প্রযুক্তি বা কৃৎকৌশলের অন্তর্গত। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটে অনেকটা জ্যামিতিক হার বা Geometric Progression-এ।

প্রযুক্তিগত বেকারত্ব Technological Unemployment. প্রায়শই, কোনো উন্নত ধরনের যন্ত্র প্রবর্তিত হলে সাময়িক বেকারত্ব দেখা দেয়। ফলে, শ্রমিকরা নতুন যন্ত্রের ওপর বিরূপ হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এর প্রবর্তনের বিরোধিতা করে। অবশ্য পরিণামে উন্নততর যন্ত্র প্রবর্তনের ফল শুভ হয়, কেননা এর ফলে উৎপাদন, তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং সমগ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটে। যেসব দেশে প্রায় পূর্ণ কর্মসংস্থান বিদ্যমান, সেসব দেশে উন্নততর যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি প্রবর্তনের ফলে সাময়িক বেকারসমস্যা দেখা দিলেও, শেষ পর্যন্ত নতুন প্রযুক্তি কল্যাণকর ও কর্মসংস্থানের সহায়ক বলেই প্রমাণিত হয়। সমস্যাটা প্রকটতর মনে হয় অনুন্নত দেশসমূহে, যেখানে জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশই বেকার বা অর্ধবেকার। যদিও চূড়ান্ত বিচারে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ব্যতিরেকে, তথা সমকালীন প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করা না গেলে দেশের শিল্পায়ন, উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও বেকারসমস্যার সমাধান কোনোটিই সম্ভবপর নয়।

প্রযুক্তিবাদ Technocracy এই মতবাদের প্রবক্তারা মনে করেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প, কৃষি, ব্যাবসা-বাণিজ্য তো বটেই, এমনকি প্রশাসন, সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এর প্রভাব ও গুরুত্ব ধীরে ধীরে একচ্ছত্র হয়ে উঠছে। প্রযুক্তিবাদীরা মনে করেন যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্বপরিস্থিতে একমাত্র প্রযুক্তিবিদরাই সমাজ ও রাষ্ট্রের যথার্থ নেতৃত্ব দিতে পারেন এবং শুধু তাঁদের নেতৃত্বেই সমন্বিত উন্নয়নের ধারা সুনিশ্চিত করা সম্ভবপর। এই মতবাদীদের প্রচেষ্টা হল, রাজনীতি ও প্রশাসনসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের কল সেক্টর ও বিভাগের ওপর প্রযুক্তিবিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা।

প্রয়োগবাদ : বা অভিজ্ঞতাবাদ বা হাতুড়েবাদ; ইংরেজিতে Empiricism। এই দার্শনিক মতানুসারে কেবল প্রয়োগ বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানই একমাত্র যথার্থ জ্ঞান। জ্ঞানের অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। এই মতবাদীরা, তাঁদের স্ব স্ব অভিজ্ঞতার বাইরে আর কোনোকিছুকে জানার তোয়াক্কা করেন না; গ্রহণ করেন না অন্যদের অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফসল। প্রয়োগবাদ তাই একপেশে, সীমাবদ্ধ, হাতুড়ে ও অবৈজ্ঞানিক বলে বিবেচিত।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় নিরাপত্তা চুক্তি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ১৯৫১ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখে সম্পাদিত এই চুক্তি আনজাস (ANZUS) নামেই সমধিক পরিচিত। ANZUS অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ইউনাইটেড স্টেটস-এরই সংক্ষেপিত রূপ।

প্রাইজ কোর্ট Prize Court. যুদ্ধকালে কোনো দেশ কর্তৃক স্থাপিত আদালত, যে-আদালত যুদ্ধে দখলীকৃত শত্রুপক্ষীয় জাহাজের ব্যাপারে রায়প্রদান করে।

প্রাকৃতিক অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই কিছু জন্মগত বা প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা থাকে, যেমন—বেঁচে থাকা, সুস্থ থাকা, আশ্রয় থাকা, দাম্পত্য জীবন যাপন

করা, স্বীয় প্রতিভার বিকাশসাধন করা, নির্দ্বিধায় স্বীয় মতামত ব্যক্ত করা, নিজেদের নেতৃত্ব নিজেরা নির্ধারণ করা, রুচিমতো সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি। এ-সমস্ত বিষয়ের অধিকার স্বাভাবিক ও হস্তান্তরযোগ্য নয় বিধায় এগুলোকে বলা হয় প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights)।

প্রাকৃতিক আইন Natural Law. যে-নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতি পরিচালিত হয় এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ঘটে থাকে, তাকেই বলে প্রাকৃতিক আইন। যেমন, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, গতির নিয়ম, বিপরীত সত্তার দ্বন্দ্বের নিয়ম ইত্যাদি। এই আইনের প্রবক্তারা সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক আইন বলবৎযোগ্য বলে বিবেচনা করেন।

প্রাকৃতিক ধর্ম মানুষের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সৃষ্ট এবং সৃষ্টিকর্তাসহ সকলপ্রকার অতিপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন ধর্ম।

প্রাচুর্যের সমাজ Affluent Society যে-সমস্ত সমাজে জনগণের ভোগ ও আরাম-আয়েশের উপকরণ মৌলিক চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি, সেই সমস্ত সমাজকেই বলা হয় প্রাচুর্যের সমাজ। এরূপ বর্ধিত ও আরও বর্ধিষ্ণু প্রাচুর্য এবং ক্রমবর্ধমান যন্ত্রায়ণ বা অটোমেশন ইত্যাদির ফলে প্রায়শই সনাতনী পরিবার, জীবনধারা, সামাজিক কাঠামোর ভিত ভেঙে যায়, দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের হতাশা, আসক্তি ও বিকৃতি। সাধারণত উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহের সমাজকেই বলা হয় প্রাচুর্যের সমাজ। তৈলসম্পদেসমৃদ্ধ দেশসমূহসহ বিশ্বের কিছু দেশ মৌলিক প্রযুক্তির দিক থেকে তুলনামূলকভাবে উন্নত না হলেও, এসব দেশের সমাজেও রয়েছে অতিপ্রাচুর্য এবং তজ্জনিত উপসর্গসমূহ।

প্রাকৃতিক সুবিচার Natural Jastice. এই কথাটির দ্বারা বোঝানো হয় যে, লিখিত আইনে স্পষ্টভাবে থাকুক বা না-থাকুক, প্রত্যেক ব্যক্তিই আইনের দৃষ্টিতে কতিপয় অধিকারের অধিকারী। ব্রিটিশ আইনব্যবস্থায় এ-প্রসঙ্গে দুটি কথা আছে অডি অলটেরাম পার্টেম (audi alteram partem), অর্থাৎ যে-কোনো মামলায় প্রত্যেক পক্ষেরই বক্তব্যপেশের অধিকার আছে এবং আদালত তা শুনতে বাধ্য ও নেমো জুডেক্স ইন পার্টে সুয়া (nemo jndex in parte sua), অর্থাৎ কোনো মামলায় সংশ্লিষ্ট বিচারকের কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকতে পারবে না।

প্রাভদা : রুশ শ্রমিকদের সংগৃহীত অর্থে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত বলশেভিকদের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। ১৯১২ সালের ২২ এপ্রিল (৫ মে) তারিখে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ছাপা হত ৪০ হাজার থেকে ৬০ হাজার কপি। লেনিনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত প্রাভদা সোয়া তিন বছরে জার সরকার কর্তৃক আট বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে পত্রিকাটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৪ সালের ৮ (২১) জুলাই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর (১৮ মার্চ) পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। ওই বছরের ৫ (১৮) জুলাই ক্যাডেট ও কোজাকরা এর সদর দফতর তছনছ করে দেয়। অক্টোবর বিপ্লবের পর প্রাভদা পুনরায় প্রকাশিত হয়। বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র প্রাভদাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল শ্রমিক-সাংবাদিকদের এক শক্তিশালী বাহিনী এবং এটা কাজ করেছিল পার্টির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর, তথা জনগণের প্রধান সংযোগমাধ্যম হিসাবে।

প্রিভি কাউন্সিল Privy Council. প্রথম দিকে এটি ছিল ব্রিটিশ রাজা বা রানির উপদেষ্টা কাউন্সিল। এখন আর এটিকে উপদেশের জন্য ডাকা হয় না। বর্তমানে রাজা বা রানি তিনজন প্রিভি কাউন্সিলারের সামনে কোনো বিল বা ঘোষণায় অনুমোদন দান করেন এবং ধরে নেওয়া হয় যে রাজা বা রানি প্রিভি কাউন্সিলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত করেছেন। বস্তুত রাণির অনুমোদনের জন্য প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনা ও সুপারিশ করে। বলা বাহুল্য, মন্ত্রিসভাও প্রিভি কাউন্সিলের একটি অনানুষ্ঠানিক কমিটি এবং সকল কেবিনেটমন্ত্রী (এবং কতিপয় অন্যান্য মন্ত্রী) পদাধিকার বলে প্রিভি কাউন্সিলার। কোনো কোনো সময় রাষ্ট্রের জন্য অসাধারণ কাজের পুরস্কার হিসাবেও 'প্রিভি কাউন্সিলার'—এই অবৈতনিক উপাধি প্রদান করা হয়। প্রিভি কাউন্সিলারদের সম্বোধন করা হয় 'রাইট অনারেবল' বলে। প্রিভি কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটি আছে। কিন্তু এগুলো বসে কালেভদ্রে। তবে এর মধ্যে যে-কমিটিটি প্রায়শই বসে, সেটি হল বিচারসংক্রান্ত কমিটি। এই কমিটি সাধারণত বিচার বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (যেমন ল লর্ডস, সাবেক জজ প্রভৃতি) যাঁরা প্রিভি কাউন্সিলরও বটে—তাঁদের নিয়েই গঠিত। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত অ্যাপিলের শুনানি প্রদান ছাড়াও রাজা বা রাণি কর্তৃক প্রেরিত চার্চসংক্রান্ত আপিলের শুনানিপ্রদানও প্রিভি কাউন্সিলের এই কমিটির দায়িত্বভুক্ত।

প্রুধোঁ, পিয়ের যোসেফ : (১৮০৯-১৮৬৫) ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত শ্রমিকনেতা। তিনি ১৮৪০ সালে 'সম্পত্তি কী?'—এই নামে রচিত একটি পুস্তকের মাধ্যমে প্রমাণ করার প্রয়াস পান যে, সম্পত্তির মালিকদের সম্পত্তি আহরণের মূলে রয়েছে চুরি। পরবর্তীকালে তিনি কেবলমাত্র বৃহৎ সম্পত্তির মালিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সীমাবদ্ধ করেন এবং আপন শ্রমের দ্বারা লব্ধ ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিকদের পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি মুদ্রা ও সুদপ্রথার অবসান, ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিকদের সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সেই সমাজে বার্টার বা পণ্যবিনিময়ব্যবস্থা প্রচলনের প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান। তাঁর মতে এইরূপ সমাজপ্রতিষ্ঠার জন্য কোনো বিপ্লবের প্রয়োজন নেই—সমবায় ও বিনিময় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এ-সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাঁর প্রস্তাবিত সমাজে সরকারের বা প্রচলিত আইনের কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সমর্থক হয়ে দাঁড়ান।

প্রেশার গ্রুপ Pressure Group বা চাপসৃষ্টিকারী গ্রুপ। প্রেশার গ্রুপ ঠিক রাজনৈতিক দল নয়, বরং কিছু লোকের সংঘ বা সমিতি,—যে-সংঘ বা সমিতি কোনো-একটি বিশেষ লক্ষ্য হাসিলের জন্য সরকার বা সংশ্লিষ্ট দল বা মহলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। প্রেশার গ্রুপ তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য যে-সমস্ত পন্থা অবলম্বন করতে পারে, তা হল সংবাদপত্রে লেখালেখি, জনমতসৃষ্টি, গণদরখাস্ত প্রদান, সভা মিছিলাদি অনুষ্ঠান, ধর্মঘট প্রভৃতি। প্রেশার গ্রুপের কাজ হয় মূলত প্রচারধর্মী।

প্রেসিডিয়াম Presidium. এর বাংলা হল সভপতিমণ্ডলী। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে, বিশেষত বামপন্থি সংগঠনের সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হল প্রেসিডিয়াম। প্রেসিডিয়ামের সদস্যদের প্রত্যেকেই সভাপতির পদমর্যাদাসম্পন্ন। তবে, প্রেসিডিয়ামের কার্যাবলীর সুষ্ঠু পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য এর একজন চেয়ারম্যান থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রেসিডিয়ামের পরবর্তী স্তর হিসাবে সেক্রেটারিয়েট বা সম্পাদকমণ্ডলী থাকতে পারে।

সেক্ষেত্রে প্রেসিডিয়াম মূলনীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে কাজ করে এবং সেক্রেটারিয়েট তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়।

প্রোটেকটোরেট যে-দেশ বা ভূখণ্ড অন্য কোনো রাষ্ট্রের তদারকি বা নিয়ন্ত্রণাধীন, অথচ শাসনতান্ত্রিকভাবে ওই রাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলের মতো অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচিত নয়,—সেই দেশ বা ভূখণ্ডকেই বলা হয় প্রোটেকটোরেট (Protectorate)।

প্রোটোকল একাধিক রাষ্ট্র, সরকার বা পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার আগে কূটনৈতিক পর্যায়ে চুক্তির যে-চূড়ান্ত দলিল তৈরি করা হয়—সেটাকেই বলে প্রোটোকল (Protocol)। তা ছাড়া, কূটনৈতিক শিষ্টাচার বা আচরণবিধিকেও প্রোটোকল বলা হয়।

প্রোপাগান্ডা : Propaganda. এর অর্থ প্রচার। কোনো একটি বিষয়, বিশেষত রাজনৈতিক বিষয় বিভিন্ন উপায়ে জনগণকে অবহিত করা। বক্তৃতা, প্রচারপত্র-পোস্টারাদি বিতরণ, সংবাদপত্রে বিবৃতি, রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠানই হল প্রোপাগান্ডার মাধ্যম। প্রোপাগান্ডাকারীদের উদ্দেশ্য হল জনগণকে তাঁদের মতের সপক্ষে নিয়ে আসা এবং বিরোধী শক্তিকে দুর্বল করে তোলা। সরকারি ও বিরোধী—উভয় প্রকার রাজনৈতিক দলই স্ব স্ব স্বার্থে প্রোপাগান্ডার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

প্লুটোক্র্যাসি গ্রীক পুরান অনুযায়ী প্লুটো (Pluto) হল ধন-দেবতা। সুতরাং প্লুটোক্র্যাসি হল ধনীদের তন্ত্র বা ধনিকতন্ত্র। অর্থাৎ যে-ব্যবস্থায় শুধু ধনী ব্যক্তিরাই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিপত্য করতে সমর্থ হয়—সেই ব্যবস্থাকেই বলে প্লুটোক্র্যাসি (Plutocracy)। অনেকের মতে, বনেদি বা বুর্জোয়া গণতন্ত্রও কার্যত প্লুটোক্র্যাসি, কেননা এ-তন্ত্রেও জনগণের নামের ছদ্মাবরণে আসলে ধনীদের একাধিপত্যই কায়েম থাকে। (ধনিকতন্ত্র দ্রষ্টব্য)।

প্লেখানভ, জর্জি ভেলেন্টিনোভিচ্ (১৮৫৬-১৯১৮) ইনি ছিলেন রুশ বিপ্লবী এবং রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের জনক। প্রথমদিকে তিনি নারোদবাদী সংগঠন, 'ভূমি ও মুক্তি'-র নেতা ছিলেন। এই সংগঠনেরই পরবর্তীকালে নাম হয়েছিল 'কৃষ্ণ পুনর্বণ্টন'। ১৮৮০ সালে তিনি দেশত্যাগ করেন, মার্কস-এঙ্গেলসের দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং পশ্চিম ইউরোপের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ফলশ্রুতিতে, নারোদবাদ ত্যাগ করে তিনি মার্কসবাদের একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে পড়েন এবং ১৮৮৩ সালে সুইজারল্যান্ডে 'শ্রমের মুক্তি' নামে একটি গ্রুপ গড়ে তোলেন। এই গ্রুপ রাশিয়ায় মার্কসবাদের বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্লেখানভ নারোদবাদ, বৈধ সমাজতন্ত্র, সংশোধনবাদ, বুর্জোয়া দর্শন প্রভৃতির তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু ১৯০৩ সালে নতুন বাস্তব অবস্থার উদ্ভব হলে, তিনি বিপ্লবী মার্কসবাদ ত্যাগ করে সুবিধাবাদীদের সঙ্গে আপোসের নীতি গ্রহণ করেন এবং অবশেষে মেনশেভিক দলভুক্ত হয়ে পড়েন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি উগ্র দেশপ্রেমিক সমাজবাদীদের পক্ষ নেন। তিনি ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবকেও মেনে নিতে পারেননি। তবে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেলেও মার্কসবাদের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। তাই, লেনিন মেনশেভিকদের তীব্র সমালোচনা করেও বলেছিলেন, "দর্শনে প্লেখানভ সত্যকেই তুলে ধরেছিলেন"।

বস্তুত প্লেখানভ ইতিহাসের বস্তুবাদী উপলব্ধির বিকাশ সাধন করেন, সামাজিক জীব ও সমাজসচেতনতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন, সমাজের পরস্পরবিরোধী শ্রেণীসমূহের দ্বন্দ্বের গুরুত্ব তুলে ধরেন, মার্কসবাদী সৌন্দর্যতত্ত্ব ও শিল্প-সমালোচনা রীতির ভিত্তিস্থাপন করেন, রাশিয়ায় মার্কসবাদের অগ্রদূত হিসাবে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সপ্রমাণ করেন, ধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও সমাজজীবনে ধর্মের প্রভাবের ওপর তত্ত্ব প্রদান করেন এবং ধর্মের প্রতি মার্কসবাদী সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করেন। বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি (যার অন্যতম ছিল বিপ্লবের বিষয়গত বা সাংগঠনিক দিকগুলোকে খাটো করে দেখা) সত্ত্বেও রাশিয়ায় মার্কসবাদের বিকাশে তাঁর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। তিনি সারাজীবন দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সপক্ষে লড়াই করে গেছেন। তাঁর রচনাসমূহের অন্যতম হল 'দি ডেভেলপমেন্ট অব দি মনিস্ট ভিউ অব হিস্ট্রি' (১৯৮৫), 'দি রোল অব ইন্ডিভিজুয়ালস ইন হিস্ট্রি' (১৮৮৯) ইত্যাদি।

প্লেটোবাদ গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭)-এর মতবাদ। তাঁর রচনা নাটকীয় কথোপকথনের আকারে রচিত। এর ৩৫টি খণ্ড রয়েছে। তার মধ্যে—প্রোটাগোরাস, ফেডো, সিম্পোজিয়াম, রিপাবলিক ইত্যাদিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজনীতি ও সমাজনীতিসম্পর্কিত মতবাদ 'রিপাবলিক'-এ বিধৃত। প্লেটোই সর্বপ্রথম নীতিতত্ত্ব (Principles of Ethics) প্রণয়ন করেন। তাঁর দার্শনিক মত হল এই যে, বিশ্বপ্রকৃতি, মানুষ ও সকল বস্তু এক শাশ্বত (অবিনশ্বর) ভাব ও নিয়মেরই বহিঃপ্রকাশ। সমাজনীতি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সমাজব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যাতে সমাজের প্রত্যেক সদস্য পূর্ণমাত্রায় ন্যায়বিচার পায়, পূর্ণমাত্রায় তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধান সম্ভবপর হয় এবং প্রত্যেকের জীবন পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হতে পারে। রাজনীতি সম্পর্কে তিনি 'রিপাবলিক'-এ বলেন যে, যে-সরকার প্রজাদের নৈতিক আদর্শে শক্তিমান করার চেষ্টা করে না, যে-সরকার পবিত্র, সত্য ও মঙ্গলময় বিষয়ে প্রজাদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে মর্যাদাশীল জাতিগঠনের প্রয়াস পায় না, সে-সরকার সরকার নামেরই অযোগ্য। প্রেম সম্পর্কে তাঁর মত হল এই যে, নিষ্কাম, ইন্দ্রিয়-লালসামুক্ত আত্মার সঙ্গে অনুরূপ আত্মার মিলনের মধ্যেই সত্যিকার প্রেমের মর্ম নিহিত।

প্লেবিয়ান Plebian. এই গ্রিক শব্দের অর্থ ইতরজন। গ্রিক ও রোমান সভ্যতা ছিল দাসসমাজভিত্তিক। এই সমাজের ক্রীতদাস প্লেবিয়ানদের ভোটাধিকার তো দূরের কথা, কোনোপ্রকার নাগরিক বা মানবিক অধিকারই ছিল না; তাদেরকে সিটিজেন বা নাগরিক বলেই গণ্য করা হত না। বস্তুত, প্লেবিয়ানরা ছিল মালিকশ্রেণী বা প্যাট্রিশিয়ানদের অন্যান্য গৃহস্থালি দ্রব্য বা পশুপাখির মতোই দ্রব্য বা পণ্যসামগ্রী মাত্র। অবশ্য, আধুনিক কালে প্লেবিয়ান বলতে সাধারণ জনগণকেই বোঝায়। এই শব্দ থেকেই প্লেবিসাইট বা গণভোট কথাটির উৎপত্তি।

॥ ফ ॥

ফটকাবাজি ভবিষ্যতে অধিক মুনাফা হবে—এরূপ আন্দাজ করে কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে বা কোনো পণ্য ক্রয় করে তা মজুত করার ব্যাপারে অর্থলগ্নি করার কাজকে বলা

হয় ফটকাবাজি (Speculation)। ফটকাবাজির ফলে প্রায়শই বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্কট সৃষ্টি হয় ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।

ফতওয়া : ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞ বা মুফতি কর্তৃক প্রদত্ত বিধান। কোনো বিশেষ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে যখন শরিয়ত সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীতে হুবহু কোনো সমাধান পাওয়া যায় না, তখনই ফতওয়ার প্রয়োজন পড়ে। ইসলামি জীবনসংক্রান্ত বিধি-বিধানের উৎস চারটি, যথা—কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াস। প্রসিদ্ধ ইমামগণের ফতওয়ার সঙ্কলনই হচ্ছে ফিক্‌হ্। বলাবাহুল্য, ফতওয়া প্রদান করা হয় উপরোক্ত চারটি উৎসেরই পরিপ্রেক্ষিতে। ফতওয়ার বিভিন্নতার দরুন মুসলিম দুনিয়ায় বহু বিভেদ ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। শীআ, সুন্নাহ্, খারিযি, মুতাজিলা, ওহাবি প্রমুখ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে 'কাফির' 'বাতেল' 'মুরতাদ' প্রভৃতি ফতওয়া দিয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌কে বিভক্ত করে রেখেছে। যদিও ইসলামের মৌলিক বিষয়ে সকলেই মোটামুটি একমত।

ফয়েরবাখ, লুডউইগ (১৮০৪-৭২) Ludwig Fehuerbach. জার্মান বস্তুবাদী দার্শনিক। তিনি জীবনের শেষদিকে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে যোগদান করলেও মার্কসবাদ গ্রহণ করেননি। তাঁর বস্তুবাদী মতবাদ সমকালীন তরুণদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তিনি বিপ্লবী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি হেগেলীয় বস্তুবাদের ভাববাদী চরিত্রের কঠোর সমালোচনা করেন; কিন্তু তিনি প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতার মার্কসবাদী ব্যাখ্যাও পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে তিনি অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থক এবং অজ্ঞেয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে ধর্ম মানুষের 'অচেতন আত্মচেতনা'। তাঁর নৈতিকতার তত্ত্ব ছিল শাশ্বত এবং সর্বজনীন। ফয়েরবাখ আধুনিক বস্তুবাদের অন্যতম স্থপতি হলেও চূড়ান্ত বিচারে ভাববাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও ফয়েরবাখ ছিলেন মার্কসবাদের পূর্বসূরি। এ ব্যাপারে ফয়েরবাখ-সম্পর্কিত থিসিসে কার্ল মার্কস বলেন যে, "ফয়েরবাখের বস্তুবাদ ছিল পা ওপরের দিকে আর মাথা নিচের দিকে; আমরা এই বস্তুবাদকে পায়ের ওপর দাঁড় করাচ্ছি মাত্র।"

ফরায়েজি বিদ্রোহ : ওহাবি আদর্শে দীক্ষাপ্রাপ্ত হাজী শরিয়তউল্লাহ ১৮২০ সালে ফরায়েজি মতবাদ প্রচার শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ মহসীন (দুদু মিয়া) এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ফরায়েজিরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খলিফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন, জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ১৮৩১ সালে বেআইনি কর দিতে অস্বীকার করেন। হিন্দু প্রজারাও এই আন্দোলনে যোগ দেয়। ফরায়েজিরা ঘোষণা করেন, "জমি আল্লাহর দান। ব্যক্তিমালিকানায় বা বংশপরম্পরায় জমি ভোগ করার অধিকার কারওরই নেই।" ১৮৩৮ সালে বিদ্রোহ প্রবল হয়ে উঠলে দুদু মিয়া গ্রেফতার হন, কিন্তু অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর ফরায়েজিরা মহাজনদের ঋণ পরিশোধ বন্ধ করে দেন এবং নিজস্ব আদালত স্থাপন করেন। ১৮৫৭ সালে দুদু মিয়া পুনরায় গ্রেফতার হন এবং মুক্তি পান। ১৮৬০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ফরায়েজি বিদ্রোহের মৌল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে গোঁড়ামিমুক্ত ও সর্বজনীন করা, ইংরেজদের বিতাড়ন করা এবং প্রজাদের শোষণমুক্ত করা। বস্তুত ফরায়েজি বিদ্রোহ ছিল ওহাবি আন্দোলনেরই অংশবিশেষ।

ফায়ারিং স্কোয়াড Firing Squad. যুদ্ধাপরাধী, রাষ্ট্রদ্রোহী বা সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী অপরাধীকে অনেক সময় গুলি করে হত্যা করা হয়। সশস্ত্রবাহিনী বা পুলিশের যে-দলটি অপরাধীদের এভাবে গুলি কর হত্যা করে, সে-দলটিকেই বলা হয় ফায়ারিং স্কোয়াড। ফায়ারিং স্কোয়াড কোনো স্থায়ী কাঠামো নয়; গুলি করে হত্যার আদেশ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই ওই বিশেষ দায়িত্বটি সম্পাদন করার জন্য এরূপ স্কোয়াড গঠন করা হয়।

ফার্ক Revolationary Armed Forces of Columbia, সংক্ষেপে FARC. এটি দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় মার্কসবাদী গেরিলাদল। এর সদস্যসংখ্যা প্রায় ১৭০০০। ফার্ক দীর্ঘদিন কলম্বিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে একটা বিরাট অংশ দখল করে রাখে। বস্তুত ফার্ক ও পিপল্‌স্ লিবারেশন আর্মি (APL) প্রমুখ কলম্বিয়ার মোট ৭,৫৬,৬২২ বর্গ কিলোমিটার এলাকার প্রায় ৪২০০ বর্গ কিলোমিটার দখল করে রেখেছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেসা পাস্ত্রানাকে টমাহক হেলিকন্টারসহ বিপুল সামরিক সহায়তা দেওয়ায় ফার্ক গেরিলারা কিছুটা বিপাকে পড়ে।

ফালুন গং : Falun Gong চীনের একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলনের নাম। ১৯৯২ সালে এর উত্থান। এই আন্দোলনের সদস্যেরা 'ফালুন দাফা' নামক এক আধ্যাত্মিক রীতির অনুসারী। এই আন্দোলনের নেতা লি হংঝি। পুলিশের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ ফালুন দাফার সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি। কিন্তু ফালুন গং-এর মতে চীনেই এর সদস্যসংখ্যা ৬ কোটির বেশি এবং সারা বিশ্বে এর ১০ কোটি সদস্য রয়েছে। বাস্তবিকই এর সদস্যসংখ্যা বাড়ছে বিস্ময়কর হারে। এরা মনে করে যে বুদ্ধ ও তাও-এর শিক্ষা মেনে চলার পাশাপাশি 'কি গং' পদ্ধতিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের চর্চা ও ধ্যান করলে প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তৃতীয় নয়নের উন্মেষ ঘটে। ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে ফালুন গং-এর ১০ হাজার সদস্য রাজধানী বেজিং-এ সরকারবিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকেই ২০০ জনকে গ্রেফতার করে এবং ২২ জুলাই এই আন্দোলনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফালুন গং নিজেদের অরাজনৈতিক বলে দাবি করলেও এদের আন্দোলনের ব্যাপকতায় চীন সরকার খুবই উদ্বিগ্ন। নিষিদ্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও এই আন্দোলনের বিস্তার এবং এর সদস্যদের ওপর সরকারি নিপীড়ন—দুইই অব্যাহত আছে।

ফিক্‌হ্ : এই আরবি শব্দের অর্থ বুদ্ধি, জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। ইসলামের আইনসমষ্টিই ফিক্‌হ্ নামের পরিচিত। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও পৌরজীবনের সকল দিকই এর আওতাভুক্ত। আনুষ্ঠানিক ও ধর্মীয় কাজ; পারিবারিক উত্তরাধিকার ও সম্পত্তিবিষয়ক আইন, অপরাধসংক্রান্ত আইন; শাসনতান্ত্রিক, প্রশাসনিক ও যুদ্ধসংক্রান্ত আইন ইত্যাদিও ফিক্‌হ্‌র আওতাভুক্ত। এই আইন যাঁরা প্রণয়ন করেন, তাঁদের বলা হয় ফকিহ্ বা ধর্মীয় আইনজ্ঞ। ফকিহ্‌রা কুরআন, সুন্নাহ্, কিয়াস ও ইজমার ভিত্তিতেই বিভিন্ন রায় দেন। বলাবাহুল্য, ইসলামি আইন বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য প্রভাবের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে। যেমন, সিরিয়া ও ইরাক এলাকায় রোমীয় আইনের প্রভাবের দরুন সেখানকার ভূমি ও রাজস্বব্যবস্থায় ইসলামের বিজয়ের পরও রোমীয় প্রভাব অব্যাহত ছিল। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম আইনবিদরা কুরআন-সুন্নাহ্‌র পরিপন্থি না হলে এরূপ আইনসমূহকেও ইসলামি আইনের পাশাপাশি সন্নিবেশিত করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

ফিজিওক্র্যাসি Physiocracy. অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে উদ্ভূত একটি রাজনৈতিক মতবাদ। এই মতবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, ব্যাবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক ব্যাপার নাগরিকদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হওয়া উচিত এবং এ-ব্যাপারে কোনোপ্রকার রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ থাকা বিধেয় নয়। এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও অবাধ প্রতিযোগিতাই যে-কোনো সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতির চালিকাশক্তি।

ফিনিক্স পার্কের হত্যাকাণ্ড Phoenix Park Massacre. ১৮৮২ সালের ৬ মে অপারেজয় (Invincible) বলে কথিত আইরিশ চরমপন্থিরা টমাস বার্ক (আয়ারল্যান্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্রিটিশ স্থায়ী আন্ডার-সেক্রেটারি)-কে আক্রমণ করে এবং ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। ১১ মাস পর ৯ জন 'অপরাজেয়' ধরা পড়ে এবং এদের ৫ জনের ফাঁসি হয়। এই ঘটনার ফলে আইরিশদের সম্পর্কে ব্রিটিশদের মনোভাব আরও কঠোর হয়ে ওঠে।

ফিলিবাস্টারিং Filibustering. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে উত্থাপিত কোনো বিলকে ঠেকিয়ে রাখার একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বিলের বিরুদ্ধবাদীরা একের পর এক বক্তৃতা চালিয়ে যেতে থাকেন, যাতে সরকারি দল বিলটি পাশ করানোর সুযোগই না পায়। উপস্থিত সিনেটরদের এক-তৃতীয়াংশ বা ততোধিক সিনেটর সংশ্লিষ্ট বিলটি তাৎক্ষণিকভাবে ভোটে দেওয়ার বিরোধিতা করলে ফিলিবাস্টারিং-এর অবসান ঘটানো সুকঠিন হয়ে পড়ে। অবৈধ বা অন্যায় যুদ্ধবাজিকেও ফিলিবাস্টারিং বলে।

ফিলিস্তিন Philistine প্রাচীন কালের একটি ইহুদি জাতি, যারা বর্তমান প্যালেস্টাইন অঞ্চলে বসবাস করত। এরা পরবর্তীতে অত্যন্ত দুর্নীতিবাজ হয়ে পড়ে এবং সকল সমাজপ্রগতির বিরোধিতা করে। জার্মান কবি হেইনে (Heine) প্রগতিবিরোধীদের এই নামে অভিহিত করতেন। লেনিন নীতিভ্রষ্ট লোকদের এই নামে চিহ্নিত করতেন। যেসব লোক সমাজতন্ত্রের বুলি কপচায়, অথচ শ্রেণীসংগ্রামকে ভয় করে ও এড়িয়ে চলে, তাদেরকই মার্কসবাদীরা এ-নামে অভিহিত করে।

ফেডারেশন Federation বা ফেডারেল রাষ্ট্র হল কতিপয় স্বকীয়তাসম্পন্ন রাষ্ট্রের বা রাজ্যের ইউনিয়ন। ফেডারেল সরকারের রাষ্ট্রপরিচালনাসংক্রান্ত যাবতীয় কাঠামো বিদ্যমান থাকে এবং ফেডারেল সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ অঙ্গরাজ্যসমূহ এবং তাদের নাগরিকদের ওপর প্রযোজ্য হয়। সার্বভৌম ক্ষমতা অংশত ফেডারেল সরকারের ওপর এবং অংশত অঙ্গরাজ্যসমূহের ওপর ন্যস্ত থাকে। যুদ্ধ-ঘোষণা, শান্তিস্থাপন, বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। অপরদিকে, অঙ্গরাজ্য বা সদস্যরাষ্ট্রসমূহ স্ব স্ব পরিধিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ কর্তৃত্ব, স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা ভোগ করে। ১৮৮৭ সাল-পরবর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৮৪৮ সাল পরবর্তী সুইজারল্যান্ড, বর্তমান রাশিয়া ফেডারেশন ইত্যাদিই এর উদাহরণ।

ফেবিয়ান সোসাইটি Fabian Society. রোমান জেনারেল কুইনটাস ফেবিয়াস ম্যাক্সিমাস-এর নামানুসারে ১৮৮৪ সালে লন্ডনে ফেবিয়ান সোসাইটির জন্ম হয়। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, লেখক ও রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে এই সোসাইটি গড়ে ওঠে। ওয়েবল, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, জর্জ বার্নার্ড শ প্রমুখ ছিলেন এর সদস্য। রোমান

সেনাপতি ফেবিয়াস ম্যাক্সিমাস হ্যানিবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কালক্ষেপ করা এবং চূড়ান্ত লড়াই এড়ানোর যে-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, ফেবিয়ানরা সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য সেই কৌশলকেই যথার্থ বলে বিবেচনা করতেন। তাঁরা শ্রেণীসংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর অপরিহার্যতা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার এবং সামাজিক ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়াতেই পুঁজিবাদী সমাজের সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তর সম্ভবপর। ১৯০০ সালে এই সোসাইটি বিলাতের লেবার পার্টির একটি অংশে পরিণত হয়ে যায়।

ফেয়ার ডিল Fair Deal. প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিউ ডিল বা নয়া ব্যবস্থার মতোই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৯৪৯ সালে ফেয়ার ডীল বা ন্যায্য ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন জনগণের (বিশেষত নিম্নআয়ের জনগণের) জীবন-মানের উন্নয়ন এবং নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ন্যায্য শ্রম আইন প্রণয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই ব্যবস্থায় পরিকল্পিত অর্থনীতির সম্ভাবনা বাতিল করা হয়। তবে বলা হয় যে, জনগণের বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচি এবং জাতীয় সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শর্ত হিসাবে অবস্থিত মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন ঠেকাতে হবে এবং তার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রভাবকে কাজে লাগানোই হবে যথার্থ উপায়। এই ব্যবস্থায় বিদেশে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের বিষয়ও সন্নিবেশিত করা হয়।

ফ্যালাঞ্জিস্ট স্পেনীয় ফ্যাসিবাদীরা। স্পেনের ডিক্টেটর (১৯২৩-৩০) প্রাইমো ডি রিভেরার পুত্র জোসে অ্যান্টোনিও প্রাইমো ডি রিভেরা ১৯৩৩ সালের ২৯ অক্টোবর ফ্যালাঞ্জিস্ট ধারার সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে রিপাবলিকানরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। ১৯৩৭ সালের উনিশে এপ্রিল বিভিন্ন ডানপন্থি রাজনৈতিক গ্রুপ এবং ফ্যালাঞ্জিস্টরা একত্রীভূত হয়ে নতুন দল গঠন করে। দীর্ঘদিন যাবৎ ফ্যালাঞ্জিস্টদের দল ফ্যালাঞ্জে এস্পানোলাই ছিল স্পেনের একমাত্র স্বীকৃত রাজনৈতিক সংগঠন।

ফ্যাসিবাদ Facism. লগ্নিপুঁজির উগ্র সাম্রাজ্যবাদী মর্মবস্তু, উগ্র জাত্যাভিমান এবং উগ্র প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে উদ্ভূত সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব। শাসকগোষ্ঠী যখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আর সামাল দিতে পারে না, তখনই এই পথের আশ্রয় নেয়। ফ্যাসিবাদীরা আঘাত হানে প্রধানত প্রগতিশীল শক্তি ও শ্রমিকশ্রেণীর ওপর। সর্বপ্রথম (১৯২২ সালে) ইতালিতেই ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর এর গোড়াপত্তন হয় জার্মানিতে (১৯৩৩)। জার্মানিতে 'জাতীয় গণতন্ত্র'-এর মুখোশে একে কায়েমি করার প্রয়াস চালানো হয়। ফ্যাসিবাদের দুই প্রধান মহানায়ক ছিলেন ইতালির বেনিটো মুসোলিনি এবং জার্মানির এডলফ্ হিটলার। বস্তুত ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদেরই সন্তান। পুঁজিবাদীরা ফ্যাসিবাদের আশ্রয় নেয় দুটি সময়ে,—এক. তার বিকাশের সময়ে এবং দুই. তার ধ্বংসের সময়ে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগে বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহে ক্ল্যাসিক্যাল ধারায় পুঁজির বিকাশ আর সম্ভবপর নয়। তাই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এবং সংশ্লিষ্ট দেশের আধাকাঁচড়া ও কমবেশি মুৎসুদ্দি চরিত্রসম্পন্ন পুঁজির স্বার্থকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং শোষিতশ্রেণীর আন্দোলন ও ক্ষমতাদখলকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যেই অনুন্নত দেশসমূহের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীও ক্ষেত্রবিশেষে ফ্যাসিবাদের আশ্রয়

নেয়। এ-কাজে তারা প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে, বিশেষত সামরিক বাহিনীকে।

ফ্যুয়েরার Fuehrer এই জার্মান শব্দটির অর্থ হচ্ছে নেতা। জার্মানির নাৎসিনেতা ও একনায়ক হিটলার ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় এসে ফ্যুয়েরার উপাধি ধারণ করেন।

ফ্যুরিয়ার, চার্লস Francois-Marie-Charles Fourier. (১৭৭২-১৮৩৭) ফরাসি ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী। তিনি বুর্জোয়া সমাজের কড়া সমালোচনা করেন এবং দারিদ্র্য ও সম্পদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, মানুষের সকল অনুভূতি ও আবেগ (প্রেম, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, উচ্চাশা ইত্যাদি) মূলত ভালো। সুতরাং, এগুলোকে অবদমিত কর উচিত নয়। স্খলনের জন্য মানুষ দায়ী নয়—দায়ী সামাজিক পরিস্থিতি। তাই সমাজকে এমনভাবে পরিবর্তন করা উচিত, যাতে মানুষের আবেগ-অনুভূতি স্ফূর্তি পায় এবং বিকাশলাভ করে। তাঁর উদ্ভাবিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক-একটি অঞ্চল বা ফ্যালাং-এ কয়েকটি উৎপাদন ইউনিট থাকবে; ওই ফ্যালাং-এর প্রত্যেক সদস্য নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কোনো-একটি উৎপাদন ইউনিটে যোগদান করবে। পেশার সঙ্কীর্ণতা মানুষকে সীমিত করে বিধায় তা পরিহার করা হবে এবং ফ্যালাং-এর প্রত্যেক সদস্যই এক থেকে দেড় ঘণ্টা করে এক-একটি কাজ করবেন এবং এভাবে অনেকগুলো ক্ষেত্রে প্রতিদিন কাজ করে যাবেন। ফলে, কাজ হবে একটি বৈচিত্র্যময় আনন্দ এবং এতে উৎপাদনও বেড়ে যাবে। এই ব্যবস্থায় সম্পদের বণ্টন হবে শ্রম ও প্রতিভার ভিত্তিতে। শারীরিক ও মানসিক শ্রমের দ্বন্দ্ব এবং গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব নিরসনে তাঁর মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তিনি সর্বহারা শ্রেণীর মার্কসীয় ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেননি বিধায় বিপ্লবের গুরুত্বও স্বীকার করেননি। তিনি মনে করতেন যে, জনগণের মধ্যে, বিশেষত পুঁজিপতিদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রচারণাই উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রধান উপায়।

ফ্রন্ট Front. কোনো বিদেশী শাসক-শোষক বা দেশীয় স্বৈরাচারী সরকার বা আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী বা সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফরম। সাধারণত ফ্রন্টের শরিকসমূহ নিজ নিজ আদর্শ বা স্বকীয়তা বিসর্জন না দিয়েই কতিপয় সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। সাধারণ লক্ষ্য অর্জিত হলে ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যায়। আবার অনেক সময় রেডিক্যাল একক সংগঠনের ক্ষেত্রেও 'ফ্রন্ট' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের এক-একটি ক্ষেত্রকেও ফ্রন্ট বলা হয়ে থাকে।

ফ্রন্ট, গণ : কোনো সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন শ্রেণী বা সংগঠনের সম্মিলিত ফ্রন্ট।

ফ্রন্ট, জাতীয় কোনো পরাধীন বা অর্ধস্বাধীন দেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য বিদেশী শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে উক্ত দেশের বিভিন্ন দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও সংগঠনের ফ্রন্ট। বিদেশী শত্রুর দ্বারা কোনো দেশ আক্রান্ত হলে বা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হতে পারে। জাতীয় মুক্তিফ্রন্টও জাতীয় ফ্রন্টেরই একটি রূপ।

ফ্রন্ট, পপুলার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন ও গ্রুপের ঐক্য বা ফ্রন্ট। ত্রিশের দশকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' কর্তৃক এরূপ

ফ্রন্ট গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা এরূপ ফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ নেয়। ফ্যাসিবাদকে বাধাদান এবং কতিপয় গণতান্ত্রিক সংস্কারমূলক কাজই ছিল পপুলার ফ্রন্টের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করাই তখন প্রধান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তব্য ছিল বিধায়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বক্তব্য এ-সময়ে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে ও স্পেনে পপুলার ফ্রন্ট সরকারও গঠন করে। কিন্তু পপুলার ফ্রন্টের শরিকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে এবং ফ্যাসিবাদী চাপের মুখে পপুলার ফ্রন্ট পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। স্পেনে হিটলার-মুসোলিনির সামরিক সাহায্যপুষ্ট ফ্যাসিবাদী সেনাপতি ফ্রাঙ্কো পপুলার ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ শুরু করেন এবং পপুলার ফ্রন্টকে পরাজিত করে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

ফ্রন্ট, যুক্ত : কোনো সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন সংগঠনের সাময়িক ঐক্যফ্রন্ট। কোনো নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এরূপ ফ্রন্ট গঠিত হয়ে থাকে। যুক্তফ্রন্টের শরিকরা পরস্পরের সমালোচনা করার অধিকার রাখে।

ফ্রন্ট, সর্বহারার ঐক্য United Front of the Proletariat. একটি মার্কসীয় কর্মপদ্ধতি। এটি হল শ্রমজীবী জনগণের সংযুক্ত ফ্রন্ট। বিভিন্ন সংস্কারপন্থি দলের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দলের সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠন করার প্রধান উদ্দেশ্য হল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সর্বহারা ও শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। জর্জি দিমিত্রভ সর্বহারার ঐক্য ফ্রন্টের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এটিকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম ধাপ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

ফ্রয়েডতত্ত্ব Freudism. অস্ট্রিয় চিকিৎসক ও মনস্তত্ত্ববিদ সিগমান্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)-এর নামানুসারেই এই তত্ত্বের নামকরণ। ফ্রয়েড মানুষের সমস্ত কাজ ও মানসিক অভিব্যক্তি—এমনকি সমস্ত ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনাকেও মনোবিশ্লেষণের আওতাভুক্ত বলে মনে করেন এবং এসব কিছুকে অচেতন, বিশেষত যৌন ঝোঁক দ্বারা পরিচালিত বলে ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্বানুযায়ী মানব-ইতিহাস, নৈতিকতা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ধর্ম, আইন, মূল্যবোধ, যুদ্ধসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডেরই মূলে রয়েছে অচেতন বা অবচেতন মনস্তত্ত্ব—বিশেষত যৌনতা। স্থূল বস্তুবাদীরা মনে করতেন যে, মনস্তত্ত্বের সকল দিক ও পরিবর্তনের মূলে হল দৈহিক কারণ। ফ্রয়েড এর তীব্র বিরোধিতা করলেও নিজে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে সরে পড়েন। তিনি মনে করেন যে, পরিবেশ বা বাইরের কার্যকরণ নয়—বরং অচেতনতার নিচে চাপা-পড়া অজ্ঞেয় অথচ শাশ্বত মনস্তাত্ত্বিক শক্তি—যা প্রধানত যৌনতা, তাই হল মানুষের, মানুষের আচার-আচরণ, কার্যকলাপ ও সামাজিক সম্পর্কের মূলকথা।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন Frankenstein. ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ মহিলা সাহিত্যিক মিসেস মেরি শেলি (১৭৯৭-১৮৫১) তাঁর উপন্যাসে এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেন। এক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে ডাঃ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এক মানবরূপী দানবের সৃষ্টি করেন, যে-দানব পরিণামে তার স্রষ্টাকেই হত্যা করে। সামাজিক ও রাজনৈতিকক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা কিংবা এমন কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করা কিংবা এমন কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা বা কর্মকাণ্ড শুরু করাকে বোঝায়—যা পরিণামে তার স্রষ্টা বা উদ্যোক্তার জন্যই ধ্বংস কিংবা মহাবিপদ ডেকে আনে।

ফ্রাঙ্কো Francisco Franco y Bahamonde (১৮৯২-১৯৭৫) ইউরোপের সর্বকনিষ্ঠ জেনারেল। ১৯৩৬-৩৯ সালের স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ (Spanish Civil War)-র সময় তিনি জাতীয়তা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং সেনাবাহিনী প্রধান ও অস্থায়ী সরকারের প্রদান হন। তিনি সফলভাবে গৃহযুদ্ধ দমন করেন এবং স্পেনের একচ্ছত্র একনায়ক হিসাবে আবির্ভূত হন। রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। আমৃত্যু তিনি ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সুপ্রিম কমান্ডার। তাঁর আমলের স্পেন ছিল কার্যত একটি কর্পোরেট রাষ্ট্র এবং তিনি দেশ শাসন করতেন অনেকটা বেনিটো মুসোলিনির স্টাইলে। ফ্রাঙ্কোর কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ না থাকলেও তিনি ছিলেন রক্ষণশীল, ধর্মনিষ্ঠ, সমাজতন্ত্রবিরোধী এবং কর্তৃত্ববাদী। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য স্পেনে উদার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ফ্রি জোন Free Zone. সাধারণত কোনো সমুদ্রবন্দর বা বিমানবন্দর-এর নিকটবর্তী এলাকা, যেখানে কোনো পণ্য পুনরফতানির উদ্দেশ্যে অথবা রফতানিমূলক শিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানি করলে, তার জন্য কোনো আমদানি শুল্ক দিতে হয় না।

ফ্রি পোর্ট : বা অবাধ বন্দর, যে-বন্দরের মাধ্যমে যে-কোনো রাষ্ট্রের যে-কোনো ব্যবসায়ী কোনোপ্রকার বিধিনিষেধ ছাড়া এবং আমদানি শুল্কাদি ব্যতিরেকেই যে-কোনো পণ্য আমদানি বা রফতানি করতে পারে।

ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি French Community. ১৯৫৮ সালে পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র মোতাবেক গঠিত ফ্রান্সের উপনিবেশ বা প্রভাবাধীন এলাকাসমূহের সমন্বয়ে এটি গঠিত। গিনি এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভোট দেয় এবং স্বাধীন হয়ে যায়। এই শাসনতন্ত্র মোতাবেক সাব্যস্ত হয় যে, কমিউনিটির সদস্যেরা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করবে। তবে মুদ্রা, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি কতিপয় বিষয় থাকবে কমিউনিটির হাতে। ফ্রান্সের উপনিবেশভুক্ত ১৯টি এলাকার মধ্যে শাদ, কঙ্গো, মৌরিতানিয়া, সুদান, মালি, মাদাগাস্কার ও দাহোমিসহ ১২টি এলাকা কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত হতে রাজি হয়। কিন্তু কমিউনিটির আওতায় থাকার দরুন সার্বভৌমত্ব দারুণভাবে খর্বিত হওয়ায় কমিউনিটিভুক্ত এলাকাসমূহের জনগণের পক্ষ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ওঠে। ফ্রান্স প্রথম দিকে এর বিরোধিতা করলেও ১৯৬১ সালে স্বীকার করে নেয় যে, কমিউনিটিভুক্ত এলাকাসমূহ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েও কমিউনিটির সদস্যত্ব বজায় রাখতে পারবে। ১৯৬০ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যেই এর সকল সদস্যরাষ্ট্রই পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ৪টি রাষ্ট্র (দাহোমি, আইভরি কোস্ট, নাইজার, আপার ভোল্টা) কমিউনিটির সদস্যত্ব ত্যাগ করে। এই কমিউনিটির রয়েছে—১. একজন প্রেসিডেন্ট, যিনি অবশ্যই ফ্রান্সেরও প্রেসিডেন্ট, ২. ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী, সদস্যরাষ্ট্রসমূহের সরকার-প্রধান ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, ৩. ফ্রান্স এবং সদস্যরাষ্ট্রসমূহের পার্লামেন্টসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সিনেট এবং ৪. পারস্পরিক বিষয় নিষ্পত্তির জন্য একটি আদালত।

ফ্রেলিমো ফ্রিডম অ্যান্ড লিবারেশন মুভমেন্টের সংক্ষিপ্ত রূপ হল ফ্রেলিমো (FRELIMO)। আফ্রিকার মোজাম্বিক ছিল একটি পর্তুগিজ উপনিবেশ। মোজাম্বিকের জনগণ ফ্রেলিমোর নেতৃত্বে দীর্ঘ একযুগ যাবৎ রক্তক্ষয়ী সাম্রাজ্যবাদ

-উপনিবেশবাদবিরোধী সশস্ত্র গণসংগ্রাম চালিয়ে যায়। এর পরিণতিতে ১৯৭৫ সালে মোজাম্বিক স্বাধীনতা লাভ করে এবং ফ্রেলিমো রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে।

॥ ব ॥

বংশগতি Heredity. বংশগতি হল বংশধরদের মধ্যে নিজের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সঞ্চালিত করে দেওয়ার প্রক্রিয়া। জৈব বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। উচ্চতর জীবের ক্ষেত্রে বংশগত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চালন যৌনকোষের ওপর নির্ভরশীল। বংশগতির ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন সাধিত হয় মূলত পরিবেশের প্রভাবে। এ-ধরনের পরিবর্তনকে বলে মিউটেশন (Mutation)। ক্ষতিকর মিউটেশনের ফলে জীবের ধ্বংস ঘটে; আর প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুকূল মিউটেশনকে সংবদ্ধ করে। বস্তুত মিউটেশন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনই হল জৈব বিবর্তনের মূল কারণ। আধুনিক জীববিদ্যা এটা প্রমাণ করেছে যে, দেহাণুসমূহ প্রতিনিয়তই নিজেদের হুবহু অনুরূপ দেহাণু জন্ম দিয়ে থাকে। এরূপ দেহাণুর উপাদান ডাই অক্সিরিবো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA)ই হল বংশগতি সঞ্চালনের বস্তুগত মাধ্যম। বংশগতির এই বস্তুভিত্তিক তত্ত্ব জীবের ক্ষমতা ও গুণাবলীর কারণ অলৌকিক বলে যে-ভাববাদী ধারণা ছিল, সেটাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেয়। আধুনিক জীন তত্ত্ব জীবের দৈহিক ও মানসিক গঠন, আচার-আচরণ ও বৈশিষ্ট্যসহ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এক বিপ্লবাত্মক সত্যকে উদঘাটিত করেছে।

বংশ যবনিকা Bamboo Curtain. ১৯৪৯ সালে চীনবিপ্লব সম্পন্ন হলে বিপ্লবী ব্যবস্থা ও ধ্যানধারণাকে প্রতিষ্ঠা করা, প্রতিবিপ্লবীদের নির্মূল করা, বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে ভেতরের ব্যবস্থাকে রক্ষা করা ইত্যাদি স্বার্থে চীনের কমিউনিস্ট সরকার এমন কড়া ব্যবস্থা গড়ে তোলে যাতে চীনের অভ্যন্তরে কী ঘটছে না-ঘটছে, তা যেন বহির্বিশ্বের কেউ আদৌ জানতে না পারে এবং চীনের জনগণও যেন বাইরের কোনো মতবাদ বা সমালোচনার সংস্পর্শে আসতে না পারে। এই ব্যবস্থাকেই বলা হত বংশ যবনিকা। সম্ভবত চীন-ভিয়েতনাম প্রভৃতি অঞ্চলে বাঁশ বা বংশ পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মায় এবং বাঁশ দিয়েই বেড়া, দেওয়াল ইত্যাদি দেওয়া হয় বলেই, রূপকার্থে এই ব্যবস্থাকে বলা হয় বংশ যবনিকা। সোভিয়েত ইউনিয়নের যে-ব্যবস্থাকে 'লৌহ যবনিকা' বলা হত, 'বংশ যবনিকা' তারই চীনা সংস্করণ।

বক্সার বিদ্রোহ : এটি ১৯০০ সালে চীনে সংঘটিত বিদেশী শক্তি বিরোধী বিদ্রোহ। চীনে ইউরোপীয় বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং জার্মানি কর্তৃক কিরায়ওচো অধিকার (১৮৯৭), রাশিয়া কর্তৃক পোর্ট আর্থার দখল ও ব্রিটেন কর্তৃক ওয়েই হাই-ওয়েই অধিকার (১৮৯৮) ইত্যাদির ফলে উত্তর চীনের জনগণের মধ্যে তীব্র বিদেশীবিরোধিতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, তৎকালীন চীন সরকারের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় এবং বিধবা সম্রাজ্ঞী শু শির সমর্থনে তরুণ চীনারা এক গোপন সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠনের নাম ছিল 'সমছন্দিত মুষ্টিবদ্ধ হস্তসমূহের সমিতি' (Society of Harmonious Fists) এবং এর সদস্যেরা সংক্ষেপে মুষ্টিযোদ্ধা বা বক্সার বলে পরিচিত হয়। তারা নবদীক্ষিত খ্রিষ্টান, খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক এবং বিদেশী নিয়ন্ত্রণাধীন রেল-কর্মচারীদের ওপর আক্রমণ চালায়।

এর প্রত্যুত্তরে অ্যাডমিরাল সেমুর-এর নেতৃত্বে বিদেশীরা রাজধানী পিকিং (বর্তমানে বেজিং) দখল করতে উদ্যত হলে টাকুর দুর্গ থেকে তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পিকিংয়ে বক্সার বিদ্রোহ ফেটে পড়ে। ১৯ জুন (১৯০০) পিকিংস্থ জার্মান মিনিস্টার আততায়ীর হাতে নিহত হন এবং প্রায় সকল বিদেশী দফতর ঘেরাও হয়ে যায়। ১৪ আগস্ট ছয়জাতি বাহিনীর সংঘবদ্ধ চেষ্টায় বিদেশী দফতরসমূহ মুক্ত করা হয়। কিন্তু এই বাহিনী এর পরপরই বেপরোয়া লুটপাটের তাণ্ডব শুরু করে। বছরের শেষদিকে ভন ওয়াল্ডেসির নেতৃত্বে এক জার্মান বাহিনী পিকিংয়ে এসে জার্মান মিনিস্টার হত্যার প্রতিশোধের নামে ব্যাপক নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই বিদ্রোহ সেনসি ও মাঞ্চুরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রত্যুত্তরে রুশবাহিনী প্রদেশ দুটির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। বক্সার বিদ্রোহ দমনের জন্য বিদেশী শক্তিসমূহ যে-হিংস্র পদ্ধতি গ্রহণ করে, তা বিদেশীবিরোধিতা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং ফলশ্রুতিতে বিপুলসংখ্যক চীনা তরুণ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী ও প্রজাতন্ত্রী আন্দোলনে যোগদান করে।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম থেকেই ভারতবর্ষের বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা অঞ্চল একজন ছোটলাট বা গভর্নরের দ্বারা শাসিত হত। এতবড় এলাকা একজন গভর্নরের পক্ষে শাসন করা ছিল দুরূহ। তাই ১৯০৫ সালে বড়লাট লর্ড কার্জনের উদ্যোগে এই প্রদেশকে বিভক্ত করা হয় এবং আসাম ও বঙ্গ বা বাংলার রাজশাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ নিয়ে 'পূর্ববাংলা ও আসাম' প্রদেশ গঠিত হয়। এর রাজধানী হয় ঢাকায়। বঙ্গের বাকি অংশ এবং উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় অপর একটি প্রদেশ। এই বিভক্তিকে হিন্দুরা নাম দেয় 'বঙ্গভঙ্গ' এবং এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। কংগ্রেস এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। এই আন্দোলন হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। বলাবাহুল্য, মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের প্রতিই সমর্থন জানায়, কেননা নবগঠিত 'পূর্ববাংলা ও আসাম' প্রদেশে পরিপূর্ণভাবে মুসলিম প্রাধান্যই কায়েম হয়। কলকাতার হিন্দু আইনজীবী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য পেশাদার মানুষ তাঁদের পসার কমে যাবে বলে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে শুরু হয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও। তীব্র সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে আবার উভয় প্রদেশকে এক প্রদেশে রূপায়িত করা হয়।

বনবেড়াল ধর্মঘট Wildecat Strike. অঘোষিত বা বিধিবহির্ভূত ধর্মঘটকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বনবেড়াল ধর্মঘট বলে অভিহিত করা হয়।

বন্দে মাতরম এর অর্থ হচ্ছে, 'হে মাতা তোমায় প্রণাম'। এখানে মাতা বলতে দেশকেই বোঝানো হযেছে। বাঙালি কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই কথাগুলোকে বিশেষ তাৎপর্যে নিয়ে আসেন তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মাধ্যমে। এই স্লোগানটি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হত। বর্তমান ভারতেও স্লোগানটির বহুল প্রচলন আছে।

বফোর্স কেলেঙ্কারি : ১৯৮৬ সালের ২৪ মার্চ সুইডেনের এ.বি. বফোর্স নামক একটি অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতের অস্ত্র ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি মোতাবেক মোট ১৪৩৭ কোটি ৭২ লক্ষ রুপি মূল্যে ১৫৫ মিলিমিটার ব্যসের চারশোটি

কামান সরবরাহ করা হয়। অমনি ভারত জুড়ে হৈচৈ শুরু হয় এবং বিরোধীদল অভিযোগ তোলে যে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং ডিলবাবদ ৬৪ কোটি রুপি ঘুষ গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেস সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ভি পি সিংও এই দুর্নীতির প্রতিবাদে কংগ্রেস ছেড়ে জনতা দলে যোগ দিলে এবং বফোর্স কেলেঙ্কারির বিচার দাবি করলে রাজীব গান্ধী ভয়ানকভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়েন। ভারতজুড়ে স্লোগান ওঠে. "গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়"। ফলে, ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস হেরে যায়। পরবর্তীতে ভিপি সিং প্রধানমন্ত্রী হলে এই মামলার তদন্ত শুরু হয় এবং ৮৩ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে ১৯৯১ সালে ২১ মে রাজীব গান্ধীকে হত্যা করলে তদন্ত শ্লথ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতাসীন হলে আবার মামলাটি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এর মধ্যে সুইডেন থেকে প্রেরিত নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, কোয়েত্রিচিচ ও তাঁর স্ত্রী মারিয়া, উইন চাড্ডা ও তাঁর স্ত্রী কান্তা, পুত্র হর্ট চাড্ডা ও এস. কে. ভাটনগর প্রমুখ এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত ছিলেন।

বয়কট Boycott.বয়কট হল, কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, কর্তৃপক্ষ, দেশ বা বস্তুকে সমবেতভাবে বর্জন করা। ১৮৮০ সালে সমগ্র আয়ারল্যান্ড জুড়ে থ্রি-এফ আন্দোলন শুরু হয়। থ্রি-এফ (Three–F) হল ১. Fixity of Tenancy অর্থাৎ জমির ওপর প্রজার সত্ত্ব নির্ধারণ ২. Free Sale অর্থাৎ প্রজার জমি বিক্রির অবাধ অধিকার এবং ৩. Fair Rent অর্থাৎ ইচ্ছামতো খাজনাবৃদ্ধির বদলে ন্যায়সঙ্গত হারে জমির খাজনা স্থিরকরণ। এসব দাবি আদায়ের জন্য আইরিশ ল্যান্ড লীগ নামে একটি সংগঠনও গঠিত হয় এবং এই সংগঠন সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেসব জমিদার বা কর্মকর্তা এই থ্রি-এফ দাবি স্বীকার করবেনা তাদেরকে সমবেতভাবে বর্জন বা একঘরে করা হবে। এ-সময় উত্তর-আয়ারল্যান্ডের মেরো কাউন্টির জমিদারের প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন চার্লস সি. বয়কট এ-দাবি মানতে অস্বীকার করায় প্রজারা তাঁকে বর্জন করে, তাঁর চাকরবাকরদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে ছাড়িয়ে নেয়, তাঁর বাড়িতে খাবারদাবার সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং তাঁর বাড়ির চতুষ্পার্শস্থ দেয়ালও ভেঙে দেয়। এমতাবস্থায় বয়কট এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। সেই থেকে বয়কট কথাটি একঘরে করা বা সমবেত বর্জন অর্থে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত হয়েছে। এখন শব্দটি দেশ, বস্তু, গোষ্ঠী ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

বর্ণবাদ Racism. কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতি ভিন্ন গাত্রবর্ণের কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বৈষম্যমূলক আচরণের নীতি। সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গশাসিত দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায়দের প্রতি যে অমানবিক বৈষম্যমূলক আচরণ ও নীতি অনুসৃত হয়, সেই নীতিই বর্ণবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্থানীয় ভাষায় এই বর্ণবাদকে বলা হয় অ্যাপার্টহিড (Apartheid).

বর্বর যুগ Barbarian Age. অসভ্য যুগ ও সভ্য যুগের মধ্যবর্তী স্তর। এ-যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পশুপালন ও কৃষিকাজের আরম্ভ। এ-যুগের শেষের দিকে খনিজ লৌহ ও প্রস্তর গলানো, পশুদুগ্ধের ব্যবহার, পশুপালন, পাথরের ওপর অঙ্কন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

বলকান চুক্তি ১৯১৪ সালের ৯ আগস্ট তারিখে গ্রিস, তুরস্ক ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে সম্পাদিত সামরিক মৈত্রী চুক্তি। ইতালিও বুলগেরিয়া আক্রমণ করতে পারে, এই আশঙ্কা

থেকেই ১৯১৪ সালে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। গ্রিক পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে মৈত্রী। এই চুক্তির ফলে গ্রিস এবং তুরস্কের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটলেও সাইপ্রাসের সঙ্কটকে কেন্দ্র করে এই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অপরদিকে পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে যুগোস্লাভিয়াও এই চুক্তি সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায়, স্বভাবতই বলকান চুক্তি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯০৪ সালে প্রথম বলকান চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল গ্রিস এবং যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে।

বলশেভিক Bolshevik. রুশ শব্দ 'বলশেভিনস্টভো' বা সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে বলশেভিক শব্দের উৎপত্তি। ১৯০৩ সালে অনুষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কংগ্রেসে বিপ্লবপন্থি এবং আপোসকামীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবপন্থিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং বলশেভিক নামে পরিচিত হয়। অপরপক্ষ মেনশেভিক (সংখ্যালঘু বা 'মেনশিনস্টভো' শব্দ থেকে উদ্ভূত) নামে অভিহিত হয় ও আলাদাভাবে সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এই বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বেই ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। এই পার্টি পরবর্তীকালে 'রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (CPSU) নামে রূপান্তরিত হয়।

বলশেভিকবাদ : Bolshevism. রাশিয়ার বলশেভিক দলের মতবাদ ও কর্মপন্থা। বনেদি কমিউনিস্টদের কাছে বলশেভিকবাদই হল খাঁটি সমাজতন্ত্র ও সঠিক বিপ্লবের লাইন।

বলশেভিকীকরণ : কোনো কমিউনিস্ট পার্টিকে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির ভাবাদর্শ ও কর্মপন্থায় পরিচালিত করা।

বলিভার, সাইমন : Simon Boliver. (১৭৮৩-১৮৩০) দক্ষিণ আমেরিকার মুক্তির অগ্রদূত সাইমন বলিভারের জন্ম হয় ভেনিজুয়েলার ক্যারাকাসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ইউরোপে ব্যাপক ভ্রমণকালে তিনি ব্রিটিশ দার্শনিক লক এবং ফরাসি দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৮১২ সালে মিরান্ডার নেতৃত্বে ভেনিজুয়েলা প্রজাতন্ত্রের জন্য যে প্রথম ব্যর্থ বিদ্রোহ হয়, তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি নিউ গ্রানাডা (কলম্বিয়া)-য় পালিয়ে গিয়ে একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন এবং ১৮১৩ সালে ক্যারাকাস দখল করেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিণতিতে ক্যারাকাস ছাড়তে এবং ১৮১৫ সালে কলম্বিয়া ছাড়তেও বাধ্য হন। তিন বছর পর বলিভার জামাইকায় নির্বাসন থেকে ওরিনোকো অববাহিকায় ফিরে আসেন এবং এঙ্গোস্টুরা (বর্তমান নাম সিউডাড বলিভার) নামক স্থানে ঘাঁটি গড়ে তোলেন। অতঃপর ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তা নিয়ে তিনি আন্ডিজ পর্বতমালা এলাকায় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন এবং ১৮১৯ সালের ডিসেম্বরে কলম্বিয়া ও ভেনিজুয়েলাকে স্বাধীন ঘোষণা করেন (যদিও ১৮২১ সালের পুর্ব পর্যন্ত ভেনিজুয়েলার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত ছিল না)। ১৮২২ সালে বলিভার তাঁর কর্মক্ষেত্র ইকুয়েডর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন এবং স্যান মার্টিন ইউরোপ চলে গেলে তিনি পেরুর জাতীয়তাবাদী বাহিনীরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে ১৮২৫ সালে এই বাহিনী একটি এলাকাকে মুক্ত করে (তাঁর সম্মানে এই এলাকার নাম রাখা হয় বলিভিয়া)। তাঁর স্বপ্ন ছিল সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকাকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠন করা। কিন্তু ভেনিজুয়েলা ও কলম্বিয়ায় স্বাতন্ত্র্যবাদী

আন্দোলন (১৮২৯-৩০) তাঁর সে-স্বপ্নকে ভেঙে দেয়। তা ছাড়া তাঁর কতিপয় বিশ্বস্ত সহচরের ষড়যন্ত্রও তাঁকে পীড়া দেয়। এমতাবস্থায় মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

বস্তুগত বা বস্তুমুখী (Objective)। বস্তুজগৎ মানুষের ধারণা করা না-করার ওপর নয় বরং মানুষের চেতনানিরপেক্ষভাবেই অবস্থান করে, এই দৃষ্টিভঙ্গি। এখন মানুষের ক্ষেত্রেও বস্তুগত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যে-মানুষ ব্যক্তিগত খেয়াল, সংস্কার বা পূর্বনির্ধারিত ধারণামুক্ত হয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো বিষয়ের সকল দিক বিশ্লেষণ করেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকেও বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়।

বস্তুগত অবস্থা, বিপ্লবের : Objective Situation for Revolution. শ্রেণী বা সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তীক্ষ্ণ হওয়া, শোষকশ্রেণীর শক্তিকেন্দ্রসমূহ দুর্বল হয়ে পড়া, ব্যাপক জনগণের কাছে বর্তমান অবস্থা অসহ্য হয়ে ওঠা, জনগণ কর্তৃক প্রবলভাবে একটি পরিবর্তন কামনা করা, শোষকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের আন্তর্জাতিক মিত্রদের যোগসূত্র দুর্বল হয়ে পড়া ইত্যাদিই হল বিপ্লবের বস্তুগত পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে আত্মগত বা সাংগঠনিক প্রস্তুতি থাকলেই বিপ্লব সংগঠিত হয়।

বস্তুবাদ Materialism. যে-দার্শনিক মতবাদ যাবতীয় আধ্যাত্মিক বিষয়কে অস্বীকার করে এবং শুধুমাত্র বস্তু ও বস্তুর গতিকেই বিশ্বের সকল প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনার নিয়ামক বলে বিবেচনা করে সেই মতবাদকেই বলা হয় বস্তুবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃতি বা বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের চেতনা ও অনুভূতি-নিরপেক্ষ। লেনিনের মতে, 'বস্তুই বাস্তব সত্য, বস্তুর অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে। বস্তু, বিশ্বপ্রকৃতি প্রভৃতি বাস্তব বিষয়ই হল মুখ্য এবং আত্মা, চেতনা, অনুভূতি, যাতনা ইত্যাদি মানসিক দিক গৌণ।' চেতনা-নিরপেক্ষ বস্তুজগতের স্বাধীন অস্তিত্বের মতবাদই বস্তুবাদের মূলকথা। এঙ্গেলস বস্তুবাদ ও ভাববাদের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, "যাঁরা বিশ্ব প্রকৃতির ওপর আত্মার প্রাধান্য আরোপ করেন এবং তাই শেষ পর্যন্ত কোনো-না কোনোভাবে সৃষ্টির মূলে কিছু-একটা (অলৌকিক শক্তি) কে অনুমান করে নেন, তাঁদের নিয়েই ভাববাদীদের দল; আর যাঁরা বিশ্ব প্রকৃতিকে (বস্তুকে) প্রাধান্য দেন, তাঁদের নিয়ে বস্তুবাদীদের দল গঠিত।" হেগেল ছিলেন একজন ভাববাদী এর অর্থ এই যে, তাঁর মতে, "মনের চিন্তা কোনো বস্তুর বিমূর্ত প্রতিবিম্ব নয়, বরং বস্তু ও বস্তুর বিকাশধারাই হল 'শাশ্বত ভাব'-এর প্রতিবিম্ব। এই ভাবই আসল এবং এই 'ভাব' বিশ্বসৃষ্টির পূর্বেও কোথাও-না-কোথাও ছিল।" অনেকে বস্তুবাদের উদ্দেশ্যমূলক অপব্যাখ্যা করেন। মুনাফাখোরি, দৈহিক ভোগ-বিলাস, ধাপ্পাবাজি ইত্যাদিকেই বস্তুবাদ বলে চালিয়ে দেয়ার প্রয়াস পান।

বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক Historical Materialism. ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ধারণা। বস্তুবাদকে যখন সামাজিক বিকাশ ও সমাজজীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন তাকে বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে উৎপাদন-প্রক্রিয়াই হল সমাজের বিকাশ, ইতিহাস, রাজনীতি, আইন-কানুন, ভাব-চিন্তা, মূল্যবোধ ইত্যাদির মৌল ভিত্তি। সভ্যতার প্রতিটি স্তরের সমাজ-ইতিহাসের ধারা সংশ্লিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক কাঠামো দ্বারাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অর্থনৈতিক কাঠামোর চরিত্র আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের স্তরের ওপর নির্ভরশীল। যেমন, মার্কসের ভাষায় বায়ুচালিত উৎপাদন -যন্ত্র দিয়েছে সামন্তবাদী সমাজ, আর স্টিম ইঞ্জিন দিয়েছে পুঁজিবাদ।

বস্তুবাদ, যান্ত্রিক একধরনের বস্তুবাদ। এই দার্শনিক বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু, প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশ ধারা হল সংখ্যা, পরিমাণ অথবা অবস্থার সহজ যৌগিক হ্রাস-বৃদ্ধি এবং ঘটনার সহজ পুনরাবৃত্তি মাত্র। এই তত্ত্বানুযায়ী গতি বা পরিবর্তন হল বাইরের বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষের পরিণতি। এই বস্তুবাদ পরিমাণের গুণগত পরিবর্তন ও নিরাকরণের নিরাকরণকে স্বীকার করে না বিধায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরোধী। যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের মতে, রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে বস্তুর কাঠামো সম্পর্কে যান্ত্রিক বস্তুবাদের নিয়মাবলী খুবই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু উচ্চতর প্রাকৃতিক অবস্থা বিশ্লেষণে অপর্যাপ্ত। যান্ত্রিক বস্তুবাদের যথেচ্ছ প্রয়োগ ধ্রুপদী ফরাসি বস্তুবাদের একটি মৌলিক ত্রুটি। এর অপর ত্রুটি হল এই যে, এটি সমগ্র জগৎকে একক নিয়মাধীন একই ঐতিহাসিক বিকাশধারার আওতায় ক্রমবিকাশমান বিষয় হিসাবে দেখতে অক্ষম।

বহুজাতিক কর্পোরেশন Multinational Corporation. বিশালাকায় শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, যার উৎপাদন ইউনিট বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকে। ফোর্ড, শেল, কোকা-কোলা ইত্যাদিই এ-ধরনের বহুজাতিক কর্পোরেশন। এরূপ কোনো কোনো কর্পোরশেনের আয় অনুন্নত বিশ্বের বহু দেশের জাতীয় আয়ের তুলনায় তো বটেই, এমনকি সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের জাতীয় আয়ের চেয়েও বেশি। এসব কর্পোরেশন বৃহদাকারের মনোপলি বা একচেটিয়াও বটে। সমাজতন্ত্রীদের মতে নয়া সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় বহুজাতিক কর্পোরেশনসমূহই হল দরিদ্র বিশ্বকে শোষণ করার ও দরিদ্র রাখার হাতিয়ার।

বাইবেল Bible. খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের এই পবিত্রতম পুস্তক নিউ টেস্টামেন্ট (New Testament) নামেও পরিচিত। এটা ঠিক কুরআন-বর্ণিত ইনজিল নয়, কেননা এর ভাষা আল্লাহ্‌র বা ঈশ্বরের জবানিতে নয়, বরং সেন্ট বা ঋষিদের ভাষ্যে। এর চারটি গসপেল (Gospel–God Spell বা God Story-র অপভ্রংশ) রয়েছে। যেমন, সেন্ট ম্যাথিউর গসপেল, সেন্ট মার্কের গসপেল, সেন্ট ল্যুক-এর গসপেল এবং সেন্ট জন-এর গসপেল। নিউ টেস্টামেন্টে বিভিন্ন সাধুজনের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদিও সন্নিবেশিত আছে।

বাঁচার জন্য সংগ্রাম : বা টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম, Struggle for Survival. জীবন ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার বিরুদ্ধে জীবের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এর ফলে অবস্থিত প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে যারা যত বেশি খাপ খাওয়াতে পারে, তারা তত বেশি সফলতার সঙ্গে বেঁচে বা টিকে থাকে। যারা খাপ খাওয়াতে পারে না তারা ধ্বংস হয়ে যায়। এই সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় জীবের অভ্যন্তরে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্রমবিবর্তন ঘটে। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকেই এই তত্ত্বকে স্থূলভাবে প্রয়োগ করে বলেন যে, সমাজে যারা শক্তিশালী তারাই টিকে থাকবে এবং যারা দুর্বল তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম; সুতরাং এর বিরুদ্ধে বিপ্লব হল প্রাকৃতিক নিয়মেরই বিরোধিতা।

বাকুনিন Bakunin. মিখাইল বাকুনিন (১৮১৪-৭৬) ছিলেন রুশ পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবী, জন্মের দিক থেকে সম্ভ্রান্ত এবং তত্ত্বের দিক থেকে নৈরাজ্যবাদী। ফিখটে এবং

হেগেলের দ্বারা প্রভাবিত বাকুনিন ১৮৪০ সালে দেশত্যাগ করেন এবং তরুণ হেগেলীয়দের দলে যোগদান করেন। তিনি ১৮৪৮-৫০ সালে প্রাগ ও ড্রেসডেন-এর বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নেন। রাশিয়ায় ফিরে এলে ১৮৫১ সালে তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৮৫৭ সালে তাঁকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। ১৮৬১ সালে তিনি পলায়ন করেন এবং সত্তরের দশক পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে কাজ করেন। মার্কসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তিনি ১৮৭২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন। চার বছর পর বার্নে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর তত্ত্বের মূল কথা হল এই যে, রাষ্ট্রই মানুষের প্রধান শোষক; সুতরাং মানুষকে মুক্তির লক্ষ্যে নিতে হলে পয়লা চোটেই রাষ্ট্রকে উড়িয়ে দেওয়া দরকার। আর দরকার জনগণের জীবন থেকে সকলপ্রকার কর্তৃত্বের অবলুপ্তি ঘটানো। বাকুনিনবাদীরা মনে করতেন যে, জনগণ অকর্মক এবং তাই সকর্মক বীরেরাই তাদের পরিচালিত করে, এই বীরেরাই রচনা করে ইতিহাস। এজন্য তাঁরা ব্যাপক জনগণকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করার প্রয়োজীয়তাকে বাতিল করে দেন এবং সরাসরি বিপ্লবী অ্যাডভেঞ্চারে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে রাশিয়ার নারোদবাদীদের মধ্যে বাকুনিনের চিন্তাধারার প্রসার ঘটে। রাশিয়ায় বাকুনিনের মানসপুত্র ছিলেন নেচায়েভ। নেচায়েভের মৃত্যুর পর পাদপ্রদীপের সামনে আসেন জেলি জালিয়াভব। কিন্তু স্পেন এবং ইতালির মতো রাশিয়ায়ও ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে-না-হতেই বাকুনিনবাদীদের কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটে। সমাজ-বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগে ব্যর্থ নারোদবাদীরা শ্রেণীসংগ্রাম ও সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্বের বিরোধিতা করে।

বাগদাদ প্যাক্ট ১৯৫৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাগদাদে ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে এই প্যাক্ট বা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল সদস্যরাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা। এই চুক্তিকালে সাব্যস্ত হয় যে, ইসরায়েল ছাড়া যে-কোনো আরব-রাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা ও শান্তির সঙ্গে জড়িত অন্য যে-কোনো রাষ্ট্রও এর সদস্য হতে পারবে। তদনুযায়ী, সে-বছরেরই ৩০ মার্চ যুক্তরাজ্য এবং ২৩ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ও ইরান এর সদস্যত্ব গ্রহণ করে। ১৯৫৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র এর সামরিক কমিটির সদস্য হিসাবে আসন গ্রহণ করে, তবে মূল চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় না। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মতে এই চুক্তি ছিল সম্ভাব্য সোভিয়েত হামলার বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা। ১৯৫৮ সালের ১৪ জুলাই ইরাকে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ব্রিগেডিয়ার আবদুল করিম কাসেম বাদশাহ ফয়সল, বাদশার আত্মীয়-স্বজন এবং প্রধানমন্ত্রী ও বাগদাদ প্যাক্টের অন্যতম উদ্যোক্তা নূরি আস সাইয়িদকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন এবং হাশেমি রাজত্বের অবসান ঘটান। এই পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই মাসের শেষের দিকে চুক্তিভুক্ত অন্যান্য সদস্যগণ লন্ডনে মিলিত হন এবং মতপ্রকাশ করেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই চুক্তিকে বাতিল তো নয়ই, বরং আরও জোরদার করাই আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে এর প্রধান কার্যালয় বাগদাদ থেকে আংকারায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অভ্যুত্থানের পর থেকেই ইরাক এর কোনো কাজে অংশগ্রহণ করছিল না। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে ইরাক আনুষ্ঠানিকভাবে এর সদস্যপদ প্রত্যাহার করলে এর নাম বাগদাদ প্যাক্ট রাখার যৌক্তিকতাও ফুরিয়ে যায়। ফলে ঐ বছরেরই ২১ আগস্ট এর নতুন নাম দেয়া হয় কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা বা সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন (CENTO)।

বাজপাখি ও ঘুঘু Hawks and Doves. ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় এই শব্দ দুটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বাজপাখি বলা হত তাদেরই, যারা কঠোর সামরিক ব্যবস্থা ও শক্তির জোরে সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতি ছিল। অন্যদিকে ঘুঘু বলা হত তাদের, যারা আলাপ-আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হক্‌স্ বা বাজপাখিরা ১৯৭১ সালে নিক্সন সরকার কর্তৃক কম্বোডিয়ায় ব্যাপক বোমাবর্ষণের পক্ষপাতী ছিল। যারা পি.এল.ও.-এর বিরুদ্ধে ইসরায়েল কর্তৃক কঠোর ব্যবস্থাগ্রহণের পক্ষপাতি ছিল, তাদেরকেও হক্‌স্ বলে অভিহিত করা হত। বর্তমানে যারা রাজনীতি বা কূটনীতির ব্যাপারে উগ্রতাবাদী ও বলপ্রয়োগের পক্ষপাতি তাদেরকে বলা হয় হক্‌স্ এবং যাঁরা শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছার পক্ষপাতি তারা ডাভ্‌স্ বা ঘুঘু নামে অভিহিত।

বাজেট : Budget. পরবর্তী অর্থবছরের জন্য কোনো সরকারের আয় ও ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবে। গণতান্ত্রিক দেশে প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত বাজেট পার্লামেন্টে পেশ করেন। পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হলেই বাজেট পাশ করা হল বলে ধরা হয়। সরকার ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের বাজেট তৈরি করতে পারে। সরকারি বাজেট প্রধানত দুরকম হতে পারে; যথা রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট। অবশ্য, অগণতান্ত্রিক দেশেও বাজেট প্রণয়ন ও পাশের রেওয়াজ আছে।

বাজেট, উন্নয়ন : Development Budget. উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তৈরি বাজেট। রুটিনকাজের বাইরে আন্তঃকাঠামো, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে উন্নয়নই এ-বাজেটের বিষয়। রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত (যদি থাকে) এবং বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য (অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে) ইত্যাদিই হল উন্নয়ন বাজেটের আয়ের উৎস।

বাজেট, রাজস্ব Revenue Budget. যে-বাজেটের আয় রাজস্ব থেকে উদ্ভূত সেটাই রাজস্ব বাজেট। এই বাজেটের আয়ের উৎস আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, বিক্রয়কর, আয়কর, ভূমি-খাজনা ইত্যাদি। আর এই বাজেটের মূল ব্যয় হল সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, আইন-শৃঙ্খলা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রুটিন বা নির্ধারিত ব্যয়।

বাণিজ্যের ভারসাম্য Balance of Trade. একটি দেশ মুদ্রার হিসাবে যে-পরিমাণ পণ্য আমদানি করল, তার রফতানিকৃত পণ্যের মূল্যের পরিমাণও যদি একই হয়, তা হলে বলতে হবে যে, সে-দেশের বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষিত হল। আর যদি দেখা যায় যে আমদানি হয়েছে বেশি অথচ রফতানি হয়েছে সে-তুলনায় কম, তা হলে দেশটি ক্ষতিগ্রস্ত বা ঋণগ্রস্ত হল, অর্থাৎ বাণিজ্যের ভারসাম্য ক্ষতিকর বা অসুবিধাজনক (Unfavourable) হল। অন্যথায়, অর্থাৎ রফতানি বেশি হয়ে আমদানি কম হলে ভারসাম্য দেশটির অনুকূলে (favourable) হল বলে ধরা হয়। এককথায়, আমদানি-রফতানির অনুপাতই হল বাণিজ্যের ভারসাম্য। এটা কোনো দেশের সামগ্রিক আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে, আবার অপর কোনো বিশেষ দেশের সঙ্গে সম্পাদিত আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

বাদের-মেইনহফ বাদের ও মেইনহফ নামের দুজন প্রণয়ী-প্রণয়িনীর নেতৃত্বে সংগঠিত জার্মানির একটি সন্ত্রাসবাদী দল। সত্তরের দশকে এই দল উল্কার মতো জ্বলে ওঠে এবং

আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। অচিরেই বাদের ও মেইনহফ উভয়েই নিহত হন। তাঁদের ভক্ত ও অনুসারীরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ দলের নাম দেয় বাদের-মেইনহফ গ্রুপ (Bader-Meinhoff Group)। সত্তরের দশকের মধ্যেই এই দল হীনবল হয়ে পড়ে।

বানানা ইম্পেরিয়ালিজম বা কদলী সাম্রাজ্যবাদ। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল কলাচাষের জন্য বিখ্যাত। বিভিন্ন উন্নত দেশের, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিরা ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিশালাকায় কলার খামার স্থাপন করে। স্থানীয় জনগণকে কলাচাষে বাধ্য করে এবং কলা রফতানি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। মোটকথা, এরূপ খামার স্থাপনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরা দীর্ঘদিন যাবৎ ল্যাটিন আমেরিকার অর্থনীতি, সমাজ ও সরকারের ওপর একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে রাখে। এজন্য দক্ষিণ বা ল্যাটিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কায়দাটিকে বানানা ইম্পেরিয়ালিজম বলে অভিহিত করা হয়।

বান্দুং সম্মেলন : ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, চীনের প্রধানমন্ত্রী জো এন লাই এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমদ শোয়েকার্নোর উদ্যোগে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ আফ্রিকা ও এশিয়ার ২৯টি দেশ আফ্রো-এশীয় সংহতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক সম্মেলনে মিলিত হয়। এই সম্মেলনই বান্দুং সম্মেলন নামে খ্যাত। এই সম্মেলনে তাইওয়ান, ইসরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েনতাম, ও উত্তর ভিয়েতনামকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। এই সম্মেলন আফ্রো-এশীয় সংহতির মূলনীতি হিসাবে 'পঞ্চশীলা'কে গ্রহণ করে। বান্দুং সম্মেলনে সিয়াটোর তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার ব্যাপারে আফ্রো-এশিয়ার দেশসমূহকে পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরুন পশ্চিমা শক্তিসমূহেরও সমালোচনা করা হয়। অবশ্য ষাটের দশকেই এই সংহতিতে চিড় ধরে যায়।

বাফার স্টেট Buffer State. দুইটি বৃহৎ বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ বা সংঘাত এড়ানোর জন্য দু রাষ্ট্রের মাঝখানে সাধারণত যে-ক্ষুদ্ররাষ্ট্র সৃষ্টি করা বা বজায় রাখা হয়, সেই রাষ্ট্রকেই বলা হয় বাফার স্টেট।

বামপন্থি Lefttist. সমাজতন্ত্রী ও প্রগতিশীলদেরই এখন সাধারণভাবে বামপন্থি বলা হয়। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় গঠিত ফরাসি জাতীয় পরিষদে তৎকালীন প্রগতিশীল দলসমূহের সদস্যেরা স্পীকারের বাম দিকে বসতেন, (মধ্যপন্থিরা বসতেন মাঝখানে এবং রক্ষণশীলরা বসতেন ডানদিকে)। ফলে তাঁরা Left Winger বা বামপন্থি বলে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশের আইনসভায়ও বসার এই রীতিটি প্রচলিত হয়।

বার্ক, এডমন্ড Edmund Burke (১৭২৯-৯৭)। ডাবলিনে জন্ম। বাকিংহাম থেকে হুইগ দলীয় এম.পি নির্বাচিত হন। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে শুল্কধার্যের বিরোধিতা করে তিনি বাগ্মী হিসাবে খ্যাতিলাভ করনে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আশির দশকে তিনি ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারনে হেস্টিংসের দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেন। হুইগ আদর্শের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ফরাসি বিপ্লবের বিরোধিতা করেন। ১৭৯৩ সালে ফরাসিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তিনি ছিলেন সবচেয়ে সোচ্চার সমর্থক।

তিনি আমেরিকার স্বাধীনতার সমর্থক ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের বিরোধী হলেও আসলে তিনি ছিলেন একজন সনাতনপন্থি।

বার্টার Barter নগদ অর্থে নয়, বরং পণ্য দিয়ে পণ্যের মূল্য পরিশোধকেই বলা হয় বার্টার। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে অসমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বাণিজ্য প্রধানত বার্টারব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্পাদিত হত। এখন বার্টারের চল ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে।

বার্নস্টাইন এডুয়ার্ড বার্নস্টাইন (১৮৫০-১৯৩২) ছিলেন জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এবং সংশোধনবাদের জনক। 'সমাজতন্ত্রের সমস্যা ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের দায়িত্ব' শীর্ষক একগুচ্ছ প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে (১৮৯৭-৯৮) সমালোচনার স্বাধীনতার নামে তিনি মার্কসবাদী দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকে 'সংশোধন' করার প্রয়াস পান। তিনি কান্টের কাছে ফিরে যাওয়ার স্লোগান তোলেন, দর্শনের মৌলিক সমস্যাসমূহের বস্তুবাদী সমাধানের সর্বজনীনতা অস্বীকার করেন এবং মার্কসবাদী ও হেগেলীয় দ্বন্দ্ব তত্ত্ব একই জাতের বলে অভিহিত করেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে এবং সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বকে অস্বীকার করে তিনি বলেন যে, শ্রেণীসংগ্রাম মরে যাচ্ছে এবং শ্রমিকদের জন্য যা করা যেতে পারে, তা হল বুর্জোয়া কাঠামোর আওতায় কিছু সংস্কার। তিনি পুঁজিবাদের ধ্বংসের অনিবার্যতাকেও অস্বীকার করেন এবং শ্রেণীসংঘাতের বদলে সকল শ্রেণীর মৈত্রীর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এই সংশোধনবাদী চিন্তা থেকেই বেরিয়ে আসে তাঁর তত্ত্ব "চূড়ান্ত লক্ষ্য কিছুই না, আন্দোলনই হল সবকিছু"। মার্কসীয় লেনিনীয় সমাজতন্ত্রে ধস নামার পর অনেকে বার্নস্টাইনদের তত্ত্বকেই অধিকতর সঠিক বলে মনে করেন।

বার্লিন টানেল Berlin Tunnel. ইউরোপে স্নায়ুযুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন সিআইএ কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানিতে গোয়েন্দা তৎপরতা চালানোর উদ্দেশ্যে পশ্চিম বার্লিন থেকে আধা কিলোমিটার দীর্ঘ এই সুড়ঙ্গ বা টানেল নির্মাণ করে এবং পূর্ব জার্মানির দুর্ভেদ্য গোয়েন্দা নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এই সুড়ঙ্গ পূর্ব জার্মানির একটি আর্মি রাডার স্টেশনের তলা দিয়ে চলে যায়। ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে একটি দ্বিতল বাসে সিআইএ ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তারা সুড়ঙ্গ প্রকল্পের ব্যাপারে আলোচনায় মিলিত হলে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থায় ঘাপটি মেরে থাকা কেজিবির আন্ডারকভার এজেন্ট জর্জ ব্ল্যাক বিষয়টি জেনে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্কোকে তা জানিয়ে দেয়। মস্কো না জানার ভান করে থাকে এবং এক বছর পর রুটিন চেকআপ করতে গিয়েই যেন টানেলটির সন্ধান পেয়েছে—এরূপ ভালো করে টানেলটি বন্ধ করে দেয়। বার্লিনে সিআইএ-র অপারেশন বেসের সাবেক প্রধান ডেভিড মারফি, সিআইএর রেডিও ল্যাবরেটারির সাবেক পরিচালক জর্জ বেইলি ও কেজিবির অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল সার্গেই কন্দ্রাসভ 'ব্যাটল গ্রাউন্ড বার্লিন দি সিআইএ ভার্সাস কেজিবি ইন দ্য কোল্ড ওয়ার' শীর্ষক বইটি লিখে প্রকাশ করলে বিশ্ববাসী এ ব্যাপারে জানতে পারে।

বাস্তবতাবাদ : এই দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী মানুষের চেতনা-নিরপেক্ষভাবে বস্তুজগতের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে। বলাবাহুল্য, এই মতবাদ ভাববাদের বিপরীত। সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে বাস্তববাদীরা ভাব-কল্পনা (Romanticism) এবং জীবনকে মিথ্যা কল্পনার রঙে রাঙানোর বিরোধী। তাঁরা জীবন যেমন ঠিক তেমনি চিত্রিত করার পক্ষপাতী। বাস্তবতাবাদের ইংরেজি হল Realism.

বাস্তুত্যাগী বাস্তুত্যাগী বিভিন্ন রকম হতে পারে। কেউ ব্যক্তিগত বা আর্থিক কারণে বাস্তুত্যাগ করতে পারে। কেউ বাস্তুত্যাগ করতে পারে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় নিষ্পেষণের কারণে। এ ছাড়াও যুদ্ধজানিত কারণে যারা নিরাপত্তার জন্য স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হয়, তাদেরকেও বলা হয় বাস্তুত্যাগী (Evacuee)।

বি.এন.পি. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা Bangladesh Nationalist Party (BNP), ১৯৭৮ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক গঠিত। জিয়াউর রহমান (জন্ম ২৯.১.১৯৩৬) ১৯৫৫ সালে ত ৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় খেমকারান সেক্টরে যুদ্ধ করেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাক হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরু করলে চট্টগ্রামস্থ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসাবে বিদ্রোহ করেন এবং ২৬ মার্চ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে নিজ নামে এবং ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি জেড-ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সিপাহি জনতার অভ্যুত্থানের ফলস্বরূপ জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং তারই ভিত্তিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) গঠন করেন। বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে জাগদলের প্রধান মনোনীত করা হয়। ১৯৭৮ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর জাগদলের অবলুপ্তি ঘটিয়ে বিএনপি গঠন করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট জিয়া সরাসরি এ-দলের চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে এ-দল বিজয়ী হয় এবং ১৯৭৫-এর পর পুনরায় বাংলাদেশে পার্লামেন্ট চালু হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়া সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী অফিসারের হাতে নিহত হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার দেশের প্রেসিডেন্ট ও দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিচারপতি সাত্তার নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার কয়েক মাস পরই ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ত ৎকালীন প্রধান সেনাপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এক সামরিক ক্যু-এর মাধ্যমে বিএনপি সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। উৎখাত হওয়ার পর বিচারপতি সাত্তার রাজনীতি থেকে সরে যান এবং নিহত প্রেসিডেন্ট জিয়ার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দলের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি এরশাদের বিরুদ্ধে লাগাতার আপোসহীন আন্দোলন পরিচালনা করে। ১৯৮৯-৯০ সালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের ফলে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং ১৯৯১-এর পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হয়ে পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিএনপি পরাজিত হয় এবং আওয়ামী লীগ পুনরায় সরকার গঠন করে। বিএনপি দাবি করে যে, তাদের আদর্শ হচ্ছে আওয়ামী লীগের 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর বিপরীতে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'। আর বিএনপির কর্মসূচি হচ্ছে ১৯৭৭ সালে ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচি, যার মধ্যে রয়েছে দেশের স্বাধীনতা অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বরক্ষা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র, আত্মনির্ভরশীলতা, উৎপাদন বৃদ্ধি,

অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সংস্থান, নারীর মর্যাদা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শ্রমিককল্যাণ, জনসংখ্যাবৃদ্ধিরোধ, সমতাভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়। বিএনপি তাদের রাজনীতিকে 'উৎপাদনের রাজনীতি' বলেও দাবি করে থাকে। বিএনপিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী লোক, সাবেক সাম্যবাদী-সমাজতন্ত্রী, মুসলিম লীগ প্রমুখ রক্ষণশীল ঘরাণার লোকসহ বিভিন্ন ঘরাণা ও চিন্তাচেতনার মানুষের অবস্থান রয়েছে। বিএনপি বাংলাদেশের বৃহত্তম দুটি দলের অন্যতম দল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তি যেমন আওয়ামী লীগের মূল চালিকাশক্তি তেমনি বিএনপির মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে জেনারেল জিয়াউর রহমানের ভাবমূর্তি।

বিকল্প ভোট এটি হল একটি নির্বাচনব্যবস্থা, যাতে নির্বাচকমণ্ডলীকে দ্বিতীয়বার প্রতিনিধিত্ব সাব্যস্ত করার অধিকার প্রদান করা হয়। এইরূপ নির্বাচনব্যবস্থায় কোনো প্রার্থী যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তা হলে বিকল্প ভোটের আর প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কোনো প্রার্থীই যদি প্রথমবারে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করে, তা হলে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দুজন প্রার্থীকে যারা ভোট দিয়েছিল তাদের ছাড়া বাকি প্রার্থীদের ভোট দানকারীদের এই সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে তারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী যে-কোনো একজনের পক্ষে পুনরায় ভোট দিতে পারে। প্রথমবারে প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে দ্বিতীয়বারে প্রাপ্ত ভোট যোগ করার পর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রার্থীর মধ্যে যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন, তাঁকেই নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা চালু আছে।

বিকল্প সদস্য Alternate Member. সাধারণত সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি ও পলিট ব্যুরোর কিছুসংখ্যক বিকল্প সদস্য থাকেন। বিকল্প সদস্যেরা স্ব স্ব স্তরের কাঠামোর দ্বিতীয় পর্যায়ের সদস্য। উক্ত কাঠামোয় কোনো পদ খালি হলে তা বিকল্প সদস্যদের মধ্য থেকেই সাধারণত পূরণ করা হয়। তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট কমিটির বর্ধিত সভায় বিকল্প সদস্যেরাও আসনগ্রহণ করে থাকেন।

বিকেন্দ্রীকরণ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতাকে একক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রের হাতে সীমাবদ্ধ রাখার বদলে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াকে বলে বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation). বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্যাবসা প্রশাসন পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

বিক্ষোভ সৃষ্টি Agitation. কোনো একটি বিশেষ সামাজিক অথবা রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সৃষ্টি বা রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য জনগণকে উত্তেজিত করে তোলা এবং বিভিন্নভাবে তার প্রকাশ ঘটানোকে বলে বিক্ষোভ সৃষ্টি। সাধারণত বিক্ষোভ সৃষ্টি করা হয় কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বে। বিক্ষোভ সৃষ্টির পদ্ধতি হল প্রচার, বক্তৃতা, গ্রুপ বৈঠক, গোপন বৈঠক ইত্যাদি অনুষ্ঠান এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের উপায় হল মিছিল, ধর্মঘট, হরতাল, ঘেরাও, স্লোগান প্রদান ইত্যাদি।

বিচ্ছিন্নতা : কোনো রাষ্ট্র, সংঘ, প্রতিষ্ঠান বা দল থেকে বেরিয়ে-আসা বা বিচ্ছিন্ন হওয়াকে বলে বিচ্ছিন্নতা আর যারা এভাবে বিচ্ছিন্ন হতে চান তাঁদেরকে বলা হয় বিচ্ছিন্নতাবাদী।

যেমন, ১৭৭৬ সালে আমেরিকার ১৪টি ব্রিটিশ কলোনি গ্রেট ব্রিটেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। অথবা যেমন, ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে পরিণত হয়। অথবা যেমন ভারতীয় কংগ্রেসের কিছুসংখ্যক নেতা-কর্মী বিচ্ছিন্ন হয়ে জনতা পার্টি গঠন করে।

বিচ্ছিন্নতাবাদ : অন্য কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বা অন্যান্য দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধবিগ্রহে না জড়িয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকার নীতিই হল বিচ্ছিন্নতাবাদ বা স্বাতন্ত্র্যবাদ (Isolationism)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম মহাযুদ্ধের পরপর এই মত প্রাধান্য লাভ করায়, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন-এর ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও প্রথম জাতিসংঘ বা লীগ অব নেশনসে যুক্তরাষ্ট্র যোগদান করতে সমর্থ হয়নি।এই মতবাদীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালেও ইংল্যান্ড বা অন্য কোনো দেশকে সাহায্য-সহযোগিতা না দেওয়ার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু ১৯৪০ সালের দিকে যুদ্ধ প্রবলাকার ধারণ করলে এটা অনুভূত হয় যে, মিত্রশক্তি পরাজিত হলে যুক্তরাষ্ট্রও বিপন্ন হয়ে পড়বে, ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন থাকা আর সমীচীন নয়। এই উপলব্ধি থেকেই যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষের পক্ষ অবলম্বন করে। বর্তমান বিশ্ব এতই আন্তর্জাতিক এবং লেনদেন ও স্বার্থাদি এতই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যে, এখন কারও পক্ষেই পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা দুঃসাধ্য।

বিদআত শব্দগত অর্থ হল পূর্বে যার নজির নেই। রাসুলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে, কেরামদের দ্বারা অনুসৃত হয়নি এমন কর্মকাণ্ড বা নিয়ম কানুনকেই বলে বিদআত। বিদআত দুপ্রকার; বিদআতুল হাসানা (বা কল্যাণকর বিদআত) ও বিদআতুস সাইয়া (বা ক্ষতিকর বিদআত)। যে-সমস্ত কর্মকাণ্ড বা নিয়মকানুন রাসুলুল্লাহ (সা) বা সহাবায়ে কেরামদের আমলে প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রয়োজন হয়েছে, অথচ এসব কর্মকাণ্ড বা আইন-কানুন কুরআন সুন্নাহ্র কোনো অনুশাসনের বিরোধী নয়, এগুলোই হচ্ছে বিদআতুল হাসানা। যেমন বাসে বা ট্রেনে যাতায়াত, বিদ্যুৎবাতির ব্যবহার, পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত আইন, পাসপোর্ট-ভিসাসংক্রান্ত আইন, আণবিক শক্তি কমিশন বা রেলওয়ে মন্ত্রণালয় গঠন ইত্যাদি হাজারো বিষয় হল বিদআতুল হাসানার অন্তর্গত। আর যে সমস্ত কর্মকাণ্ড, বিশ্বাস বা আইন-কানুন কুরআন সুন্নাহ্র আদেশ, নির্দেশ বা মর্মবাণীর বিরোধী তা বিদআতুস সাইয়া। যেমন, ড্রাগআসক্তি, মহিলাদের পর্দাহীনতা, অশ্লীলতাকে সঠিক জ্ঞান করা, আল্লাহ্কে সদা সর্বত্র বিরাজমান নয় বা অচেতন বলে মনে করা, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সকল দিকের অনুসরণ সকল কালে সম্ভবপরও নয় প্রয়োজনীয়ও নয় মনে করা, সুদকে কোনো পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য মনে করা ইত্যাদি হাজারো বিষয় হল বিদআতুস সাইয়ার অন্তর্গত।

বিদেশী চর Foreign Agent. কোনো ব্যক্তি যদি একদেশে থেকে অর্থ বা স্বার্থের বিনিময়ে অন্য দেশের স্বার্থে কাজ করে, তা হলে তাকে বলা হয় বিদেশী চর। বিদেশী চর যে-দেশের স্বার্থে কাজ করছে সে-দেশের অধিবাসী হতে পারে আবার যে-দেশে কাজ করছে সে-দেশেরও অধিবাসী হতে পারে। এমনকি তৃতীয় কোনো দেশের অধিবাসী হওয়াও বিচিত্র নয়। বিদেশী চরেরাও একধরনের গুপ্তচর। সভ্যতার আদিকাল থেকেই এরূপ চরবৃত্তি চলে আসছে।

বিনিয়োগকারী বা এন্ট্রেপ্রেনার (Entrepreneur)। এটি একটি ফরাসি শব্দ। যে-ব্যক্তি মুনাফালাভের উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদনের জন্য জমি, যন্ত্রপাতি, ও শ্রমশক্তিতে মূলধন বিনিয়োগ করে, তাকেই বলে বিনিয়োগকারী বা এন্ট্রেপ্রেনার।

বিপরীত সত্তার অন্তর্মিলন : (Interpenetration of Opposites) দ্বন্দ্ব তত্ত্বের অন্যতম প্রধান সূত্র। এর অর্থ এই যে, সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার মধ্যেই বিপরীত সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। এই বিপরীত সত্তা একদিকে যেমন সংহত বা অন্তর্মিলিত হয়ে আছে, অপরদিকে তেমনি রয়েছে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। ওই অন্তর্মিলনের জন্যই বস্তু বা ঘটনাটি বর্তমান পর্যায়ে বা অবস্থায় রয়েছে। অন্তর্মিলন আপেক্ষিক; ফলে বস্তু বা ঘটনার স্বরূপও আপেক্ষিক। অন্তর্মিলনের দিকটা যতক্ষণ প্রধান থাকছে, ততক্ষণ বস্তু বা ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে যেমন আছে তেমনি থাকছে। কিন্তু বিপরীত সত্তার দ্বন্দ্বের ফলে এক পর্যায়ে গিয়ে বস্তু বা ঘটনা পরিবর্তিত হয়ে নতুন বস্তু বা ঘটনার উদ্ভব হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত নতুন বস্তু বা ঘটনার অভ্যন্তরেও শুরু হচ্ছে নতুন বিপরীত সত্তার অন্তর্মিলন ও দ্বন্দ্ব। এই প্রক্রিয়া আবহমান কাল ধরে চলছে এবং সময়ের শেষ পর্যন্ত চলবে। এই সূত্র প্রকৃতি ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। এইরূপ দুই বিপরীত সত্তা ছাড়া কোনো অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। যেমন, দাস বা দাস-মালিক ছাড়া দাসসমাজ হতে পারে না এবং পুঁজিপতি ও শ্রমিক ছাড়া পুঁজিবাদী সমাজ হতে পারে না। দাস ও দাস-মালিকের দ্বন্দ্ব যতক্ষণ প্রবল হয়নি ততক্ষণ দাসসমাজ বলবত থেকেছে। কিন্তু দাস ও দাস মালিকদের দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে দাসসমাজ ধ্বংস হয়ে সামন্তবাদী সমাজের উদ্ভব ঘটেছে। তখনও তাতেও থেকেছে দুই নতুন বিপরীত সত্তা অর্থাৎ সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাস। সাম্যবাদী সমাজেও দ্বন্দ্ব থাকবে, তবে সে-দ্বন্দ্ব বৈরী না হয়ে অবৈরী রূপ ধারণ করবে বলে সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন। বলা বাহুল্য, প্রকৃতিবিজ্ঞানেও রয়েছে বিপরীত সত্তার অন্তর্মিলন, যেমন গণিতের যোগ ও বিয়োগ, পদার্থবিদ্যার ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তি ইত্যাদি।

বিপ্লব Revolution. এর অর্থ আমূল পরিবর্তন। মার্কসবাদ অনুযায়ী বিপ্লব হল এক শ্রেণীকে উৎখাত করে অপর শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, যেমন বুর্জোয়াদের উৎখাত করে সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। মার্কসবাদী বিপ্লবের বস্তুগত ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি দীর্ঘদিনের হলেও ক্ষমতাদখলের ব্যাপারটি ঘটে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এবং আকস্মিকভাবে। সমাজ ও রাষ্ট্ররূপের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবের পর্যায়ও বিভিন্ন হতে পারে, যেমন বুর্জোয়া বিপ্লব, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইত্যাদি। কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করছে সেটাই বিপ্লবের পর্যায়ের নির্ধারক। মার্কসবাদী বিপ্লবীরা অবশ্য অবস্থাভেদে অন্তর্বর্তীকালীন বিভিন্ন স্তরের কথাও স্বীকার করেন। বিপ্লব সম্পন্ন হলে, অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল হলেই বিপ্লবের কাজ শেষ হয়ে যায় না। বরং শুরু হয় বিপ্লবের কঠিনতর পর্যায়, অর্থাৎ, সমাজব্যবস্থাকে পালটানোর কাজ। বিপ্লব সম্পন্ন করা এবং বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ করা ঠিক এক ব্যাপার নয়, বরং প্রথমটি দ্বিতীয়টির শর্ত। অনেকে মনে করেন যে, বিপ্লব আমূল পরিবর্তন ঠিকই, তবে তা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সম্পন্ন করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। এঁদের মতে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে যেমন বিপ্লব সম্ভবপর, তেমনি এক-একটা ঐতিহাসিক পর্যায়ে বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকেও

বিরাট পরিবর্তন সম্ভবপর। বড় ধরনের আন্দোলন, বিদ্রোহ বা মৌলিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন না করে, বড় ধরনের সংস্কারকেরও অনেক বিপ্লব বলে অভিহিত করেন। তবে মার্কসবাদীরা এগুলোকে বিপ্লব বলে স্বীকার করেন না।

বিপ্লব, ইংল্যান্ডের ১৬৪২ সাল থেকে ১৬৮৯ সাল পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত বিপ্লব। এর প্রথম অংশ (১৬৪২-৪৮)কে বলা হয় ক্রমওয়েল বিপ্লব এবং দ্বিতীয় অংশকে (১৬৮৮-৮৯) বলা হয় ইংলিশ বিপ্লব। এই বিপ্লবের মূল কাজ ছিল শিল্প-বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ সামন্তবাদের মূলোৎপাটন করা। ১৬০৩ সালের দিকে বুর্জোয়াশ্রেণী মোটামুটি শক্তিশালী হয়ে উঠলে সামন্তবাদের সমর্থক ক্যাথলিক ও পুঁজিবাদের সমর্থক প্রোটেস্টেন্টদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। ১৬৪২ সালে রাজা প্রথম চার্লস বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের আধিপত্যপূর্ণ পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং পার্লামেন্টের নেতা অলিভার ক্রমওয়েল, কিম ব্যাম্পডেন প্রমুখকে গ্রেফতার করার উদ্যোগ নেন। ব্যবসায়ী ও ধনীদের প্রতিরোধের মুখে রাজা চার্লস পালিয়ে গিয়ে এক নয়া সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। ১৬৪৪ সালে ক্রমওয়েলের হাতে রাজকীয় বাহিনী পরাজিত হয়। ১৬৪৭ সালে ক্রমওয়েলের হাতে রাজকীয় বাহিনী পরাজিত হয়। ১৬৪৭ সালে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। রাজা স্কটল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১৬৪৯ সালে রাজা প্রথম চার্লস চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও বন্দি হন। বিচারে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। এর ফলে ক্যাথলিকরা বিতাড়িত হয় এবং ধনিকশ্রেণীর কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর ১৬৬০ সালে বিপ্লবীদের দক্ষিণপন্থি অংশ রাজতন্ত্রের সঙ্গে আপোস করে এবং প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে ক্ষমতায় বসায়। দ্বিতীয় চার্লসের পুত্র জেমস্ ক্যাথলিকতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উদ্যত হলে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। ১৬৮৯ সালে জেমস্ পালিয়ে যান এবং উইলিয়াম অব অরেঞ্জ ও মেরি রাজা-রানি পদে অধিষ্ঠিত হন। নতুন রাজা-রানি পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ও এর দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্রকে স্বীকার করে নেন। ১৬৮৯ সালের এই বিপ্লব 'ইংলিশ বিপ্লব' নামে খ্যাত। ইংল্যান্ডের বুর্জোয়াশ্রেণী রাজতন্ত্রের সঙ্গে একধরনের আপোসের পথ গ্রহণ করে, যার ফলে রাজতন্ত্র ও হাউস অব লর্ডস থেকে যায়; কিন্তু প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতেই চলে আসে।

বিপ্লব, জনগণতান্ত্রিক People's Democratic Revolution. আধা-উপনিবেশিক-আধা-সামন্তবাদী দেশের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। এরূপ বিপ্লবের ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়া বা উঠতি বুর্জোয়াদের বিপ্লবের পক্ষে নেওয়া হয় বটে, কিন্তু নেতৃত্বটা থাকে সর্বহারা শ্রেণীর হাতে। অন্য কথায়, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সাধিত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবই হল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। এরূপ বিপ্লব সম্পন্ন হলে আর-একটি দ্বন্দ্বমূলক ও রক্তক্ষয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজন পড়ে না। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণীই রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয় বিধায় রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে আর কাউকে উচ্ছেদের প্রশ্ন আসে না, ফলে এ-পর্যায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটে বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ায়।

বিপ্লব, জাতীয় : National or Nationalist Revolution. জাতীয় স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে বিদেশী দখলদারের বিরুদ্ধে উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশের জনগণের বিপ্লবই হল জাতীয় বিপ্লব। বিদেশীরা উৎখাত হলে জাতীয় পুঁজির বিকাশ সহজ হবে,

এই আশায় সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ কর্তৃক পদানত জাতীয় বুর্জোয়ারাও জাতীয় বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে। অনেক ক্ষেত্রে উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ও এলিট প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামের মধ্য দিয়েও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়। যেমন—ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা। আবার অনেক ক্ষেত্রে তা অর্জিত হয় সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে। যেমন চীন ও উত্তর কোরিয়ার স্বাধীনতা।

বিপ্লব, জাতীয় গণতান্ত্রিক National Democratic Revolution. উপনিবেশবাদীরা তাদের শাসন-শোষণের স্বার্থে উপনিবেশসমূহে একদিকে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নস্যাৎ করে এবং অন্যদিকে জাতীয় পুঁজির বিকাশের সম্ভাবনাকে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে স্থানীয়ভাবে সামন্তবাদকে কায়েম রাখে এবং এর সঙ্গে আঁতাঁত করে। ফলে, উপনিবেশের মুক্তিকামীদের সামনে থাকে দুটি দিক এক. উপনিবেশবাদের কবল থেকে জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের দিক এবং দুই. সামন্তবাদ (যা গণতন্ত্রের অন্তরায়)কে উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র কায়েমের দিক। এই দুই কাজ একই সঙ্গে সম্পন্ন করতে হয় বলে এরূপ বিপ্লবকে বলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বনেদি উপনিবেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ হয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক-আধা-সামন্তবাদী দেশে এর রূপ হয় জনগণতান্ত্রিক। অর্থাৎ এ-বিপ্লব বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সম্পাদিত হলে তাকে বলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সম্পন্ন হলে এর নাম হয় জণগণতান্ত্রিক বিপ্লব।

বিপ্লব, ফরাসি French Revolution. এটি ইউরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব। ভলতেয়ার, রুশো প্রমূখ ছিলেন এই বিপ্লবের দার্শনিক অগ্রদূত। ধনিকশ্রেণী ছিল এই বিপ্লবের নায়ক এবং অত্যাচারিত কৃষকেরা ছিল মিত্রবাহিনী। ১৭৮৯ সালে রাজা ষোড়শ লুই প্যারিসে অভিজাত শ্রেণী, পুরোহিত ও মধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। প্রতিনিধিরা শাসনসংস্কার দাবি করলে ক্রুদ্ধ রাজা সম্মেলন নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু গণপ্রতিনিধিরা রাজার নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে একটি গণপরিষদ গঠন করেন এবং ভীত রাজা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। অতঃপর রাজা তাঁর অনুগত বাহিনীকে প্যারিসে আনার চেষ্টা করলে ক্রুদ্ধ জনসাধারণ ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসের কুখ্যাত ব্যাস্টিল দুর্গ ও কারাগার দখল করে সমস্ত বন্দিকে মুক্ত করে দেয়। শুরু হয়ে যায় ফরাসি বিপ্লব। অবিলম্বে এ বিপ্লব সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটে। এদিকে গণপরিষদ ইতিহাসবিখ্যাত 'মানবাধিকার ঘোষণাপত্র' রচনা করে। এতে রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে নাকচ করে দেয়া হয়। ভার্সাইতে অবস্থানকারী রাজা এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলে, ডান্টন বা দাঁতোঁ-এর নেতৃত্বে জনগণ ভার্সাই আক্রমণ করে এবং রাজাকে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করে। রাজা পুনরায় সামরিক শক্তি সংহত করতে উদ্যত হলে, রাজাকে বন্দি করা হয়। ১৭৯২ সালে অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার রাজারা বন্দি ফরাসি রাজাকে উদ্ধারের উদ্যোগ নেন। এমতাবস্থায়, গণপরিষদ রাজা ষোড়শ ল্যুইকে সিংহাসনচ্যুত করে, জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং ফ্রান্সকে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করে। ১৭৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে গণদাবির প্রেক্ষিতে গিলোটিনে রাজা ষোড়শ ল্যুই-এর শিরশ্ছেদ করা হয়। অতঃপর ক্ষমতাসীন গিরোঁদি (Girondins) দল বিপ্লববিরোধী ভূমিকা নিলে এর নেতৃত্বে জেকোবিঁ (Jacobins)-রা ক্ষমতাদখল করে নেয়। এরা সামন্তবাদের

ধ্বংসাবশেষও নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দেয়। রোবস্পেয়ার (Robspeare)-এর নেতৃত্বে বিপ্লব পরিচালনার জন্য গঠিত হয় 'জন নিরাপত্তা কমিটি'। এ-সময় দলের দক্ষিণপন্থিরা সন্ত্রাসবাদের অবসান এবং ক্রুদ্ধরা (Enragers) আরও বেশি সন্ত্রাস দাবি করে। ক্রুদ্ধরা কোণঠাসা হয়ে পড়লে, ১৭৯৪ সালে এর নায়ক হেবার্টকেও গিলোটিনে শিরশ্ছেদ করা হয়। অন্যদিকে এপ্রিল মাসে চক্রান্তের অভিযোগে দাঁতোঁ (Danton)কেও একইভাবে হত্যা করা হয়। এ-সময় বিপ্লবের নায়ক রোবস্পেয়ার দোদুল্যমানতা প্রদর্শন করলে তাঁকেও গিলোটিনে শিরশ্ছেদ করা হয়। এই সুযোগে ধনীদের সমর্থনে গিরোঁদাঁরা পুনরায় ক্ষমতাদখল করে সর্বত্র শ্বেতসন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয় এবং রোবস্পেয়ারপন্থিদের পাইকারিভাবে হত্যা করতে থাকে। এই সময় বেবেউফ-এর নেতৃত্বে ফ্রান্সের শ্রমিকরা শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে (১৭৯৬)। এটাই বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই রক্তের বন্যায় এই বিদ্রোহ ডুবে যায় এবং বেবেউফকেও গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়। এই নৈরাজ্যবাদী পটভূমিতেই নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ক্ষমতা-দখল করেন। সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তিনি ফরাসি বিপ্লবের মূলবাণী 'মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্পত্তির পবিত্র অধিকার'-এর ধ্বনি ইউরোপের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। ১৮২২ সালে নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করে পরাজিত হন। ১৮১৫ সালে ওয়াটালুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র ইউরোপ থেকে অচিরেই সামন্তবাদের মূল উৎপাটিত হয়ে যায়।

বিপ্লব, বুর্জোয়া পুঁজিবাদী বিকাশের পথে অবস্থিত অন্তরায়সমূহ অপসারণের বিপ্লবই হল বুর্জোয়া বিপ্লব। ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই বিপ্লবের সূচনা বলে মনে করা হয়। এই বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রদান করে উঠতি পুঁজিপতি বা বুর্জোয়াশ্রেণী। অনেক ক্ষেত্রে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তির স্বার্থে সর্বহারারাও এরূপ বিপ্লবে বুর্জোয়াদের পক্ষ নেয়। ক্ষেত্রবিশেষে এরূপ বিপ্লবের পর্যায়ে নেতৃত্ব হাতবদল হয়ে বুর্জোয়াদের হাত থেকে সর্বহারাদের হাতে চলে আসতে পারে। এই বুর্জোয়া বিপ্লবেরই অপর এক রূপ হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। পুঁজিবাদী বিকাশের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বহারা ও কৃষকশ্রেণীর মৈত্রীর মাধ্যমে সংঘটিত বিপ্লবেরই নাম হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কোনো উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশিক দেশে সংঘটিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়।

বিপ্লব, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক Bourgeoise Democratic Revolution. বনেদি উপনিবেশে উপনিবেশবাদী শক্তি ও তাদের দেশীয় মিত্র সামন্তবাদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকেই বলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লবে উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদের দ্বারা অবদমিত বুর্জোয়া বা উঠতি বুর্জোয়ারাও জনগণের পক্ষে থাকে, এমনকি নেতৃত্ব দিতেও এগিয়ে আসে, কারণ তারা মনে করে যে, উপনিবেশবাদ-সামন্তবাদ উচ্ছেদ হলে এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্র কায়েম হলে তাদের পুঁজির বিকাশ সুনিশ্চিত হবে। আপামর জনগণও অধিকতর শত্রু ও জাতীয় বিকাশের অধিকতর অন্তরায় উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য জাতীয় পুঁজিবাদীদের পক্ষ নেয়। বস্তুত এই বিপ্লব সম্পন্ন হলে জাতীয় পুঁজিপতিরাই রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে এবং জাতীয় পুঁজির বিকাশ ঘটে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় বুর্জোয়া

বিপ্লব সম্পন্ন হলে, তারপর বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি পর্যায় থেকেই যায়। এক কথায় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সম্পাদিত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকেই বলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

বিপ্লব, মার্কিন American Revolution. ১৭৭৬ সালে যে-রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমেরিকা ব্রিটিশ শাসনের কবলমুক্ত হয়, সেই সংগ্রামই মার্কিন বিপ্লব নামে খ্যাত। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলেও, এই যুদ্ধ শুরু হয় ১৭৭৫ সালে এবং তা চলে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত। পূর্ব থেকেই ব্যাবসা-বাণিজ্য ও স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্রিটিশদের সঙ্গে আমেরিকাপদের বিবাদ চলে আসছিল। ১৭৭৫ সালে ব্রিটিশ সরকার স্ট্যাম্প ট্যাক্স ধার্য করলে অবস্থা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ১৭৭৩ সালে মার্কিনিরা বোস্টনে তিনটি ব্রিটিশ-জাহাজের পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেয়। ১৭৭৪ সালে ফিলাডেলফিয়া নগরে এক কংগ্রেসে সমবেত হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মার্কিন জনগণের মৌলিক অধিকার-সংবলিত এক ঘোষণাপত্র তৈরি করেন। ১৭৭৫ সালে মার্কিন জনগণ একদল ব্রিটিশ সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের পরাজিত করে। এই আক্রমণের মধ্য দিয়েই বিরোধ যুদ্ধে রূপ পরিগ্রহ করে। জর্জ ওয়াশিংটন মার্কিনবাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে আমেরিকায় অবস্থিত ফরাসি সৈন্যেরা স্বাধীনতাকামী মার্কিনিদের পক্ষ অবলম্বন করে। ১৭৭৬ সালে ১৩টি রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৭৮১ সালে প্রধান ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড কর্নওয়ালিশ পরাজিত হয়ে জর্জ ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করলে স্থলভাগের যুদ্ধ প্রধানত শেষ হয়ে যায়। ১৭৮৩ সালে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও ১৮১৪ সাল পর্যন্ত জলযুদ্ধ বলবৎ ছিল। স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচিত হয় ১৭৮৭ সালে। এই বৎসরই জর্জ ওয়াশিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৮০০ সালের পর অন্যান্য রাজ্যও মূল ১৩টি রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগদান করে। ১৯০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫টিতে। পরবর্তীতে আরও কিছুসংখ্যক রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে।

বিপ্লব, রুশ Russian Revolution. ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে কেরনস্কি সরকারকে উচ্ছেদ করে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি তথা রাশিয়ার সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই হল রুশবিপ্লব। খাদ্যাভাব মোকাবেলায় কেরনস্কি সরকারের ব্যর্থতা ও প্রবঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে এ-বছরের প্রথম থেকেই তীব্র শ্রমিক-বিক্ষোভ শুরু হয়। রসদহীন, অস্ত্র-গোলাবারুদের পর্যাপ্ত সরবরাহবঞ্চিত বিক্ষুব্ধ সৈন্যেরাও এ-সময় বিদ্রোহী শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেয়। ৩ জুলাই পেট্রোগ্রাডে পাঁচ লক্ষ শ্রমিক ও সৈন্যদের এক শোভাযাত্রার ওপর কেরনস্কির অনুগত সৈন্যরা গোলাবর্ষণ করলে কয়েক হাজার শ্রমিক ও সৈন্য নিহত হয়। সেনাপতি কোনিলভের নেতৃত্বে এক বিমানবাহিনী বলশেভিক-প্রভাবিত পেট্রোগ্রাড অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করলে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন লালফৌজ তাদের পরাজিত ও পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। ইতিমধ্যেই লেনিন সুইজারল্যান্ড থেকে রাশিয়ায় চলে এসেছিলেন এবং স্ট্যালিন সাইবেরিয়া থেকে পেট্রোগ্রাডে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন। ৬ নভেম্বর রাতে লেনিন তাঁর গোপন আশ্রয়স্থান থেকে বেরিয়ে এসে স্মোলনি প্রাসাদে উপস্থিত হন এবং বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাতের মধ্যেই তাঁরা নগরীর কেন্দ্রস্থল দখল করেন এবং 'শীত প্রাসাদ' ঘিরে ফেলেন।

দুর্গের সৈন্যেরা বলশেভিকদের পক্ষে যোগদান করে এবং যুদ্ধজাহাজ অরোরাও বিপ্লবীদের পক্ষে যোগ দিয়ে শীতপ্রাসাদ-এর ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। ফলে শীতপ্রাসাদ-এর পতন ঘটে এবং কেরেন্স্কি মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য গ্রেফতার হন। ঐ দিনই স্মোলনি প্রাসাদের বিপ্লবকেন্দ্র থেকে কেরেন্স্কি সরকারের উচ্ছেদ ও নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ইশতেহার জারি করা হয়। এই ইশতেহারের ফলে জার পরিবার, জমিদার ও কুলাকদের বিপুল জমি (৪০ কোটি একর) বাজেয়াপ্ত করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া যাবতীয় খনিজসম্পদ, নদী ইত্যাদিকেও জনগণের সম্পত্তিরূপে ঘোষণা করা হয়। মস্কোয় প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বলশেভিকরা বিজয়লাভ করে। বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের সহায়তায় বিপ্লববিরোধীরা ১৯২১ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু গণপ্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে।

বিপ্লব, শান্তিপূর্ণ Peaceful Revolution. বিপ্লবের সাধারণ অর্থ হল একটি অবস্থিত সরকার ও ব্যবস্থাকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করে নয়া সরকার-ব্যবস্থা কায়েম করা। কিন্তু, শান্তিপূর্ণ বিপ্লব-এর তত্ত্বে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, একটা শক্র-সরকার ও ব্যবস্থাকে শান্তিপূর্ণ উপায়েও অপসারণ করা যায়, যদি ব্যাপক জনগণ বিপ্লবের পক্ষে থাকে। তাঁরা আরও মনে করেন যে, রক্তপাত ও যুদ্ধে না গিয়ে সঠিক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমেও একটি ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা যায়। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের উদাহরণস্বরূপ স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক আমূল পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিপ্লবে বলপ্রয়োগের অন্যতম প্রবক্তা লেনিনও শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেননি। তাঁর মতে বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়েও বিপ্লব সাধন করা সম্ভবপর হতে পারে।

বিপ্লব, সবুজ Green Revolution. ইদানীং অনুন্নত বিশ্বে সবুজ বিপ্লব কথাটাকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস পাওয়া হচ্ছে। এই বিপ্লবের প্রবক্তাদের স্লোগান হচ্ছে, "অধিক শস্য ফলাও"। তাঁরা বলেন যে, নিবিড় কৃষির মধ্যেই অনুন্নত বিশ্বের জনগণের দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কবল থেকে মুক্তির চাবিকাঠি নিহিত। বস্তুত সবুজ বিপ্লবের প্রবক্তারা অনুন্নত বিশ্বে প্রকারান্তরে শিল্পায়নেরই বিরোধিতা করেন। এই মতবাদের বিরোধীরা মনে করেন যে, শিল্পবিপ্লব কৃষিবিপ্লবের পূর্বশর্ত। সুতরাং শিল্পবিপ্লবের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে 'সবুজ বিপ্লব' 'অধিক খাদ্য ফলাও', 'কৃষি বিপ্লব' ইত্যাদি স্লোগানে মুখর হওয়া আসলে অনুন্নত দেশসমূহকে অনুন্নত রাখা তথা উন্নত দেশসমূহের বাজার হিসাবে বহাল রাখারই কৌশলমাত্র।

বিপ্লব, সর্বহারা শ্রেণীর Proletarian Revolution. সর্বহারা শ্রেণীর সংগঠন বা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র ও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাকেই বলে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব। সর্বহারা শ্রেণীই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান চালিকাশক্তি এবং এ-বিপ্লবের উদ্দেশ্যই হল ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এই বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নামেও অভিহিত হয়। রাশিয়ার ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবই বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

বিপ্লব, সাংস্কৃতিক Cultural Revolution. একটি বিপ্লবী পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে এক শ্রেণীর পতন ও অন্য শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটলেও পুরানো সমাজব্যবস্থার চিন্তা-চেতনা, ঝোঁক, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ রাতারাতি পালটে যায় না। এগুলো বহাল থাকলে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পালটানো দুষ্কর হয়ে পড়ে। তা ছাড়া রাষ্ট্রক্ষমতা পালটালেও যে-কোনো সময় প্রতিবিপ্লব ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। ফলে, আর্থ-সামাজিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা পালটানোর পাশাপাশি পূর্বতন, পশ্চাৎমুখী ও ক্ষতিকর চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদিরও আমূল পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখতে হয়। এটাকেই বলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হলে পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা, মনমানসিকতা, ঝোঁক, মূল্যবোধ ইত্যাদি পালটে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করাই হল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ। অনুরূপভাবে, ইসলামি বিপ্লব হলেও দেখা যায় যে, অনইসলামি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রাম অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মোটকথা, সকল বিপ্লবের ক্ষেত্রেই উক্ত বিপ্লববিরোধী সংস্কৃতিকে পালটে বিপ্লবী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লড়াই অব্যাহত রাখতে হয়।

বিপ্লব, সামাজিক Social Revolution. সামাজিক বিপ্লব হল সমাজের আমূল বা মৌলিক পরিবর্তন। মানব সভ্যতার অর্থাৎ সমাজসৃষ্টির ঊষাকাল থেকে সামাজিক বিপ্লব চলে আসছে এবং যতদিন মানবসমাজ থাকবে ততদিন সামাজিক বিপ্লবও অব্যাহত থাকবে। অন্য কথায়, সামাজিক বিপ্লব এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। দাসসমাজের বিরুদ্ধে সামন্ত বিপ্লব, সামন্তসমাজের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী বিপ্লব, সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইত্যাদিই হল ধারাবাহিক সামাজিক বিপ্লবের এক-একটি পর্যায়। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যেহেতু চলতেই থাকবে, সেহেতু উৎপাদিকাশক্তিরও বিকাশ ঘটতেই থাকবে, বর্ধিত উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে অবস্থিত উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্বও তাই দেখা দিতে থাকবেই এবং এর পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে গুণগত পরিবর্তনও দেখা দেবেই। ফলে, সামাজিক বিপ্লব কখনোই শেষ হবে না। তবে, অবস্থাভেদে এর রূপ পালটাতে পারে মাত্র। অবস্থাভেদে বিপ্লব সংঘাতময় না হয়ে শান্তিপূর্ণও হতে পারে, যেমন, শোষক ও শোষিত না থাকলে শ্রেণীদ্বন্দ্বও সেভাবে থাকবে না। ফলে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের প্রশ্নও আসবে না।

বিপ্লবী পরিস্থিতি Revolutionary Situation. যে-ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো-একটি বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভবপর, সে-ধরনের পরিস্থিতিকেই সামগ্রিকভাবে বলা হয় বিপ্লবী পরিস্থিতি। লেনিনের মতে, বিপ্লবী পরিস্থিতির লক্ষণ হল নিম্নরূপ ক. যখন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর পক্ষে পুরানো প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা আর সম্ভবপর হচ্ছে না, ফলে তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পর প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিচ্ছে। খ. সমাজের উঁচুনিচু সকল স্তরের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং গ. জনগণ, বিশেষত জনগণের দরিদ্রতম অংশের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে ও তারা বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন চাইছে। শুধুমাত্র বিপ্লবী পরিস্থিতি হলেই বিপ্লব হয়ে যায় না, যদিনা সাংগঠনিক প্রস্তুতিও বলবৎ থাকে। অর্থাৎ, বিপ্লবকে সঠিক পথে পরিচালনা করে বিজয়অর্জনের মতো যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীসংবলিত সাংগঠনিক শক্তি ও প্রস্তুতি (Subjective Preparation) না থাকলে বিপ্লবের বস্তুগত পরিস্থিতি (Objective Situation) বলবৎ থাকলেও বিপ্লব সংঘটিত হয় না।

বিবর্তন ও বিপ্লব Evolution and Revolution. বিকাশের অবিচ্ছেদ্য দুটি দিক। বিবর্তন হল কোনো একটি অবস্থার সেই গুণগত পরিবর্তন যা ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হতে থাকে। আর বিপ্লব হল দ্রুত গুণগত বা আকস্মিক পরিবর্তন। সমাজে একটি গুণগত পরিবর্তন সংঘটিত হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিরও দ্বান্দ্বিক নিয়মে ক্রমপরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটতে থাকে। এভাবে গুণগত পরিবর্তনের বস্তুগত ভিত্তি রচিত হয়। কিন্তু চূড়ান্ত পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন পড়ে। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া না থাকলে সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিকাশ ঘটত না। আবার বিপ্লবের পথ পরিহার করে স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলেও সমাজের ঈপ্সিত ও যথার্থ পরিবর্তন সাধিত হত না।

বিবর্তনতত্ত্ব Theory of Evolution. চার্লস ডারউইন (১৮০৯-৮২) সর্বপ্রথম প্রাণিজগৎ সম্পর্কে এই তত্ত্ব হাজির করেন। এই তত্ত্ব ছিল বহু শতাব্দীর নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ফলাফল। প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও নৃতত্ত্বের আবিষ্কারসমূহ এবং ডারউইনের বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানমূলক সফরেরই ফল ছিল এই তত্ত্ব। এই তত্ত্বানুযায়ী প্রাণিজগতের বিবর্তনের কারণ হল মিউটেশন, বংশগতি ও নির্বাচন (গৃহ পরিবেশে কৃত্রিম এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক)। বাহ্যিক পরিবেশের পটভূমিকায় যারা সবচেয়ে যোগ্য, তারাই টিকে থাকে এবং বংশবিস্তার করে। প্রাকৃতিক নির্বাচন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ক্রমাগত বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী করে গড়ে তোলে এবং প্রাণীর গঠন ও কার্যক্ষমতার বিকাশসাধন করে। এই তত্ত্বানুযায়ী মানুষসহ প্রতিটি প্রাণীই দীর্ঘদিনের ছেদহীন বিবর্তনের মধ্য দিয়েই আজকের স্ব স্ব আকারে এসে পৌঁছেছে। ভবিষ্যতেও এই বিবর্তনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে যেসব প্রাণী খাপ খাওয়াতে পারবে না, তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে, যেমন অতীতে হয়েছে ডায়নোসরসহ অনেকে, আজও হচ্ছে সোনালি ঈগলসহ অনেক প্রাণী। ডারউইনের এই তত্ত্বের মধ্যে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও এই তত্ত্ব প্রাণিজগতের উদ্ভব সম্পর্কিত ভাববাদী ও আধিভৌতিক ধারণার মর্মমূলে আঘাত হানে এবং এ-ব্যাপারে, তথা মানুষ ও মানবসমাজের বিকাশের ব্যাপারে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ভিত্তিস্থাপন করে। এঙ্গেলস এই তত্ত্বকে আরও বিকশিত করে প্রমাণ করেন যে, আদি এপ-সদৃশ (বানর নয়) অবস্থা থেকে মানুষের বর্তমান অবস্থায় আসার মূলে রয়েছে তার ক্রমবিকাশমান শ্রম ও ভাষা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এপ (Ape) একটি শারীরিক গঠনের নাম, কোনো নির্দিষ্ট প্রাণীর নাম নয়। কিন্তু অনেকে এপকে বানর বলে ভুল করেন এবং বিবর্তনবাদের ভুল ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মানুষ বানর থেকে এসেছে এবং এটাই নাকি বিবর্তনবাদীদের তত্ত্ব। আসলে বানর (Monkey) মানব-পরিবার (Anthropoid Family)-এর সদস্যই নয়। উল্লেখ্য যে, বিবর্তনতত্ত্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে অনেকাংশে সাংঘর্ষিক। যেমন বাইবেল অনুযায়ী 'অ্যাডাম' একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে বর্তমান আকৃতিতে সৃষ্ট। কিন্তু বিবর্তনতত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের উৎপত্তি পানিতে, অ্যামিবা হিসাবে; তারপর জলচর অবস্থা, উভচর অবস্থা ইত্যাদির বহুস্তর পার হয়ে মানুষের বর্তমান আকৃতিতে উত্তরণ। বিবর্তনতত্ত্বানুযায়ী বিবর্তনপ্রক্রিয়া শাশ্বত, যতদিন সৃষ্টি থকবে, ততদিন বিবর্তনের প্রক্রিয়া চলবেই। বিবর্তনতত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, আর্থ-সামাজিক বিবর্তন এবং শারীরিক-মানসিক-মেধাগত বিবর্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর ক্রিয়াশীল।

বিবর্তনবাদ বিবর্তনতত্ত্বের অনুরূপ।

বিবেকানন্দ, স্বামী (১৮৬৩-১৯০২) ভারতীয় ভাববাদী দার্শনিক। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন (১৮৮০-৮৪) এবং ১৮৯৩ সালে বেদান্ত দর্শন প্রচারের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপান সফর করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। রামকৃষ্ণের মতোই তিনি বেদান্তভিত্তিক 'একক ধর্ম'-এর প্রচারক ছিলেন। তবে, তিনি ধর্মসংস্কারকমাত্র ছিলেন না। ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁর বলিষ্ঠ স্থান ছিল। তিনি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন এবং যেসব নরমপন্থিরা ব্রিটিশের কাছে আবেদন-নিবেদনের পথ গ্রহণ করেছিল, তিনি তাঁদের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে সমাজপ্রগতির চারটি স্তর। এই চার স্তরে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা ক্ষমতায় ছিল, আছে বা থাকবে। তিনি পুঁজিবাদী সমাজকে বৈশ্যদের সমাজ বলে অবিহিত করেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, বর্ণবাদ ও সমরবাদেরও বিরোধিতা করেন।

বিমস্টেক : BIMSTEC. ১৯৯৭ সালের জুন মাসে ব্যাংককে গঠিত এই আঞ্চলিক সংস্থাটির নাম ছিল বে অব বেঙ্গল ইকনমিক কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন বা বঙ্গোপসাগর অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা। এর সদস্য ছিল বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড। পরে এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ইকনমিক কো-অপারেশন, সংক্ষেপে BISTEC. এরপর মায়ানমার এই সংস্থায় যোগ দিলে এর নাম হয় BIMSTEC. সার্ক ও আসিয়ানের মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী এই সংস্থার উদ্দেশ্য হল সদস্যদেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করে পারস্পরিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা।

বিরাষ্ট্রীয়করণ Denationalisation. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প-কারখানা ও ব্যাবসা-বাণিজ্যকে ব্যক্তিগত মালিকানায় ফেরত দেওয়া। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ফায়দা লোটে সংশ্লিষ্ট আমলা, কর্মকর্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা। জাতি এ থেকে কখনোই উপকৃত হয় না। তাই বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বিরাষ্ট্রীয়করণের ব্যাপক প্রক্রিয়া চলছে।

বিরোধ Antagonism. পরস্পরবিরোধী দুই শক্তির মৌলিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। দার্শনিক ও সামাজিক অর্থে সমাজ অথবা কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফল হিসাবেই বিরোধের সৃষ্টি। সুতরাং দ্বন্দ্ব (Contradiction) ও বিরোধ এক নয়। প্রথমটি কারণ, দ্বিতীয়টি তার ফল।

বিল অব রাইটস Bill of Rights. গণঅধিকারসম্বলিত এমন বিল, যা শাসনতন্ত্রের অংশ। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সে জনগণ ও নাগরিকদের অধিকারসংক্রান্ত ঘোষণা (Declearation of the Rights of Man and of the Citizen, 1789)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৮২ সালে কানাডায় অধিকার ও স্বাধীনতাসংক্রান্ত চার্টার (Charter of Rights and Freedoms) সেদেশের শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। জনগণের বক্তব্যের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা, নিজের সম্পদের ওপর অধিকার, নিরপেক্ষ সুবিচার পাওয়ার অধিকার, দ্বৈত শাস্তি রদ, শিক্ষার অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার ইত্যাদি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এরূপ বিল প্রণয়ন, পাশ ও সংবিধানভুক্ত করা হয়ে থাকে।

বিলোপবাদী Liquidationist. রাশিয়ার ১৯০৫-৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পর মেনশেভিক সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে এই ধারার উদ্ভব ঘটে। পোট্রেসভ, শেরেভানিন, লারিন প্রমুখ ছিলেন এর প্রধান নেতা। বিলোপবাদীরা দাবি করেন যে, সর্বহারা শ্রেণীর বেআইনি বিপ্লবী পার্টির অবলুপ্তি ঘোষণা করাই সঙ্গত, তাঁরা শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলন ত্যাগ করতে বলেন। তাঁদের প্রস্তাব ছিল, সোশ্যাল রিভল্যুশনারি ও নৈরাজ্যবাদীসহ বিভিন্নপন্থি লোকের সমন্বয়ে একটি 'প্রকাশ্য' 'আইনসঙ্গত' ও 'ব্যাপক ভিত্তিক' শ্রমিক পার্টি গড়ার জন্য একটি নির্দলীয় শ্রমিক কংগ্রেস আহ্বান করা। তাঁদের মতে, এই ব্যাপক ভিত্তিক পার্টির কাজ হবে সকলপ্রকার বিপ্লবী স্লোগান পরিহার করা এবং জার সরকার যতটুকু অনুমতি দেয়, ঠিক ততটুকু আইনি কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া। বলশেভিক পার্টি, বিশেষত লেনিন এঁদের মুখোশ উন্মোচিত করে দেখিয়ে দেন যে, এঁরা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এঁদের বাস্তবিকই কোনো ভিত্তি ছিল না। ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত প্রাগ সম্মেলনে বিলোপবাদীদের আর.এস.ডি.এল.পি. থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বিশে জুলাই ষড়যন্ত্র, ১৯৪৪ : নাৎসিবিরোধী গ্রুপের পক্ষ থেকে ওই তারিখে কর্নেল বন স্টফেনবার্গ হিটলারের রাস্টেনবার্গস্থ প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স টেবিলের নিচে একটি বোমা রেখে আসেন। হিটলার মারা গেছেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি বার্লিনে চলে আসেন। কথা ছিল, হিটলারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ড মার্শাল ভন উইটজলবেন ও জেনারেল ভন-বেক ক্ষমতা দখল করে লাইপজিগের সাবেক লর্ড মেয়র কার্ল গোর্ডেলার-এর নেতৃত্বে সরকার গঠন করবেন। কিন্তু ওই বোমা বিস্ফোরণে হিটলার আহত হন মাত্র। নাৎসিবিরোধীরা খোদ জার্মানিতে ব্যর্থতার দরুন অচিরেই পরাজিত হন। ফলে উইটজলবেন ও ভন-বেকসহ ১২ জন জেনারেল ও দুজন সাবেক রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে প্রায় ১৫০ জন কথিত চক্রান্তকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তা কার্যকর করা হয়। ফিল্ড মার্শাল রোমেলসহ ১৫ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আত্মহত্যা করে নাৎসিদের কোপ এড়ানোর পন্থা গ্রহণ করেন। স্ট্যাফেনবার্গের সম্পর্ক ছিল ক্রিসাউচক্র (Kreisau Circle) নামক একটি তরুণদলের সঙ্গে। ডিয়াট্রিচ ভনহয়ার নাম্নী ৩৭ বছর বয়স্কা এক ধর্মযাজিকাও হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠনের জন্য প্রচারকাজ চালিয়ে আসছিলেন। ২০ জুলাইয়ের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিসাউচক্র, ডিয়াট্রিচ ভনহয়ার ও তাঁর অনুসারীদেরও চক্রান্তকারী অফিসারদের মতো একই ভাগ্যই বরণ করতে হয়।

বিশ্বগ্রাম Global Village. তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগ ও লেনদেনের বিস্ময়কর বিকাশের ফলে, অঞ্চল ও রাষ্ট্র নির্বিশেষে বিশ্বের মানুষ আজ একে অপরকে গভীরভাবে জানতে পারছে এবং রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রেই মানুষ পরস্পরের একান্ত নিকটবর্তী হয়ে পড়ছে। একটি গ্রামের প্রতিটি মানুষ যেমন পরস্পরকে চেনে-জানে, বিশ্বের সমগ্র জনগণের অবস্থাও আজ তেমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কম্পিউটার প্রযুক্তি এই পারস্পরিক সংযোগকে আরও নিবিড়তর করে তুলেছে। বস্তুত সমগ্র বিশ্বটাই এখন একটি গ্রামের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে পড়ছে।

বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি World Outlook. চতুর্দিকের বিশ্ব সম্পর্কে ধারণার রূপ। ব্যাপক অর্থে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি হল বিশ্বের তাবৎ দার্শনিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ন্যায়শাস্ত্রীয়, নান্দনিক ও বৈজ্ঞানিকসহ সকল চিন্তার সম্মিলিত রূপের সমাহার। কিন্তু বিশেষ অর্থে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি

হল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। দার্শনিক দিক থেকে মূলত দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বস্তুবাদী ও ভাববাদী। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির শ্রেণীচরিত্র থাকে। বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব এই যে, এটা পরিপার্শ্বিক বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে এবং করণীয়ের স্বরূপনির্ণয়ে সহায়তা করে। প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি সমাজ-প্রগতির অন্তরায় এবং শোষকের স্বার্থবহ। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মতে, তাঁদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিই বৈজ্ঞানিক এবং সমগ্র জনগণের স্বার্থবহ। আবার যাঁরা ইসলামি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, তাঁদের মতে, বিশ্বব্যাপী ইসলামি বিধিব্যবস্থা কায়েমই একদিকে শোষণমুক্তি ঘটাতে এবং অপরদিকে মানুষের স্বকীয়তার বিকাশকে পূর্ণ স্ফূর্তি দিতে সমর্থ।

বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংস্থা World Intellectual Property Organisation. (WIPO). বিশ্বের সাহিত্য ও শিল্পকলা সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালে সংশ্লিষ্ট কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৭০ সালে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৭৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর এটি জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থায় পরিণত হয়। এই সংস্থা বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য কাজ করে।

বিশ্বব্যাংক বা আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক। ইংরেজিতে International Bank for Reconstruction and Development (IRDB) যা World Bank নামেও পরিচিত। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করাই এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য। এর প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটনে অবস্থিত। ১৯৪৬ সালে এর প্রতিষ্ঠা। বিশ্বব্যাংক জাতিসংঘেরই একটি প্রতিষ্ঠান।

বিশ্ব শান্তি আন্দোলন World Peace Movement. ১৯৪৯ সালে বার্লিনকে কেন্দ্র করে তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে বিশ্ব শান্তি আন্দোলন শুরু হয়। বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দূর করে বিশ্বব্যাপী শান্তি অব্যাহত রাখা ও সকল দেশের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি সুনিশ্চিত করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। বিশ্বের শান্তিকামী নর-নারীর ব্যাপক সমর্থন নিয়ে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিই ছিল এই আন্দোলনের প্রক্রিয়া। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসে বিশ্বের শান্তিকামী জনগণের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ব শান্তি পরিষদ নামে একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং পরিষদের দুই অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময়ে কাজ চালানোর জন্য একটি ক্ষুদ্র কমিটি বা ব্যুরো গঠন করা হয়। বিশ্ব শান্তি পরিষদ ও তার ব্যুরোর সম্পাদক নির্বাচিত হন ফ্রান্সের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জুলিও কুরি। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে এর শাখা রয়েছে এবং এসব শাখা স্ব স্ব দেশের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, শ্রমিক, কৃষক প্রমুখকে শান্তির সপক্ষে আনার জন্য কাজ করছে। বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা নিম্নরূপ "আমরা জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সনদের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন সকল প্রকার সামরিক জোটের বিরোধী। আমরা মনে করি বিপুল সামরিক জয়ের বোঝাই জনসাধারণের দারিদ্র্যের কারণ। সুতরাং, ব্যয় (যুদ্ধ বাবদ) হ্রাস করা, আণবিক ও অন্যান্য গণহত্যার উদ্দেশ্যে অস্ত্র নিষিদ্ধ করা এবং বৃহৎশক্তিসমূহের সামরিক বাহিনীসমূহ সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন।"

বিশ্ব সরকার : World Government. অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, কিংসলি মার্টিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের নিরসন

করে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হল বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি একক সুস্থ রাষ্ট্র গঠন করা, যা জাতিসংঘের মতো সমিতিমাত্র হবে না; বরং সকল সদস্যরাষ্ট্রের ওপর যার চূড়ান্ত ও কার্যকর কর্তৃত্ব থাকবে। বিশ্ব সরকারের ধারণা অনুযায়ী, বিশ্ব সরকারই হবে ফেডারেল সরকারের অনুরূপ কেন্দ্রীয় সরকার এবং বর্তমান রাষ্ট্রসমূহ হবে রাজ্য সরকারের অনুরূপ আঞ্চলিক সরকার। ফলে, উভয়ের ক্ষমতা ও এখতিয়ারও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা World Health Organisation. সংক্ষেপে WHO. জাতিসংঘের এই সংস্থাটি ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল গঠিত হয়। এই সংস্থার বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিদপ্তর নামে একটি পরিষদ রয়েছে, যার সদস্য হচ্ছেন সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। এ ছাড়াও সংস্থার একটি নির্বাহী বোর্ড, একটি সেক্রেটারিয়েট ও একজন মহাপরিচালক আছেন। সংস্থার সদর দফতর জেনিভায় অবস্থিত। সংস্থা প্রধানত দুধরনের কাজে ব্যাপৃত ১. পরামর্শমূলক কাজ : ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, এইডস এইচআইভিসহ বিভিন্ন যৌনব্যাধি, প্লেগ, টাইফয়েড, কলেরা, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং মাতা ও শিশুস্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য-প্রশাসন, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পরামর্শদান; ২. প্রযুক্তিবিষয়ক কাজ স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান, স্বাস্থ্যবিষয়ক পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রকাশ ইত্যাদি।

বিশ্বায়ন Globalisation. বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্যামিতিক অগ্রগতি; সড়ক, বিমান ও ম্যারিটাইম যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে পণ্যের বিপুলতর লেনদেন এবং সর্বোপরি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল ইত্যাদির বিস্ময়কর উন্নয়নের ফলে সারা বিশ্বের মানুষ এখন দেশ, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে পরস্পরের নিবিড় থেকে নিবিড়তর সান্নিধ্যে এসে যাচ্ছে। মানুষের জীবনধারণের উপকরণ, সংস্কৃতি ও চিন্তাচেতনার মধ্যেও স্থাপিত হচ্ছে গভীরতর সাযুজ্য। রাজনীতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রেও শুরু হয়েছে একাত্মীকরণের প্রক্রিয়া। দেশ, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে পৃথিবীর মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রযৌক্তিক ও সাংস্কৃতিক নৈকট্য ও একাত্মতার এই ধারাকেই বলা হয় বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ Analysis and Synthesis. সাধারণভাবে বিশ্লেষণের অর্থ হল কোনো সমগ্র-এর অংশসমূহকে আলাদা আলাদাভাবে বিচার করা এবং প্রতি অংশের স্বরূপ ও চরিত্র নির্ণয় করা। অপরপক্ষে, সংশ্লেষণের অর্থ হল বিভিন্ন অংশ বা দিক-এর সামগ্রিক রূপ বা চরিত্র নির্ণয় করা। রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ-এর কাজ হল কোনো অবস্থা বা ঘটনার বিভিন্ন দিকের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ নির্ণয় করা যাতে সামগ্রিক অবস্থা বা ঘটনার সঙ্গে অংশ বা দিকসমূহের সম্পর্ক এবং সমগ্র-এর ওপর অংশসমূহের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। আর সংশ্লেষণের কাজ হল বিভিন্ন দিক বা অংশসমূহের বৈশিষ্ট্যসমূহকে সামগ্রিক খাতে প্রবাহিত করা। বস্তুত বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের ক্রমাগত ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সদাপরিবর্তনশীল রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার যথার্থ উপলব্ধি সম্ভবপর হয়।

বিসমার্ক, অটো ভন (১৮১৫-৯৮) জন্ম ব্র্যাডেনবুর্গে। প্রথম জীবনে তিনি কয়েকটি ছোটখাটো কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৪৮ সালের দিকে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করা হলে তিনি সাময়িকভাবে দেশত্যাগ করেন। ১৮৫১ সালে তিনি

ফ্রাঙ্কফুটস্থ অ্যাসেম্বলি অব জার্মান ফেডারেশন-এ প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং পরে সেন্ট পিটার্সবার্গ ও প্যারিসে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে প্রুশিয়ার মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হয় এবং সেনাবাহিনী সংস্কার করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পার্লামেন্ট-অনুমোদিত কোনো বাজেট ছাড়াই তিনি এ-কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি বাস্তববাদী ছিলেন এবং জাঙ্কার শ্রেণীর নেতৃত্বে সমগ্র জার্মান জাতির পুনরেকত্রীকরণে বিশ্বাস করতেন। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে ডেনমার্ক (১৮৬৪) ও অস্ট্রিয়া (১৮৬৬)-সহ অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৮৭০ সালে তিনি ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৭১ সালের জানুয়ারি মাসে ভার্সাইতে জার্মান সাম্রাজ্যের ঘোষণার প্রাক্কালে তিনি রাজকীয় চ্যান্সেলরের পদ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী ১৯ বছর যাবৎ ইউরোপীয় রাজনীতির প্রধান নিয়ামকরূপে পরিগণিত হন। এ-সময় জার্মানি সম্ভাব্য বৃহত্তম আকৃতি লাভ করে। এমতাবস্থায় তিনি অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। তিনি রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলে ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে তোলেন যাতে ফ্রান্স প্রতিশোধমূলক যুদ্ধে নামতে সাহস না পায়। ১৮৭৮-৭৯ সালের স্বল্প সময় ব্যতীত তাঁর সঙ্গে রাশিয়ারও সুসম্পর্ক বজায় ছিল। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি ততটা সুবিধা করতে পারেননি। ১৮৭১ সালে তিনি লিবারেলদের পক্ষ নেন; কিন্তু ১৮৭৯ সালেই তিনি তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, এখন অবাধ বাণিজ্যের বদলে জার্মানির জন্য আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাই অধিক প্রয়োজন। তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের আন্দোলন ও সংগঠনকে সন্দেহের চোখে দেখতেন বিধায় রোমান ক্যাথলিক (১৮৭০) ও সমাজতন্ত্রী (১৮৮০)দের সঙ্গেও বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ধীরে ধীরে প্যান-জার্মান মনোভাবাপন্ন তরুণসমাজের সহানুভূতি হারিয়েও ফেলেন এবং ১৮৯০ সালের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র বিষয়ে মতভেদের পরিপ্রেক্ষিতে ৩২ বছর যাবৎ রাজ্যশাসনের পর রাজা দ্বিতীয় উইলিয়াম তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করেন।

বুখারিন (১৮৮৮-১৯৩৮) রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনে লেনিনের বিরোধী একটি উপদলের নেতা ছিলেন। তিনি শ্রেণী-সংগ্রামের বদলে শ্রেণী-সমঝোতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯২৮-২৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন কৃষির সর্বাত্মক যৌথকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন বুখারিন ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিরোধিতা করেন এবং ধনী কৃষকদের সঙ্গে গরিব ও মধ্য কৃষকদের দ্বন্দ্বের ব্যাপারটিকে আড়াল করার চেষ্টা করেন। তিনি আরও তত্ত্ব দেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বড় কৃষকদের মৈত্রীস্থাপনের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। ১৯৩৭ সালে একটি বিশ্বাসঘাতক গ্রুপে যোগদান করার অভিযোগে তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং ১৯৩৮ সালে সোভিয়েত সুপ্রিমকোর্ট বুখারিনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ওপর বুখারিনের লেখা পুস্তক এক সময় উক্ত বিষয়ের উপর লিখিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলে বিবেচিত হত।

বুদ্ধিজীবী Intellectuals. বুদ্ধিবৃত্তি, অর্থাৎ বিদ্যা, অধ্যয়ন, মেধা ইত্যাদিভিত্তিক পেশার মাধ্যমে যাঁরা জীবিকানির্বাহ করেন তাঁদেরকেই বলা হয় বুদ্ধিজীবী। সাধারণত শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, আইনজীবী, বিশেষজ্ঞ প্রমুখকেই বুদ্ধিজীবী বলে ধরা হয়। একটা দেশের জনমত গঠন ও তা পরিচালনার

ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেউ-কেউ এই অভিযোগ উথাপন করেন যে, বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই তত্ত্বসর্বস্ব এবং বাস্তবতার সঙ্গে প্রায়শই সম্পর্কবিবর্জিত। ফলে, এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেখা দেয় একধরনের অন্ধ অহমিকা। এঁরা ভীতি ও সুবিধাবাদের শিকার বলেও অনেকে অভিযোগ করেন। বস্তুত এই অভিযোগ ঢালাওভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র যা-ই হোক-না কেন, কোনো একটি রাজনৈতিক বা আদর্শিক আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে সম্ভাব্য সর্বাধিকসংখ্যক বুদ্দিজীবীদের পক্ষে আনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়।

বুয়র যুদ্ধ Boer War. ১৮৮০-৮১ সালে প্রথম বুয়র যুদ্ধ এবং ১৮৯৯-১৯০২ সালে দ্বিতীয় বুয়র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৮৮০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালের অধিবাসী বুয়রগণ ডাচ বংশোদ্ভূত অধ্যুষিত দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালকে একটি সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করলে ইংরেজরা এদেশ আক্রমণ করে। প্রথম বুয়র যুদ্ধে ইংরেজরা পরাজিত হয়ে ১৮৮১ সালে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সন্ধিপত্রে ইংরেজরা ট্রান্সভালের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়। ১৮৯৯ সালে ইংরেজরা পূর্বসন্ধি অগ্রাহ্য করে পুনরায় ট্রান্সভাল আক্রমণ করে বসে। অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ট্রান্সভালের পক্ষে যোগ দেয়। ইংরেজরা প্রথমে পরাজিত হলেও পরে এই দুটি অঞ্চলই দখল করে নেয়। ১৯০২ সালে আবার সন্ধি হয়। ১৯০৯ সালে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটকে সংযুক্ত করে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গঠন করা হয় এবং এই ইউনিয়নকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়।

বুর্জোয়া : Bourgeoise. শব্দটি ফরাসি। এর শাব্দিক অর্থ মধ্যবিত্ত। সামন্তযুগের শেষের দিকে যখন শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে, তখন সমাজে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের এক নতুন গোষ্ঠী গড়ে উঠতে থাকে। এরা ভূমিদাসদের মতো নিঃস্ব ছিল না। এরাও ছিলো বিত্তশালী। কিন্তু সামন্তপ্রভুদের বিশাল বিত্তের তুলনায় এদের বিত্ত ছিল অনেক কম। তাই এদেরকে বলা হত মধ্যবিত্ত বা বুর্জোয়া। কিন্তু শিল্পবিপ্লব ও শিল্পে যন্ত্রায়নের ফলে বৃহদাকার শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। ফলে, এক পর্যায়ে শিল্পপতি প্রমুখদের বিত্ত সামন্তপ্রভুদের বিত্তকে ছাড়িয়ে যায়—এমনকি এক পর্যায়ে সামন্তবাদী ব্যবস্থাও উচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা যত অগাধ সম্পত্তিরই মালিক হোকনা কেন, তাদের বুর্জোয়া নামকরণই বহাল থাকে। বর্তমানে বুর্জোয়া বলতে সমগ্র শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের গোষ্ঠীকেই বোঝানো হয়।

বুর্জোয়া, একনায়কত্ব Dictatorship of the Bourgeoise. এটা বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই অপর নাম। কেননা বুর্জোয়া গণতন্ত্র যদিও কাগজে-কলমে বলে যে, এই ব্যবস্থায় যে-কেউ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে সদস্য, মন্ত্রী, এমনকি সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত হতে পারে; কিন্তু কার্যত সমস্ত ব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যাস করা থাকে যে, তাতে পুঁজিপতি শ্রেণী বা তাদের প্রতিভূ ছাড়া অপর কেউ কখনোই নির্বাচিত হতে পারে না। জনগণের নামে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে পুঁজিপতি ও তাদের প্রতিভূরা স্বশ্রেণীরই একচ্ছত্র স্বার্থে কাজ করে এবং শোষণ অব্যাহত রাখে। এই ব্যবস্থায় কাগজে-কলমে বলা হয় আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। কিন্তু বাস্তবে ব্যবস্থাটি এমনই যে, একজন ধনী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একজন দরিদ্রের সুবিচার পাওয়া কোনোক্রমেই

সম্ভবপর হয় না। সুতরাং, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বাহ্যিক চেহারা গণতন্ত্র হলেও, আসলে তা ধনিকতন্ত্র বা বুর্জোয়াদেরই একনায়কত্ব।

বুর্জোয়া, জাতীয় : National Bourgeoise. যে-সমস্ত বুর্জোয়া জাতীয় চরিত্রসম্পন্ন, অর্থাৎ যে-সমস্ত পুঁজিপতি কোনো বিদেশী স্বার্থের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে না, বরং বিদেশী স্বার্থ ও বাজারের বিরুদ্ধে নিজ দেশের শিল্পোৎপাদনের বিকাশে তৎপর হয়, সে-সমস্ত পুঁজিপতি বা বুর্জোয়াকে বলে জাতীয় বুর্জোয়া। জাতীয় বুর্জোয়ারা দেশের শিল্পবিকাশে সহায়ক হয়।

বুর্জোয়া, দালাল যে-সমস্ত বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি বিদেশী উৎপাদক ও স্বার্থের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে এবং দালালি কমিশন বা প্রিমিয়ামপ্রাপ্তির মাধ্যমে সম্পদশালী হয়, তাদেরকে বলে দালাল বুর্জোয়া। দালাল বুর্জোয়ারা তাদের নিজ দেশের শিল্প-কারখানার বিকাশ হোক এবং বিদেশী পণ্যের আমদানি খর্ব হোক, তা কখনোই চায় না। কারণ, যে-সমস্ত পণ্যের তারা দালাল, সে-সমস্ত পণ্য দেশেই উৎপাদিত হতে শুরু করলে তাদের দালালি বা কমিশনের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই, দালাল বুর্জোয়ারা জাতীয় শিল্পায়ন তথা জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের অন্তরায়স্বরূপ। ইংরেজিতে দালাল বুর্জোয়াদের বলে Comprador. Bourgeoise.

বুর্জোয়া, পেটি : পেটি বুর্জোয়া দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহ Great Geographical Discoveries. পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক—এই চল্লিশ বছরে যতগুলো ভৌগোলিক আবিষ্কার হয়, ইতিপূর্বে কখনোই এমনটি দেখা যায়নি। এ-সমস্ত আবিষ্কার শুধু পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের ধারণাকেই পালটে দেয় না, বরং আন্তর্জাতিক ব্যাবসা-বাণিজ্যের পথকেও উন্মুক্ত করে দেয়। সর্বোপরি, এসব ভৌগোলিক আবিষ্কারই উপনিবেশ স্থাপন ও উপনিবেশের জন্য যুদ্ধের সূচনা করে। ১৪৮৭-৮৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক বার্থলোমিউ ডায়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন। ইতালীয় নাবিক কলম্বাস ১৪৯২ সালে সান সালভাডর, বাহামা, কিউবা ও হাইতি, ১৪৯৩-৯৬ সালে পোর্টেরিকা, জ্যামাইকা প্রভৃতি এলাকা এবং ১৪৯৯ সালে আমেরিকার মূল ভূখণ্ড আবিষ্কার করেন। ১৪৯৭ সালে জেনোয়াবাসী জন ক্যাবট নিউ ফাউন্ডল্যান্ড এবং ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কোডাগামা ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। ১৫১৯-২২ সালে পর্তুগিজ নাবিক ফার্ডিন্যান্ড ম্যাগিলান ফিলিপাইনস হয়ে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করলে 'পৃথিবী সমতল' এই ধারণা ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। এ-সমস্ত আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় ব্যাপক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উপনিবেশ-স্থাপনের প্রক্রিয়া।

বেদ বেদ অর্থ জ্ঞান। বেদ চারটি। ঋক, শাম, যজু ও অথর্ব। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই বেদসমূহ রচিত হয়। হিন্দু বিশ্বাস মতে বেদ কোনো মানুষের সৃষ্টি নয়; বরং সরাসরি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত। বেদে যেসব আচার-উপাসনার কথা বলা আছে, তার ব্যাখ্যাসংবলিত অংশের নাম ব্রাহ্মণ। বেদের বিভিন্ন প্রতীক ও আচারের মরমি ব্যাখ্যা যে-অংশে রয়েছে, তার নাম আরণ্যক। ঈশ্বর (ব্রহ্ম), মানুষ এবং প্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধের দার্শনিক ব্যাখ্যা মিলে হয়েছে উপনিষদ। সৃষ্টির অস্তিত্বের কারণ ও লক্ষ্য, সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাই বেদের প্রতিপাদ্য। হিন্দুমতে বেদই সনাতন ধর্মের মূল ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

বেনেলুক্স Benelux. ১৯৪৭ সালের ২৯ অক্টোবর বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেমবার্গের মধ্যে সমন্বিত আমদানি শুল্ক প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বেনেলুক্স গঠন করা হয়। ১৯৫৪ সালে এর সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে একটি সাধারণ বাণিজ্য ও মূল্যপরিশোধ নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে বেনেলুক্স এই তিন রাষ্ট্রের পক্ষে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আলাপ-আলোচনার অধিকার অর্জন করে। ১৯৫৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি দি হেগে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় যে, এই তিন রাষ্ট্রের মধ্যে পুঁজি, পণ্য, যানবাহন ও নাগরিকদের চলাচল অবাধ হবে। এতে আরও স্থির হয় যে, বাণিজ্য বিনিয়োগ, কৃষি ও বিভিন্ন সামাজিক ব্যাপারেও তিন রাষ্ট্র সমনীতির দ্বারা পরিচালিত হবে। ১৯৬০ সালের পয়লা নভেম্বর এই চুক্তি কার্যকর হয়।

বেন্থামবাদ : Bentham Doctrine. জেরিমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৯২)-এর দার্শনিক মতবাদ। তাঁর মতানুসারে সমাজের সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ-সুবিধা বিধানই নীতিশাস্ত্রের মূল অনুশাসন হওয়া উচিত। বেন্থামের এই মতবাদ উপযোগিতাবাদ বা Utilitarianism নামেও পরিচিত।

বেবুভিজম বা বেবুবাদ Babouvism. অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এর নেতা ও তাত্ত্বিক গ্রেকাস বেবেউফ (১৭৬০-৯৭) এর নামানুসারেই এর নাম হয় বেবুবাদ। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল এমন একটি 'সমকক্ষদের প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করা, যে-প্রজাতন্ত্রে থাকবে একটি একক কেন্দ্র থেকে শাসিত একক কমিউন। বেবেউফ এবং তাঁর সাথি বুনারোটি মারেশাল, এন্টোনেল, ডার্থে, জার্মেইন, ডেবন, লেপেলেটিয়ার প্রমুখ 'সমকক্ষদের চক্রান্ত' (Conspiracy of the Equals) গড়ে তোলেন। কিন্তু চক্রান্ত ধরা পড়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে বিচারের জন্য আনা হয়। ১৭৯৭ সালে গিলোটিনে বেবেউফ এবং ডার্থের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ফরাসি বিপ্লবের তুলনায় বেবুবাদ ছিল সামাজিক সুবিচারের ক্ষেত্রে একধাপ অগ্রগতি। কেননা, এই মতবাদ এসেছিল এমন একটি স্তরে, যখন পুঁজিবাদ দৃঢ় হয়ে উঠছিল। বস্তুত বেবুবাদীরাই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকে অনুশীলনে নিয়ে যান এবং নিপীড়িত জনগণের অবস্থার উন্নয়ন ও প্রতিবিপ্লবীদের ঠেকানোর জন্য একটি ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরেন। তাঁরা বিপ্লবের বিজয়ের পর শ্রমজীবী মানুষের একনায়কত্ব বহাল রাখার ধারণা দেন, সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের বিভিন্ন পর্যায়গুলোকে চিহ্নিত করেন এবং বলেন যে ইতিহাস হল ধনী ও দরিদ্র, পেট্রিশিয়ান ও প্লেবিয়ান, প্রভু ও ভৃত্য এবং খাদ্যপুষ্ট ও ক্ষুধার্তদেরই দ্বন্দ্বের ইতিহাস। বেবুবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বহুদিকই বর্তমান ছিল। তথাপি, কৌশলের দিক থেকে এই আন্দোলন নিছক চক্রান্তের চৌহদ্দিকে অতিক্রম করতে পারেনি। যদিও তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে সমাজতন্ত্রের চিন্তাকে কল্পনার স্তর থেকে বিজ্ঞানের স্তরে নিয়ে আসার জন্য বেবেউফ ও তাঁর সাথিদের অবদান ছিল অসামান্য, তথাপি তাঁদের আন্দোলন ইতিহাসে অলীক বা ইউটোপীয় হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। বস্তুত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা কাল্পনিক সমাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের নামে অন্ধতা ও গোঁড়ামির ধারণার বিপরীত।

বেলফুর ঘোষণা Balfour Declaration. ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব স্যার বেলফুর প্রখ্যাত ব্রিটিশ-ইহুদি লর্ড রথচাইল্ডের কাছে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের একটি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে-চিঠি লেখেন, সেটাই ইতিহাসে

বেলফুর ঘোষণা নামে খ্যাত। এই চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে স্যার বেলফুর রথচাইল্ডকে জানান যে, ব্রিটিশ সরকার ইহুদিদের নিজ আবাসভূমির আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে এবং এই ঘোষণা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত। তিনি আরও লেখেন যে, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্রিটেন পুর্ণ সমর্থন প্রদান করে। তবে এই শর্তে যে, এই রাষ্ট্রে অইহুদিদের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকারকে খর্ব করা হবে না। এই ঘোষণা বিশ্ব ইহুদি কংগ্রেসের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যও বেলফুর রথচাইল্ডের কাছে অনুরোধ জানান। এই ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। ফ্রান্স ও ইতালি যথাক্রমে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি ও মে মাসে সরকারিভাবে এই ঘোষণার প্রতি অনুমোদন প্রদান করে।

বেলুন ব্যারেজ : Balloon Barrage. ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিটলার ইতিহাসের সর্বাধিকসংখ্যক জঙ্গি বিমান নিয়ে ব্রিটেনের ওপর হামলা চালালে, শত্রু-বিমানকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ব্রিটেন আকাশে অসংখ্য বেলুন উড়িয়ে দেয়। ফলে নাৎসি বোমারু বিমানসমূহ নির্ধারিত লক্ষ্যস্থলের অবস্থান নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়ে এলোপাথাড়ি বোমাবর্ষণ করে। এতে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হলেও তারা তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। বেলুনের আবরণ দিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে আড়াল করার এই কৌশল ইতিহাসে বেলুন ব্যারেজ নামে খ্যাত।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র Scientific Socialism. মার্কস ও এঙ্গেলসই হলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক। এর ভিত্তি হল বিজ্ঞান, তথা ঐতিহাসিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়ামাবলী। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা বিজ্ঞান, দর্শন ও অর্থনীতিকে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ বলে বিবেচনা করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, বস্তু থেকেই চিন্তা-চেতনার উদ্ভব; বিশ্বের সকল কর্মকাণ্ডের বস্তুগত কারণ আছে এবং বস্তুগত নিয়মাবলী প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা আরও মনে করেন যে, সমাজের বস্তুগত নিয়মগুলিকে অনুধাবন করার মাধ্যমেই বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভবপর। তাঁরা আরও মনে করেন যে, ধনী-দরিদ্র শহর-গ্রাম, কৃষক-শ্রমিক-চাকুরিজীবী প্রমুখদের মধ্যে যে-পার্থক্য তা সম্পূর্ণ নিরসন করে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণ ঘটানোর জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায় অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক পর্যায় অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা এটাও মনে করেন যে, 'বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ'ই হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূলকথা এবং 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' কোনো অন্ধ অনড় বিশ্বাস নয়, বরং একটি 'গতিশীল বিজ্ঞান'। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিপ্লবের কৌশল, কায়দা ও রূপেরও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য।

বৈপ্লবিক আবিষ্কারসমূহ যে-সমস্ত আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন, মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক বা অতিব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সে-সমস্ত আবিষ্কারকে বলা হয় বৈপ্লবিক আবিষ্কার। যেমন—আগুনের ব্যবহার, ভূমিকর্ষণের কৌশল, হরফ, মুদ্রা, লৌহের ব্যবহার, জলযান, বারুদ, প্রিন্টিং প্রেস, স্টীম ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ, বেতার, বিমান, প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক্স, আপেক্ষিক তত্ত্ব, জিনেটিক্স্, আণবিক শক্তি, সাইবারনেটিক্স্, মহাশূন্যযান, যোগাযোগ উপগ্রহ, কম্পিউটার ইত্যাদিই হল এ-যাবৎকালীন বৈপ্লবিক আবিষ্কার।

বৈরী ও অবৈরী দ্বন্দ্ব : Antagonistic and Non-antagonistic Contradictions. দ্বন্দ্বকে সাধারণভাবে বৈরী ও অবৈরী, এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অবৈরী দ্বন্দ্ব হল দুই বিপরীতমুখী বা পরস্পরবিরোধী শক্তি, শ্রেণী, ব্যবস্থা বা স্বার্থের দ্বন্দ্ব। যেমন, পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া ও সর্বহারার দ্বন্দ্ব কিংবা সাম্রাজ্যবাদী-অধিপত্যবাদী শক্তির সঙ্গে নিপীড়িত জাতিসমূহের দ্বন্দ্ব। এরূপ দ্বন্দ্বের আপোস-মীমাংসা সম্ভবপর নয়। এর মীমাংসা হয় মূলত শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে, বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, প্রগতিশীল দিকের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল দিকের উচ্ছেদের মাধ্যমে। আর অবৈরী দ্বন্দ্ব হল সেই শক্তি, শ্রেণী বা ব্যবস্থা সমূহের দ্বন্দ্ব, যেই শক্তি, শ্রেণী বা ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বের দিক থাকলেও মৌলিক প্রশ্নে বা মৌলিক স্বার্থে তেমন কোনো দ্বন্দ্ব নেই। যেমন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কৃষক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, কিংবা বর্ধিত উৎপাদনের সঙ্গে পিছিয়ে-পড়া বণ্টনব্যবস্থার দ্বন্দ্ব কিংবা সর্বহারা শ্রেণীর একাংশের সঙ্গে অন্য অংশের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য বিপ্লব, শ্রেণীসংঘাত বা বলপ্রয়োগের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বরং পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন বা বিবর্তনমমূলক ব্যবস্থাগ্রহণের মাধ্যমেই এর মীমাংসা সম্ভবপর হয়। তবে, অবৈরী দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব হয় পুরাতন ও নতুনের মধ্যে; প্রগতি ও পশ্চাৎপদতার মধ্যে। এক্ষেত্রেও প্রগতির বিজয়ের মধ্যেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা নিহিত। দ্বন্দ্ব যেহেতু আবিষ্কার ও অগ্রগতির মূল কথা, সেহেতু মানবসমাজে কোনোদিনই দ্বন্দ্বের অবসান হবে না। তবে একপর্যায়ে বৈরী দ্বন্দ্বের অবসান হবে বলে সাম্যবাদীরা বিশ্বাস করেন।

বোগোটা সম্মেলন ১৯৪৮ সালের এপ্রিল-মে-তে কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটায় অনুষ্ঠিত আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের এই নবম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমেরিকান রাষ্ট্রসংস্থা গঠন করা হয়। এটা ছিল প্যান-অ্যামেরিকান ইউনিয়নেরই এক দৃঢ়তর সংস্করণ। এ-সময় প্রচণ্ড দাঙ্গার ফলে সম্মেলনের কাজ কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এই দাঙ্গার জন্য দায়ী করা হয় ওখানকার কমিউনিস্টদের।

বৌদ্ধ দর্শন গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং দুঃখনিবৃত্তির পথ আছে—এই চারটি মহৎ সত্য বা 'আর্য সত্যের' ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বৌদ্ধ দর্শন। এই দর্শনানুযায়ী দুঃখ মানবসমাজের নিত্যসঙ্গী; যা আপাত সুখকর তার পেছনেও দুঃখ আছে। দুঃখের কারণ হল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ আর জন্মের কারণ হল বস্তুর প্রতি লালসা, কামনা ও বাসনা। বস্তুর প্রতি কামনার অবসানের মধ্যেই দুঃখ থেকে মুক্তি নিহিত। দুঃখনিবৃত্তির জন্য আছে অষ্ট মার্গ বা আটটি মহান পথ; যথা—সৎ বিশ্বাস, সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ উপার্জন, সৎ চেষ্টা, সৎ অনুভূতি ও সৎ ধ্যান। এই অষ্ট মার্গের পথ বেয়েই লাভ করা যায় নির্বাণ। বৌদ্ধ দর্শনমতে নির্বাণ হল সেই অবস্থা, যেই অবস্থায় আর জন্ম নেই, রোগ নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, নেই শোক-দুঃখ, কষ্ট কিংবা হতাশা। বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী বিনা কারণে কোনোকিছুই ঘটে না। প্রত্যেকে কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করবে। সবকিছুই অনিত্য, কোনোকিছুই চিরন্তন নয়—যার উৎপত্তি আছে তার অবশ্যই নিরোধ বা অবসান আছে। শাশ্বত আত্মা বলেও কিছুই নেই। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের বা কোনো পরম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। বৌদ্ধমতে প্রত্যেক কার্যেরই পূর্ববর্তী কারণ আছে; চূড়ান্ত কারণ বা ধ্রুব কারণ বলে কিছু নেই। সুতরাং,ঈশ্বর থাকলে তাঁর সৃষ্টিকর্তার প্রশ্নও এসে যায়।

অতএব চূড়ান্ত কোনো জগৎকর্তার অস্তিত্ব নেই। আর ঈশ্বর যদি জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন, তা হলে তিনি তা নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তাঁর কোনো অভাব বা চাওয়া-পাওয়া থাকলে। সেক্ষেত্রে ঈশ্বর পরিপূর্ণ হতে পারেন না। আর ঈশ্বর যদি পূর্ণই হন, তা হলে জগতে এত অপূর্ণতা কেন? বস্তুত বৌদ্ধমতে কর্মের চেয়ে বড় কিছুই নেই এবং জগৎ পরিচালিত হয় একটি অমোঘ নিয়মের দ্বারা, যে-নিয়ম জগতের মধ্যেই বিদ্যমান।

ব্যক্তি ও সমাজ Individual and Society. ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক এক-একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে এক-এক আকার ধারণ করে। সমাজ বলে চিরন্তন কিছু নেই। কেননা, এক-একটি আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে সমাজের রূপ ও কাঠামো এক-এক আকার পরিগ্রহ করে। অনুরূপভাবে, ব্যক্তিরও কোনো চিরন্তন রূপ নেই, কেননা ব্যক্তিও ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সামাজিক ব্যবস্থারই সৃষ্টি। শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় বক্তির সঙ্গে, বিশেষত শোষিত ব্যক্তির সঙ্গে সমাজব্যবস্থার বিরোধ থাকে। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যবর্তী ফাঁক দূরীভূত হয়ে যায়, সেহেতু এই ব্যবস্থায় ব্যক্তির সঙ্গে সমাজব্যবস্থার বিরোধ লোপ পায় বলে সমাজতন্ত্রীরা দাবি করেন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি Private Property. ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পত্তি, যা সে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার বা ভোগ করতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বংশবংশানুক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হয়। সমাজতন্ত্রীরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তজ্জনিত চিন্তাচেতনাকে শোষণ-বৈষম্যের মৌল কারণ বলে মনে করেন।

ব্যক্তিত্ববাদ বা ব্যক্তিত্বপূজা Cult of the Individual. কোনো ব্যক্তির, বিশেষত রাজনৈতিক ব্যক্তির গুণাবলীর অতিমূল্যায়ন এবং এরূপ ব্যক্তির কর্তৃত্বের প্রতি প্রশ্নহীন আত্মনিবেদনেরই নাম হল ব্যক্তিত্ববাদ। কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১) প্রমুখ দার্শনিক ব্যক্তিত্ববাদকে দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। ব্যক্তিত্ববাদীদের মতে বিশাল ব্যক্তিত্বশালী ব্যক্তি বা মহাপুরুষরাই ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করেন। এঁদের মতে বস্তুগত নিয়মাবলী বা জনগনের যৌথ ইতিহাসের তেমন গুরুত্ব নেই। অনেক সময় আদর্শের ব্যক্তিকরণ (Personification) এর নামে ব্যক্তিত্ববাদের উদ্ভব ঘটে। ব্যক্তিত্ববাদী নেতা, সেনাপতি বা দার্শনিকের উদ্ভবের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী তাঁর অনুসারী ও ভক্তরা। ভক্তরাই প্রায়শই এরূপ ব্যক্তিদের অতিমানব বলে বিবেচনা করে, তাঁকে দোষ-ত্রুটি ও সাধারণ বিবেচনার ঊর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করে, এমনকি তাঁর ওপর রহস্যময়তা ও অলৌকিকত্বও আরোপ করে। ব্যক্তিত্ববাদী নেতাও তা হওয়ার জন্য সকল কৌশল, ছলনা ও শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনেকের মতে ব্যক্তিকরণ ও ব্যক্তিবাদের মধ্যেকার পার্থক্য খুবই ক্ষীণ বা অনুপস্থিত। উভয় ক্ষেত্রেই আচরণ একই রূপ। এজন্যই একসময়ে যাঁরা আদর্শের ব্যক্তিকরণ হিসাবে সম্মানিত বা পূজিত হয়েছেন, অন্য সময় তাঁরাই ব্যক্তিত্ববাদী বা আত্মবাদী বলে সমালোচিত ও বর্জিত হয়েছেন। এমনকি, স্ট্যালিন, মাও-এর মতো ব্যক্তিত্বরাও এই অভিযোগ থেকে রেহাই পাননি। কাগজে-কলমে ব্যক্তিত্ববাদ মার্কসবাদবিরোধী। কেননা মার্কসবাদ মনে করে যে, ব্যক্তি নয়, বরং জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে, জনগণ তথা জনগণের আন্দোলনই সৃষ্টি করে নেতৃত্ব; কোনো ব্যক্তি যত ক্ষমতাবান বা প্রজ্ঞাবানই হোন না কেন তিনি

জনগণের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় বা তাৎপর্যবহ হতে পারেন না। কিন্তু কার্যত মার্কসবাদীদের মধ্যেই ব্যক্তিত্ববাদের অধিক প্রকোপ। বস্তুত ব্যক্তিত্ববাদ গণতন্ত্র ও যৌথ নেতৃত্বের ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থি এবং একনায়কত্বের সূচক।

ব্যক্তিমালিকানা Private Ownership. উৎপাদনের উপায়সমূহ (জমি, মেশিন, উৎপাদনের অন্যান্য হাতিয়ার), পণ্যের বণ্টনপ্রক্রিয়া (ব্যাবসা-বাণিজ্য) এবং এসব থেকে উদ্ভূত যাবতীয় প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানের ওপর ব্যক্তির বংশবংশানুক্রমিক অধিকারই হল ব্যক্তিমালিকানা। সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা দাসসমাজ, সামন্তসমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য। আদি সাম্যবাদী সমাজে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজেও এর কোনো অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। ব্যক্তিমালিকানার দরুনই সমাজে ঘটে শ্রেণীবিভক্তি, দেখা দেয় শ্রেণীদ্বন্দ্ব। আর উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকরা শ্রমের মালিকদের শোষণ করে, উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে এবং এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় সম্পদ ক্রমশ কতিপয় ব্যক্তির একচেটিয়ায় পরিণত হয়। যারাই সম্পদের মালিক তারাই হয় সমাজ ও রাষ্ট্রেরও কর্তাব্যক্তি। মালিকরা স্বেচ্ছায় তাদের মালিকানা ত্যাগ করে না বলেই এবং তারা তাদের স্বার্থরক্ষায় রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে বলেই ব্যক্তিমালিকানার বদলে সামাজিক মালিকানা কায়েম করতে গেলে বলপ্রয়োগের প্রশ্ন আসে। আবার অনেকের মতে ব্যক্তিমালিকানাই উন্নয়ন ও প্রগতির মূলসূত্র।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ Individualism. অ্যাডাম স্মিথ, জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, সরকারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা যথাসম্ভব হ্রাস করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ ও তা কার্যকর করার স্বাধীনতার মধ্যেই ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ নিহিত। তাঁদের এই মতবাদকেই বলা হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ।

ব্যাংক ব্যাংক হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যে-প্রতিষ্ঠান অল্প সুদে ঋণ নেয় বা টাকা গচ্ছিত রাখে এবং বেশি সুদে ওই টাকাই অন্যকে ঋণ দেয়। ১৬০৯ সালে হল্যান্ডে ব্যাংক আমস্টার্ডাম নামে বিশ্বের প্রথম ব্যাংক স্থাপিত হয়। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৯৪ সালে। বস্তুত ইংল্যান্ডেই সর্বপ্রথম ব্যাংকের বিস্তৃতি ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে ব্যাংক ব্যাবসা-বাণিজ্যের ও বিনিয়োগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। মার্কসীয় মতে ব্যাংক হল মুদ্রা পুঁজির কারবারি প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকের কারবার হল মুদ্রা নামক পণ্য নিয়ে। লেনদেনের ব্যাপারে মধ্যবর্তী ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ব্যাংক নিষ্ক্রিয় মূলধনকে সক্রিয় করে তোলে, অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থকে ঋণ হিসাবে প্রদান করে মূলধনে পরিণত করে। ব্যাংকের কাজ ও পরিধি বাড়তে বাড়তে এগুলো অতি শক্তিশালী একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। তদুপরি, ব্যাংক অন্যদেশের উৎপাদনের উপকরণ ও কাঁচামালের ওপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শিল্পপুঁজি ও ব্যাংক পুঁজির একত্রীভবনের মধ্য দিয়েই জন্ম হয় লগ্নিপুঁজি বা Finance Capital-এর, যার মাধ্যমে চলে নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও আধিপত্য। ব্যাংক প্রধানত দুপ্রকার। যথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংক হল জনসাধারণের লেনদেনের ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল ব্যাংকসমূহের ব্যাংকার। মুদ্রা তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একতিয়ারভুক্ত। কাজের ধরনের দিক থেকেও ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন—সাধারণ

বাণিজ্যিক ব্যাংক, শিল্পব্যাংক, কৃষিব্যাংক ইত্যাদি। আবার এমনকিছু ব্যাংক রয়েছে, যেগুলো শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ের, প্রধানত রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে ঋণ আদান-প্রদান করে। যেমন বিশ্বব্যাংক।

ব্যবসাদারি দৃষ্টিভঙ্গি রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আদর্শের বদলে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীলাভ-ক্ষতির ব্যাপারটিকে প্রাধান্য দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিকেই বলে ব্যাবসাদারি দৃষ্টিভঙ্গি (Commercialism).

ব্যাক বেঞ্চার Back Bencher. পার্লামেন্টের অধিবেশনে যেসব সদস্য প্রায়শই পেছনের সারিতে উপবেশন করেন এবং পার্লামেন্টের বিতর্ক, আলোচনা ও অন্যান্য কার্যক্রমে নীরব ভূমিকা পালন করেন, তাঁদেরকেই বলা হয় ব্যাক বেঞ্চার বা পেছনের সারির সদস্য। অনুরূপভাবে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনে বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যাঁরা অগ্রণী ভূমিকায় এগিয়ে আসেন না, তাঁদেরকেও বলা হয় ব্যাক বেঞ্চার।

ব্যাটলশিপ পোটেমকিন ১৯০৬ সালে রাশিয়ার ওডেসা বন্দরে অবস্থিত যুদ্ধজাহাজ পোটেমকিন (Battleship Potemkin)-এর নৌসেনারা রাশিয়ার তৎকালীন জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং জাহাজটি নিয়ে কৃষ্ণসাগরে চলে যায়। জারের অনুগত বাহিনী জাহাজটিকে অবরোধ করে রাখে। শেষ পর্যন্ত রসদ ফুরিয়ে গেলে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর পোটেমকিন-এর বিদ্রোহী সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই নৌ-বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও লেনিন এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই ঘটনাকে ১৯১৭ সালের কমিউনিস্ট বিপ্লবের সূচনা বলে অভিহিত করেন। সার্গেই আইজেনস্টাইন এই বিদ্রোহের ওপর 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন' নামে এক কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

ব্যাস্টিল : Bastille. ফ্রান্সের একটি দুর্গ। প্যারিসে অবস্থিত এই ইতিহাসবিখ্যাত দুর্গে রাজনৈতিক বন্দিদের আটক রাখা হত। ফরাসি বিপ্লবের শুরুতে (১৭৮৯) বিপ্লবী জনতা ব্যাস্টিল দুর্গ অবরোধ করে। তারা ১৭৮৯ সালের ১০ জুলাই উক্ত দুর্গসহ কারাগার দখল করে এবং তা ধূলিস্মাৎ করে দেয়। এই দুর্গের পতনের মাধ্যমেই ফরাসি বিপ্লবের আরম্ভ সূচিত হয়।

ব্রাউন শার্টস Brown Shirts. বেনিটো মুসোলিনির ব্ল্যাক শার্টসদের অনুকরণে হিটলার তাঁর এই নিজস্ব ঝটিকাবাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীর সদস্যরা বাদামি রঙের শার্ট পরত বলেই তাদের নাম হয় ব্রাউন শার্টস। ব্রাউন শার্টসদের প্রধান কাজ ছিল প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সভাদি পণ্ড করে দেওয়া এবং নাৎসি সভা-সমিতিতে কেউ যেন কোনো গোলযোগ সৃষ্টি করতে না পারে, তা সুনিশ্চিত করা। এই ব্রাউন শার্টসদেরই বাছাই-করা অংশ নিয়ে গঠন করা হয়েছিল 'সম্ভ্রান্ত রক্ষীদল'। (Elite Guards)। এরা প্রধানত নাৎসি নেতাদের দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করত এবং কঠিনতর দায়িত্বসমূহ পালন করত।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য : British Empire. ব্রিটেনের রাজা বা রাণীর অধীনস্থ দেশ ও অঞ্চলসমূহ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গমাইল; অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ। লোকসংখ্যাও ছিল প্রায় অনুরূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হত ১. ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেন; ২. স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত দেশ বা ডোমিনিয়নসমূহ যথা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড ও নিউ ফাউন্ডল্যান্ড (১৯৩৩ সালে এর স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাহার করা হয়); ৩. ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ; ৪. বিভিন্ন ধরনের উপনিবেশ, যেমন ব্রিটেনের রাজার সরাসরি শাসিত দেশ বা Crown Colonies. আশ্রিত দেশ বা Protectorates ও জাতিসংঘ হতে শাসনাধিকার প্রাপ্ত দেশ বা Mandated Territories. ডোমিনিয়ামসমূহ প্রথমে ব্রিটিশরাজেরই আশ্রিত উপনিবেশ ছিল, পরে এগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই ডোমিনিয়ানসমূহে স্বাধীনতার দাবি ওঠে। ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্য সম্মেলন ((Imperial Conference)-এ ডোমিনিয়নসমূহকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতাভুক্ত (অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে স্বাধীনতাসম্পন্ন) স্বায়ত্তশাসিত দেশ বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। ১৯৩১ সালের সাম্রাজ্য সম্মেলনে এসব দেশ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সকল কর্তৃত্ব থেকেও মুক্তিলাভ করে। এই সম্পর্কিত আইন ১৯৩১ সালের ওয়েস্টমিনস্টার আইন (Statute of Westminster, 1931) নামে খ্যাত। ডোমিনিয়নসমূহ ব্রিটিশরাজকে নিজেদের রাজা বলে স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ ও বার্মাও স্বাধীনতা লাভ করে। পরবর্তী কয়েক দশকে আরও বেশ কয়েকটি উপনিবেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

ব্রেজনেভ, লিওনিদ (১৯০৬-৮২)। ১৯৬৪ সালে ক্রুশ্চেভের পতনের পর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ক্ষমতায় বহাল থাকেন। তাঁর সময় পর্যন্ত লেনিন-স্ট্যালিন-প্রবর্তিত সমাজতান্ত্রিক ধারাটি মোটামুটি অব্যাহত থাকে। তাঁর আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক ব্যয় ৫০% বৃদ্ধি করা হয় এবং অস্ত্রপ্রতিযোগিতা (Arms Race) তীব্রতর হয়ে ওঠে। তাঁর আমলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে সোভিয়েতপন্থি নুর মোহাম্মদ তারাকিকে ক্ষমতায় বসায় এবং আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটায়। তিনি ঘোষণা করেন যে, যে-কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের অভ্যন্তরে যে-কোনো সমাজতন্ত্রবিরোধী তৎপরতা দেখা দিলে তা দাবিয়ে দেওয়ার অধিকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের রয়েছে। তিনি তাঁর এই মতবাদকে 'ব্রেজনেভ নীতি' (Brezhnev Doctrine) বলে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। তাঁর আমলে উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়, সর্বস্তরে দুর্নীতি ও চরিত্রের অবক্ষয় ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। এরই ফলস্বরূপ তাঁর উত্তরসূরি গর্বাচেভ-এর আমলে সোভিয়তব্যবস্থা কার্যত ধসে পড়ে।

ব্রেনড্রেন : Brain Drain, কোনো দেশ কর্তৃক অন্যান্য দেশ থেকে মেধাবী বিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদ, অর্থনীতিবিদ, প্রযুক্তিবিদ ও অন্যান্য মেধাবী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক প্রলোভন, বড় রকমের সম্মান, পদমর্যাদা, বিশেষ সুযোগদান ইত্যাদির মাধ্যমে টেনে নিয়ে আসা। বস্তুত কোনো উন্নত দেশই অনুন্নত দেশসমূহ থেকে ব্রেনড্রেন করতে পারে। এর উদ্দেশ্য হল বিশ্বের সেরা মেধাবী ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে নিজ দেশের উন্নয়ন সাধন এবং অনুন্নত দেশসমূহকে অনুন্নত রাখার মাধ্যমে বাজার ও আধিপত্য সংরক্ষণ।

ব্রেস্ট-লিটোভস্ক শান্তিচুক্তি ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত রাশিয়া এবং জার্মানি ও তার মিত্রদের মধ্যে এ-চুক্তি সম্পাদিত হয়। রাশিয়ার পক্ষে এ-চুক্তি ছিল আপাত-অসম্মানজনক। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী জার্মানি অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ও বাল্টিক এলাকার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে। ইউক্রেনও জার্মানির কর্তৃত্বাধীনে চলে যায়। আরও সাব্যস্ত হয় যে, রাশিয়া জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দেবে। রাশিয়া এ-চুক্তি মানতে বাধ্য হয়েছিল এ-কারণে যে, একদিকে জার আমলের পুরানো বাহিনী বিলুপ্ত করা হয়েছিল, অন্যদিকে লালফৌজের ছিল তখন অতি শৈশবাবস্থা। প্রতিকূল শর্তাবলী সত্ত্বেও ব্রেস্ট-লিটোভস্ক শান্তিচুক্তি রাশিয়াকে দিয়েছিল এমন একটি অবসর, যার তখন ছিল খুবই প্রয়োজন। এই অবসরে রাশিয়া ভূস্বামী ও বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবীদের মূলোৎপাটন করা এবং বিদেশী হামলা প্রতিরোধ করার উপযোগী বাহিনী গঠন করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯১৮ সালের নভেম্বরে এ-চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয়।

ব্লকেড : Blockade. ব্লকেড হচ্ছে শত্রুপক্ষের সরবরাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। এটা সমুদ্রপথে বাধাসৃষ্টির মাধ্যমে করা যেতে পারে, যাতে কোনো পণ্যবাহী জাহাজ শত্রুর বন্দরে বা উপকূলে ভিড়তে না পারে। আবার কোনো সময় গোটা শত্রুদেশটিকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমেও ব্লকেড সৃষ্টি করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্য জার্মানিকে ব্লক করার উদ্যোগ নিয়েছিল। যুদ্ধাবস্থা ছাড়াও কোনো অন্যায়ের প্রতিকারের উদ্দেশ্যেও ব্লকেড সৃষ্টি করা হয়। যেমন, ১৮৬২ সালে ব্রাজিলের উপকূলে একটি ব্রিটিশ জাহাজকে ধ্বংস করার প্রতিকার দাবি করে যুক্তরাজ্য ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনিরোকে ব্লক বা অবরুদ্ধ করে রাখে, যাতে কোনো ব্রাজিলীয় জাহাজ উক্ত বন্দরে যাতায়াত করতে না পারে। বর্তমান সময়ে জাহাজ বা সৈন্য গোলাবারুদাদি প্রেরণ না করে অর্থনৈতিক ব্লকেড বা অবরোধও সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

ব্লিৎসক্রিগ Blitzkrieg. এটি একটি জার্মান শব্দ। এর অর্থ হল বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলার ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এই পদ্ধতির মৌল কথা হল কোনো পূর্বাভাস না দিয়ে, শত্রুকে হতবাক করে দিয়ে ত্বরিতগতিতে আক্রমণ করা এবং শত্রুকে নাজেহাল করে দেওয়া। এই পদ্ধতির আক্রমণের সময়কাল তুলনামূলকভাবে ক্ষণস্থায়ী।

ব্লু বুক : Blue Book. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ধারাবিবরণী যে-বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়, তার মলাট নীল রঙের বিধায়, এই বইকে বলা হয় 'ব্লু বুক'। অনুরূপভাবে ইতালির আইনসভার ধারাবিবরণীর পুস্তককে বলা হয় 'গ্রীন বুক' ফ্রান্স ও চীনে এই পুস্তককে বলা হয় 'হোয়াইট বুক' এবং জাপানের এই পুস্তকের নাম 'গ্রে বুক'।

ব্ল্যাকমেইল Blackmail. কারও কোনো দুর্বলতা বা অপকর্ম প্রকাশ করে দেওয়া হবে, এরূপ হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা অন্যায়ভাবে আদায় করাকেই বলে ব্ল্যাকমেইল করা।

ব্ল্যাকলিস্ট Black List. কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত তালিকা, যে তালিকাভুক্ত ব্যক্তি, সংগঠন, দেশ বা পণ্যের ব্যাপারে অবস্থিত সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার প্রদান করা হয় না।

ব্ল্যাকলেগ Blackleg. মূলত তাস খেলায় বা ঘোড়ার রেসে যে-ব্যক্তি প্রতারণা বা ধোঁকার আশ্রয় নেয়, তাকেই বলে ব্ল্যাকলেগ। কিন্তু, ১৯৩০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শব্দটি ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। বর্তমানে শ্রমিকরা যখন ধর্মঘটরত থাকে তখন যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মালিকের পক্ষে কাজ করে এবং ধর্মঘটিদের ক্ষতিসাধন করে, তাকেই বলা হয় ব্ল্যাকলেগ।

ব্ল্যাক শার্টস Black Shirts. ১৯২২ সালে বেনিটো মুসোলিনি ইতালির রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ফ্যাসিস্ট পার্টিই ইতালির একমাত্র বৈধ পার্টিরূপে পরিগণিত হয়। এই পার্টির সদস্যেরা কালো জামা পরিধান করত বলে এদের নাম হয় 'ব্ল্যাক শার্টস'। এরা প্রাচীন রোমান কায়দায় সামনের দিকে হাত সম্প্রসারিত করে নেতাকে অভিবাদন জানাত। তারা স্লোগান দিত "মুসোলিনি সদাসর্বদাই সঠিক (Mussalini ho sempre ragione)"

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর : Black September. এই প্যালেস্টাইনি গোপন গেরিলা সংস্থা ১৯৭০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ দিনের মধ্যে ২টি মার্কিন, একটি সুইস এবং একটি ব্রিটিশ বিমান ছিনতাই করে। এই দলেরই সদস্যা লায়লা খালেদ একটি ইসরায়েলি বিমান ছিনতাইর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর জর্ডানের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করে। এর পরপরই তারা জার্মানিতে বসবাসরত ৫ জন জর্ডানিকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে হত্যা করে। অতঃপর ইসরায়েলকে সাহায্য করে, এই অপরাধে হামবুর্গের একটি কারখানা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। ১৯৭২ সালের মে মাসে তারা একটি বোয়িং ৭০৭ বিমান ছিনতাইর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, কিন্তু অক্টোবরে লুফথানসার একটি বিমান ছিনতাই করে তিন জন গেরিলার মুক্তি আদায় করে নেয়। ১৯৭৩ সালের ৩ মার্চ এরা খার্তুমে ২ জন মার্কিন ও একজন বেলজিয়ান কূটনীতিককে হত্যা করে। ১৯৭২ অলিম্পিকে যোগদানকারী ইসরায়েলি প্রতিযোগীদের হত্যার হুমকি দিয়েও ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর আলোড়ন সৃষ্টি করে। ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর বস্তুত পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন বা পি.এফ.এল.পি.-এরই জঙ্গি শাখা।

ব্ল্যাঙ্কি : লুই অগাস্ট ব্ল্যাঙ্কি, Louis Auguste Blanqui, (১৮০৫-৮১) ছিলেন ফরাসি ইউটোপীয় কমিউনিস্ট। তিনি ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন, দুবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় কারান্তরালে অতিবাহিত করেন। যান্ত্রিক বস্তুবাদ, আস্তিকতা, অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ এবং ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র—বিশেষত বেবুবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল তাঁর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। ব্ল্যাঙ্কির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বস্তুবাদী। পুঁজিবাদের তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক। সমাজতন্ত্রকে তিনি মনে করতেন 'সভ্যতার মুকুট'-স্বরূপ। কিন্তু ঐতিহাসিক বিকাশের প্রশ্নে তিনি প্রদান করেন এক ভাববাদী ব্যাখ্যা। তাঁর চক্রান্তমূলক কৌশল ছিল ভ্রান্ত এবং তা তাঁর সমর্থকদের জন্য বয়ে এনেছিল পরাজয়ের গ্লানি। ব্ল্যাঙ্কিবাদীরা বুঝতে পারেননি যে, বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে আপামর মেহনতি মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যেই বিপ্লবের সাফল্য নিহিত। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা ব্ল্যাঙ্কির বিপ্লবী অবদানের প্রশংসা করলেও তাঁর কৌশলের তীব্র সমালোচনা করেন। রাশিয়ার নারোদবাদীরা ব্ল্যাঙ্কির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

॥ ভ ॥

ভদ্রলোকের চুক্তি আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদন না করে দুজন ব্যক্তি বা দুপক্ষের মধ্যে মৌখিক বা চিঠিপত্র বিনিময়ের মাধ্যমে প্রদত্ত অনানুষ্ঠানিক অঙ্গীকার। আনুষ্ঠানিক না হলেও যে-কোনো সত্যিকার ভদ্রলোক নিজের অঙ্গীকার নিজে মানতে বাধ্য, এই ধারণা থেকেই Gentleman's Agreement বা ভদ্রলোকের চুক্তি (অঙ্গীকার) কথাটির উৎপত্তি।

ভলতেয়ার : Francois Marie Arovet de Voltaire. (১৬৯৪-১৭৭৮) ফরাসি লেখক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। সামন্তবাদবিরোধী ব্যাঙ্গরচনার অপরাধে তিনি ১৭১৭ ও ১৭২৫ সালে দুবার গ্রেফতার হন। তিনি ছিলেন দ্বৈতবাদী বা Diest। তিনি একদিকে নিউটনীয় মেকানিক্স্ ও পদার্থবিদ্যার সমর্থক ছিলেন এবং অন্যদিকে, মূল কারণস্বরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে ঈশ্বরকে এক করে দেখতে চাইতেন। আত্মার আলাদা সত্তায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। চেতনাকে তিনি জীবন্ত বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণ হিসাবে চিহ্নিত করতেন। তিনি প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বিশ্বাস করতেন, নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস বলে বিবেচনা করতেন এবং লক-এর বস্তুবাদের অনুসরণ করতেন। একই সঙ্গে তিনি 'চূড়ান্ত কারণ' ও 'মহাবিশ্বের স্থপতি'তেও বিশ্বাস করতেন। সামাজিক-রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি ছিলেন সামন্তবাদবিরোধী। আইনের চোখে সাম্য, সম্পত্তির ট্যাক্স, বক্তব্যের স্বাধীনতা ইত্যাদির তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমর্থক ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, সমাজ অবশ্যম্ভাবীরূপেই ধনী ও দরিদ্রে বিভক্ত হতে বাধ্য। তাঁর মতে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত রাষ্ট্র হল শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র যার প্রধান হবেন একজন বিচক্ষণ রাজা। শেষজীবনে তিনি প্রজাতন্ত্রের সমর্থক হয়ে পড়েন। তিনি মনে করতেন যে, 'ইতিহাসের দর্শন' (এই কথাটিও তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন)-এর ভিত্তি হল এই যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে সমাজপ্রগতি এগিয়ে যাবে। কিন্তু, সমাজপ্রগতি বা পরিবর্তনের কারণ হিসাবে তিনি বস্তুগত কারণের বদলে 'চিন্তার পরিবর্তন'-এর ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর ব্যঙ্গ রচনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল খ্রিস্টান ধর্ম ও ক্যাথলিক গির্জা, কারণ এগুলোকেই তিনি সমাজপ্রগতির প্রধান অন্তরায় বলে গণ্য করতেন। ভলতেয়ার ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁর কোনো প্রেরিত পুরুষের ওপর তাঁর (ভলটেয়ারের) বিশ্বাস ছিল না। মোটকথা, ভলতেয়ার ছিলেন পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দর্শনের অন্যতম স্থপতি।

ভাগ্যবাদ Fatalism. জগৎ এবং মানবজীবনের সকল বিষয় ভাগ্যগত বা পূর্বনির্ধারিত, এই মতবাদ। এই মতবাদের প্রবক্তারা মনে করেন যে, যা ঈশ্বর বা প্রকৃতি কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত, তার বাইরে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। অবশ্য ইসলাম ধর্ম এবং সেন্ট অগাস্টাইন, মার্টিন লুথার, ক্যালভিন প্রমুখ খ্রিস্টান মহাপুরুষদের মতে মানুষকে ভালোমন্দ নির্ধারণের জন্য বিবেক প্রদান করা হয়েছে; সুতরাং মন্দ কাজের সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছার কোনোই সম্পর্ক নেই। পাইথাগোরাস এবং পরবর্তীকালে নিতসে-র দর্শনানুযায়ী সুযোগ এবং স্বাধীনতাই ভাগ্যের বাহন। তাঁদের ভাগ্যবাদ অনেকটা স্বইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত। বস্তুবাদীদের মতে ভাগ্যবাদ মানুষের উদ্যোগ এবং

সংগ্রামী চেতনাকে ভোঁতা করে দেয়। এই কারণে এবং এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বিধায় এর চরিত্র প্রতিক্রিয়াশীল বলেও মার্কসবাদীরা মনে করেন।

ভাববাদ Idealism. ভাববাদ বস্তুবাদের বিপরীত। ভাববাদ অনুযায়ী, বস্তুর অন্তর্নিহিত ও পারস্পরিক কারণে নয় বরং সর্বশক্তিমান একজন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ীই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ও বিকাশ সাধিত হয়ে চলেছে। ভাববাদ অনুযায়ী বাহ্য বস্তুসমূহ প্রকৃত নয়, এসব বস্তু ভাবেরই প্রতিচ্ছবিমাত্র। অর্থাৎ প্রকৃতি বা বস্তুর ওপর ভাব বা আত্মাকে স্থাপন করে বলে এবং ভাব বা আত্মাকে বস্তুর সৃষ্টির মূল হিসাবে গ্রহণ করে বলেই এই মতবাদকে বলা হয় ভাববাদ। ভাববাদ অনুযায়ী ১. বিশ্ব আসলে পরমভাব (Absolute Idea). সর্বজনীন আত্মা বা পরমাত্মা (Universal Spirit), প্রাণশক্তি (Elan Vital) বা সৃজনশীল শক্তি (Creative Force) ইত্যাদিরই প্রতিবিম্ব (Reflection) মাত্র; ২. মনই হল একমাত্র মৌলিক বাস্তব সত্য; আর বাস্তব জগৎ বা প্রকতি বা বস্তুর অস্তিত্ব কেবল মনে, ধারণায় বা ভাবে এবং ৩. সৃষ্টি, প্রকৃতি ও তার নিয়মাবলী সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়; আর বিজ্ঞান কোনোদিনই প্রকৃতির মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হবে না। মার্কসবাদ অনুযায়ী ভাববাদ শোষক-শাসকেরই আদর্শ; ভাববাদের মাধ্যমেই ধর্মযাজকরা সবকিছুকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করে রাখতে সমর্থ হয়।

ভাববাদ, পরম Absolute Idealism. দার্শনিক হেগেলের মতে আত্মা ও অনাত্মার (বাহ্যজগতের) পেছনে এক পরমতত্ত্ব (Absolute Idea) রয়েছে এবং তা আত্মা-পরমাত্মা-বহির্ভূত তৃতীয় পদার্থরূপে নয়, বরং আত্মা-পরমাত্মার অন্তর্নিহিত সত্তার মধ্যেই তার অস্তিত্ব। পরম ভাববাদ অনুযায়ী চৈতন্য ও বস্তু পরমভাব বা পরমাত্মারই ক্রমবিকাশ।

ভাববাদ, বাস্তব Practical Idealism. দার্শনিক শেলিং (Schelling) এই মতের প্রবক্তা। তাঁর মতে বস্তু ও আত্মা সমভাবেই বাস্তব ও ভাবাত্মক এবং পরম সত্তা (Absolute Idea) থেকেই সকল কিছুর সৃষ্টি।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন 'Quit India' Movement. ভারত থেকে অবিলম্বে এবং নিঃশর্তভাবে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের দাবিতে কংগ্রেস সূচিত 'গণ আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৪২)'। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলনের মোকাবেলা করে এবং আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধীসহ বহু কংগ্রেস নেতাকে কারাগারে প্রেরণ করে। এই আন্দোলন সফল হলে মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমি, তথা পাকিস্তানের অবকাশ না থাকায় মুসলিম লীগ এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে।

ভারত মহাসাগরীয় রাজনীতি : Indian Ocean Politics. ভারত মহাসাগরের অবস্থান এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া, এই তিন মহাদেশ জুড়ে। সবচেয়ে বড় কথা, এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোই হল উন্নত দেশসমূহের বাজারের সিংহভাগ। ফলে, বৃহৎ শক্তিসমূহ মনে করে যে, ভারত মহাসাগর যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, বিশ্ববাজার এবং শক্তির ভারসাম্যও থাকবে তাদেরই পক্ষে। এজন্য ভারত মহাসাগরের আধিপত্য নিয়ে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা। এই লক্ষ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপে স্থাপন করেছে তাদের সামরিক ঘাঁটি।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি Communist Party of India–CPI. ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লব ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যেও এক নবজাগরণের সঞ্চার করে। ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর মস্কো-প্রবাসী শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় (এম. এন. রায়) রাশিয়ার তাসখন্দে কতিপয় ভারতীয় বিপ্লবীদের এক সমাবেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও এর ৭ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সদস্যেরা হলেন চেয়ারম্যান এম. এন. রায়, সম্পাদক মোহাম্মদ শফিক, সদস্যবৃন্দ এম. এন. রায়ের আমেরিকান পত্নী ইভেলিন রায়, অবনী মুখার্জী, তদীয় রুশ স্ত্রী রোজা ফিটিংগাস, মোহাম্মদ আলি ও এম. পি.বি.টি. আচার্য্য। সমসাময়িক কালে এ-ব্যাপারে দ্বিতীয় উদ্যোগটি গ্রহণ করেন প্যান-ইসলামিক খিলাফত আন্দোলনের নেতা মোহাম্মদ আলি, রহমত আলি খান, ফিরোজউদ্দিন মনসুর, আবদুল মজিদ ও শওকত ওসমানী। তৃতীয় উদ্যোগটি গ্রহণ করেন গাদার পার্টির নেতা রতন সিং ও সন্তোষ সিং প্রমুখ। এই তিন উদ্যোগই ছিল ভারতের বাইরে। ভারতের ভেতরে যাঁরা এরূপ উদ্যোগ গ্রহন করেন, তাঁরা হলেন বোম্বেতে এস. এ. ডাঙ্গে, মাদ্রাজে সিঙ্গারভেলু চেট্টিয়ার এবং বাংলায় মুজাফফর আহমদ প্রমুখ। এম. এন. রায় এ-সমস্ত উদ্যোগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুরে নতুনভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় এবং এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে এস. ভি. ঘাটে ও কে. এন. যোগলেকার। আর. এস. নিম্বকর ও মুজাফফর আহমদ প্রমুখ সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ সালে এম. এন. রায় যুগপৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল (কমিনটার্ন) থেকে বহিষ্কৃত হন। অবনী মুখার্জী চিহ্নিত হন একজন আন্তর্জাতিক প্রতারক (Imposter) হিসাবে। বলাবাহুল্য প্রথম উদ্যোক্তাদের কেউই শেষ পর্যন্ত পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকেননি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কমিউনিস্ট পার্টি দত্ত-ব্রাডলি থিসিসের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর এক পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টিও বিভক্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, সি. পি. আই., সি. পি. আই. (এম.), সি. পি. আই. (এম. এল.) ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য সিপিআই (এম) ভারতের কয়েকটি রাজ্যে প্রভাব বজায় রাখতে ও রাজ্য সরকারে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানে এই আন্দোলন প্রায় বিলুপ্তই হয়ে যায়। বাংলাদেশেও ভারতের অনুরূপ অসংখ্য কমিউনিস্ট দল-উপদলের সৃষ্টি হয় এবং অনেকটা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।

ভারসাম্যের তত্ত্ব Theory of Balance. এই তত্ত্বানুযায়ী সমাজপ্রগতির মূলকথা শ্রেণীসংগ্রাম নয়, বরং সমাজের বাহ্যিক দ্বন্দ্ব ও পরিবেশগত কারণসমূহ। কোঁতে, কাউটস্কি, বোগদানভ, বুখারিন প্রমুখ ছিলেন এই তত্ত্বের প্রবক্তা। এই তত্ত্ববিদদের মতে বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভবপর।

ভার্সাই চুক্তি Versaille Pact. প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে, ১৯১৯ সালের ২৮ জুন বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহ এবং পরাজিত জার্মানির মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির প্রথমাংশই বস্তুত লীগ অব নেশনস-এর ভিত্তি স্থাপন করে। আর চুক্তির দ্বিতীয়াংশ অনুযায়ী জার্মানি বিপুল এলাকা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, আলসাস-লোরেইন চলে যায়

ফ্রান্সের হাতে, ইউক্রেন মালমেডি বেলজিয়ামের হাতে, আপার সাইলেশিয়ার অংশবিশেষ, পোসেন এবং পশ্চিম প্রুশিয়া পোল্যান্ডের হাতে, মেসেল বন্দর ও তার পশ্চাদ্‌ভূমি লিথুয়ানিয়ার কাছে, হালচিন চেকোস্লোভাকিয়ার হাতে এবং সেলজউইনের অংশ ডেনমার্কের হাতে। এই চুক্তিতে আরও সাব্যস্ত হয় যে, ডানজিগের ওপর থেকে জার্মান সার্বভৌমত্ব লুপ্ত হবে। জার্মান-অস্ট্রিয়া সংযুক্তির পরিকল্পনা আপাতত বাতিল হবে, জার্মানি এক লক্ষের বেশি সৈন্য রাখতে পারবে না, জার্মান নৌবহরে ছয়টি যুদ্ধজাহাজ এবং সে-অনুযায়ী ক্রুজার ও ড্রেস্ট্রয়ার ছাড়া সাবমেরিন বা আর কোনো যুদ্ধজাহাজ থাকবে না। তা ছাড়া জার্মানি কোনো জঙ্গিবিমান বা ভারী কামানও রাখতে পারবে না এবং কোনো দুর্গাদিও নির্মাণ করতে পারবে না। এ ছাড়াও রাইনল্যান্ড ১৫ বছর যাবৎ বিজয়ীদের দখলে থাকবে, সার অন্তর্জাতিক এলাকা হবে, জার্মান নদীসমূহ আন্তর্জাতিকীকৃত হবে, এবং জার্মান উপনিবেশসমূহ বিজয়ীদের মধ্যে বাঁটোয়ারা হবে বলেও চুক্তিতে সাব্যস্ত হয়। এভাবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির যাবতীয় দায়দায়িত্ব জার্মানির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। সর্বোপরি, ১৯২১ সালে এই চুক্তি মোতাবেক সাব্যস্ত হয় যে, জার্মানি ৬৬০ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দেবে। স্বভাবতই এই চুক্তি জার্মানির জন্য শুধু চরম অবমাননাকরই ছিল না, জার্মান অর্থনীতির জন্যও এটা ছিল দুর্বহ। ১৯৩২ সালে জার্মানি ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৩৫ সালেই ভার্সাই চুক্তিকে বাতিল ঘোষণা করেন। ১৯৩৯ সালের মধ্যেই জার্মানি তার হাতছাড়া হওয়া প্রায় সকল এলাকাই পুনঃদখল করে নেয়। অনেকে মনে করেন যে, ভার্সাই চুক্তির শর্তাবলীর দরুনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনেকটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

ভাষা আন্দোলন পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার এক পাঁয়তারা শুরু হয়। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন যে, "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"। বস্তুত বাংলা ভাষার ওপর এই হামলা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)কে ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন-শোষণ করার এবং এই প্রয়োজনে এই এলাকার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার নীলনকশারই অংশবিশেষ। স্বভাবতই বাংলাদেশের মানুষ, বিশেষত ছাত্রসমাজ এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৫২ সালে এই আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে স্বৈরাচারী সরকারের গুলিতে বরকত, সালাম, রফিক, সালাউদ্দিন, জব্বার প্রমুখ শহীদ হন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে আন্দোলন এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে সরকার শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনের ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সার্বিক পরাজয় বরণ করে। বস্তুত ভাষা আন্দোলন ছিল ত ৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের নিপীড়িত জনগণের স্বাধিকার আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামেরই প্রথম ধাপ। পৃথিবীর আর কোনো দেশে ভাষার জন্য এরকম প্রচণ্ড আন্দোলন ও প্রাণদানের নজির নেই।

ভিয়েতমিন ১৯৪১ সালে ইন্দোচীনে জাপানি আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করার জন্য হো চি মিন যে রাজনৈতিক সংগঠন গঠন করেন, তারই নাম ছিল ভিয়েতমিন। ১৯৫১ সালে

এই সংগঠন লিয়েন ভিয়েত ফ্রন্ট নামে পরিচিত হয়। এই সংগঠনের ছিল সমাজতান্ত্রিক আদর্শপুষ্ট এবং দক্ষ এক সেনাবাহিনী। বস্তুত ১৯৪৫ সাল থেকে ভিয়েতনামের বনাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে এদেরই ছিল মূল নিয়ন্ত্রণ। ১৯৫৪ সালে এই বাহিনী দিয়েন-বিয়েন ফুতে (জেনারেল গিয়াপের নেতৃত্বে) ফরাসি বাহিনীকে যেভাবে পরাজিত করে, তা বিশ্বের গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী ১৭তম অক্ষরেখার উত্তরাঞ্চলকে গণপ্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং এই রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয় এই সংগঠন। কিন্তু এতে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেনা। যুদ্ধ চলতেই থাকে এবং ক্রমে দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। সত্তুরের দশকে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম মিলে এক রাষ্ট্রের পত্তন হয় এবং ভিয়েতমিনের উত্তরসূরীরাই রাষ্ট্রক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়।

ভূ-অর্থনীতি Geo-Economy. অর্থনীতি শাস্ত্রে এটি তুলনামূলকভাবে একটি সাম্প্রতিক সংযোজন। এর তাৎপর্য হল এই যে, একটা দেশ বা অঞ্চলের অর্থনীতি তার ভৌগলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশের ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদাদির বিন্যাস মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আবার, অনেকক্ষেত্রে এক একটা অঞ্চলের নদনদী, তেল-গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ সম্পদের আকর, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সাগরের অবস্থান, বন্দর সুবিধা, কাঁচামাল ও শিল্পের অবস্থান ইত্যাদি এমনভাবে বিন্যস্ত যে, এরূপ অঞ্চলে সেক্টর বিশেষে বা কতিপয় সেক্টরে কোনো একক রাষ্ট্র কর্তৃক পরিকল্পনা গ্রহণের বদলে সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্র কর্তৃক সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ সকলের জন্য অধিকতর কল্যাণকর হতে পারে। বর্তমান বিশ্বে শিল্পায়ন, আন্তঃকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান এবং সম্পদ ও সুবিধাদির প্রাপ্যতার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠা উচিত বলে অনেকে মনে করেন। এরূপ ভৌগলিক অবস্থান, সুবিধাবাদি ও সম্পদ ভিত্তিক অর্থনীতিকেই বলে ভূ-অর্থনীতি।

ভূদান : ভারতের আচার্য বিনোবা ভাবে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস থেকে ভূদান আন্দোলন শুরু করেন। আচার্য ভাবে মনে করতেন যে, সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য রক্তক্ষয়ী শ্রেণীসংগ্রামের কোনোই প্রয়োজন নেই, বরং ধনী ভূস্বামীদের বিবেকের কাছে যথাযথভাবে আবেদন জানাতে পারলে, তাঁরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের অতিরিক্ত জমি বা ভূমি গরিবদের মধ্যে দান করে দেবেন এবং এতে করে শান্তিপূর্ণ উপায়েই বৈষম্য দূর হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভারতের প্রায় সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। বলাবাহুল্য, ভূদান আন্দোলন ভারতের ধনীশ্রেণীর মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়নি।

ভূমিদাস Serf. সামন্তবাদী ব্যবস্থার দুই চূড়ান্ত শ্রেণী হল সামন্তপ্রভু বা ভূস্বামী এবং ভূমিদাস। ভূমিদাসদের সঙ্গে পুঁজিবাদী যুগের কৃষিশ্রমিকদের মৌলিক পার্থক্য আছে। কৃষিশ্রমিকরা আইনত স্বাধীন; কিন্তু ভূমিদাসরা স্বাধীন নয়। ভূমিদাসরা জমির সঙ্গে আবদ্ধ, তারা সংশ্লিষ্ট ভূস্বামীর এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় যেতে পারত না, ভূস্বামীর আজ্ঞা মতো ভূস্বামীর জন্য কাজ করা ছিল তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। বংশবংশানুক্রমে ভূমিদাসরা ভূস্বামীর দাসত্ব-মজুরি খাটতে বাধ্য থাকত। ভূস্বামী যদি তার জমিদারি অন্য

কোনো ভূস্বামীর কাছে বিক্রি করে দিত, তা হলে এই জমিদারির সমস্ত ভূমিদাসও নতুন ভূস্বামীর সম্পত্তি বলে গণ্য হত। ভূমিদাসরা ক্রীতদাসদের মতো সরাসরি পণ্য না হলেও, পরোক্ষভাবে পণ্য হিসাবেই পরিগণিত হত। বংশ-বংশানুক্রমে ভূমিদাসের সমগ্র পরিবারই ভূমিদাস ও ভূস্বামীর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হত।

ভূমি-সাম্যবাদ : Land Communism. কোনো সমাজের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে সমানভাবে ভূমিবণ্টনের মতবাদ। এই মতবাদকে কার্যকর করার আন্দোলনও এই মতবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ভূ-রাজনীতি Geo-Politics. সভ্যতার আদিকাল থেকে একটা দেশ অপর এক বা একাধিক দেশকে এই যুক্তিতে জয় করে নিত যে, অধিকৃত অঞ্চল ব্যতীত দেশটি ভৌগোলিকভাবে পূর্ণাঙ্গ বা স্বয়ংসম্পুর্ণ হচ্ছে না। একই যুক্তিতে এক-একটা অঞ্চলকে পরিণত করা হত করদরাজ্য বা কলোনিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অন্যের এলাকা সরাসরি দখল করে নেওয়ার রেওয়াজ উঠে যায় বললেই চলে। বরং উলটো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একের পর এক কলোনি স্বাধীনতাই অর্জন করতে থাকে। বিকল্প হিসাবে এখন ভৌগোলিক অনিবার্যতা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, যৌথ নিরাপত্তা ইত্যাদির নামে গঠন করা হয় বিভিন্ন জোট, সম্পাদিত হয় বিভিন্ন প্রোটোকল। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবিকই এক-একটা অঞ্চলের ভৌগোলিক বিশেষত্ব ও সুবিধাসমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যে, ওই অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, জোটবদ্ধতা ও যৌথ প্রতিরক্ষা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই অধিকতর কল্যাণকর হতে পারে। এভাবে, কোনো রাষ্ট্র যদি নিজ স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় নিজের প্রভাববলয় সৃষ্টি করতে বা বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয় তা হলে এই প্রচেষ্টাকে বলে ভূ-রাজনীতি। একইভাবে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র যদি তাদের সাধারণ স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলভিত্তিক কোনো জোট, ঐক্য বা সহযোগিতা গড়ে তোলে, তা হলে সেটাও ভূ-রাজনীতির আওতায় পড়ে। আবার কোনো একটি একক দেশও তার ভৌগোলিক বাস্তবতার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের এক বা একাধিক দেশের সঙ্গে বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্ক, লেনদেন বা সহযোগিতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে পারে। (ভৌগোলিক রাজনীতিও দ্রষ্টব্য)

ভেটো : Veto. এর অর্থ হল প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা। সাধারণত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের বিশেষ ক্ষমতাই ভেটো পাওয়ার নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে রাশিয়া সংশোধনী প্রদান করে যে, মূল পাঁচ শক্তির ঐকমত্য ব্যতিরেকে নিরাপত্তা পরিষদের কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণই সঠিক হবে না। ভেটোক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি দেশ হল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। ১৯৪৯ সালে মূল চীনে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সত্তর দশকের শেষার্ধ নাগাদ নয়াচীনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না এবং তৎপরির্তে চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বাধীন তাইওয়ানই ভেটোক্ষমতা ভোগ করে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত নয়াচীনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং নয়াচীন ভেটোক্ষমতাও লাভ করে। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সকল সদস্যরাষ্ট্রের মর্যাদা সমান হলেও ভেটোক্ষমতার দরুন উক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচটি দেশ অন্যদের তুলনায় অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে আসছে।

ভোগবাদ গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাসই (খ্রিস্টপূর্ব ৩৪১-২৭০) ভোগবাদ বা Epicurism-এর প্রবক্তা। এই মতবাদ অনুসারে, যেহেতু সুখ মানুষের মৌল আকাঙ্ক্ষা

এবং দুঃখ অবাঞ্ছিত, সেহেতু দর্শনের প্রধান কাজই হল মানুষের সর্বাধিক সুখলাভ ও দুঃখ পরিহারের উপায় দেখিয়ে দেওয়া। এপিকিউরাসের মতে সকলপ্রকার সুখ ভোগ্য নয়; ব্যক্তিগত বা ইন্দ্রিয়গত সুখ পরিহার করে প্রকৃত সুখ বা পূর্ণ মানসিক শান্তি লাভ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর এই মানসিক শান্তিলাভের জন্য চাই বিভিন্ন সদ্‌গুণ। এপিকিউরাসের কতিপয় শিষ্য তাঁর মতবাদের স্থূল ব্যাখ্যা করে দুর্নীতিমূলক ও পাপমূলক সুখে নিমগ্ন হলে, তিনি তাঁদের শিষ্য বলে অস্বীকার করেন।

ভোট, কৌশলগত Tactical Vote. সাধারণভাবে একজন ভোট দেয় তার পছন্দের দল বা প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য। কিন্তু কোনো কোনো সময় এমন পরিস্থিতিও দেখা দিতে পারে, যে-পরিস্থিতিতে একজন ভোটার তার ভোটক্ষমতা প্রয়োগ করে যে-দল বা প্রার্থীকে সে ঘৃণা করে তাকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে। এরূপ ক্ষেত্রে সে নিজের পছন্দের প্রার্থী বা দলকে ভোট না দিয়ে তার ঘৃণিত প্রার্থী বা দলকে ঠেকানোর জন্য তৃতীয় কোনো প্রার্থী বা দলকেই ভোট দিয়ে দিতে পারে। যেমন– ধরা যাক, ব্রিটেনের কোনো এলাকার লেবার পার্টির সমর্থকরা দেখল যে তারা যদি তাদের দলের প্রার্থীকে ভোট দেয়, তা হলে কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থীই জিতে যায় ; তাই তারা কনজারভেটিব প্রার্থীকে হারানোর জন্য লিবারেল ডেমোক্রেট প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিল। এরূপ ভোটই হল কৌশলগত ভোট।

ভোট, বাধ্যতামূলক Compulsory Vote. অর্থাৎ যে-ভোট প্রদান করতে প্রতিটি ভোটার বাধ্য। অস্ট্রেলিয়ার কোনো ভোটার ভোট দিতে ব্যর্থ হলে তাঁকে এই অপারগতার জন্য কারণ দর্শাতে হয়। কারণ সন্তোষজনক না হলে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে অর্থদণ্ড দেওয়া যেতে পারে।

ভোট, স্ট্র : Straw Vote. আসন্ন কোনো নির্বাচনের ফলাফল কী হতে পারে, সে-সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার উদ্দেশ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংবাদপত্রের উদ্যোগে যে বেসরকারি ভোটগ্রহণ করা হয়, সেই ভোটকেই বলা হয় স্ট্র ভোট।

ভোটাধিকার Franchise. জনগণের ভোটাধিকারের চিত্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। ব্রিটেনে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে জনগণকে ভোটাধিকার প্রদান করা শুরু হয় এবং ১৯১৮ সালে সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ নাগরিকই ভোটাধিকার প্রাপ্ত হন। ১৯২৮ সাল নাগাদ সমস্ত নারীও ভোটাধিকার লাভ করেন। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে ভোটাধিকার প্রাপ্তির সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে ভোটাধিকার পাওয়ার জন্য বাসস্থান, জাতীয়তা, নাগরিকত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে কড়াকড়ি শর্তও আরোপ করা হয়। তবে, বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়।

ভোটাধিকারবাদীনীরা Suffragettes. যে-সমস্ত মহিলা মহিলাদের ভোটাধিকারের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদেরকে এই নামে অভিহিত করা হত। ব্রিটেনে ১৯০৩ সালে মিসেস প্যাঙ্ক হার্স্ট 'মহিলাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইউনিয়ন' (Women's Social and Political Union) গঠন করেন, যা ১৯০৬-১৪ সালে আরও জঙ্গি রূপ পরিগ্রহ করে। এর সদস্যারা কারাদণ্ড ভোগ করে এবং অনশনের আশ্রয়

নেয়। ফলে ১৯১৮ সালে ৩০ বছরের অধিক বয়স্কা মহিলারা ভোটাধিকার লাভ করে। অবশ্য ১৯২৮ সালে ২১ থেকে ৩০ বছর বয়স্কারাও ওই অধিকার পেয়ে যান। যুক্তরাষ্ট্রে এই আন্দোলন শুরু হয় আরও আগে। ১৮৬৯ সালে ওহাইও-র ক্লিভল্যান্ডে 'মার্কিন মহিলা ভোটাধিকার সমিতি' (American Women's Suffrage Association). গঠিত হয়। ১৮৯০ সালে এই সমিতি 'জাতীয় মহিলা ভোটাধিকার সমিতি' নাম ধারণ করে এবং সংগ্রামের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। সুজান এন্থনির নেতৃত্বে নারীরা জঙ্গি কৌশল অবলম্বন করে। ফলে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই ১১টি রাজ্যে মহিলারা ভোটাধিকার লাভ করে। ১৯২০ সালের ২৮ আগস্ট মার্কিন শাসনতন্ত্রের ঊনবিংশতম সংশোধনীর ফলে সমগ্র মার্কিন মহিলা এই অধিকার অর্জন করে। এর আগে মহিলাদের ভোটাধিকার দান করা হয় নিউজিল্যান্ডে (১৮৯৩)। ১৯০৭ সালে নরওয়ের মহিলারাও এই অধিকার অর্জন করেন।

ভোটাধিকার, সর্বজনীন : Universal Adult Franchise. একটি দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের নারী-পুরুষ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা-নির্বিশেষে ভোটদানের এবং ভোটপ্রার্থী হওয়ার অবাধ অধিকারকে বলে সর্বজনীন ভোটাধিকার।

ভৌগোলিক রাজনীতি এর অর্থ কোনো দেশ বা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাজনীতি। তবে, এই নামে একটি সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বও রয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সামান্য পূর্বে ফ্রেডারিখ র‍্যাটজেল নামক জনৈক জার্মান ভূগোলবিদ 'বাঁচার জায়গা' (Lebensraum)-র নামে সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের এক তত্ত্ব হাজির করেন। তাঁর মতে, বিশ্বের দেশসমূহ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই ন্যায় এবং এরা 'বাঁচার জায়গা'-র জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এই তত্ত্বের অন্যান্য প্রবক্তাদের মধ্যে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাডমিরাল মাহান, ব্রিটেনের হ্যালফোর্ড ম্যাকিনভার প্রমুখ। জার্মানি পররাজ্য গ্রাসের যুক্তি হিসাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই তত্ত্বকেই হাজির করেছিল। বর্তমানেও বিভিন্ন পরাশক্তি স্ব স্ব প্রভাববলয়ের স্বার্থে এই তত্ত্বকে কোনো-না-কোনো রূপে উপস্থাপিত করে। (ভূ-রাজনীতিও দ্রষ্টব্য)।

ভ্যাটিকান : Vetican. এটি খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপের আবাস ও কর্মকেন্দ্র। ইতালির রোম নগরীর কয়েকটি সুবৃহৎ প্রাসাদ নিয়ে এটি গঠিত। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত পোপের রাজ্য ইতালির অনেকাংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ওই বছর ইতালির রাজা ওই প্রাসাদগুলো ছাড়া পোপের বাদবাকি এলাকা দখল করে নেন। পোপরা তাঁদের এই 'রাজ্যগ্রাস' কখনোই মেনে নেননি। এই বিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৯ সালে তৎকালীন পোপ ও ইতালির সরকারের মধ্যে 'ল্যাটেরান চুক্তি' (Lateran Treaty) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি মোতাবেক ভ্যাটিকানের প্রাসাদসমূহ, ল্যাটেরান প্রাসাদ (রোমে অবস্থিত) এবং বাস্টেল গন্ডলকো নামক স্থানে অবস্থিত পোপের বাসগৃহের ওপর পোপের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়। এ ছাড়া পোপকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে একশত কোটি লিরা (ইতালির মুদ্রা) প্রদান করা হয়। নিজের সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করার জন্য পোপ ভ্যাটিকানের মুদ্রা, ডাকটিকেট ইত্যাদির প্রবর্তন করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্যাটিকানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেন। ভ্যাটিকান চিরকালই রক্ষণশীলতার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত।

॥ ম ॥

মক্কা ঘোষণা ১৯৮১ সালের ২৫-২৮ জানুয়ারি মক্কায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে ৪০টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধানগণ এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। এই ঘোষণায় বিশ্বাসের ঘোষণা, মুসলমানরা এক জাতি, হৃত অধিকার উদ্ধারের প্রশ্ন, আলকুদস্ শরিফের মুক্তি, আফগানিস্তান প্রশ্ন, পরাশক্তিদের দ্বন্দ্ব, মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন, নতুন বিশ্ব গড়ার ডাক, আন্তর্জাতির প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগণের অধিকার, অর্থনৈতিক সহায়তার প্রশ্ন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গ, ওআইসি ও ইসলামি সংগঠন, জনগণের প্রতি, বিশ্বের প্রতি, এবং প্রার্থনা শীর্ষক স্তবক রয়েছে। এই ঘোষণায় ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান, ইসলামি মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য, ভাষা, বর্ণ, দেশ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মুসলমান যে একটি এক ও অখণ্ড জাতি, মুসলমানদের হারানো ভূ-খণ্ড উদ্ধার, পবিত্র স্থানসমূহ মুক্ত করার জিহাদে সর্বশক্তি প্রয়োগ, আফগান জনগণের সঙ্গে একাত্মতা, উপসাগরীয় দেশসমূহে বাইরের হস্তক্ষেপ যে অবাঞ্ছিত, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, শক্তির দাপট, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা, অবিচার, নিপীড়ন ও বঞ্চনার কবলমুক্ত নতুন বিশ্ব গঠন, তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের প্রতি সংহতি, মুসলিম দেশসমূহের সকল সম্পদ সমন্বিতকরণ ও পারস্পরিক সহযোগিতা, শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামি নীতি আদর্শ ও আধুনিক বিজ্ঞান-কলাকৌশল ইত্যাদির সংযোজন, ইসলামি ঐক্যসংস্থাকে আরও কার্যকরকরণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সিরাতুল মুস্তাকিমে থাকার তৌফিকদানের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহর প্রতি প্রার্থনা জানানো হয়। এই ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ হচ্ছে আলজিরিয়া, বাহরাইন, বাংলাদেশ, ক্যামেরুন, জিবুতি, আরব আমিরাত, গ্যাবন, জাম্বিয়া, গিনি, গিনি-বিসাউ, আপার ভোল্টা, কমোরো, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, লিবিয়া, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মালি, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, নাইজার, ওমান, উগান্ডা, পাকিস্তান, কাতার, সৌদী আরব, পিএলও, সেনেগাল, সুদান, সিরিয়া, সোমালিয়া, চাদ, তিউনিসিয়া, তুরস্ক এবং দুই ইয়েমেন। মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র ইরান এই সম্মেলনে অনুপস্থিত ছিল।

মজুরি : Wages. সাধারণ অর্থে শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে প্রদত্ত মূল্যই হল মজুরি। মজুরি সাধারণত দুই প্রকার আপাত মজুরি (Notional Wage) এবং প্রকৃত মজুরি (Real Wage)। শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে টাকার হিসাবে যে মূল্য পায়, সেটাই হল আপাত-মজুরি। আর ওই মজুরি দিয়ে শ্রমিক যে-পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ইত্যাদির সংস্থান করতে পারে, সেটাই হল প্রকৃত আয়। প্রায়শই দেখা যায় যে, শ্রমিকের আপাত আয় বাড়ছে; কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন আপাত বর্ধিত মজুরি দিয়ে শ্রমিক পূর্ববর্তী সময়ের পরিমাণ সামগ্রীও কিনতে পারছে না। এর অর্থ হল, আপাত আয় বাড়লেও প্রকৃত আয় কমে গেছে। মার্কসীয় মতে মজুরি 'শ্রমশক্তির দাম, শ্রমের দাম নয়'। কেননা মালিক শ্রমিককে যে-মজুরি দেয়, তা তার সমগ্র শ্রমের মূল্য নয়; বরং তার শ্রমশক্তিকে ক্রয় করার মূল্য। মার্কসীয় মতে এই দুই মূল্যের পার্থক্য থেকেই উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব।

মজুরি, আপাত Notional Wage. অর্থাৎ, অর্থের হিসাবে প্রদত্ত মজুরি। এক্ষেত্রে প্রদত্ত মুদ্রা মজুরি দিয়ে কতটা সামগ্রী বা সেবা কিনতে পারা যাবে, তা ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না।

মজুরিদাসত্ব Wage Slavery. মার্কসীয় মতে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকরা আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন হলেও কার্যত জীবনধারণের প্রয়োজনে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য। শ্রমিকদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের মজুরির হার কমিয়ে রাখে এবং শ্রমিক সরবরাহ কমে যাওয়ার ফলে যাতে মজুরিহার বৃদ্ধি করতে না হয়, তার জন্য বেকারবাহিনী তৈরি করে রাখে। মোটকথা, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকদের পুঁজিপতিদের মুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হয়। মজুরদের এই অবস্থাকে মার্কসবাদীরা বলে মজুরিদাসত্ব। তবে শিল্পোন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশসমূহে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে।

মজুরি, প্রকৃত : Real Wage. প্রাপ্ত মজুরি কতটা সামগ্রী ও সেবা ক্রয় করতে পারে, তার হিসাবে ধার্যকৃত মজুরি। ফলে, আপাত-মজুরি বাড়লেও প্রকৃত মজুরি নাও বাড়তে পারে। যেমন ধরা যাক, কোনো দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা সরবরাহ হ্রাসজনিত কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেল গড়ে শতকরা ৫০ ভাগ, আর শ্রমিকদের মজুরি বাড়ল গড়ে শতকরা ২০ ভাগ। তা হলে অর্থের বিচারে যে-শ্রমিক ১০০ টাকা পেত সে এখন ১২০ টাকা মজুরি পাবে, অর্থাৎ তার আপাত আয় ১০০ টাকা থেকে বেড়ে ১২০ টাকায় দাঁড়াল। কিন্তু দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির আগে ১০০ টাকায় সে যে-পরিমাণ সামগ্রী ও সেবা কিনতে পারত, এখন ১২০ টাকায়ও তা কিনতে পারছে না। অর্থাৎ তার প্রকৃত মজুরি কমে গেছে। আবার দ্রব্যমূল্য কমে গেলে আপাত-মজুরি না বাড়লেও প্রকৃত মজুরি বেড়ে যেতে পারে।

মজুরিশ্রম : শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে যে-সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেটাই মজুরি শ্রমের সম্পর্ক। পুঁজিবাদ শ্রমশক্তিকে একটি পণ্যে রূপান্তরিত করেছে। সামন্তব্যবস্থার ধ্বংসের ফলে শ্রমিক দুই অর্থে মুক্ত হয়, প্রথমত সে তার শ্রমশক্তি বিক্রির ব্যাপারে স্বাধীন ও বাধামুক্ত হয়, দ্বিতীয়ত সে জমি এবং অন্য কোনো উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা থেকে মুক্ত হয়। অর্থাৎ সে সর্বহারায় পরিণত হয় এবং শ্রমশক্তি বিক্রয় করা ছাড়া তার জীবনধারণের আর কোনো উপায় থাকে না। মার্কসীয় অর্থনীতিতে মজুরিশ্রমের অপর নাম মজুরিদাসত্ব।

মজুরি-শ্রমিক : Wage Labour. পুঁজিবাদী সমাজে যে-শ্রমিক নিজের জন্য পণ্য উৎপাদন করে না, বরং পণ্য উৎপাদন করে তার নিয়োগকারী পুঁজিপতির জন্য এবং যে-শ্রমিক তার শ্রমের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয় এবং এভাবে নিয়োগকারী পুঁজিপতির স্বার্থে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি করে, সেই শ্রমিককেই মজুরি-শ্রমিক বলে। বস্তুত এই মজুরি-শ্রমিকই হল মার্কসীয় পরিভাষায় সর্বহারা বা প্রোলেটারিয়েট।

মতাদর্শ Ideology. যে-আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কোনো শ্রেণী, গোষ্ঠী বা দলবিশেষের স্বার্থ ও লক্ষ্য প্রকাশ পায় এবং ওই স্বার্থ বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যক্রম, আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালিত হয়, তাকেই বলে Ideology বা মতাদর্শ। মার্কসীয় মতে বর্তমান সমাজে মূলত দুটি মতাদর্শ রয়েছে, যথা বুর্জোয়া মতাদর্শ ও শ্রমিকশ্রেণীর বা সর্বহারা শ্রেণীর মতাদর্শ। বুর্জোয়ারা আপামর জনগণের সাইনবোর্ড টাঙালেও আসলে তাদের মতাদর্শ তাদেরই নিরঙ্কুশ স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। অবশ্য, বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী মতাদর্শের মধ্যেও বিভিন্ন মত আছে; যেমন রুশপন্থি সমাজতন্ত্রীরা চীনা সমাজতন্ত্রীদের সমাজতন্ত্রী বলেই স্বীকার করে না।

তা ছাড়া কল্যাণরাষ্ট্রের মতাদর্শ, ইসলামি মতাদর্শ ইত্যাদি অন্যান্য মতাদর্শও বিশ্বে বিদ্যমান রয়েছে। আর সনাতন সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শেরও ঘটছে আমূল পরিবর্তন। অনেক ক্ষেত্রে তা পুনরায় পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে।

মদিনা সনদ : ৬২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন এবং মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। এ-সময় সেখানে তিন শ্রেণীর মানুষ ছিল, যথা পৌত্তলিক, ইহুদি ও নবদীক্ষিত মুসলমান। এদের মধ্যে ছিল গোষ্ঠীগত হিংসা বিদ্বেষ। তাই সকলের মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপন ও সুশাসন সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ৫৩টি ধারাসম্বলিত একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। এই সংবিধানই মদিনা সনদ নামে পরিচিত। এর প্রথম ১০ ধারায় বলা হয় যে, মুহাজিরগণ, বনু আউফ, বনু সাইদা, বনু হারিস, বনু জুশাম, বনু নাজ্জার, বনু আমর, বনু নবীত ও বনু আউস পূর্বহারে রক্তপণ আদায় করবে এবং মুমিনদের মধ্যে প্রচলিত নিয়মনীতি এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে রক্তপণের মাধ্যমে বন্দিদের মুক্ত করবে। ১১ থেকে ২০ ধারায় মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্পর্কিত আইন বিধৃত হয়। ২১ থেকে ২৬ ধারায় কোনো মুমিনকে হত্যাকারীর শাস্তি, কোনো মুমিন কোনো অন্যায়কারীকে আশ্রয় দিলে তার শাস্তি, কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তার মীমংসাপদ্ধতি, ইহুদিগণ কর্তৃক যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহ ও ইহুদিদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ক আইন সন্নিবেশিত হয়। ২৭ থেকে ৩৬ ধারায় সন্নিবেশিত হয় বিভিন্ন ইহুদি গোত্রের স্বরূপ-সম্পর্কিত বিধান। পরবর্তী ধারাসমূহে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুমতি ব্যতীত ইহুদিদের যুদ্ধে না যাওয়া, কোনো নাগরিকের ক্ষতির প্রতিশোধ, নিজ নিজ ব্যয়নির্বাহ, এই সনদ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হলে তার ব্যাপারে ব্যবস্থা, বন্ধুর দুষ্কর্ম, যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহ, সনদ গ্রহণকারীদের মদিনায় থাকার অধিকার, আশ্রয়দানকারী ও আশ্রিতের সম্পর্ক, নারীর আশ্রয়, এই সনদ গ্রহণকারীদের মধ্যে শান্তিভঙ্গের আশংকা দেখা দিলে করণীয়, কুরাইশদের ব্যাপারে ব্যবস্থা, মদিনার ওপর অতর্কিত আক্রমণ হলে করণীয়, চুক্তি, স্বপক্ষের কাছ থেকে প্রতিটি মানুষের প্রাপ্য, বনু আউস বিষয়ক কিতাব বাস্তবায়নে বাধাদানকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি এবং আল্লাহই যে রক্ষাকারী ও মুহাম্মদ (সাঃ)-ই যে আল্লাহর রাসুল—এই ঘোষণাসম্বলিত বিধিসমূহ সন্নিবেশিত হয়। বিশ্বের ইতিহাসে এটিই প্রথম লিখিত চুক্তি ও সংবিধান।

মধ্যপন্থি রাজনৈতিক মতাদর্শ বা কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে যারা উগ্র নয়, আবার অতি নমনীয়তা বা নতজানু নীতিরও পক্ষপাতী নয়, তাদেরকেই বলা হয় মধ্যপন্থি। মধ্যপন্থিরা মনে করে যে অতিউগ্রতা বা অতিউদারতা কোনোটিই স্থায়ী কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না; বরং মধ্যপন্থার মধ্যেই মানবসমাজের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। ইংরেজিতে এদের বলা যায় Middle Roaders.

মধ্যবিত্ত শ্রেণী Middle Class. সামন্তযুগে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসদের মধ্যবর্তী শ্রেণী ছিল তৎকালীন বুর্জোয়ারা। তারাই তখন মধ্যবিত্ত অর্থাৎ মধ্যমবিত্ত বা সম্পদের অধিকারী বলে গণ্য হত। পুঁজিবাদের যুগে পুঁজিপতি ও সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী, পেশাদার, বুদ্ধিজীবি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী প্রভৃতিই মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসাবে পরিচিত। ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক এবং বৃহৎ ভূস্বামী ছাড়া অন্যান্য কৃষকদেরও মধ্যবিত্ত বলে গণ্য করা হয়। মধ্যবিত্তেরা সাধারণত একদিকে সমাজসচেতন এবং অন্যদিকে ঝুঁকি

নেওয়ার ব্যাপারে দোদুল্যমান, অর্থাৎ এদের মধ্যে পেটি বুর্জোয়া চরিত্রেরই প্রাধান্য।

মধ্যস্বত্বভোগী Middleman. উৎপাদক এবং ভোক্তা বা ভোগকারীর মাঝখানে যেসব ব্যবসায়ী থাকে তাদেরকেই বলে মধ্যস্বত্বভোগী, যেমন পাইকার, এজেন্ট, পরিবেশক, দালাল, ইন্ডেন্টার প্রভৃতি। উৎপাদক ও ভোক্তার মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগীর স্তর যত বাড়ে, পণ্যের মূল্যও ততই বাড়ে, অর্থাৎ ভোক্তা মধ্যস্বত্বভোগীদের মুনাফার স্বার্থেই অধিক মূল্য দিতে বাধ্য হয়। মধ্যস্বত্বভোগীরা তাদের মুনাফার প্রয়োজনে বাজারে কৃত্রিম সঙ্কটও সৃষ্টি করে। মধ্যস্বত্বভোগীরা পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ।

মনরো-নীতি Monroe Doctrine. ১৮২৩ সালের দোসরা ডিসেম্বর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনরো ইউরোপ এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ সম্পর্কে যে-নীতি ঘোষণা করেন, সেটাই ইতিহাসে মনরো ডকট্রিন বা মনরো-নীতি নামে প্রসিদ্ধ। এই নীতির তিনটি প্রধান দিক হল ক. অতঃপর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে কোনো ইউরোপীয় শক্তির উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা চলবে না; খ. ইউরোপীয় শক্তিসমূহ তাদের ব্যাপার নিয়ে যে-যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়, আমরা (যুক্তরাষ্ট্র) তাতে কখনোই অংশ নিই না এবং নেব না, কারণ তা আমাদের নীতির পরিপন্থি এবং গ. এই দুই মহাদেশের কোথাও কোনো ইউরোপীয় শক্তি তাদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করলে, আমরা সেটাকে আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি বিপজ্জনক বলে বিবেচনা করব। ১৮২৩ সালে রাশিয়া (আলাস্কা তখনও রাশিয়ার দখলে) আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলকে রুশ ছাড়া অন্য সকল দেশের জাহাজের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ নিলে এবং প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া, ও রাশিয়ার তথাকথিত 'হলি এলায়েন্স' বা পবিত্র সংঘবদ্ধতার ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ আমেরিকার নবগঠিত প্রজাতন্ত্রসমূহে হামলার আশঙ্কা দেখা দিলেই প্রেসিডেন্ট মনরো এই নীতি ঘোষণা করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ এই নীতিকে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, দুই আমেরিকা মহাদেশ থেকে ইউরোপীয় শক্তির উচ্ছেদ ঘটিয়ে সেস্থলে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য কায়েমই ছিল মনরো-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ Psychological Warfare. এটি আধুনিক যুদ্ধের একটি কায়দা। এই যুদ্ধেরও লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুকে পরাজিত করা। তবে, এই যুদ্ধে গোলাগুলির পরিবর্তে আশ্রয় নেওয়া হয় এমন প্রচারকৌশলের, যে-প্রচারের ফলে শত্রুর মনোবল ভেঙে যায় এবং শত্রু আত্মসমর্পণ করে অথবা এমন দোদুল্যমান অবস্থায় যুদ্ধে লিপ্ত হয় যে, ওই অবস্থায় পরাজয় অনিবার্য। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ কোনো পরিপূর্ণ যুদ্ধ নয়, এটা অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধের পরিপূরক একটি যুদ্ধ মাত্র। যুদ্ধের সময় তো বটেই, প্রকৃত যুদ্ধের আগে-পরেও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালিত হতে পারে। এই যুদ্ধের মাধ্যম হল রেডিও, টেলিভিশন, লাউড স্পীকার, মুখে-মুখে প্রচার, সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, পুস্তিকা, পোস্টার, গুজব ছড়ানো, শত্রুমহলে এজেন্ট ও গুপ্তচর নিয়োগ ইত্যাদি। শত্রু যাতে আত্মসমর্পণ করে, সেজন্য অনেক সময় এরূপ যুদ্ধে যুদ্ধবন্দিদের চিঠি বা ছবি শত্রুদের মধ্যে বিমান বা মর্টারজাতীয় অস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে শত্রুসৈন্যেরা মনে করে যে, যারা ধরা পড়েছে বা আত্মসমর্পণ করেছে, তারা খুব আরাম-আয়েশে আছে। এরূপ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল শত্রুসৈন্যের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করা, যাতে তারা তাদের উপরস্থ কর্মকর্তা বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

মন্টেস্কু Montesquieu. (১৬৮৯-১৭৫৫)। তাঁকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম জনক বলে বিবেচনা করা হয়। এই ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ The Spirit of the Laws (১৭৪৮)। তিনি এই মতবাদ পোষণ করতেন যে, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইতিহাসই একটা জাতির সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ওপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলে। মন্টেস্কু লক (Locke)-এর সমন্বয়ে 'ক্ষমতার পৃথকীকরণ' তত্ত্বের বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস পান এবং বলেন যে, রাষ্ট্রের প্রকাশন, পার্লামেন্ট ও বিচার বিভাগ একে অপরের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীন থাকলেই ক্ষমতার ভারসাম্য (Check and balance) ঠিকমতো বজায় থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণেতারা মন্টেস্কু-এর চিন্তাধারার দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়।

মন্ট্রিল কনভেনশন Montreal Convention. বিমান ছিনতাই ঘটনার মোকাবেলার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে মন্ট্রিলে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিমান ছিনতাই রোধ ও ছিনতাই-ঘটনার মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৮টি রাষ্ট্র এতে স্বাক্ষরদান করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, একই উদ্দেশ্যে ইতঃপূর্বে ১২৯টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে ১৯৭০ সালে হেগ কনভেনশন এবং তারও পূর্বে ১৯৬৩ সালে ১২১টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে টোকিও কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

মনট্রিল প্রোটকল Montreal Protocol. ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ২৪টি দেশ কানাডার মনট্রিলে এই প্রোটকলে স্বাক্ষর করে। রেফ্রিজারেশন, এয়ারকন্ডিশানিং, অ্যারোসল স্প্রে, ফার্মাসিউটিক্যালস্, কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রনিকস্সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদির মাধ্যমে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (Chloroflourocarbon—CFC) এবং ব্রোমাইন কম্পাউন্ড নিঃসরণের মাধ্যমে যে ওজোন (ozone) স্তরকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে এবং আলট্রাভায়োলেট রশ্মি (UV-B)-র পৃথিবীতে অনুপ্রবেশকে অবারিত করে দেওয়া হচ্ছে এবং তার ফলে মানুষসহ পৃথিবীর জীবজগতের অস্তিত্বই যে ক্রমবর্ধমান হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রোটকলের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, আপাতত ক্লোরোফ্লোরোকার্বন ও ব্রোমাইন কম্পাউন্ড (বা Halon)-এর নিঃসরণকে ১৯৮৬-র পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা হবে, ১৯৯৪ সালের মধ্যে তা ২৯% হ্রাস করা হবে এবং ১৯৯৯ সালের মধ্যে হ্রাস করা হবে ৫০%। ২০০০ সালে ক্লোরোফ্লোরোকার্বনের নিঃসরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে। ঘোষিত লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলেও এই প্রোটোকল পরিবেশ সংরক্ষণ রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেছে বলে মনে করা হয়।

মন্দা : Depression. ব্যাবসা-বাণিজ্যের সাময়িক অধোগতিকেই বলে মন্দা।

মসজিদ মসজিদ শব্দের অর্থ সিজদা করার স্থান বা উপাসনালয়। অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়ের মতো মসজিদ মুসলমানের জন্য কোনো মৌলিক প্রয়োজন নয়, কেননা প্রত্যেক স্থানই আল্লাহ্‌র নিকট সমান এবং উপাসনার জন্য উপযোগী। মহানবী (সা) তাই বলেছিলেন যে, তাঁকে সমগ্র পৃথিবীই মসজিদরূপে প্রদান করা হয়েছে। অপর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "যেখানেই সালাতের সময় হবে, সেখানেই সালাত আদায় করবে এবং সেটাই একটা মসজিদ।" কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং মসজিদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত ছিলেন এবং মসজিদ নির্মাণে উৎসাহ প্রদান করেছেন। এর কারণ শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিকও বটে। উপাসনালয় ছাড়াও গণপ্রশাসন

কেন্দ্র, বিচারালয়, কল্যাণ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হিসাবেও মসজিদ ব্যবহৃত হত এবং হতে পারে। মহানবী (সা) স্বয়ং মসজিদে মামলা-মকদ্দমার মীমাংসা করতেন। প্রাথমিক যুগে মসজিদই ছিল শাসক ও জনগণের সাধারন সভার জায়গা। যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনাদিও মসজিদেই অনুষ্ঠিত হত। শাসনকর্তারা প্রশাসন যুদ্ধ ইত্যাদি-সম্পর্কিত বিষয়ে মসজিদেই বক্তব্য রাখতেন। শ্রোতারা এর পক্ষে বা বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে পারত। পরবর্তীকালের শাসকরা শাসনকার্যকে তাঁদের স্বস্ব স্বার্থে স্ব স্ব প্রাসাদের বা দফতরের চত্বরে নিয়ে গেলে, মসজিদসমূহ শুধুমাত্র উপাসনালয়ে পর্যবসিত হয়ে পড়ে।

মস্তক ধোলাই : Brain Wash. মস্তক ধোলাই হল কোনো ব্যক্তির আদর্শগত বিশ্বাস বা মতবাদকে পরিবর্তন করে দেওয়ার প্রক্রিয়া। শারীরিক ও মানসিক চাপ, অত্যন্ত ভালো ব্যবহার, মনস্তাত্ত্বিক ওরিয়েন্টেশন, অর্থনৈতিক সুবিধাদান, ভোগবিলাসের সুবিধাদান, বিশেষ মর্যাদাদান, প্রশিক্ষণ, প্রোপাগান্ডা ইত্যাদিই হল মস্তক ধোলাইয়ের প্রধান উপায়। পাশ্চাত্য বিশ্বের অভিযোগ ছিল এই যে, কমিউনিস্ট দেশ সমূহে অকমিউনিস্ট বন্দিদের ওপর মস্তক ধোলাইয়ের প্রক্রিয়া চালানো হয়, যাতে ওরা রাজনৈতিক ও নৈতিকভাবে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় মার্কিন সরকারের একটি কমিটি লক্ষ করে যে, কমিউনিস্টদের হাতে বন্দি মার্কিন সেনাদের অনেকেরই চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটে গেছে, কেননা তারা কমিউনিস্টদের যুক্তির বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী যুক্তি দিয়ে এঁটে উঠতে সক্ষম হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মস্তক ধোলাইয়ের অভিযোগ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। অপরদিকে, পাশ্চাত্য দুনিয়া, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও মস্তক ধোলাইয়ের অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য দুনিয়া তাদের প্রাচুর্য দেখিয়ে, প্রচার চালিয়ে ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে এবং সর্বোপরি বিভিদ প্রকার উৎকোচ দিয়ে অনুন্নত বিশ্বের রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ, অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মস্তক ধোলাই করে দিচ্ছে, যাতে তারা এমন সব নীতি গ্রহণ করে যে-নীতি এ-সমস্ত দেশকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশসমূহের ওপর অর্থনৈতিকভাবে চিরকাল নির্ভরশীল করে রাখবে। এ ছাড়া, অনুন্নত বিশ্বের যে-সমস্ত ছাত্র বা গবেষক উন্নত পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়, তাদেরও শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে মস্তক ধোলাই করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। তদুপরি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারকাজ চালিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের নাগরিকদের মতবাদে পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা চালায় বলেও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব অভিযোগ করে।

মস্তিষ্কবিজ্ঞান Cybernatics. এই বিজ্ঞান প্রাণীর, বিশেষত মানুষের স্নায়ুগত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, কীভাবে মস্তিষ্ক কোনো কোনো বিষয় ধরে রাখে এবং কোনো কোনো বিষয় বর্জন করে তার মেকানিজম, মস্তিষ্কে ধৃত তথ্যাদির ট্রান্সমিশন ও প্রসেসিং, গাণিতিক যুক্তিবিজ্ঞান (Mathematical Logic), স্নায়ুব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চর্চা করে। স্বনিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব, ইলেক্ট্রনিক্স্ এবং কম্পিউটার-ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই বিজ্ঞানেরও উন্নয়ন ঘটে। এই বিজ্ঞান প্রমাণ করে যে, মানবমস্তিষ্ক সূক্ষ্মতর, জটিলতর, স্বয়ংক্রিয়, স্বয়ং সংগঠিত (Self-Organising), ও স্বয়ং প্রতিস্থাপিত (Self-adjusting) জৈব কম্পিউটার বিশেষ। মস্তিষ্করূপ কম্পিউটারে তথ্যাবলী প্রেরিত হয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, অতঃপর মস্তিষ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেসব তথ্য থেকে বাছাই-ছাঁটাই করে, প্রসেস করে এবং প্রয়োজনমতো ট্রান্সমিট করে। মস্তিষ্কবিজ্ঞান এবং

জিনবিজ্ঞানের বিকাশ মানুষ, মানুষের স্বভাব ও প্রবৃত্তি, উত্তরাধিকার ও পরিবেশের প্রভাব—তথা ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে এমন বিস্ময়কর সব তথ্য সরবরাহ করেছে, যা কিছুকাল আগেও অচিন্তনীয় ছিল। সাইবারনেটিক্স্, জিনেটিকস, আণবিক তত্ত্ব, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ইত্যাদি প্রমাণ করেছে যে, যে-বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপর মার্কসবাদকে দাঁড় করানো হয়েছিল, তা ছিল নিতান্তই অপর্যাপ্ত।

মস্কো-ঘোষণা Moscow Declearation. ১৯৯৯ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট জিয়াং জে মিন মস্কো সফর করেন এবং রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলিৎসিন-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে উভয় নেতা যে যৌথঘোষণা দেন, সেটাই মস্কো-ঘোষণা নামে পরিচিত। এই ঘোষণার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের রুশ-চীন ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং উভয়পক্ষ সাবেক চীন-সোভিয়েত সীমান্ত থেকে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করতে সম্মত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যেসব সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের সীমান্ত রয়েছে, সেইসব রাষ্ট্রের নেতারাও মস্কো ঘোষণার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় উভয় নেতাই এককেন্দ্রিক (Unipolar) বিশ্ব ও একটি দেশ কর্তৃক সমস্ত আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার তৎপরতাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে মত প্রকাশ করেন এবং বহুকেন্দ্রিক (Multipolar) বিশ্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই যৌথঘোষণার পরপরই রাশিয়া চীনের নিকট সাবমেরিনসহ অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র বিক্রয় করবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়। মস্কো-ঘোষণার মধ্য দিয়ে রুশ-চীন স্বাভাবিক সম্পর্কের সূচনা ঘটে।

মহাজাতি Race. মহাজাতি বা বৃহৎ মানবগোষ্ঠী। এটি হল বিশ্বজোড়া মানব-পরিবারের প্রাথমিক বা মৌলিক বিভাগ। এই তত্ত্বানুযায়ী শ্বেতকায়রা নিজেদের কৃষ্ণকায়দের চাইতে শ্রেষ্ঠতর জাতি এবং কৃষ্ণকায়দের ওপর আধিপত্য করার অধিকারী বলে বিবেচনা করত। এই তত্ত্বানুযায়ীই নাৎসিরা আর্যশ্রেষ্ঠত্বের ধুয়া তোলে। ১৯৫০ সালে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিসংক্রান্ত সংগঠন (UNESCO) এই তত্ত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বলে ঘোষণা করে এবং দেখায় যে, সকল মানুষেরই মস্তিষ্ক প্রায় সমান উন্নত, সুতরাং একের ওপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন অবান্তর। ইউনেস্কো Race কথাটির বদলে Ethnic Group (শারীরিক লক্ষণাদির ভিত্তিতে নির্ধারিত মানব-পরিবার) ব্যবহারের সুপারিশ করে। এসব শারীরিক লক্ষণ হল, ১. চুলের রূপ ও রং ২. মস্তকের খুলি ও নাসিকার গঠন, গণ্ডাস্থি ও হস্তাদির দৈর্ঘ্য ইত্যাদি ৩. চক্ষু-তারকার বর্ণ ইত্যাদি। এসব লক্ষণের ভিত্তিতে বিভক্ত মানব-শাখাসমূহ প্রধানত নিম্নরূপ ১. পূর্ব-এশিয়ার মঙ্গোলীয় শাখা, যাদের গায়ের রং প্রধানত পীত, ২.পশ্চিম এশিয়ার ককেশীয় শাখা, যারা প্রধানত শ্বেতকায়, ৩. আফ্রিকার নিগ্রো শাখা, যারা প্রধানত কৃষ্ণকায়, ৪. পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সেমেটিক শাখা, ৫. ওসিয়ানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের মালয়ি শাখা এবং ৬. আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান শাখা।

মহামন্দা Great Depression. প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে, বিশেষত ১৯২৯-৩৫ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ভয়াবহ রকমে কমে যায় এবং প্রচণ্ড বেকারত্ব দেখা দেয়। এই অবস্থাটিকেই বলা হয় মহামন্দা। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট 'নিউ ডীল' নীতি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে প্রবল অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হলে এই অবস্থা কেটে যেতে শুরু করে।

মহাযুদ্ধ, প্রথম First World War. উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য ইত্যাদি প্রথম মহাযুদ্ধের মৌল কারণ হলেও এর সূচনা ঘটে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ডের হত্যার মধ্য দিয়ে। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন সার্বিয়া সফরকালে যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ড ও তৎপত্নী সোফিয়া আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে তারই সূত্র ধরে ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শিগ্‌গিরই এ-যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি, রুমানিয়া, গ্রিস, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, চীন, জাপান প্রমুখকে নিয়ে গঠিত হয় মিত্রপক্ষ। আর জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, অটোম্যান সাম্রাজ্য, বুলগেরিয়া প্রমুখকে নিয়ে গঠিত হয় চক্রীপক্ষ। যুক্তরাজ্যও মিত্রপক্ষে যোগদান করে। প্রথম দিকে চক্রীপক্ষ একের পর এক বিজয় অর্জন করে। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল জার্মানির বিরুদ্ধে এবং ডিসেম্বর মাসে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। এ-সময়ে শ্যাম (বর্তমান থাইল্যান্ড), লাইবেরিয়া, চীন, ব্রাজিল, গুয়াটেমালা, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হাইতি, হন্ডুরাস প্রমুখও মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। ১৯১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়া আত্মসমর্পণ করে। এক মাসের মধ্যে তুরস্ক এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিও আত্মসমর্পণ করে। জার্মানির অভ্যন্তরেও দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। ১৯১৮ সালের ২৮ অক্টোবর কীল-এ নৌবাহিনী বিদ্রোহ করে; ৮ নভেম্বর মিউনিখে শুরু হয় বিদ্রোহ। এমতাবস্থায়, ৯ নভেম্বর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম পদত্যাগ করেন এবং নেদারল্যান্ডে পালিয়ে যান। অনন্যোপায় চ্যান্সেলার প্রিন্স ম্যাক্সিমিলিয়ান ১১ নভেম্বর সকাল ১১টায় মিত্রপক্ষের সর্বাধিনায়ক মার্শাল ফক-এর নিকট আত্মসমর্পণ করলে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে। এই যুদ্ধে সর্বপ্রথম বিমান, সাবমেরিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধসমাপ্তির পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন-এর ১৪ দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্যারিসের নিকটবর্তী ভার্সাইতে এক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে ২৮ জুন একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষে ৪.২ কোটি সৈন্য এবং চক্রীপক্ষে ২.৩ কোটি সৈন্য অংশগ্রহণ করে; তৎকালীন মূল্যে ১৮৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, একমাত্র ব্রিটেনেরই ৬০০০ জাহাজ ধ্বংস হয়, জার্মানি একাই হারায় ২০০টি সাবমেরিন। এই যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক কোটিতে এবং আহত হয় প্রায় দুই কোটি মানুষ। ভার্সাই চুক্তির শর্তানুসারে জার্মানি তার বিপুল এলাকা ও সাম্রাজ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, জার্মানির ওপর অস্বাভাবিক অঙ্কের ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জার্মান সেনাবাহিনীর জন্য বিমান, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন ইত্যাদির ব্যবহার প্রায় নিষিদ্ধ করা হয় এবং বাস্তবত জার্মানির সার্বভৌমত্বই খর্বিত করে দেওয়া হয়। এই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই জাতিপুঞ্জ (League of Nations)-এর জন্ম হয়।

মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় Second World War. প্রথম মহাযুদ্ধের পর সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তিতে পরাজিত জার্মানির ওপর যে-সমস্ত অপমানজনক, ভারসাম্যহীন ও নির্যাতনমূলক শর্তাদি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো মেনে চলা কোনো দেশপ্রেমিক ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন জার্মানের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। মিত্রপক্ষের এই অদূরদর্শী ও প্রতিহিংসামূলক শর্তাবলীই ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধান কারণ। এই কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং জার্মানদের উগ্র দেশপ্রেম ও

আর্য আভিজাত্যবোধ। ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় আসীন হয়েই হিটলার ভার্সাই চুক্তিকে উপেক্ষা করে শক্তি সঞ্চয় শুরু করেন এবং খণ্ডিত জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা ও জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা করেন। ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ২৮ সেপ্টেম্বর জার্মানি ও রাশিয়া পোল্যান্ডকে ভাগ করে নেয়। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে হিটলার ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করেন। অচিরেই নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গের পতন ঘটে। মে মাসে বেলজিয়ামেরও পতন ঘটে। ১৪ জুন নাৎসিবাহিনী প্যারিস দখল করে। অগাস্ট মাসে ১৫০০ জার্মান বোমারু বিমান ইংল্যান্ড আক্রমণ করে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের বলিষ্ঠতার মুখে এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ক্রমশ হিটলার যুগোস্লাভিয়া ও মুসোলিনি গ্রিস দখল করেন। বুলগেরিয়া, ইতালি, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়া হিটলারের পক্ষ অবলম্বন করে। এতদিন যাবৎ সমাজতন্ত্রবিরোধী হিটলার ও সমাজতন্ত্রী স্ট্যালিন ছিলেন অন্তরঙ্গ মিত্র। কিন্তু বলদর্পী হিটলার ১৯৪১ সালের ২২ জুন অতর্কিতে রাশিয়া আক্রমণ করে বসেন। পূর্বাঞ্চলে জাপান ১৯৪০ সালের জুন মাসের মধ্যেই ইন্দোচীন দখল করে নেয়। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর ৪২৩টি জাপানি বিমান হাওয়াইয়ের পার্লহারাবারস্থ মার্কিন ঘাঁটি আক্রমণ করে বসে। পরদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪২ সালের মধ্যেই জাপান হংকং, ফরমোজা, মালয় ও বার্মা দখল করে নেয়। সিঙ্গাপুরেরও পতন ঘটে। এমতাবস্থায় ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবেই মিত্রতা গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৪৩ সালে লেনিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্মানবাহিনী পরাজয় বরণ করে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে উত্তর আফ্রিকা থেকেও নাৎসিবাহিনীকে উৎখাত করা হয়। মিত্রশক্তির প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সেপ্টেম্বরে (১৯৪৩) মুসোলিনির পতন ঘটে এবং ইতালি আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই জার্মানি ইতঃপূর্বে দখলকৃত প্রায় সব এলাকাই হারিয়ে ফেলে। ৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করেন এবং ২ মে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৫ সালের ৬ অগাস্ট জাপানের হিরোশিমা এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকির ওপর আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলশ্রুতিতে ২ সেপ্টেম্বর জাপানও আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আনুমানিক ২.২০ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়, ৩.৪০ কোটি মানুষ আহত হয়, ১০০০ বিলিয়ন ডলারের ওপর খরচ হয়, আরও ১০০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদাদি ধ্বংস হয় এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় আরও কোটি কোটি মানুষের। এই যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতিসংঘের উদ্ভব ঘটে।

মহাশূন্য চুক্তি : Outer Space Treaty. ১৯৬৭ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি অনুযায়ী চুক্তিভুক্ত দেশসমূহ মহাশূন্যে পারমাণবিক অস্ত্র বহন না করা, চাঁদে বা অন্য কোনো গ্রহে পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপন না করা এবং শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাশূন্য গবেষণা বা অভিযানে পারস্পরিক সহযোগিতা করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা Mountbatten Plan. ১৯৪৭ সালের ৩ জুন তারিখে ব্রিটিশ-ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত উপমহাদেশের বিভক্তি

এবং নবগঠিত ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের হস্তে ক্ষমতা-হস্তান্তরের যে ভিত্তি ও পদ্ধতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রদান করেন, সেটাই ইতিহাসে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা বলে খ্যাত। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটের ফলাফল অনুযায়ী পাঞ্জাব ও বঙ্গ প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান এবং উপমহাদেশের বাদবাকি এলাকা নিয়ে ভারত রাষ্ট্র গঠিত হবে বলে এই পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই এই পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করে।

মাউ মাউ : Mau Mau. এটি কেনিয়ার কিকুয়ু, মেরু ও ইম্বু উপজাতির মধ্যে সঞ্চরণশীল একটি জঙ্গি গুপ্ত সংগঠন। এর উদ্দেশ্য ছিল শ্বেতাঙ্গ বসতি স্থাপনকারীদের উৎখাত করা এবং এদের উদ্দেশ্যসাধনের পথ ছিল তীব্র সন্ত্রাসসৃষ্টি। মাউ মাউ-এর সদস্যরা তাদের শত্রুদের নির্মূল করবে বলে গোপন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হত। উপরোক্ত সম্প্রদায়সমূহের ব্যাপক জনগণ মাউ মাউ-এর সদস্য বা মাউ মাউ-এর প্রতি সহানভূতিশীল হওয়ার দরুন এবং গভীর জঙ্গলে তাদের আস্তানা হওয়ার ফলে তাদের দমন করা তৎকালীন কেনীয় সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে কেনিয়া স্বাধীনতা লাভ করলে মাউ মাউ-এর কার্যকলাপও স্বভাবতই বন্ধ হয়ে যায়।

মাও সে তুঙ : Mao Tse Tung. (বর্তমান উচ্চারণ Mao Zhe Dong)। তাঁর জীবনকাল ১৮৯৩-১৯৭৬। ১৯২০ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এই সংগঠনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। ত্রিশের দশকে চেন তু সিউ প্রমুখ সুবিধাবাদীরা ভ্রান্ত লাইন গ্রহণ করলে পার্টি বিভক্ত হয়ে যায় এবং মাও সে তুঙ মূল পার্টির নেতৃত্বে চলে আসেন। ত্রিশের দশকের বিখ্যাত লং মার্চও তাঁরই নেতৃত্বেই অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাতীয় প্রশ্ন প্রধান হয়ে দেখা দিলে তিনি অনুপ্রবেশকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সরকারের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে চিয়াং কাইশেককে বিতাড়িত করে কমিউনিস্ট চীনের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু চীনের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে বহাল থাকেন। 'শতফুল ফোটা', 'গ্রেট লীফ ফরওয়ার্ড', 'সাংস্কৃতিক বিপ্রব' প্রভৃতি পদক্ষেপ বস্তুত তাঁরই উদ্যোগে গৃহীত হয়। সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী তত্ত্বের সঙ্গে 'আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী' সমাজব্যবস্থায় 'জনগণতান্ত্রিক' বিপ্লবের তত্ত্ব দিয়ে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-এর সঙ্গে নতুন মাত্রার সংযোজন করেন। ১৯৫৬ সালের পর নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, মাও রুশবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী বলে চিহ্নিত করেন। পার্টি সংগঠন ও শৃঙ্খলা, ক্যাডার ও নেতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, গ্রামীণ এলাকায় কাজ করার পদ্ধতি, কৃষক-শ্রমিকের মৈত্রী ইত্যাদি বিষয়ের ওপর তাঁর লেখাসমূহ অমূল্য। তাঁর সর্বাধিক পঠিত ও আলোচিত রচনা 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' (On Contradiction)। ১৯৭৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পরপরই তাঁর অনুসারীরা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবসহ মাও সে তুঙ-এর বিভিন্ন পদক্ষেপ কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। পক্ষান্তরে একসময় বহিষ্কৃত লিউ শাও চি, তেং শিয়াও পিং (দেং জিয়াও পিং) প্রমুখ পুনরায় সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হন। অচিরেই চীন থেকে মাওবাদের কার্যত অবলুপ্তি ঘটে।

মাতাহারি : পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী গুপ্তচর। আসল নাম মার্গারেথা গিরট্রুইজা জেলে (Margaretha Geertruida Zelle)। ১৮৭৬ সালের ৭ আগস্ট এক ডাচ পরিবারে তাঁর জন্ম। কৌশোরেই তাঁর পিতামাতার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এবং ১৫ বছর বয়সে মা মারা যান। ১৮ বছর বয়সে বিয়ে করেন ৩৯ বছর বয়স্ক ক্যাপ্টেন জন ম্যাকলিয়ডকে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর তিনি হল্যান্ড থেকে প্যারিস চলে আসেন এবং তাঁর বাদামি রঙের সুবিধা নিয়ে দাবি করেন যে, তিনি আধা-জাভানীজ এবং ভারতের মালাবারে দেবালয়-নর্তকী হিসাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এ-সময়েই মাতাহারি (ভোরের আঁখি) নামে তাঁর নবজন্ম ঘটে। ইতিমধ্যে তাঁর তুলনাহীন যৌন আবেদনে সাড়া দিয়ে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তাঁর শয্যাসঙ্গী হন এবং তাঁর খ্যাতি গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনালগ্নে তিনি বার্লিন চলে আসেন এবং ক্রাউন প্রিন্স উইলহেলমসহ বহুসংখ্যক রাজপুরুষ ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা তাঁর অঙ্কশায়ী হন। ফলে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান সৈন্যদের গতিবিধির প্রায় সকল তথ্যই অবগত হয়ে যান। ১৯১৫ সালে তিনি লন্ডন এলে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা তাঁকে জেরা করে এবং তিনি স্বীকার করেন যে তিনি গুপ্তচর বৃত্তি করেছেন, তবে জার্মানির পক্ষে নয়, ফ্রান্সের পক্ষে। জার্মানরা উপলব্ধি করে যে মাতাহারি এত বেশি গোপন তথ্য জেনে গেছেন যে, তাঁকে আর বাঁচিয়ে রাখা ঠিক নয়। তিনি লন্ডন থেকে ফ্রান্সে ফিরে এলে তাঁকে জার্মান গুপ্তচর হিসাবে গ্রেফতার করা হয়। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে এক গোপন কোর্টমার্শালে তাঁর বিচার হয়। ১৯১৭ সালের ১৫ নবেম্বর তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। হত্যার সময় তিনি জমকালো পোশাকে সজ্জিত হন, চোখ বাঁধতে অস্বীকার করেন এবং ঘাতকের প্রতি হাত নেড়ে শুভেচ্ছাস্থাপন করেন। অবিচল চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করার মাধ্যমে মাতাহারির স্বল্প কিন্তু বর্ণময় জীবনের অবসান ঘটে।

মাথাপিছু আয় Per Capita Income. একটা রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে বছরে মুদ্রার হিসাবে যে-পরিমাণ আয় করে, সেটাকেই বলা হয় মাথাপিছু আয়। সাধারণত মাথাপিছু আয় বলতে একটা রাষ্ট্রের সমগ্র জনগণের গড় আয়কে বোঝানো হয়ে থাকে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই গড় মাথাপিছু আয়ের দ্বারা দেশের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায় না। যেমন ধরা যাক, পাঁচ জন ব্যক্তির মধ্যে প্রথম জনের বার্ষিক আয় এক কোটি টাকা, দ্বিতীয় জনের ৮০ লক্ষ টাকা, তৃতীয় জনের ১২ হাজার টাকা, চতুর্থ জনের ৫ হাজার টাকা এবং পঞ্চম জনের ৩ হাজার টাকা। এখন এই পাঁচজনের আয়ের গড় করলে প্রত্যেকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় দাঁড়ায় ৩৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা করে। এভাবে গড় করার ফলে অল্পআয়ী ৩ জন হতভাগ্যের প্রকৃত অবস্থা বোঝা গেল না। বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় মাথাপিছু আয়কে এভাবে গড় করে দেখানো হয় বলে, বিরাট বিপুল দরিদ্র জনগণের প্রকৃত অবস্থা প্রথম দৃষ্টিতে ধরতে পারা যায় না। যেমন—বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় ২৪০ ডলারের মতো। কিন্তু এখানকার ধনী (যাঁরা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২ জনের বেশি নন) ব্যক্তিদের আয় বাদ দিয়ে বাকি ৯৮ জনের আয়ের গড় করলে দেখা যাবে তাদের মাথাপিছু আয়ের অঙ্ক মাত্র ৫০/৬০ ডলারে নেমে এসেছে।

মানবকল্যাণবাদ Utilitarianism. যে-ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ বিধান করা যায়, সেই ব্যবস্থা বা ব্যবস্থার দর্শনকেই বলা হয় মানবকল্যাণবাদ। এই

মতবাদ অনুযায়ী সকল সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরোক্ত লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ইপিকিউরাস (Epicurus, খ্রিস্টপূর্ব ৩৪১ অব্দ) প্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু তিনি এর প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে, সামাজিক পর্যায়ে নয়। আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে জেরেমি বেন্থাম সামাজিক পর্যায়ে মানবকল্যাণবাদ প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি 'সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ' স্লোগানটিকে জনপ্রিয় করার প্রয়াস পান। পরবর্তীকালে জন স্টুয়ার্ট মিল এই মতবাদের আরও বিকাশসাধন করেন।

মানবতাবাদ Humanism. মানবজাতির স্বার্থ ও কল্যাণসংক্রান্ত মতবাদ। ইউরোপের নবজাগরণ বা রেনেসাঁর সময়ই মানবতাবাদের উৎপত্তি হয়।

মানবতাবাদী ধর্ম যে ধর্ম সর্বপ্রকার অতীন্দ্রিয় ব্যাপারকে বাতিল করে প্রধানত মানবজাতির কল্যাণবৃদ্ধিতেই সচেষ্ট হয়, তাকেই বলা হয় মানবতাবাদী ধর্ম বা Religion of Humanity. ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোঁতে (August Comte) এই দার্শনিক মতবাদের প্রবক্তা।

মানবাধিকার Human Rights. এই অধিকারও নাগরিক অধিকারের সমগোত্রীয়। মানুষের কোন্ কোন্ অধিকার মানবাধিকারের পর্যায়ভুক্ত, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সময় মানবাধিকারের তালিকা তৈরি করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতিসংঘের মানবাধিকার-সম্পর্কিত ঘোষণা (United Nations Declearation of Human Rights) এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতারক্ষার্থে ইউরোপীয় কনভেশন (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) ইত্যাদি। মানবাধিকার রক্ষার জন্য মানবাধিকার-সম্পর্কিত ইউরোপীয় আদালত (European Court of Human Rights)-ও গঠন করা হয়েছে। সাধারণভাবে, কথা বলার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, পারিবারিক জীবনের অধিকার, ফৌজদারি মামলায়ও সুবিচার পাওয়ার অধিকার, অমানবিক শাস্তি থেকে নিষ্কৃতির নিশ্চয়তা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা ইত্যাদিই মানবাধিকারের পর্যায়ভুক্ত। অনুন্নত, একনায়ক বা স্বৈরাচারশাসিত এবং গোঁড়া কমিউনিস্ট দেশেই মানবাধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয় বলে মনে করা হয়ে থাকে।

মানবিক-সম্পর্কের তত্ত্ব এই তত্ত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস পায় যে, আধুনিক পুঁজিবাদ মানবিক, কেননা এক্ষেত্রে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক খ্রিষ্টীয় অনুশাসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'জনগণের পুঁজিবাদ'-এর যে আওয়াজ অধুনা উঠেছে, এই তত্ত্ব তারই অংশবিশেষ। এই তত্ত্বে এমনসব ব্যবস্থার কথা রয়েছে, যা পুঁজিবাদী শোষণকে আড়াল করে রাখতে পারে। যেমন—শ্রমিকদের বহুজাতিক কর্পোরেশনের শেয়ারক্রয়ের অধিকার, মুনাফার অংশলাভ, গ্রুপ ইন্সিওরেন্স, শিল্প-মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের আবাসস্থল পরিদর্শন, বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে শ্রমিকদের উপহারপ্রদান, মালিক ও শ্রমিকদের যৌথ আলোচনা ইত্যাদি।

মানিব্যাগ গণতন্ত্র Moneybag Democracy. চীনে ভিন্নমত পোষণকারীদের ওপর ব্যাপক জেলজুলুম চাপিয়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের শুরুতে মার্কিন পররাষ্ট্র

বিভাগ চীনের সমালোচনা করে এবং তাদের এই আচরণকে স্বেচ্ছাচারী বা কর্তৃত্ববাদী (Authoritarian) বলে আখ্যায়িত করে। এর জবাবে চীন বলে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে গণতন্ত্রের মডেল বলে দম্ভ করলে কী হবে, মার্কিন গণতন্ত্র আসলে মানিব্যাগ গণতন্ত্র মাত্র। অর্থাৎ এটা ধনীদেরই গণতন্ত্র। ২০০ বছর যাবৎ মার্কিনিরা গণতন্ত্রের নামে আসলে ধনিকতন্ত্র বা মানিব্যাগ গণতন্ত্রই চর্চা করে এসেছে বলে চীন অভিযোগ করে। অবশ্য ১৯৯৮ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের ব্যাপক চীনসফরের পর উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের আরও উন্নয়ন ঘটে।

মানুষ প্রাণীকুলের একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক সামাজিক জীব। জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ পৃথিবীতে প্রাণীর বিকাশের সর্বোচ্চ রূপ। প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষই বিবেকসম্পন্ন ও কথা বলতে সমর্থ। অন্যান্য প্রাণী তাদের জৈব প্রবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হয়। কিন্তু মানুষের আচরণ নির্ধারিত হয় তার চিন্তা, আবেগ, ইচ্ছা এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞানের স্তরের দ্বারা। মানুষের সঙ্গে প্রাণিজগতের অন্যান্য সদস্যের মৌল পার্থক্য হল এই যে, মানুষ প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে নেওয়ার জন্য যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি তৈরি বা আবিষ্কার করতে ও ব্যবহার করতে পারে, যা অন্য কোনো প্রাণীই পারে না। মার্কসীয় মতে, মানুষের চেতনা, আধ্যাত্মিকতা এবং বিচিত্র ধরনের শ্রমের হাতিয়ার ব্যবহার করার ক্ষমতা সবকিছুই হল সামাজিক শ্রমের ফসল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় সকল মানুষ তাদের শারীরিক ও আত্মিক ক্ষমতার পূর্ণবিকাশ ঘটাতে পারে না। এ-সমাজে শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান থাকে। ধর্মীয় মতে (ইসলাম, খ্রিষ্ট ইত্যাদি) মানুষ সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সৃষ্টিকর্তা প্রথম থেকেই বিবেক বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ (Adam বা আদমকে) সৃষ্টি করেছেন।

মার্কস, কার্ল Karl Marx. (১৮১৮-৮৩), বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রবর্তক ও বিশ্ব-সর্বহারার নেতা। ছাত্রজীবনেই তিনি তরুণ হেগেলীয়দের সঙ্গে যোগ দেন এবং এদের মধ্যেও উগ্র বামপন্থি অংশের সঙ্গেই একাত্ম হন। পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের পর ১৮৪২ সালে তিনি 'রাইনীষ জেয়তুঙ' পত্রিকায় যোগ দেন এবং অচিরেই এর প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। বাস্তব কাজ ও তাত্ত্বিক গভীরতায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হেগেলীয় দর্শনের আপোসমূলক দিক ও স্ববিরোধিতার দরুন এর সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বে চলে আসেন। তিনি বস্তুবাদের অনুসারী হয়ে পড়েন এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রের বদলে সর্বহারার সাম্যবাদকে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে গ্রহণ করেন (১৮৪৪)। ইতিমধ্যে তিনি প্যারিস চলে আসেন এবং তখনকার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সাইলেশিয়ার বিদ্রোহ (১৮৪৪)-ও তাঁকে প্রভাবিত করে। ঐ বছরই তিনি সর্বহারা শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং সমাজবিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা প্রমাণ করে প্রবন্ধ লেখেন। এ-সময় তিনি এঙ্গেলসের সংস্পর্শে আসেন এবং শুরু হয় দর্শনের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের এক অভিনব অধ্যায়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৮৪৫ সালে 'হোলি ফ্যামিলি' এবং ১৮৪৫-৪৬ সালে 'জার্মান আইডিওলোজি' রচিত হয়। ১৯৪৫ সালেই রচিত হয় 'ফয়েরবাখের ওপর থিসিস' এবং ১৮৪৭ সালে রচিত হয় 'দর্শনের দারিদ্র্য'। ১৮৪৭ সালে তিনি ব্রাসেলসে এসে 'কমিউনিস্ট লীগ'-এর সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং এর কংগ্রেসের অনুরোধক্রমে তিনি ও

এঙ্গেলস যৌথভাবে যুগান্তকারী 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' (১৮৪৮) রচনা করেন। জার্মানির ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৮৪৯ সালে জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত হলে তিনি চিরতরে লন্ডন চলে আসেন। ১৮৬৪ সালে কমিউনিস্টদের প্রথম আন্তর্জাতিক গঠিত হয়। এতে মার্কসের অবদান ছিল অসামান্য। ১৮৪৮-৪৯ সালে অনুষ্ঠিত ইউরোপের বুর্জোয়া বিপ্লবসমূহের অভিজ্ঞতা মার্কসকে তাঁর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, শ্রেণীসংগ্রাম ও সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের তত্ত্ব প্রণয়নে বিপুলভাবে সহায়তা করে। এ-সময়েই তিনি বুর্জোয়া-বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণীর কর্তব্য এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেন (ফ্রান্সের শ্রেণীসংগ্রাম, ১৮৫০-এ প্রকাশিত)। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত 'লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার'-এ তিনি বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের অনিবার্য ধ্বংস এবং ১৮৭১ সালে প্রকাশিত 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' শীর্ষক গ্রন্থে (প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকে) সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বরূপ তুলে ধরেন। 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' (১৮৭৫)-য় তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের আরও বিকাশসাধন করেন। তাঁর রাজনৈতিক-অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ক্যাপিটেল'-এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৬৭, ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তাঁর অর্থনীতি ও সমাজ-পর্যালোচনার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি এবং ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতি পূর্ণতা লাভ করে। এই গ্রন্থেরই চতুর্থ খণ্ডে পরিশিষ্ট আকারে প্রকাশিত হয় 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' বা থিওরি অব সারপ্লাস ভেল্যু। পরবর্তীকালে লেনিন মার্কসীয় তত্ত্বের আরও বিকাশসাধন করেন। বলাবাহুল্য, মার্কসবাদের অন্যতম মূলকথাই হল, সৃষ্টির মধ্যে কোনোকিছুই ধ্রুব নয়, সবকিছুই আপেক্ষিক, পরিবর্তনশীল। সুতরাং কোনো বস্তু, কাঠামো বা প্রক্রিয়াকে চিরস্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় বিবেচনা করা অমার্কসবাদী।

মার্কসবাদ : Marxism. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের মতবাদ। মার্কসবাদের মূল উৎস তিনটি, যথা—১. জার্মান দর্শন (বিশেষত হেগেলের) ২. ব্রিটিশ অর্থনীতি (বিশেষত রিকার্ডোর) এবং ৩. ফরাসি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মার্কসবাদের ভিত্তি। মার্কসবাদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো বা উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ীই সমাজকাঠামো গড়ে ওঠে। মার্কস-এঙ্গেলস আরও দেখান যে, আদি সাম্যবাদী সমাজের পর থেকে একের পর এক শ্রেণীবিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাই প্রচলিত হয়ে এসেছে এবং প্রচলিত ইতিহাস হচ্ছে বস্তুত শ্রেণীসংগ্রামেরই ইতিহাস। তাঁরা প্রমাণ করেন যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে উৎপাদিকাশক্তির বিকাশ ঘটে এবং এই বিকশিত উৎপাদিকাশক্তির সঙ্গে উ ৎপাদন-সম্পর্কের বিরোধ বাধে। এই বিরোধেরই ফলশ্রুতিতে পুরানো সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ জন্ম নেয়। তাঁরা আরও দেখান যে, পুঁজিবাদী সমাজই শোষণমূলক সমাজের শেষ রূপ। পুঁজিবাদী সমাজের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ পুঁজিপতি ও সর্বহারা শ্রেণীর দ্বন্দ্বের ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম হতে বাধ্য। কিন্তু তা আপোসে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হবে না। এজন্য সর্বহারা শ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক দলের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং বিপ্লব ঘটাতে হবে, অর্থাৎ বলপ্রয়োগের পথ গ্রহণ করতে হবে। সফল বিপ্লবের পর কায়েম করতে হবে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব, যাতে সকল শোষণমূলক ব্যবস্থা ও তার ধারক-বাহকদের নিঃশেষ করা যায়। এই পর্যায়ের পরই কায়েম হবে সাম্যবাদী সমাজ। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যেক সদস্য তার সাধ্যানুযায়ী

উৎপাদনে অবদান রাখবে এবং উপযুক্ততানুযায়ী প্রাপ্য পাবে। আর সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেকে পাবে তার প্রয়োজনানুযায়ী। লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুঙ প্রমুখ মার্কসবাদের আরও বিকাশসাধন করেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ Marxism-Leninism. মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের দার্শনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার সমন্বিত নাম হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ-এর দশকের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিআন্দোলনের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত মার্কসবাদ মানুষের দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক অধ্যায়ের সূচনা করে। মার্কসবাদের অন্যতম প্রধান দিক হল এই যে, এতে শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজের নির্মাণে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন নয়া নয়া তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। মার্কসবাদের ধারাকে অব্যাহত রেখে লেনিন এ-যুগের মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ করেন এবং পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদের যুগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপরেখা অঙ্কন করেন। লেনিন এ-তত্ত্ব প্রদান করেন যে, প্রাথমিকভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটি দেশেও বিজয় লাভ করতে পারে। তাঁর তত্ত্বের যথার্থতা রুশবিপ্লবের মাধ্যমে সম্প্রসাতি হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সংশোধনবাদ, গোঁড়ামিবাদ ও গোষ্ঠীবাদের বিরোধিতা করে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাওয়ের চিন্তাধারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে মাও ঝে ডঙের চিন্তার সংযুক্তিই হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাওয়ের চিন্তাধারা। মাও ঝে ডঙ সামন্তবাদী বা আধা-সামন্তবাদী-আধা-ঔপনিবেশিক পটভূমিতে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তিনি এই বিপ্লবের নাম দেন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব বিবর্তিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপ পরিগ্রহ করে। চীনে (যেখানে সামন্তবাদী, আধা-সামন্তবাদী ও আধা-ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট বিদ্যমান ছিল) তাঁর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে এই বিপ্লবই সংঘটিত হয়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাওয়ের চিন্তাধারার উদ্গাতা পাঁচজন; তাঁরা হলেন মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন ও মাও ঝে ডঙ। এই মতবাদের বিরোধীরা স্ট্যালিন ও মাও ঝে ডঙকে ম্যার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের ধারার নেতা বা দার্শনিক বলে স্বীকার করেন না।

মার্কিন গৃহযুদ্ধ American Civil War মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিজীবী ও ক্রীতদাস-মালিকদের দ্বন্দ্বই অবশেষে গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। ক্রীতদাসবিরোধী দল থেকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট লিংকনকে গ্রহণ করার বদলে, আমেরিকান ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বলে দক্ষিণ ক্যারোলিনাসহ সাতটি রাজ্য সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও লিংকন দক্ষিণ ক্যারোলিনার সামটার দুর্গে একটি ফেডারেল গ্যারিসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলে গৃহযুদ্ধ ফেটে পড়ে। ফেডারেল সেনারা ১৮৬১ সালের ১২ এপ্রিল দুর্গের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে এবং লিংকন বিদ্রোহ দমন করার নির্দেশ দেন। ফলে, সীমান্তবর্তী আরও চারটি রাজ্য বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করে। জুন মাস থেকে শুরু হয় পুরোপুরি সামরিক অভিযান। ফেডারেল ইউনিয়নের সুবিধা ছিল নানাবিধ, তাদের ছিল একটি সুসংগঠিত সরকার, দক্ষিণের তুলনায় দ্বিগুণ জনসংখ্যা, সমুদ্রের ওপর কর্তৃত্ব এবং শিল্প-কারখানা।

কিন্তু, তা সত্ত্বেও ভিকসসবার্গ ও গ্যাটিসবার্গে ফেডারেল ইউনিয়ন পরাজয় বরণ করে। ১৮৬১-৬২ সাল জুড়ে দক্ষিণের জ্যাকসন এবং লী প্রমাণ করেন যে তাঁরাই দক্ষতর সেনাপতি। ১৮৬৩ সালে পর্যুদস্ত ইউনিয়নের পক্ষে নামেন জেনারেল গ্রান্ট ও শেরম্যান। তাঁদের ভূমিকা এবং নৌবাহিনীর ব্লকেডের ফলে বিদ্রোহী শিবিরে ভাঙনের সৃষ্টি হয়। ব্যাপক জনগণের পক্ষত্যাগ এবং দক্ষিণের বিদ্রোহী সেনাদের মধ্যে বিভক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৫ সালের ৬ এপ্রিল লী এপ্রোমেটক্স নামক স্থানে জেনারেল গ্রান্টের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বিক্ষিপ্তভাবে আরও সাত সপ্তাহব্যাপী বিদ্রোহীরা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করে। এই গৃহযুদ্ধে উভয়পক্ষের প্রায় ৬,২০,০০০ মানুষ নিহত হয়। যেহেতু ১৮৬৩ সালের পয়লা জানুয়ারি লিংকন দাসপ্রথা রহিত করেছিলেন, সেহেতু এই বিজয়ের ফলে দক্ষিণাঞ্চলেও দাসপ্রথার অবলুপ্তির মাধ্যমে এক সামাজিক বিপ্লবের সূচনা ঘটে। লিংকনকে হত্যা (১৪ এপ্রিল, ১৮৬৫) করার পর রেডিক্যাল রিপাবলিকান বলে কথিত একটি গ্রুপ দক্ষিণাঞ্চলকে বিজিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করে। অবিবেচনাপ্রসূতভাবে তারা দক্ষিণের ওপর একদলীয় শাসন চাপিয়ে দেয় এবং সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে তা কার্যকর করার প্রয়াস পায়। ফলে, উত্তর-দক্ষিণ তিক্ততা আরও বেড়ে যায়। ১৮৭৭ সালের এপ্রিল মাসে লুইসিয়ানা ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা থেকে ফেডারেল সৈন্য তুলে না নেওয়া পর্যন্ত 'কৃষ্ণ পূনর্গঠন' (Black Reconstruction) বলে কথিত এই দমনমূলক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

মার্টিন লুথার কিং : (১৯২৯-৬৮). মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নিগ্রো নেতা জীবনের প্রথম থেকেই ছিলেন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ২৫ বছর বয়সে তিনি মন্টগোমারি উন্নয়ন সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ডেক্সটার অ্যাভিনিউ চার্চের পেস্টর মার্টিন লুথার কিং ১৯৫৫-৫৬ সালে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য যানবাহনে আলাদা আসনের প্রতিবাদে আলাবামায় ৩৮১ দিনব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং পরিণতিতে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর সপক্ষে রায় প্রদান করতে বাধ্য হয়। ১৯৫৮ সালে তিনি ভারতে আসেন এবং মহাত্মা গান্ধীর 'অসহযোগ-অসন্ত্রাস' নীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। ১৯৬১ সালে তিনি ওয়াশিংটন-মিসিসিপি হাইওয়ের বিভিন্ন স্টপেজে বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে রাস্তায় অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন; ফলে ওই বছরের নভেম্বর মাসে বর্ণবৈষম্য আইন বাতিল করা হয়। ১৯৬৩ সালে আলাবামার বৈষম্যবাদী মেয়র ইউজেনি টি. 'বুল' কোনর ও তাঁর সহযোগী দুই কমিশনার নির্বাচনে পরাজিত হয়েও ক্ষমতা ছাড়তে অস্বীকার করলে রাজ্যব্যাপী প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয় এবং কিংসহ ৫৩ জন নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হন। পরে কিং-এর বন্ধু গায়ক হ্যারি বেলফন্ট গান গেয়ে ৫০ হাজার ডলার সংগ্রহ করে তাঁকে জামিনে মুক্ত করেন। ২ মে ১০০০ ছাত্র গ্রেফতার হয় এবং বুল কোনরের সমস্ত নির্যাতনের মুখেও আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে দেশব্যাপী 'এখনই স্বাধীনতা' (Freedom Now) আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে প্রেসিডেন্ট কেনেডি কংগ্রেসকে নাগরিক অধিকার বিল পাশের নির্দেশ দেন। ১৯৬৩ সালের ২৮ আগস্ট ওয়াশিংটনের লিংকন মেমোরিয়ালে সমবেত আড়াই লক্ষ লোকের সমাবেশে কিং তাঁর বিখ্যাত 'আমার একটি স্বপ্ন আছে' (I have a Dream) শীর্ষক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট কেনেডি আততায়ীর হাতে নিহত হলেও নয়া প্রেসিডেন্ট জনসন নাগরিক অধিকার বিল পাশের ব্যাপারে অটল থাকেন। ১৯৬৫ সালের ৬ আগস্ট

প্রেসিডেন্ট জনসন বৈষম্যহীন ভোটাধিকার আইনে স্বাক্ষরদান করেন। ১৯৬৮ সালের ৪ এপ্রিল কিং যখন তাঁর মেমফিস মোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সহযোগীদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তখন জেমস আর্ল রে নামক আততায়ীর গুলিতে তিনি নিহত হন। কিং তাঁর কাজের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত ৫৪ হাজার ডলারের সবটাই আন্দোলনের জন্য দান করে দেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ভালোবাসার শক্তি' (Strength to Love)। তিনি বলতেন, "যে-মানুষ কোনো উদ্দেশ্যের জন্য প্রাণ দিতে পারে না, সে-মানুষ বেঁচে থাকার অযোগ্য।"

মার্শাল পরিকল্পনা Marshall Plan. তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্র সেক্রেটারি জর্জ মার্শাল ১৯৪৭ সালের ৫ জুন হার্ভার্ডে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় এই পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তব্য হল বিশ্বঅর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। কারণ বিশ্বঅর্থনীতি দুর্বল হলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা কোনোক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি কোনো দেশ বা মতবাদের বিরুদ্ধে হবে না। বরং তা হবে ক্ষুধা, দারিদ্র, হতাশা এবং নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে। ইউরোপের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য একতরফাভাবে পরিকল্পনা-প্রণয়ন মার্কিন সরকারের উচিত হবে না, বরং তা প্রণয়নের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে ইউরোপীয় দেশসমূহেরই ওপর। যুক্তরাষ্ট্র এই পরিকল্পনা-প্রণয়নে শুধু সহযোগিতা দিতে পারে। তবে, পরিকল্পনা প্রণীত হলে সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করাই হবে যুক্তরাষ্ট্রের মুখ্য দায়িত্ব। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্নেস্ট বেভিন এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানান। উক্ত বছরের ২৭ জুন ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এই পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য মিলিত হন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে। কোনো কমিউনিস্ট দেশই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। ফিনল্যান্ড এবং স্পেন এই আলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। ১৬টি দেশ (অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রিস, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক এবং যুক্তরাজ্য) ১৯৪৭ সালের ১২ জুলাই প্যারিসে এক সম্মেলনে মিলিত হয় এবং একটি রিপোর্ট তৈরি করে। এই রিপোর্টে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত ক্ষতির বিবরণ, যুদ্ধের ফলে পশ্চিম গোলার্ধের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতার চিত্র এবং এই অবস্থা থেকে ইউরোপের পুনরুদ্ধারের জন্য চার বছরের (১৯৪৭-৫১) পরিকল্পনা (যা ইউরোপীয় পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা নামে পরিচিত) সংযোজিত হয়। এই রিপোর্ট জর্জ মার্শালের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং তা কার্যকর করার জন্য ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইইসি) সংস্থা গঠন করা হয়।

মিউনিখ পুশ : জার্মানিতে নাৎসিরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বার্লিন অভিযানের প্রস্তুতি হিসাবে ১৯২৩ সালের ৮-৯ নভেম্বর হিটলার ব্যাভারিয়া সরকারের পতন ঘটানোর জন্য যে ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করেন, সেটাই ইতিহাসে মিউনিখ পুশ (Munich Putsch) নামে খ্যাত। জেনারেল লুডেনডর্ফ-এর সমর্থন সত্ত্বেও এই প্রয়াস ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার দরুন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রায় দুহাজার নাৎসি বিদ্রোহীর ওপর ব্যাভারিয়ান পুলিশ গুলি চালালে হিটলারের ১৬ জন সমর্থক নিহত হয়। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে হিটলারের পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়। তবে জেনারেল লুডেনডর্ফকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে এই হিটলারেরই নেতৃত্বে জার্মানিতে নাৎসিরাজ কায়েম হলে, মিউনিখ পুশে নিহত ১৬ জন নাৎসিবাদীকে নাৎসি আন্দোলনের প্রথম শহীদ হিসাবে সম্মান দান করা হয়।

মিল, জন স্টুয়ার্ট John Stuart Mill. (১৮০৬-৭৩) ব্রিটিশ দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও মানবতাবাদী জন স্টুয়ার্ট মিল ১৮৩৩-৫৬ সালে লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। ১৮৪৩ সালে তাঁর 'তর্কশাস্ত্রের প্রক্রিয়া' (A System of Logic) এবং ১৮৪৮ সালে 'রজনৈতিক অর্থনীতির নীতিমালা' (Principles of Political Economy) নামক দুটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়। নির্যাতিত মানবতার প্রতি সহানুভূতিই ছিল তাঁর তত্ত্বের মর্মবস্তু। অবাধ স্বাধীনতা (Laissez Faire)-র যাতে অপব্যবহার করা না হয়, তার জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলেও পরিচয় দিতেন। ১৮৫৯ সালে তাঁর 'স্বাধীনতা প্রসঙ্গে' (On Liberty) প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫-৬৭ সালে তিনি ওয়েস্টমিনস্টার থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য ছিলেন। প্রত্যেক ভোটদাতারই পার্লামেন্টে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার আছে এই যুক্তিতে ১৮৬৭ সালে তিনি পার্লামেন্টে নারীসমাজের ভোটাধিকারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ব্রিটিশদের জন্য এ ছিল এক অভিনব প্রস্তাব। তাঁর প্রস্তাব ৭৩-১৯৬ ভোটে পরাজিত হয়। অতঃপর ১৮৬৯ সালে তিনি নারী অধিকারের সপক্ষে 'নারীদের পরাধীনতা' (The Subjection of Women) প্রকাশ করেন। তিনি বছরের একটা অংশ ফ্রান্সে কাটাতেন; ফলে তাঁর চিন্তাধারা ফরাসি ঐতিহ্যের দ্বারাও অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিল।

মিলিয়ন ম্যান মার্চ বা অযুত মানুষের মিছিল। মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম নেতা লুই ফারাহ্ খানের আহ্বানে ১৯৯৫ সালের ১৫ অক্টোবর ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল হিলের সামনে ১০ লক্ষাধিক কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান ১১ ঘণ্টাব্যাপী এক সমাবেশে মিলিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এতবড় সমাবেশ আর কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৬৯ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে যে ৬ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল এই সমাবেশে এসেছিল তারও প্রায় দ্বিগুণ মানুষ। নারীদের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে উপস্থিতি আরও অন্তত ৫/৬ লক্ষ বেশি হত। এই সমাবেশে ফারাহ্ খান ঘোষণা করেন যে, মানবতার মুক্তির জন্য শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের অবসান ঘটাতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্যের করুণ চিত্র তুলে ধরে এই 'মিলিয়ন ম্যান মার্চ' শীর্ষক সমাবেশে লুই ফারাহ্ খান আরও ঘোষণা করেন যে, ১৯৯৬ সালের মধ্যেই তাঁদের সংগঠন 'ন্যাশন অব ইসলাম' যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হবে।

মিলিশিয়া Militia. মিলিশিয়া হল সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেইসব সাধারণ নাগরিক, যারা নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বা শৃঙ্খলাধীন নয়। কোনো রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জরুরি পরিস্থিতিতে মিলিশিয়া জনগণের পক্ষে অস্ত্রধারণ করে এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে। ক্ষেত্রবিশেষে কোনো বৈধ ও গণসমর্থিত সরকারকে রক্ষার জন্যও মিলিশিয়া অস্ত্রধারণ করতে পারে। প্রাচীন গ্রিসে প্রত্যেক নাগরিককেই সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হত এবং প্রয়োজনে যুদ্ধে যেতে হত। বর্তমান বিশ্বে সুইজারল্যান্ড মূলত মিলিশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই নিয়মিত সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি মিলিশিয়ার অস্তিত্ব রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এজন্য রয়েছে বাধ্যতামূলক

সামরিক প্রশিক্ষণ (Conscription) ব্যবস্থা। মিলিশিয়াকে নাগরিক যোদ্ধা (Citizen Soldier) নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

মিলেরাঁবাদ এর অপর নাম "মন্ত্রিত্ববাদ" (Ministrialism)। সুবিধাবাদী মিলেরাঁপন্থিরা বুর্জোয়া বা প্রতিক্রিয়াশীল সরকার সমূহে সমাজতন্ত্রীদের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়। মিলেরাঁবাদের জনক ফরাসি সমাজতন্ত্রী আলেকজান্ডার মিলেরাঁ ১৮৯৯ সালে ফ্রান্সের বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ১৯০০ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্যারি কংগ্রেসে মিলেরাঁ তত্ত্ব 'বুর্জোয়া দলসমূহের সঙ্গে মৈত্রী এবং ক্ষমতা দখল'-এর ওপর আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, বুর্জোয়া সরকারে কোনো সমাজতন্ত্রীর প্রবেশকে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের সূচনা হিসাবে গণ্য করা যায় না।

মীমাংসা : মীমাংসার অপর নাম পূর্ব-মীমাংসা। মহর্ষি জৈমিনী এর প্রণেতা। তাঁর মতে প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। জ্ঞাত ও জ্ঞেয় যদি উপস্থিত না থাকে, তা হলে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভবপর হতে পারে না। প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভর করেই মীমাংসাতত্ত্বের অনুসারীরা জগৎসত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করেন। মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই; কর্মফলদাতারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করারও কোনো প্রয়োজন নেই। এই দর্শনে বেদই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত; বেদের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। বেদের বিধানমতো কর্তব্যই ধর্ম; যে-কর্ম বেদে নিষিদ্ধ তা-ই অধর্ম। বস্তুবাদী মীমাংসার দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলেও, আত্মা স্বর্গ ও নরকেও বিশ্বাসী। তাঁদের মতে আত্মা হল এক চৈতন্যময় নিত্যবস্তু। চৈতন্য আত্মার মৌলিক গুণ নয়, বরং কতিপয় অবস্থার উপস্থিতিতেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। তাঁরা বহু আত্মায় বিশ্বাসী। তাঁদের মতে পৃথিবীতে যত জীব তত আত্মা।

মুকডেন ঘটনা Mukden Incident. ইতিপূর্বে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক জাপানি সৈন্যেরা চীনের মাঞ্চুরিয়ান রেলওয়ের দক্ষিণাঞ্চল তদারক করত। ১৯৩১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর রাত্রে এই রেলপথে একটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এবং এই অজুহাতে জাপানিরা মুকডেন দখল করে নেয়। পাঁচ মাসের মধ্যেই তারা সকল বড় শক্তির প্রতিবাদ এবং রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে সমগ্র মাঞ্চুরিয়াও দখল করে নেয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে জাপানি সমরবাদের সূচনা ঘটে এবং ১৯৩২ সালের মে মাসে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটে। এই সমরবাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয় (১৯৪৫) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

মুক্তদ্বার নীতি : Open Door Policy. কোনো দেশ বা ব্লকের বা তাদের একচেটিয়া ব্যবসায়ী বা শিল্পসংঘসমূহের কর্তৃত্ব বা বিশেষ অধিকার নাকচ করে সকল দেশের সঙ্গে সমান শর্তে ব্যাবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার নীতি।

মুক্তবাজার অর্থনীতি Free Market Economy. এই অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে এই যে, বর্তমান বিশ্ব যেহেতু আন্তর্জাতিক বিশ্ব, সেহেতু পুঁজি ও পণ্যপ্রবাহের ক্ষেত্রে কোনো দেশ কর্তৃক কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সঙ্গত হবে না। বরং পণ্যপ্রবাহের ভিত্তি হতে হবে ভোক্তার চাহিদা (Consumers' Need). অর্থাৎ বাজারের চাহিদা। একটা দেশের জনগণের কাছে বা বাজারে যে-দেশের যে-পণ্যেরই চাহিদা

থাকুক-না কেন, তা অবাধে আমদানি করতে দিতে হবে এবং এ-ব্যাপারে কোনো শুল্ক-দেওয়াল সৃষ্টি বা অন্য কোনোরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না। একইভাবে, পুঁজির প্রবাহ, বিনিয়োগ ও সঞ্চালনকেও অবারিত করতে হবে। বর্তমানে সাবেক কমিউনিস্ট দেশসমূহও ক্রমবর্ধমান হারে মুক্তবাজার অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে এবং অনেকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে সে-সমস্ত দেশের পুঁজিকে আহ্বান জানাচ্ছে, যে-সমস্ত দেশকে একসময় 'সাম্রাজ্যবাদ' বলে গালাগাল দেওয়া হত। তবে, অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, বেপরোয়া মুক্তবাজার কার্যত অনুন্নত বিশ্বের শিল্পবিকাশকে নস্যাৎ করে দেবে এবং গোটা বিশ্বকে উন্নত বিশ্বের কতিপয় দেশের একচ্ছত্র বাজারে পরিণত করবে।

মুক্ত বিশ্ব : Free World. যখন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অস্তিত্ব ছিল, তখন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বিপরীতে গণতান্ত্রিক বিশ্বকে বলা হত মুক্ত বিশ্ব। এর দ্বারা একথাই বোঝানো হত যে, গণতান্ত্রিক বিশ্বে জনগণের মতামত প্রকাশের, সংগঠন করার, ইচ্ছামতো পেশা নির্ধারণের, স্থান পরিবর্তনের, মিডিয়ার, সরকার নির্বাচনের ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার এমন মুক্ত বা অবারিত সুযোগ রয়েছে, যা কমিউনিস্ট বিশ্বে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নিষিদ্ধ।

মুক্তাঞ্চল : Free Zone. কোনো উপনিবেশবাদী শক্তি বা স্বৈরাচারী শোষক-শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে যে-এলাকা বা এলাকাসমূহকে মুক্ত করে বিপ্লবীরা তাদের শাসন কায়েম করে, সেই বা সে-সমস্ত এলাকাকে বলে মুক্তাঞ্চল। মুক্তাঞ্চলের অর্থনীতি, প্রশাসন ইত্যাদির ওপর সে-দেশের সরকারের কোনো এক্তিয়ার থাকে না—সেগুলো বিপ্লবীদের নীতি অনুযায়ীই পরিচালিত হয়। মুক্তাঞ্চলে বিপ্লবীরা তাদের ব্যারাক স্থাপন করতে পারে, বিপ্লবী গণবাহিনী গঠন করতে পারে এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

মুতাজিলা : ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতার পথিকৃৎ ছিল মুতাজিলারা। হাসান আল-বসরির শিষ্য ও ওয়াযিল বিন আতা ছিলেন এই মতবাদের উদ্গাতা। প্রায় সকল মুসলমানই আল্লাহ্‌র যে ৯৯টি গুণে বিশ্বাস করেন, মুতাজিলারা বলে যে এটা আল্লাহ্‌র একত্ব এবং শাশ্বত্বের বিরোধী; সুতরাং গ্রহণযোগ্য নয়। মুতাজিলারা কুরআনের সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ছিল বদ্ধপরিকর। তাদের মতে আল্লাহ্ স্বেচ্ছাচারী নন; সুতরাং পাপ-পুণ্যের দায়দায়িত্ব ব্যক্তির নিজস্ব। তারা বলে যে, আল্লাহ্‌র যেহেতু শরীর বা অকৃতি নেই, সেহেতু আল্লাহ্‌কে কখনোই দেখা যাবে না; "পূণ্যবানরা বেহেস্তে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করবে" কুরআনের এই বাক্যের তাৎপর্য হল পুণ্যবানরা আধ্যাত্মিকভাবেই আল্লাহ্‌র দর্শনলাভ করবে, ইন্দ্রিয়গতভাবে নয়। মুতাজিলাদের মতে, আল্লাহ্ কোনো অন্যায় করতে পারেন না; তাই আমাদের দুর্ভোগের জন্যও মহান ও দয়াবান আল্লাহ্ দায়ী হতে পারেন না। মুতাজিলারা কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অ্যারিস্টোটলীয় দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়ে বলে যে, বিশ্ব একাধারে সৃষ্ট এবং শাশ্বত। অনন্তকাল ধরে বিশ্ব স্থির ছিল এবং আল্লাহ্ একে গতি দেওয়ার ফলেই দেহ এবং প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে। কোনো কোনো ইউরোপীয় লেখক বলেন যে, খ্রিষ্টানদের প্রভাবের ফলে মুতাজিলাদের উদ্ভব ঘটেছে। একথা সত্যি নয়। কারণ, এই চিন্তাধারার সূত্রপাত ঘটেছে মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের সংস্পর্শে আসার অনেক আগে। যেমন, হজরত আয়েশা (রা)-ও বিশ্বাস করতেন যে, হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর চৌথা আসমানে আরোহণ বা মিরাজ কোনো সশরীরে আরোহণের ব্যাপার ছিল না—এটা

ছিল নিতান্তই আধ্যাত্মিক ভ্রমণের ব্যাপার। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসুদ (রা) প্রমুখও এ-ধরনের চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। মুতাজিলাদের স্বর্ণযুগ ছিল খলিফা আল মামুনের রাজত্বকাল, কারণ, তিনি এই মতবাদকে রাষ্ট্রীয় মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মামুনের পরবর্তী খলিফারা বিশেষত মুতাওয়াক্কিল ও আল কাদির মুতাজিলাদের প্রতি ছিলেন ভীষণভাবে বিরূপ। এ ছাড়া শিয়া এবং আশারীয় সম্প্রদায়ও ছিল মুতাজিলাদের বিরুদ্ধে। তাই মামুনের মৃত্যুর পরই শুরু হয় মুতাজিলাদের অবক্ষয়ের কাল।

মুৎসুদ্দি Comprador বিদেশী স্বার্থ বা পুঁজির দালাল। একটি দেশের যে-গোষ্ঠীটি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত লাভের জন্য (যেমন প্রিমিয়াম, দালালি বা কমিশনপ্রাপ্তি) কোনো বিদেশী স্বার্থ বা পুঁজির দালালি করে, তাদেরকেই বলা হয় মুৎসুদ্দি। মুৎসুদ্দিদের স্বার্থ তাদের বিদেশী প্রিন্সিপ্যাল, তথা নয়া-সাম্রাজ্যবাদী, নয়া-উপনিবেশবাদীদের স্বার্থের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা থাকে। তাই, মুৎসুদ্দিরা নয়া-সাম্রাজ্যবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদবিরাধী আন্দোলনের বিরোধিতা করে। শুধু তা-ই নয়, তারা জাতীয় পুঁজির বিকাশেরও বিরোধিতা করে; কেননা জাতীয় পুঁজির বিকাশ ঘটলে এবং দেশে শিল্পকারখানা গড়ে উঠলে তাদের বিদেশী পণ্য ও স্বার্থের মধ্যস্বত্বভোগের সুবিধা নস্যাৎ হয়ে যাবে। এজন্য জাতীয় ও সমাজতান্ত্রিক উভয় বিপ্লবেই মুৎসুদ্দিদের শত্রু হিসাবে গণ্য করা হয়।

মুৎসুদ্দি পুঁজি Comprador Capital. মুৎসুদ্দিদের পুঁজি অর্থাৎ বিদেশী পণ্য ও স্বার্থের এজেন্সী বা দালালিনির্ভর যে পুঁজি সেটাকেই বলে মুৎসুদ্দি পুঁজি। যেমন, কোনো এক ব্যক্তি একটি বিদেশী কোম্পানির মোটরগাড়ির এজেন্সি নিয়ে স্বদেশে সেই কোম্পানির মোটরগাড়ি বিক্রি করে। যত বেশি সে বিক্রি করতে পারে, তত বেশি সে পায় দালালি বা কমিশন। এই দালালি বা কমিশনের স্বার্থে সে বিদেশী স্বার্থকে রক্ষা করে এবং স্বদেশে যাতে কোনো মোটর কারখানা গড়ে না ওঠে তার জন্য কাজ করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত পুঁজিকেই বলে মুৎসুদ্দি পুঁজি। বিদেশী বৃহৎ শিল্প বা শিল্পগোষ্ঠির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পরিপূরক শিল্প (যেমন, অটোমোবাইল বা ইলেক্ট্রনিক্স এসেম্বলি প্ল্যান্ট)-এর মাধ্যমেও মুৎসুদ্দি পুঁজি গড়ে উঠতে পারে।

মুৎসুদ্দি বা দালাল বুর্জোয়া : Comprador Bourgeoise. বুর্জোয়াদের যে-অংশটি বিদেশী শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী বা বহুজাতিক কর্পোরেশন ইত্যাদির দালাল বা গোমস্তা হিসাবে কাজ করে, সে-অংশকে বলা হয় দালাল বা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া। উপনিবেশ, অর্ধ-উপনিবেশ ও অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র দেশসমূহের বুর্জোয়াদের একটা প্রধান অংশ কমিশন, দালালি বা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিদেশী পণ্যের দালাল বা এজেন্ট হিসাবে অথবা বিদেশী কলকারখানায় কাঁচামাল সরবরাহের দালাল বা এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। এই বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল। এদের মাধ্যমেই একটি অনুন্নত দেশ অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ বা তাদের পুঁজিপতিদের শোষণের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। জাতীয় শিল্পের বিকাশ হলে বিদেশ থেকে আমদানি কমে যাবে, ফলে এই বুর্জোয়ারা দালালি বা কমিশন থেকে বঞ্চিত হবে। তাই, এরা জাতীয় শিল্পের বিকাশের তীব্র বিরোধিতা করে। তদুপরি, এরা বিদেশী প্রভুদের নির্দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও যথাসম্ভব কায়েম রাখার প্রয়াস পায়। দালাল বুর্জোয়া এবং তাদের অর্থনীতিবিদরা প্রচার করেন যে, অনুন্নত দেশসমূহের শিল্পায়নে ব্রতী হওয়া ক্ষতিকর ও অনুচিত; বরং তাদের উচিত কৃষি

ও কুটিরশিল্প আঁকড়ে থাকা। বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে তারা শিল্পায়নকে বাধা দিয়ে সামন্তবাদী বিষয় ও ঝোঁকসমূহকে ধরে রাখার প্রয়াস পায়। মাও ঝে ডঙ সর্বপ্রথম 'মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া' কথাটি ব্যবহার করেন।

মুদ্রা Money (এখানে Currency অর্থে) এটি এমন একটি জিনিস যা বিনিময়, লেনদেন এবং ঋণদান ও ঋণ-পরিশোধের মাধ্যম হিসাবে সাধারণভাবে গ্রাহ্য। পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পর্যায়ে পণ্যবিনিময় বা বার্টার ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর হারে অসুবিধাজনক হয়ে পড়তে থাকলে বিনিময়ের একটি সহজ, সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই অনিবার্যতা থেকেই মুদ্রার উদ্ভব। মুদ্রা হল বিনিময় ও সামাজিক উৎপাদনের বিকাশধারার পরিণতি। সোনা, রূপা ও তামা দীর্ঘদিন ধরে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কাগজের মুদ্রার প্রচলন তুলনামূলকভাবে সাময়িক। মুদ্রার কাজসমূহ প্রধানত নিম্নরূপ ১. মূল্যের মান ও দামের মাপকাঠি হওয়া, ২. পণ্যবিনিময়ের মাধ্যম হওয়া, ৩. লেনদেনের মাধ্যম হওয়া, ৪. সঞ্চয় ও পুঁজির উপকরণ হওয়া এবং ৫. আন্তর্জাতিক লেনদেনের মাধ্যম হওয়া।

মুদ্রা, বৈদেশিক সাধারণ অর্থে বৈদেশিক মুদ্রা (Foreign Currency) বলতে অন্য দেশের মুদ্রাকে বোঝালেও বর্তমান বিশ্বঅর্থনীতিতে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। সেই অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা হল কোনো দেশের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা, যার বিনিময়ে বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয় সম্ভবপর। বর্তমান বিশ্বে ডলার এবং পাউন্ডই সর্বাধিক প্রচলিত বৈদেশিক মুদ্রা।

মুদ্রা, মজুত Reserve Currency. কোনো দেশ যে-বৈদেশিক মুদ্রা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রদান বা পেমেন্টের জন্য মজুত রাখে, তাকেই বলে মজুত মুদ্রা। এরূপ মজুত বিদেশী মুদ্রাতেই (যেমন, ডলার বা পাউন্ডে) রাখা হয়। এরূপ বৈদেশিক মুদ্রাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত (Convert) করা যায়। বর্তমানে মার্কিন ডলার এবং ব্রিটিশ পাউন্ডকেই প্রধানত মজুতযোগ্য মুদ্রা হিসাবে গণ্য করা হয়।

মুদ্রামান হ্রাস Devaluation. এটা হল বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ-রৌপ্যের তুলনায় কোনো দেশের মুদ্রার মান হ্রাস করা। এর অর্থ হল, ওই মুদ্রার একটি ইউনিটের দ্বারা আগে যে-পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বা স্বর্ণ-রৌপ্য ক্রয় করা যেত, এখন তার তুলনায় তা কম ক্রয় করা যাবে। মুদ্রামান হ্রাস করা হয় প্রধানত দুটি কারণে ১. আমদানি-রফতানির ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে, সঙ্কট দূরীকরণের জন্য বিদেশে পণ্য রফতানি বৃদ্ধি করা; কারণ মুদ্রামান হ্রাস করা হলে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্যের মূল্য হ্রাস পায় অর্থাৎ আগের চাইতে কম পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় অপেক্ষাকৃত বেশি পণ্য ক্রয় করা সম্ভবপর হয়, ফলে বিদেশী ক্রেতারা উৎসাহিত বোধ করে; ২. দেশের মধ্যে ব্যবসায়ে তেজিভাব সৃষ্টি করা, কারণ মুদ্রামান হ্রাস করা হলে পণ্যের মূল্য বেড়ে যায় এবং উৎপাদকদের অধিকতর মুনাফা হয়। আবার কোনো কোনো সরকার তার ঋণের প্রকৃত মূল্য হ্রাস করার জন্যও মুদ্রামান হ্রাস করে থাকে।

মুদ্রার সঞ্চালন গতি Velocity of Circulation of Money. একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুদ্রার এক-একটি ইউনিট যতবার হাতবদল করে, তাকেই বলে মুদ্রার প্রচলন বা সঞ্চালন গতি। অন্য কথায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট ব্যয়িত মুদ্রাকে প্রচলিত মুদ্রার

মোট পরিমাণ (ক্যাশ ও ব্যাংকে গচ্ছিত) দিয়ে ভাগ করলে যে-ভাগফল হয়, সেটাই হল মুদ্রার সঞ্চালন গতি। সঞ্চালন গতির ওপর মুদ্রার মান অনেকখানি নির্ভর করে। তীব্র মুদ্রাস্ফীতির সময় মুদ্রার মান হ্রাস পায়; কেননা, তখন মুদ্রার বর্ধিত সঞ্চালন গতির চাহিদা মেটানোর জন্য বাজারে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ বেড়ে যায়। একটা দেশের মুদ্রার সঞ্চালন গতি সঠিকভাবে হিসাব করা খুবই দুরূহ; কেননা ব্যক্তিগত পর্যায়ে (যেখানে কোনো রসিদ বা অ্যাকাউন্টস নেই)অর্থব্যয়ের হিসাব পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে মোট ব্যাংকজমার পরিপ্রেক্ষিতে মোট ব্যাংক-লেনদেনের হিসাব নিলে মুদ্রার সঞ্চালন গতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

মুদ্রাস্ফীতি Inflation. কোনো দেশের মোট পণ্যের মূল্যের চাইতে ধাতু ও কাগজের মুদ্রার পরিমাণ বেশি হয়ে যাওয়াকে বলে মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশের মোট উৎপাদিত পণ্য ও প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধাবস্থার মোকাবেলায় বা সরকারি কর্মচারীদের মাত্রাতিরিক্ত বেতনদান, মাত্রাতিরিক্ত প্রশাসন খরচ মেটানো ইত্যাদির প্রয়োজনে বা অন্য কোনো কারণে যখন অবস্থিত পণ্যের সঙ্গে সংগতিহীনভাবে মুদ্রা ছাপা ও বাজারে ছাড়া হয়, তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এ ছাড়া পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ হ্রাস, অনুৎপাদনমূলক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি ইত্যাদিও মুদ্রাস্ফীতির কারণ হতে পারে।

মুদ্রাহ্রাস Deflation. এটা Inflation বা মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত। বস্তুত মুদ্রাস্ফীতিকে ঠেকানোর জন্যই কোনো কোনো সময় মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করা হয়। মুদ্রাহ্রাস (মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস) পেলে পণ্যমূল্য হ্রাস পায় বটে, কিন্তু এর কুফল হল এই যে, এর ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে পণ্যের চাহিদাও হ্রাস পায়। তাই বর্তমানে মুদ্রাহ্রাস কার্যত মন্দা ও বেকারত্বেরই সমার্থক। তবু মাঝে মাঝে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য হালকা মুদ্রাহ্রাসব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং একে অবমুদ্রাস্ফীতি (Disinflation) বলে অভিহিত করা হয়।

মুনাফিক যার কথার সঙ্গে কাজের মিল নেই, তাকেই বলে মুনাফিক। যারা বাহ্যত মুসলামান, কিন্তু বিশ্বাসের দিক থেকে ভিন্ন ধর্ম বা মতবাদের প্রতি অনুগত তারাও মোনাফিকদেরই পর্যায়ভুক্ত। কুরআন শরিফে বলা হয়েছে যে, মোনাফিকদের কাফিরদের সঙ্গেই দোজখে নিক্ষেপ করা হবে এবং সেখানেই তারা অনন্তকাল থাকবে।

মুলতুবি : Adjournment. কোনো আইনসভার কাজের সাময়িক বিরতি। মুলতুবির সঙ্গে স্থগিতকরণ (Prorogation) এবং আইনসভা ভেঙে দেওয়ার পার্থক্য হল এই যে, স্থগিতকরণের ক্ষেত্রে অগৃহীত বিলসমূহ বিবেচনা করতে হলে পরবর্তী অধিবেশনে পুনরায় নতুনভাবে তা উত্থাপন করতে হয় এবং আইনসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে সদস্যরা সদস্যপদ হারান। কিন্তু মুলতুবির ক্ষেত্রে আইনসভার কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

মুষ্টিমেয়ের শাসন : Oligarchy. এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কতিপয় ব্যক্তির কুক্ষিগত থাকে। প্রাচীনকালে (যেমন গ্রিক সভ্যতার যুগে) সমাজের মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর নাগরিকের ভোটের দ্বারা শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত। কেবলমাত্র সামরিক কর্তাদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাও মূলত একই শ্রেণীভুক্ত বলে অনেকে মনে করেন।

মুসোলিনি, বেনিটো Benito Mussolini. (১৮৮৩-১৯৪৫) জনৈক কর্মকার ও স্কুল-শিক্ষয়িত্রীর সন্তান, বেনিটো মুসোলিনি নিজেও প্রথম জীবনে শিক্ষক ছিলেন। সামরিক বাহিনীতে ভরতি হওয়ার ভয়ে ১৯০২ সালে তিনি সুইজারল্যান্ড পালিয়ে যান। এখানে একজন সাধারণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করার সময় তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা, বিশেষত সিন্ডিক্যালিজমের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৪ সালে তিনি ইতালিতে ফিরে আসেন এবং ১১ বছর যাবৎ সমাজতন্ত্রী ও সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেন। সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৫ সালে তিনি সোশ্যালিস্ট ফ্রন্ট ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি 'ইল পোপোলো দ্য ইতালিয়া' পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে তিনি ফ্যাসিস্ট পার্টি গঠন করেন। ফ্যাসিস্টরা কমিউনিস্টদের সভাদি ভেঙে দিত। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ইতালি জুড়ে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। কমিউনিস্ট-অভ্যুত্থানের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত রাজা তৃতীয় ইমান্যুয়েল ১৯২২ সালের অক্টোবরে মুসোলিনীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। নভেম্বর মাসে তিনি একনায়কত্ব গ্রহণ করলেও, ১৯২৪ সাল পর্যন্ত পার্লামেন্টারি বিরোধী দলের অস্তিত্ব বজায় রাখেন। ১৯২৮-২৯ সালে পুরোপুরি ফ্যাসিবাদী সরকার কায়েম করা হয়। মুসোলিনি মালিক ও শ্রমিকের বিবাদ মেটানোর জন্য কর্পোরেশনসমূহের জাতীয় কাউন্সিল গঠন করেন এবং ১৯২৯ সালে সম্পাদিত লেটেরান চুক্তির মাধ্যমে চার্চ ও রাষ্ট্রের বিবাদ-এর অবসান ঘটান। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এ-সময় তিনি ব্যাপক জনহিতকর কাজ করেন এবং পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে (১৯২৪-৩৫) আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। অস্ট্রিয়ার প্রতি হিটলারের লালসার দরুন তিনি প্রথমদিকে হিটলারবিরোধী হলেও ১৯৩৫ সালে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার দরুন ১৯৩৬ সালে হিটলারের নৈকট্যে এসে চক্রীপক্ষ গড়ে তোলেন। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের সাযুজ্যও তাঁদের দুজনকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। ১৯৩৯ সালে তিনি আলবেনিয়া দখল করেন এবং ১৯৪০ সালের ১০ জুন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ২৮ অক্টোবর ইতালি গ্রিস আক্রমণ করলে গ্রিকরা তা প্রতিহত করে। লিবিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার পরাজয় মুসোলিনির ভাবমূর্তি অনেক কমিয়ে দেয়। ১৯৪১ সাল নাগাদ তিনি জার্মানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালের ২৫ জুলাই রাজা ইমান্যুয়েল ও মার্শাল বাদোগলিও ক্যু করে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। তাঁকে বন্দি করা হলে জার্মান প্যারাট্রুপাররা তাঁকে নাটকীয়ভাবে উদ্ধার করে (১২.৯.১৯৪৩) এবং জার্মান দখলাধীন এলাকায় 'প্রজাতন্ত্রী ফ্যাসিবাদী সরকার' গঠন করতে দেয়। ১৯৪৫ সালের ২৮ এপ্রিল তিনি ইতালীয়দের হাতেই ধরা পড়েন এবং পালানোর চেষ্টা করলে তাঁকে কোমো হ্রদের তীরে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁর লাশ মিলানে আনা হলে, জনসাধারণ তা দেখার জন্য পিয়াজালে লরেটোতে লাশ টাঙিয়ে রাখা হয়। মুসোলিনি প্রথম জীবনে "কার্ডিন্যালের প্রণয়িনী" নামে একটি উপন্যাসও রচনা করেন।

মুহাম্মদ (সা), হজরত (৫৭০-৬২২) : ইসলামি মতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্ম। জন্মের পূর্বেই পিতা আবদুল্লাহ্ এবং শিশুকালেই মাতা আমেনা মারা যান। তাঁকে প্রতিপালন করেন প্রথম জীবনে পিতামহ আবদুল মুত্তালিব ও পরে পিতৃব্য আবু তালেব। প্রথম জীবনে তিনি ব্যবসায়ী হিসাবে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। ২৫ বছর বয়সে তিনি বিবি খাদিজার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ৪০ বছর বয়সে তিনি ঐশীবাণী বা ওহিপ্রাপ্ত হন এবং ইসলাম প্রচার শুরু করেন। পৌত্তলিকতাবাদী ও

কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুরাইশগণ (অত্র এলাকার অধিবাসীগণ) তাঁর একেশ্বরবাদ, সাম্য ও মুক্তির বাণী গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা গ্রহণ করে না পাপাচার থেকে মুক্তির আহ্বান। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি ৬২২ সালে মদিনায় হিজরত করেন। ৬২৪ সালে বিখ্যাত 'মদিনা সনদ'-এর মাধ্যমে তিনি প্রথম ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই ছিল পৃথিবীর প্রথম লিখিত রাষ্ট্রীয় সংবিধান। এর ফলে রাজনৈতিক ঐক্য ও ইসলামি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মদিনায় ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে ৬২৬ সালের মার্চ মাসে কুরাইশরা মদিনা আক্রমণ করে। মদিনার ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক স্থানে মুসলমানদের সঙ্গে কুরাইশদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। বদরের যুদ্ধে ৩০০ মুসলমান সৈন্য ১০০০ কুরাইশ সৈন্যকে পরাজিত করে। এই বিজয়ের ফলে ইসলামের প্রভাব দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। এমতাবস্থায় ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশরা ৩০০০ সৈন্য নিয়ে পুনরায় মুসলমানদের আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে (ওহোদের যুদ্ধে) মুসলিম সৈন্যদের বিশৃঙ্খলা ও কুরাইশ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের অসামান্য বীরত্বের ফলে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে। ৬২৭ সালে কুরাইশদের সঙ্গে মুসলমানদের আর এক যুদ্ধ হয় (খন্দকের যুদ্ধ) এবং এ-যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কুরাইশরা ৬২৮ সালে 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' করতে বাধ্য হয়। ওই বছরই কুরাইশ ও ইহুদিরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলছে জানতে পেরে মুসলমানেরা খাইবার নামক স্থানে তাদের মোকাবেলা করে। খাইবারের যুদ্ধে শত্রুরা বিপর্যস্ত হয়। হিজরতের ৮ বছর পর মক্কা জয় করা হয় এবং কাবা শরিফকে পৌত্তলিকতামুক্ত করা হয়। এরপর মুসলমানেরা একে একে হুনাইন, তায়েফ ও তাবুকের যুদ্ধে জয়লাভ করে। ৬৩২ সালে তিনি শেষবারের মতো মক্কায় হজ করতে যান। এই হজ 'হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জ নামে খ্যাত। এই উপলক্ষে তিনি তাঁর চূড়ান্ত দিক্-নির্দেশনা প্রদান করেন। ৬৩২ সালের ৮ জুন নামাজরত অবস্থায় তাঁর ওফাত হয়। মুসলমান ছাড়াও অনেকের মতে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবসন্তান। মাইকেল হার্ট নামক একজন খ্রিষ্টান বিশ্বের সর্বকালের যে ১০০ জন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির তালিকা প্রস্তুত করেন, তাতে তিনি হজরত মুহাম্মদ (সা)-কে প্রথম স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। কারণ, প্রথমত তিনি ধর্মকে আচার-আনুষ্ঠানিকতার সীমায় বন্দি না রেখে জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী পরিব্যাপ্ত করে দেন এবং নিজের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অভূতপূর্ব সম্মিলন ঘটান; দ্বিতীয়ত দাসযুগ ও সামন্তযুগের ক্রান্তিলগ্নে সাম্য ও গণতন্ত্রের বাণীকে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্রে এক অশ্রুতপূর্ব অবদান রাখেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশিসংখ্যক মানুষকে পৃথিবীর অপর কোনো মহাপুরুষই আলোড়িত করে যেতে সক্ষম হননি। তিনি ধনী-দরিদ্র, বর্ণ-গোত্র-নির্বিশেষে সকল মানুষকে এক সমান্তরালে উপস্থাপন করেন, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন, অপর ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, বণ্টনের ক্ষেত্রে সমতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, সুসংগঠিত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেন এবং অজ্ঞানতা বা ভাববাদের ওপর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করেন। ইসলামই ঘোষণা করে যে, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ইমানের অঙ্গ (অর্থাৎ এটি না করলে একজন মুসলমান মুসলমান থাকবে না।)। ইসলাম ঘোষণা করে যে, হক্কুল ইবাদ বা সমাজের প্রতি দায়িত্ব অবহেলাকারীকে স্বয়ং আল্লাহ্ও ক্ষমা করেন না, যতই সে হক্কুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র

হক আদায় করুক-না কেন। তাঁর ওপর আগত ঐশীবাণীর সঙ্কলন হল আল-কুরআন এবং তাঁর নির্দেশ ও উপদেশাবলীর সঙ্কলন 'আল হাদিস'।

মূল্যবোধ : Values. সমাজের কোনো বস্তু বা বিষয়ের মূল্যসম্পর্কিত ধারণা। এক-একটি বস্তুর বিভিন্ন মূল্য থাকতে পারে, যেমন সামাজিক, আদর্শিক, আধ্যাত্মিক বা নন্দনতাত্ত্বিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মানুষের শ্রমে তৈরি একটি বাতির ঝাড়ের আর্থিক মূল্য আছে; আবার সেটার একটা শৈল্পিক বা নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যও রয়েছে। সব মিলিয়ে তার রয়েছে একটা সামাজিক মূল্য। এক-একটি সামাজিক ঘটনারও বিভিন্ন মূল্যবোধ রয়েছে। যেমন, শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ পুঁজিপতির দৃষ্টিতে বৈধ, অথচ সচেতন শ্রমিকের দৃষ্টিতে তা শোষণ, অচেতন মানুষের দৃষ্টিতে শ্রমিকের কম মজুরি 'ভাগ্য'। অনুরূপভাবে, একজন সনাতনী মানুষের বিচারে হয়তো প্রাচীন ধ্যানধারণা, ঐতিহ্য ও ব্যবস্থাসমূহকে ধরে রাখাই বিধেয়, একজন নীতিহীন উঠতি ধনীর চোখে প্রাচীন ধ্যানধারণার স্থলে অত্যাধুনিক ভোগবাদী ধ্যানধারণার প্রতিষ্ঠাই উপভোগ্য; আবার একজন সমাজবিপ্লবীর দৃষ্টিতে এই উভয়টিকেই নাকচ করে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েম করাই সঠিক। ধর্ম, নৈতিকতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সমাজব্যবস্থা. উৎপাদন-সম্পর্ক, রাজনীতি ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মূল্যবোধ রয়েছে। বলাবাহুল্য, এক-একটি মূল্যবোধ গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের শ্রেণী-অবস্থান, শ্রেণী-সচেতনতা, ধর্মবিশ্বাস, পারিবারিক ঐতিহ্য. সোসাইটি, পেশা ও অন্যান্য কার্যকরণ ইত্যাদির ভিত্তিতে।

মেইন কাম্ফ এডলফ হিটলারের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। জার্মান 'মেইন কাম্ফ' (Mein Kampf) শব্দের অর্থ হল 'আমার সংগ্রাম'। মূলত এই বইয়ের ওপর ভিত্তি করেই উগ্র জাতীয়তাবাদী নাৎসি (Nazi) বাদ গড়ে ওঠে। নাৎসিদের কাছে মেইন কাম্ফ ছিল বাইবেলের সমতুল্য। হেগেল এবং হাউসটন চেম্বারলেন ছিলেন হিটলারের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস।

মে-দিবস ১৮৭৭ সাল থেকে ন্যায্য মজুরি, ৮ ঘণ্টা কাজ ও অন্যান্য দাবিতে বামপন্থিদের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয় এক ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট। ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০০ শ্রমিক দাবিআদায়ের আন্দোলনে প্রাণ দেয়। ১৮৮৪ সালের ৭ অক্টোবর আমেরিকার 'ফেডারেশন অব লেবার' ঘোষণা করে যে, ১৮৮৬ সালের পয়লা মে ৮ ঘণ্টা কাজের দিন বলে গণ্য হবে।' আসে ১৮৮৬ সালের ঐতিহাসিক পয়লা মে। অশ্রুতপূর্ব এক ধর্মঘটে অংশ নেয় ১১,৫৬২টি শিল্প-কারখানা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা। তেসরা মে রিপার কারখানার ধর্মঘটি শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে ৬ জন শ্রমিক নিহত ও অনেকেই আহত হয়। এর প্রতিবাদে চৌঠা মে শিকাগোর হে মার্কেট স্কোয়ারে আহ্বান করা হয় এক বিশাল শ্রমিক সমাবেশ। সমাবেশের ওপর পুলিশ পুনরায় হামলা চালালে শ্রমিকরাও রুখে দাঁড়ায়। এই সংঘর্ষে ৪ জন শ্রমিক ও ৭ জন পুলিশ নিহত হয়। আহত এবং গ্রেফতার হয় অনেকে। গ্রেফতার হন আন্দোলনের নেতা অ্যালবার্ট পার্সনস, জর্জ এনজেল, অগাস্ট সায়েজ, স্যামুয়েল ফিল্টন প্রমুখ। আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে নেতারা অপরিসীম বলিষ্ঠতার পরিচয় দেন। পার্সনস ঘোষণা করেন, "যে-সমাজব্যবস্থা একজনকে করে কোটিপতি, অন্যদের করে নিঃস্ব, সমাজতন্ত্র তাকেই ধ্বংস করতে চায়।" সায়েজ ঘোষণা করেন, "আমাদের কণ্ঠ

নিস্তব্ধ হতে চলেছে। কিন্তু সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন আমাদের নিস্তব্ধতা আমাদের বাগ্মিতার চেয়েও সোচ্চার হয়ে দিগ্‌দিগন্তে অনুরণিত হবে এবং শোষিত শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্তির সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করবে।" মামলার রায় অনুযায়ী পার্সনস, এনজেল, সায়েজ, ফিল্টন প্রমুখের ফাঁসি হয়। এই আন্দোলন যখন গড়ে উঠছিল, তখন মার্কিন পুঁজিপতিদের পত্রিকা 'শিকাগো ট্রিবিউন' লিখেছিল, "ধর্মঘটিদের ওপর হাতবোমা ছুঁড়ে মারো, শ্রমিকরা রুটি চাইলে তাদের আর্সেনিকের বিষ দাও" ইত্যাদি। কেউ-কেউ লিখেছিল, "বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের গুলি করো, নেতাদের ফাঁসি দাও।" কার্যত তা করাও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের দাবি না মেনে পারা যায়নি। মেনে নিতে হয়েছিল শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিও। সেই থেকে বিশ্বের শ্রমিকরা পয়লা মে উদ্‌যাপন করে মেদিবস। আরও উল্লেখযোগ্য যে, হে মার্কেটের মৃত্যুঞ্জয়ী শ্রমিকদের রক্তরঞ্জিত জামা থেকেই বিপ্লবের পতাকা, লাল পতাকার উদ্ভব।

মেনশেভিক Menshevik. রুশ ভাষায় এই শব্দের অর্থ সংখ্যালঘু। ১৯০৩ সালে বিপ্লবের প্রশ্নে রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (আর. এস.ডি.এল.পি.) দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। লেনিনের নেতৃত্বাধীন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ 'বলশেভিক' এবং প্লেখানভ, মার্তভ, এক্সেলরড প্রমুখের নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ 'মেনশেভিক' নামে পরিচিত হয়। ১৯১২ সালে মেনশেভিকরা পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়।

মোল্লাবাদ মোল্লা হলেন ধর্মজ্ঞ বা ধর্মাচারী। কিন্তু 'মোল্লাবাদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয় বিশেষ অর্থে। যাঁরা কতিপয় আচার-অনুষ্ঠানের বাইরে ধর্মের অন্যান্য দিককে উপলব্ধি করতে পারেন না, যাঁরা ধর্ম সম্পর্কে পূর্বনির্ধারিত ধারণার সীমা অতিক্রম করে তার চতুষ্পার্শের পরিবর্তনশীল বিশ্বকে দেখতে পান না, যাঁরা কোনো বৈজ্ঞানিক বা নবতর যুক্তি বা ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে নারাজ—তাঁদেরকেই বলা হয় মোল্লাবাদী। কোনো আদর্শের ক্ষেত্রেও যারা গোঁড়া এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির প্রতি অচেতন, তাদেরকেও মোল্লাবাদী বলে অভিহিত করা হয়। এ-দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্র বা মার্কসবাদের ক্ষেত্রেও মাল্লাবাদিতা হতে পারে। এক কথায় যারা গোঁড়া, পূর্বনির্ধারিত ধারণাসর্বস্ব, স্থান-কালের পরিবর্তন সম্পর্কে অন্ধ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি সম্পর্কে অনীহাসম্পন্ন তাদেরকেই বলা যায় মোল্লাবাদী বা গোঁড়া। বস্তুত মোল্লাবাদ 'মোল্লা' শব্দের বিকৃত অর্থে ব্যবহার।

মোসাদ ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী বেন গুইরনের নির্দেশে তিনটি বিভাগ (সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ, বিদেশে গোয়েন্দাবৃত্তি বিভাগ ও রাজনৈতিক বিভাগ) সংবলিত ইসরায়েলি সিক্রেট সার্ভিস গঠিত হয়। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে এটিকে ঢেলে সাজানো হয় এবং নতুন নামকরণ করা হয় 'মোসাদ'। একসময় এর জনপ্রিয় নাম ছিল, 'দি ইনস্টিটিউট'। সায়রেট মেটকাল (Sayearet Matkal) নামে এর একটি দুর্ধর্ষ কমান্ডো ইউনিট আছে যার সদস্যেরা 'দি গাইস' (The Guys) নামে পরিচিত। ১৯৭৬ সালে এরাই উগান্ডার এন্টেবি বিমানবন্দর থেকে আরব সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা অপহৃত বিমান উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এরাই আর্জেন্টিনা থেকে নাৎসি যুদ্ধাপরাধী ও ইহুদী নিধনকারী আইখম্যানকে ধরে নিয়ে আসে। ১৯৬৮ সালে এই মোসাদই অপারেশন প্লামবোট (Operation Plumboat)-এর মাধ্যমে বেলজিয়াম থেকে জার্মানিতে প্রেরিত ৫৫০ ব্যারেল ইউরেনিয়াম অক্সাইডসহ জাহাজ গায়েব করে নিয়ে আসে—ইসরায়েলের নিজস্ব আণবিক রিঅ্যাক্টরের জন্য। বস্তুত

মোসাদ একটি অত্যন্ত দক্ষ, সুসজ্জিত, দুঃসাহসী ও নৃশংস গোয়েন্দাবাহিনী। মোসাদের হাতে অগণিত মানুষ নিহত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

মৌলবাদ : Fundamentalism. এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোশ্যাল সাইন্স-এ প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী 'মৌলবাদ' হল প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টানদের একটি গোঁড়া ধর্মীয় মতবাদ। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে মৌলবাদ হল সনাতন প্রটেস্টান্ট গোঁড়ামি (Classical Protestant Orthodoxy)-রই অপর নাম। ১৮৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস-এর সোয়াম্পস্কট্ শহরে অনুষ্ঠিত বাইবেল কনফারেন্স-এর মাধ্যমেই 'মৌলবাদ'-এর যাত্রা শুরু। পাদরি জেমস ইঙ্গলিস (James Inglish) মৌলবাদের ভিত্তিতে শুরু করেন মিলেনারিয়ান আন্দোলন। ১৯১০-১২ সালে এই আন্দোলনের উদ্যোক্তারা ১২ খণ্ডে প্রকাশ করেন 'Fundamentals A Testimony of Truth' মৌলবাদের হল পাঁচটি ভিত্তি ১. বাইবেলের নিঃশর্ত অনুপ্রেরণা ও অভ্রান্ততা (Plenary inspiration and inerrancy of Scripture) ২. যিশু খ্রিষ্টের দেবত্ব (Diety of Jesus) ৩. কুমারীগর্ভে যিশুর জন্ম (Virgin birth of Jesus), ৪. মানুষের প্রায়শ্চিত্তহেতু যিশুর রক্তক্ষরণ (Substutionary blood atonement) এবং ৫. যিশুর সশরীরে পুনরুত্থান ও রাজত্ব (Bodily insurrection and premillenial second coming of Christ)। বর্তমানে মৌলবাদীদের ৪টি ঘরানা আছে, যথা—ব্যাপটিস্ট, প্রেস-বাইটেরিয়ান, ম্যাথডিস্ট এবং ইভাঞ্জেলিস্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যের হোয়েটন শহরে মৌলবাদীদের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। প্রকৃত অর্থে মৌলবাদের সঙ্গে গোঁড়া প্রটেস্টান্টপন্থি ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের কোনো সম্পর্ক নেই।

মৌলিক Radical. এই শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Radix (roots) শব্দ থেকে। রাজনীতির ক্ষেত্রে যারা রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি বা আইনব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন চায়, তারাই এই পর্যায়ভুক্ত। আবার যারা কোনো একটি সমস্যা বা ইস্যুর মূলে গিয়ে সেটাকেই পরিবর্তন করতে চায়, তাদেরকেও এই পর্যায়ভুক্ত করা যায়। যেমন ধরা যাক, একটা দেশে খুব অপরাধের ঘটনা ঘটছে। এমতাবস্থায়, একদল চাইল পুলিশ ব্যবস্থাকে জোরদার করে অপরাধ দমন করতে। অপরদল বলল, অপরাধের উৎসমূল হচ্ছে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ; অতএব অপরাধ বাস্তবিকই দমন করতে হলে আর্থসামাজিক ব্যবস্থাটাকেই আমূল পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম দলকে রেডিক্যাল বলা যাবে না। বরং দ্বিতীয় দলই হল রেডিক্যাল। অনেকে কমিউনিস্ট বা বামপন্থিদেরও রেডিক্যাল বলে আখ্যায়িত করেন।

মৌলিক অধিকার : একটি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের বাঁচার অধিকার, জীবিকার অধিকার, ধর্মের অধিকার, সংস্কৃতির অধিকার, মতামত ও সংগঠনের অধিকার, সরকার নির্বাচনের ও সরকারে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তির অধিকার, বিবাহের অধিকার ইত্যাদিকে বলা হয় মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)। কারণ মানুষের যথার্থ জীবনযাত্রা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও স্ফূর্তির জন্য এই অধিকারসমূহকে অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা হয়। মৌলিক অধিকারকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা—পৌর অধিকার (Civil Rights) এবং রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)।

মৌলিক চাহিদা প্রতিটি মানুষকে মানুষের মতো বাঁচতে হলে ন্যূনপক্ষে তার পাঁচটি জিনিস প্রয়োজন হয়। এই পাঁচটি জিনিস হল খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান। এই

পাঁচটি ন্যূনতম বা মৌলিক প্রয়োজনকেই বলা হয় মৌলিক চাহিদা (Basic Requirements)।

ম্যাকনামারা লাইন ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালীন যুক্তরাষ্ট্র তৎকালীন উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাঝখানে বিদ্যুতায়িত তার দিয়ে এই বেষ্টনি নির্মাণ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল উত্তর ভিয়েতনামের বিদ্রোহীরা যেন দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রবেশ করতে না পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারার নামানুসারে এই বেষ্টনির নাম রাখা হয় ম্যাকনামারা লাইন (Mcnamara Line)।

ম্যাকমোহন লাইন ১৯১৩-১৪ সালে তৎকালীন ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার এবং চীন ও তিব্বত সরকাররে মধ্যে সীমান্ত নির্ধারণ প্রশ্নে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং হিমালয়ের সর্বোচ্চ অংশ বরাবর সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়। আলোচনায় ব্রিটিশপক্ষের প্রতিনিধির নামানুসারে এই সীমারখোর নাম রাখা হয় ম্যাকমোহন লাইন (Macmohon Line)। পরবর্তীকালে চীন এই সীমারেখা মেনে নিতে অস্বীকার করে।

ম্যাকার্থিবাদ ম্যাকার্থিবাদ বলতে বোঝায় উদারনীতির প্রতি অসহিষ্ণুতা। ১৯৪৬ সালে যোসেফ ম্যাকার্থি উইসকনসিন থেকে মার্কিন সিনেটে সিনেটর নির্বাচিত হন এবং ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দাবি করেন যে, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরে ২০৫ জন কমিউনিস্ট রয়েছে; সুতরাং এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। পরে তিনি এ-সংখ্যা ৫৭-তে নামিয়ে আনেন এবং আবার তা ৮১-তে উন্নীত করেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি কর্মচারীর রাজনৈতিক ও নৈতিক চরিত্রের ওপরও আক্রমণ শুরু করেন। তিনি এইসব আক্রমণ চালাতেন সাধারণত সিনেট সাবকমিটিসমূহের পাবলিক সেশানে, যাতে সাধারণ আইন তাঁকে অভিযুক্ত করার সুযোগ না পায়। অবশ্য, তাঁর অধিকাংশ অভিযোগ ও আক্রমণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। ১৯৫৪ সালে তাঁর দল থেকেই ৬৭-২২ ভোটে তাঁর নীতিকে বর্জন করা হয়; কেননা এ-নীতি খোদ মার্কিন কংগ্রেসকেই হেয় প্রতিপন্ন করছিল। যেসব মার্কিনি উদার বা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ সরকারি কর্মচারীমাত্রকেই কমিউনিস্টদের চর বা কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে বিবেচনা করত, তারাই ছিল ম্যাকার্থিবাদের সমর্থক। ১৯৫৭ সালে ম্যাকার্থির মৃত্যু হয়।

ম্যাকিয়াভেলি, নিকোলো ডি বার্নার্ডো Niccolo di Bernardo Machiavelli. (১৪৬৯-১৫২৭), ইতালীয় চিন্তাবিদ এবং উঠতি বুর্জোয়াদের তাত্ত্বিক। তাঁর মতে সমাজের বিকাশ ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে না, বরং প্রাকৃতিক কারণে ঘটে। ইতিহাসের পরিচালিকা শক্তি 'বস্তুগত স্বার্থ' এবং 'ক্ষমতা'। তিনি আপামর জনগণ ও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব অবলোকন করেন। তিনি ছিলেন এমন এক শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষপাতী, যে-রাষ্ট্র হবে সামন্তবাদী স্বার্থমুক্ত এবং যে-রাষ্ট্র গণবিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ। রাষ্ট্রক্ষমতা রক্ষার জন্য সকল প্রকার ধূর্ততা, হিংস্রতা, অপকৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতাকে তিনি যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করতেন। তিনিই শাসককে শিয়ালের মতো ধূর্ত হওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর প্রধান রচনা 'প্রিন্স'।

ম্যাক্রোকোজম ও মাইক্রোকোজম Mascrocosm হল নিখিল বিশ্ব। গ্রহ, উপগ্রহ, সাধারণভাবে দৃশ্য বা অনুভবযোগ্য যাবতীয় বস্তুকে নিয়েই ম্যাক্রোকোজম। এখানে দূরত্ব মাপা হয় মাইল, ফুট, ইঞ্চি, কিলোমিটার, মিটার, সেন্টিমিটার ইত্যাদিতে; ওজন মাপা হয়

টন, পাউন্ড ও আউন্স, গ্রাম, কিলোগ্রাম ইত্যাদিতে এবং সময় মাপা হয় বছর,দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড ইত্যাদিতে। অপর দিকে অ্যাটম, নিউক্লিয়াস, জিন, ফোটন ইত্যাদি নিয়ে হল মাইক্রোকোজম (Microcosm) বা ক্ষুদ্র বিশ্ব। মাক্রোকোজমের আওতাধীন বস্তুসমূহ সাধারণভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিকতাহীন এবং তাদের আচরণ বনেদি মেকানিকসের নিয়ম-মোতাবেক। কিন্তু মাইক্রোকোজমের আওতাভুক্ত বস্তু ঘনবিন্যস্ত এবং 'কোয়ানটাম মেকানিক্স্' ও 'ওয়েভ মেকানিকস্' ইত্যাদির নিয়মে চলমান।

ম্যাগনা কার্টা : Magna Carta. এর বাংলা অর্থ হল 'স্বাধীনতা সনদ"। ব্যাপক আন্দোলনের পরিণতিতে ইংল্যান্ডের জনগণ ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজা জন-এর নিকট থেকে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতাসংক্রান্ত এই সনদ আদায় করে নিয়েছিল। এই সনদের মৌল বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ ১. রাজা প্রজাদের নিকট থেকে নিজের জন্য কোনো অর্থ আদায় করতে পারবেন না। ২. পার্লামেন্টের মত না নিয়ে রাজা প্রথম পুত্রকে যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত করতে বা প্রথমা কন্যার বিয়ে সাব্যস্ত করতে পারবেন না। ৩. বিচার ছাড়া কাউকে কারারুদ্ধ করা, শাস্তিপ্রদান করা বা আইনের আশ্রয়চ্যুত করা চলবে না। ৪. কোনো আইনগত অধিকার বা বিচার বিলম্বিত করা বা তা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা চলবে না এবং ৫. স্থায়ী দেওয়ানি আদালত বা Civil Court প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনগণের অধিকার আদায়ের ইতিহাসে 'ম্যাগনা কার্টা' ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা।

ম্যানেজার বিপ্লব পুঁজিপতি বা শিল্প-মালিকদের হাত থেকে শিল্প-ব্যাবসার নিয়ন্ত্রণ ম্যানেজার বা প্রশাসকদের হাতে চলে যাওয়ারই নাম হল ম্যানেজার বিপ্লব (Managerial Revolution)। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক জেম্স্ বার্নহাম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Managerial Revolution (১৯৪১ সালে প্রকাশিত)-এ সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন যে, ক্রমশ শিল্প-ব্যাবসা ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ পুঁজিপতিদের হাতছাড়া হয়ে সরকারি বেসরকারি প্রশাসকদের হাতে চলে যাচ্ছে। তিনি আরও দেখান যে, ভবিষ্যতে আধিপত্যকারী শ্রেণী হবে সম্পদের মালিকেরা নয়, বরং প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক দক্ষতার অধিকারীরা। শেষোক্তারাই হবে উৎপাদনযন্ত্র ও উৎপাদিত পণ্যের বণ্টনের মৌল নিয়ন্ত্রক। পুঁজিপতিরা একসময় সুবিধা পেয়েছিল এজন্য যে, উৎপাদনযন্ত্রের ওপর তাদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ছিল নিরঙ্কুশ। কিন্তু, উৎপাদনযন্ত্র ও বণ্টনের ক্ষেত্রে যতই রাষ্ট্রের ভূমিকা বাড়ছে, ততই পুঁজিপতিদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এই ধারায় এক পর্যায়ে রাষ্ট্র কার্যত ম্যানেজারদের 'সম্পত্তি'-তে পরিণত হবে বলেও বার্নহাম অভিমত প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক ও কল্যাণরাষ্ট্রসমূহেও নিয়ন্ত্রণ প্রশাসকদের হাতেই রয়েছে। এমনকি পুঁজিবাদী দেশসমূহেও প্রশাসকদের, বিশেষত প্রযুক্তিবিদদের গুরুত্ব আজ বিপুলভাবে বেড়ে গেছে এবং ফলত ধ্রুপদী (Classical) পুঁজিবাদের চেহারাও ক্রমশই পালটে যাচ্ছে।

ম্যান্ডেট বা Mandate. কোনো এলাকার জনগণ কর্তৃক তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী, সরকার বা সরকার-প্রধানকে প্রদত্ত ক্ষমতা। ম্যান্ডেট কোনো বিশেষ ইস্যুর ওপরও দেওয়া হতে পারে।

ম্যাফিয়া Mafia. সিসিলির অপরাধীচক্রকে বলা হত ম্যাফিয়া। বর্তমানে ম্যাফিয়া বলতে প্রধানত ইতালি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধীচক্রকে বোঝালেও অন্যান্য দেশের ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অপরাধীচক্রকেও ম্যাফিয়া বলে অভিহিত করা হয়। সাধারণত

ম্যাফিয়ারা চোরাচালানি, বেআইনি অস্ত্রব্যাবসা, মাদকদ্রব্য ব্যাবসা, সন্ত্রাসবাজি, নারীপাচারসহ বিবিধ অপরাধের সঙ্গে জড়িত। এদের দেশব্যাপী বা বিশ্বব্যাপী সুদৃঢ় নেটওয়ার্ক থাকে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ে এদের লোক বা এজেন্ট থাকে, আত্মরক্ষা বা আঘাত হানার মতো দুর্ধর্ষ সশস্ত্রবাহিনী থাকে এবং থাকে প্রবল অর্থশক্তি। এই ম্যাফিয়ারা অনেক ক্ষেত্রে একটা দেশের অর্থনীতি, এমনকি রাজনীতির ওপরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারে। অনেক সময় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ীরাও ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীস্বার্থে বিভিন্ন ম্যাফিয়াচক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

ম্যালথাসবাদ ইংল্যান্ডের রেভারেন্ড টমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪) কর্তৃক প্রবর্তিত জনসংখ্যাসংক্রান্ত মতবাদ। তাঁর মতে, কোনো দেশেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা সরবরাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। এই মতানুযায়ী কোনো দেশের জনগণ যদি ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করে, তা হলে সেদেশে দারিদ্র্য অনিবার্য এবং দারিদ্র্য, পাপাচার, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির ফলে মানুষের ব্যাপকহারে মৃত্যুও হবে অনিবার্য, ফলে জনসংখ্যা হ্রাস পাবে এবং এই প্রাকৃতিক নিয়মেই খাদ্য-উৎপাদনের সঙ্গে জনসংখ্যার সমানুপাত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও বাস্তবতা ম্যালথাসবাদকে মূলত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করেছে।

॥ **য** ॥

যথেচ্ছাচার ফরাসি Laissez Faire কথাটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, 'বাধা দিও না'। এটি একটি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মতবাদও বটে। এর মূল কথা হল, কারও ব্যক্তিগত কাজে, বিশেষত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক কোনো হস্তক্ষেপ না করা। ১৬৮০ সালে সামন্তবাদী বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের উদীয়মান ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ধ্বনিরূপে লাইসেজ ফেয়ার বা অবাধনীতির উদ্ভব ঘটে। বর্তমানে প্রায়শই শব্দটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যথেচ্ছাচারের বিকল্প হিসাবে। এই অর্থে লাইসেজ ফেয়ার বা যথেচ্ছাচার হচ্ছে, দল, মিটিং, মিছিল, হরতাল, ধর্মঘট, ঘেরাও, লেখালেখি ইত্যাদির যথেচ্ছ অধিকার। অনুন্নত বিশ্বে, অর্থাৎ যেখানে যথার্থ শিল্পায়ন না হওয়ার দরুন পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের আর্থসামাজিক ভিত্তি যথার্থরূপে গড়ে ওঠেনি, সেখানে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র অসম্ভব—এটা বুঝতে অপারগ রাজনীতিবিদরা বেপরোয়া মিটিং-মিছিল-হরতাল ইত্যাদির অধিকারকেই গণতন্ত্র বলে বিবেচনা করেন, যা প্রায়শই যথেচ্ছাচারেরই রূপ পরিগ্রহ করে। (লাইসেজ ফেয়ারও দ্রষ্টব্য)।

যাইবাতসু জাপানি শব্দ 'যাইবাতসু'-র অর্থ হল অর্থশালীদের বৃহৎ গ্রুপ। প্রাচীনকাল থেকে এ-শব্দ ব্যবহৃত হয়ে এলেও মেইজি যুগে (১৮৬৮-১৯১২) এ-শব্দ বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। এ-সময়ে বিশটি বৃহৎ ব্যবসায়ী পরিবার শিল্পক্ষেত্রে বিপুল গুরুত্ব অর্জন করে। এদের মধ্যে মিৎসুই, মিৎসুবিশি, সুমিতোমো ও ইয়াসুদা ১৯০৫-১৯২০ সাল পর্যন্ত সময়ে জাপানের আধুনিকীকরণে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বস্তুত যাইবাতসু জাপানি পুঁজিবাদেরই অপর নামে পরিণত হয় এবং এরা জাপানের মন্ত্রী, পার্লামেন্ট সদস্য ও প্রশাসনের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমানে হিটাচি, হোন্ডা, ডাইহাটসু, টয়োটা ইত্যাদিও যাইবাতসু পর্যায়ভুক্ত।

যাজকতন্ত্র Theocracy. এমন রাষ্ট্রপরিচালনাব্যবস্থা, যা সরাসরি ধর্মযাজকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অথবা একমাত্র তাদেরই মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিচালিত। এক্ষেত্রেও 'দৈব-অধিকার'-এর ধুয়া তুলে বলা হয় যে, যাজকরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও সর্বেসর্বা হবে—এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

যুক্তফ্রন্ট কোনো সাধারণ লক্ষ্যঅর্জনের উদ্দেশ্যে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে একাধিক রাজনৈতিক দল যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন সেই ঐক্যকে বলে যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্টের স্থায়িত্ব সাময়িক। বিশেষ লক্ষ্যটি অর্জিত হলেই যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। কোনো উপনিবেশবাদী শক্তি বা কোনো স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধেও যুক্তফ্রন্ট হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার : Federal Government. কতিপয় রাষ্ট্র বা রাজ্য তাদের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে সম্মিলিতভাবে একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করলে সেটাকে বলে যুক্তরাষ্ট্র, আর তার সরকারকে বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল সরকার। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা, যানবাহন, দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি সাধারণ বিষয়সমূহই শুধু কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা রাজ্যসমূহই কর্তৃত্বশীল থাকে। সুইজারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

যুক্তি Reason. ইমান্যুয়েল কান্টের দার্শনিক মতানুযায়ী, যে-শক্তির দরুন দেশ,কাল, নিমিত্ত ইত্যাদি স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতিভাত হয়, সেই শক্তিই হল যুক্তি বা হেতু। তিনি যুক্তির বিভিন্ন প্রকারভেদ করেন, যেমন, বাস্তব যুক্তি; যার দ্বারা ইচ্ছানির্ভর কাজসমূহের হেতু বা সর্বজনীন সূত্র নির্ণয় করা যায়; নিখাঁদ যুক্তি; যে-যুক্তি ইন্দ্রেয়ানুভূতি-সংক্রান্ত জ্ঞানের সংস্পর্শযুক্ত এবং আনুমানিক যুক্তি; যা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। তবে সাধারণ অর্থে যুক্তি হল কোনো ঘটনা বা বিষয়ের বাস্তবিক কার্যকরণ।

যুক্তিসঙ্গতকরণ : Rationalisation. বাহুল্য ব্যয় ও বাহুল্য শ্রমিক ইত্যাদি বাদ দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থাদী গ্রহণ করে কোনো শিল্পকারখানাকে যথাসম্ভব লাভজনক ও প্রয়োজনানুগ করাকেই বলা হয় যুক্তিসঙ্গতকরণ। শব্দটি শিল্পকারখানা সংক্রান্ত বিষয়ের বাইরেও ব্যবহৃত হয়। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে, সংগঠনে বা কার্যক্রমে অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি বাদ দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সংযুক্ত করে সময় ও চাহিদার উপযোগী করে তোলাকেই বলা হয় যুক্তিসঙ্গতকরণ।

যুদ্ধ War. যুদ্ধ হল দুই বা ততোধিক দেশের সশস্ত্র সংঘর্ষ। যুদ্ধ রাজনীতিরই একটি সশস্ত্র রূপ। কোনো আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সঙ্কট যখন আর শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করা যায় না, তখনই শুরু হয় সশস্ত্র সংঘাত বা যুদ্ধ।

যুদ্ধ, ন্যায় শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন, দাসত্ব, বৈষম্য ইত্যাদির কবল থেকে মুক্তির জন্য কিংবা বিদেশী আক্রমণ, দখল বা আধিপত্যের কবল থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য কিংবা সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে কোনো উপবিনেশকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত যুদ্ধই হল ন্যায়যুদ্ধ।

যুদ্ধাপরাধ বা War Crime. যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষীয় সামরিক বা বেসামরিক ব্যক্তিদের সে-সমস্ত কার্যকলাপ, পরাজিত হলে বা ধরা পড়লে যে-সমস্তের জন্য তাদের বিচার হতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যে আন্তর্জাতিক ও দূরপ্রাচ্য বিষয়ের সামরিক আদালত গঠিত হয় (আগস্ট, ১৯৪৫), তার সনদ অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধ বলতে বোঝায় ক. শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, যেমন, আগ্রাসন বা আগ্রাসনের জন্য পরিকল্পনা, প্রস্তুতি বা উদ্যোগ; কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বা ওয়াদা ভঙ্গকারী যুদ্ধ; উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে-কোনো প্রকার চক্রান্ত এই পর্যায়ভুক্ত। খ. যুদ্ধের নিয়মভঙ্গকারী অপরাধ যেমন, যুদ্ধের স্বীকৃত নিয়ম বা প্রথা ভঙ্গ করা; অপর পক্ষের লোকদের হত্যা করা, দ্বীপান্তরিত করা বা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা; যুদ্ধবন্দিদের বা জিম্মিদের হত্যা করা, তাদের দ্বীপান্তরে দেওয়া কিংবা তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা; সরকারি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি লুট করা, শহর-বন্দর-জনপদ ইত্যাদি ধ্বংস করা ইত্যাদি যুদ্ধের নিয়মভঙ্গকারী অপরাধের আওতাভুক্ত এবং গ. মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ; বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করা; দাসত্ব করতে বাধ্য করা, দ্বীপান্তরে দেওয়া বা তাদের প্রতি অন্য যে-কোনো ধরনের অসদাচরণ করা (তা যুদ্ধের সময়ই হোক বা তার আগে-পরেই হোক), রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা জাতিগত কারণে কাউকে হত্যা বা নির্যাতন করা ইত্যাদিই মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের শামিল। উপরন্তু কোনো কর্মকর্তার নির্দেশে উপরোক্ত কার্যকলাপ কেউ করলেও সেটাকে যুদ্ধাপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে বলেও আদালত সিদ্ধান্ত নেয়, তবে যেক্ষেত্রে নিম্নপদস্থ অফিসার বা কর্মচারীর উপরওয়ালার আদেশ না মানলে প্রাণ হারানোর সম্ভাবনা ছিল শুধু সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা যেতে পারে বলেও আদালত মত দেয়। আজও মোটামুটি উপরোক্ত কার্যকলাপকেই যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য করা হয়। তবে, সাধারণত যুদ্ধাপরাধ পরাজিতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়; বিজয়ীর যুদ্ধাপরাধের বিচার কেউ করে না। যেমন—হিরোশিমা নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ বেসামরিক নারী-পুরুষ-শিশুহত্যার কোনোই বিচার হয়নি।

যুদ্ধোন্মাদ War-monger. যে-সকল ব্যক্তি বা জাতি কোনো শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করে না; বরং মনে করে যে একমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর, তাদেরকেই বলা হয় যুদ্ধোন্মাদ।

যোগ : মহর্ষি পতঞ্জল যোগ (Yoga) দর্শনের প্রবর্তক। যোগ হল সকল মানসিক কর্মের অবসান। মানসিক কর্ম অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার, যথা—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। যোগসাধনার আটটি স্তর, যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। চিত্তের পাঁচটি ভূমি আছে, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। শেষ দুটি ভূমিই যোগসাধনার জন্য বিশেষ উপযোগী। যোগের উদ্দেশ্য হল অবিবেক জ্ঞানের স্থলে বিবেক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা এবং এই জাগতিক ক্লেশ, দুর্ভোগ ও মন্দের কবল থেকে মুক্ত হওয়া। এজন্য চাই বৈরাগ্য বা জাগতিক বিষয়সমূহ থেকে বিচ্ছিন্নতা ও যোগ বা ধ্যান। যোগ-দার্শনিকদের মতে যোগীরা বিভিন্ন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। কিন্তু অলৌকিক শক্তি সিদ্ধি ও কৈবল্যলাভের পথে প্রতিবন্ধক বিধায় যোগীকে এই শক্তিলাভের প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভের জন্য ব্রতী হতে হয়। মহর্ষি পতঞ্জল (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী) রচিত 'যোগসূত্র' যোগদর্শনের ভিত্তি।

যৌথ খামার Collective Farm. এটা সেই খামার, যে-খামারে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা যৌথ। যৌথ খামারের আওতাধীন জমিসহ সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও উৎপাদিত ফসলের মালিকানা যৌথ অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সকলের। প্রাথমিক পর্যায়ে যৌথ খামারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সদস্যদের ব্যক্তিগত মালিকানায় জমিখণ্ড, গবাদিপশু ইত্যাদি থাকতে পারে। যখন যৌথ শ্রমলব্ধ উৎপাদনের দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের চাহিদা মেটানো যায়, তখন এসব ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি স্বাভাবিকভাবেই যৌথ খামারের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। বস্তুত যৌথ খামার সমাজতান্ত্রিক মালিকানার একটি ধরন।

যৌথ দরকষাকষি Collective Bargaining. কোনো শিল্পকারখানায় বা ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠানে মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের প্রতিনিধিস্বরূপ ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক শ্রমিকস্বার্থবিষয়ক আলাপ-আলোচনাই হল যৌথ দরকষাষাকষি। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে যে-ট্রেড ইউনিয়ন মালিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার অধিকারী, তাকে বলা হয় যৌথ দরকষাকষিকারী এজেন্ট বা Collective Bargaining Agent (CBA). কোনো শিল্পকারখানায় বা প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে, সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড ইউনিয়নকেই বার্গেনিং এজেন্ট বলে বিবেচনা করা হয়।

যৌথ নিরাপত্তা Collective Security. এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার নিশ্চয়তা চুক্তিবদ্ধ অন্যান্য রাষ্ট্রকে দিতে হয়। লীগ অব নেশানস ও জাতিসংঘ সনদে এটি একটি মৌলনীতি হিসাবে গৃহীত। এই পদ্ধতিতে যৌথ সিদ্ধান্ত প্রত্যেক রাষ্ট্র মানতে বাধ্য। জাতিসংঘ সনদ মোতাবেক কোথাও শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি হলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের যে-কেউ ভেটো দিলে পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না বিধায়, এই নীতি তেমন একটা কার্যকর হয় না।

যৌথ নেতৃত্ব : Collective Leadership. যৌথ নেতৃত্বের ধারণা হল ব্যক্তিনেতৃত্বের ধারণার বিপরীত। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা যত বেশিই হোক-না কেন, তা কখনোই সমগ্রের বা সমষ্টির প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার চাইতে বেশি হতে পারে না। সমষ্টির চাইতে ব্যক্তির প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা অধিক হওয়া ঐতিহাসিক বস্তুবাদবিরোধী এবং অবান্তর। তাই তাঁরা মনে করেন যে, সকল পর্যায়েই নেতৃত্ব বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ার কোনো ব্যক্তিবিশেষের হাতে নয়, বরং তা সংগঠন ও আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের হাতেই সমষ্টিগতভাবে ন্যস্ত হওয়া উচিত। এরূপ নেতৃত্ব যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিলে এবং অন্যান্য পর্যায়ের সিদ্ধান্ত ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে, সিদ্ধান্তে যেমন সকলের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটবে, তেমনি ভ্রান্তির সম্ভাবনাও তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাবে। আর ভ্রান্তি ঘটলেও দায়িত্ব সকলের বিধায়, তা শোধরানো সহজতর হবে। তা ছাড়া যৌথ নেতৃত্বের প্রক্রিয়াতেই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ক্ষমতারও সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভবপর হবে। শুধু সমাজতন্ত্রীরাই নয়, সত্যিকার গণতন্ত্রীরাও যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বাস করেন। তবে বাস্তবে প্রায়শই ব্যক্তিনেতৃত্ব যৌথ নেতৃত্বকে ছাপিয়ে ওঠে।

॥ র ॥

র : Research and Analytical Wing, সংক্ষেপে RAW. এটি ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর গোয়েন্দা শাখার নাম।

রক্তাক্ত রবিবার : Bloody Sunday. ১৯০৫ সালের ২২ জানুয়ারি গ্যাপন নামক একজন ধর্মযাজকের নেতৃত্বে একদল শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গ রাশিয়ার জারের সেন্ট পিটার্সবার্গস্থ শীত প্রাসাদে উপস্থিত হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজবন্দিদের মুক্তি, আইন পরিষদ আহ্বান এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবিসংবলিত স্মারকলিপি জারের হাতে প্রদান করা। জারের সৈন্যরা বিনা উসকানিতে সমবেত নিরস্ত্র শ্রমিক ও শ্রমিক-পরিবারের সদস্যদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। ফলে কয়েকশত নর-নারী ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণ জারের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন শহরে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। লেনিন এই ঘটনাকে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের মহড়া বা ড্রেস রিহার্সেল বলে অভিহিত করেন।

রক্ষণশীলতা Conservatism. প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমাজকাঠামো ও ব্যবস্থাসমূহ পরিবর্তন, বিশেষত বিপ্লবী পরিবর্তন না করার নীতি বা মনোবৃত্তিকেই বলে রক্ষণশীলতা।

রক্ষণশীল দল Conservative Party, ব্রিটিশ রাজনৈতিক দল। Unionist Party নামেও পরিচিত। ঐতিহ্যগতভাবে এই দলটি ডানপন্থি এবং ব্রিটিশ টোরি দলের উত্তরসূরি। ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ কমন্‌স্ সভায় পরাজিত হওয়ার পর এই দল বেশকিছুটা প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং কল্যাণরাষ্ট্রের অনুসারী হয়। ব্রিটিশ অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই দলের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। এই দলের নামকরা নেতাদের মধ্যে রয়েছেন উইনস্টন চার্চিল, হ্যারল্ড ম্যাকমিলান, এডওয়ার্ড হিথ প্রমুখ।

রবিনসন, জোয়ান Joan Robinson. (১৯০৩-১৯৮৩), ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ। পিতা মেজর জেনারলে স্যার ফ্রান্সিস মরিস। স্বামী অর্থনীতিবিদ ই.এ.জি. রবিনসন। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস জোয়ান রবিনসন লর্ড কেইনসের প্রিয় ছাত্রী ছিলেন। রেডিক্যাল চিন্তার অধিকারিণী জোয়ান মার্কসবাদের ওপর ব্যাপক অধ্যয়ন করনে। অর্থনৈতিক বিকাশ ও পুঁজির সঞ্চয়ে সামাজিক শ্রেণীসমূহের মৌল ভূমিকায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জার্মানির বিপ্লবী নেত্রী রোজা লুক্সেমবার্গের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'পুঁজির পুঞ্জীভবন' (Accumulation of Capital)। ষাটের দশকে তিনি ভারত ও চীনসহ এশিয়া, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হয়ে ওঠেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা যখন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মুনাফা ও পুঁজির বিকাশের লক্ষণ আবিষ্কার করে সমাজতন্ত্রের অসারতা প্রমাণ করতে ব্যস্ত, তখন জোয়ান রবিনসন যুক্তি দিয়ে তাঁদের এই তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দেন। ফলে, তাঁর সমকালীন পুঁজিবাদপন্থিরা তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং পরিণামে তাঁকে মার্শাল প্রফেসারশিপ থেকেও বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি এতে কিছুমাত্রও বিচলিত না হয়ে ব্রিটিশব্যবস্থার সমালোচনা অব্যাহত রাখেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামকে তীব্রতর না করে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা সম্ভবপর নয়। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রক্রিয়াতেই স্বাধীন অর্থনীতির বিকাশ সম্ভবপর।

রবুবিয়াত বা রব্বানিয়াত। 'রব' শব্দ থেকে রবুবিয়াত বা রব্বানিয়াত-এর উদ্ভব। আর 'রব' শব্দের অর্থ প্রতিপালক। ইসলাম ধর্মানুযায়ী আল্লাহ্ই একমাত্র 'রব' বা তাঁর সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালক। সুতরাং, রবুবিয়াত বা রব্বানিয়াত-এর মূল কথাই হল আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে, আল্লাহ্র বিধান মোতাবেক একটি রাষ্ট্রের সমগ্র জনগণের সুষ্ঠু ও সাম্যভিত্তিক প্রতিপালন। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। সুতরাং, রবুবিয়াত বা রব্বানিয়াত-এর রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী সাম্যভিত্তিক অর্থনৈতিক ও শাসনব্যবস্থা কায়েম এবং সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা-বিধানই রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ।

রাইডার : Rider, কোনো আইনসভায় উত্থাপিত কোনো বিলের সঙ্গে সংযুক্ত সংশোধনীকেই বলে রাইডার।

রাজতন্ত্র : Monarchy. সাধারণভাবে যে-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজাই রাষ্ট্রের প্রধান এবং রাজা হওয়ার ব্যাপারটা উত্তরাধিকারমূলক সে-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেই বলা হয় রাজতন্ত্র। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে যে-ব্যবস্থায় রাজা শুধু রাষ্ট্রপ্রধানই নন, বরং সর্বোচ্চ প্রশাসকও বটেন, সেটাকেই বলা হয় রাজতন্ত্র। নামকা ওয়াস্তে রাজা থাকলেই সেটাকে প্রকৃত অর্থে রাজতন্ত্র বলা যায় না। যেমন, ইংল্যান্ড, জাপান, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে রাজা বা রানি থাকলেও এ-সমস্ত দেশ কার্যত গণতান্ত্রিক দেশ। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে ইংল্যান্ডের রাজা বা রানি নামে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও, কার্যত এসব দেশশাসনে রাজা বা রানির বলতে গেলে কোনোই ক্ষমতা বা এক্তিয়ার নেই।

রাজনীতি Politics বা রাষ্ট্রনীতিই বাংলায় রাজনীতি বলে পরিচিত। প্রচলিত অর্থে রাজনীতি হল রাষ্ট্র ও তার নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও অধিকার-সম্পর্কিত বিষয়াদি। বস্তুত রাজনীতি একটা দেশের অবস্থিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোরই উপরিকাঠামো। আর্থসামাজিক কাঠামোর ওপরই নির্ভর করে রাজনীতির রূপ ও কাঠামো। যেমন, পুঁজিবাদী-আর্থসামাজিক কাঠামোর রাজনৈতিক রূপ ও কাঠামোও এমনভাবে বিন্যস্ত যে, এতে শুধুমাত্র পুঁজিবাদের ধারক-বাহকেরাই রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে পারে। অবশ্য একটি আর্থসামাজিক কাঠামোয় অন্য রাজনৈতিক চিন্তাভিত্তিক দল (বা কাঠামো) গড়ে উঠতে পারে বটে, কিন্তু তা যে-পর্যন্ত অবস্থিত কাঠামো ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধূলিস্মাৎ করতে না পারে, সে-পর্যন্ত তা রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এজন্যই দেখা যায় যে, সামন্তবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উপরিকাঠামো ছিল রাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাজনৈতিক কাঠামো পুঁজিবাদী গণতন্ত্র। যেখানে জাতীয় পুঁজিবাদ বা শিল্পপুঁজি আধিপত্যশীল নয়, সেখানে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রও অসম্ভব। আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতি হয় সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বভিত্তিক রাজনীতি। আর্থসামাজিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠলেও এরা পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক।

রাজনীতি, ক্ষমতার : Power Politics. অর্থাৎ ক্ষমতার জন্য রাজনীতি; প্রধানত তিনটি অর্থে ক্ষমতার রাজনীতি কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যথা ১. একই শ্রেণীভুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ বা সংগঠনের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার বা তা দখলে রাখার প্রতিযোগিতা। ২. এক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে অন্য শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া এবং ৩. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাবসৃষ্টি বা প্রভাবরক্ষার উদ্দেশ্যে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করা;

আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা, এই লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিভিন্ন শিবির ও শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা এবং ন্যায়-অন্যায়-নির্বিশেষে স্বীয় স্বার্থে অন্যের ওপর হুমকি সৃষ্টি বা বলপ্রয়োগ করা।

রাজনৈতিক অধিকার Political Rights. রাজনৈতিক অধিকার হল জনগণের স্ব স্ব পছন্দমতো রাজনৈতিক বা আনুষাঙ্গিক (যেমন, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক) সংগঠন করার অধিকার, নিজ নিজ আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করার অধিকার, সরকারি অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করার অধিকার, সংবাদপত্র-পুস্তকাদি প্রকাশ করার অধিকার, নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের সরকার নির্বাচিত করার এবং সরকারে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, পার্লামেন্টে অবাধে কথা বলার অধিকার ইত্যাদি।

রাজনৈতিক অধিকার, মহিলাদের ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নারীদের পুরুষের সমান রাজনৈতিক অধিকারদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার সময়সীমা নির্ধারিত হয় ১৯৫৪ সালের ৭ জুলাই। নারীদের অধিকার সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্তে ১১টি ধারা ছিল, যার ৩টিই ছিল রাজনৈতিক অধিকারসংক্রান্ত। এসব ধারায় কোনোরূপ বৈষম্য না করে নারীদের পুরুষের সমকক্ষভাবেই সকলপ্রকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়ার; স্ব স্ব পার্লামেন্টসহ সকল সংস্থায় ও সংগঠনে নির্বাচিত হবার সমঅধিকার দেওয়ার এবং সকল সরকারি পদে নিযুক্ত হবার সমঅধিকার দেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার করা হয়। অনেকগুলো দেশই যথাসময়ে এই চুক্তি বাস্তবায়িত করে।

রাজনৈতিক অর্থনীতি : Political Economy. সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক তত্ত্ব, ব্যবস্থা ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও কার্যক্রমের স্বরূপনির্ণয়, বিন্যাস ও বাস্তবায়নই হল রাজনৈতিক অর্থনীতি। রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বানুযায়ী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক পারস্পরিক।

রাজনৈতিক আশ্রয় : Political Asylum. কোনো রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক নিজ দেশের সরকারের রোষ বা শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে গিয়ে অপর কোনো রাষ্ট্রে বা তার দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করলে এবং উক্ত রাষ্ট্র বা দূতাবাসও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করলে এবং উক্ত ব্যক্তির মূল রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের নিকট তাকে প্রত্যার্পণ করতে অস্বীকার করলে, এরূপ আশ্রয়কে বলে রাজনৈতিক আশ্রয়।

রাজনৈতিক পুনর্বাসন Political Rehabilitation. কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল যদি কোনো কারণে রাজনৈতিক অধিকার হারায় এবং পরবর্তীতে তা পুনরায় লাভ করে, সেক্ষেত্রে পুনরায় রাজনৈতিক অধিকারলাভকে বা তার প্রক্রিয়াকে বলে রাজনৈতিক পুনর্বাসন।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি Political Culture. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে একটি রাজনৈতিক দলের শৃঙ্খলার ধরন, নেতা ও কর্মীদের আচার-আচরণ ও চরিত্র প্রতিপক্ষের প্রতি আচরণ, নেতাদের সঙ্গে কর্মীদের সম্পর্ক ও আচরণের ধরন, জনগণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, নেতানেত্রীদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক মান, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্তর, ক্ষমতায় যাওয়ার পর আচরণ ইত্যাদিকে সমষ্টিগতভাবে বোঝায়।

রাজনৈতিকীকরণ : Politicisation. কোনো ঘটনা বা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক রূপ বা চরিত্র দান করা কিংবা বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াস পাওয়াই হল রাজনৈতিকীকরণ। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষকে কোনো রাজনৈতিক মতবাদ বা উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ করার কাজকেও রাজনৈতিকীকরণ বলা যায়।

রাজবন্দি Political Prisoner অর্থাৎ রাজনৈতিক কারণে বন্দি। সাধারণত রাজনৈতিক কারণে বন্দিদের, সাধারণ বন্দি বা কয়েদিদের তুলনায় কারাগারে উচ্চতর মর্যাদা প্রদান করা হয়ে থাকে।

রাডার : Radio Detection and Ranging. এরই সংক্ষেপিত রূপ হল Radar. এটি হল বিদ্যুৎচৌম্বকীয় তরঙ্গমালার দ্বারা বিমান, জাহাজ, ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়ের প্রক্রিয়া বা Device।

রাশিয়া-ইউরোপ পাইপলাইন : রাশিয়া থেকে পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের জন্য যে-পাইপলাইন বসানো হয়, সেটাই হল রাশিয়া-ইউরোপ পাইপলাইন। এই পাইপলাইন পূর্ব ইউরোপীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে এবং গ্যাস গ্রহণকারী দেশসমূহের ওপর রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি করবে, এই বিবেচনায় কেউ-কেউ তখন এই পাইপলাইনের সমালোচনা করতেন।

রাষ্ট্র State. সাধারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী নির্দিষ্ট জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, পূর্ণাঙ্গ সরকার ও সার্বভৌমত্বই হল রাষ্ট্রের মৌল উপাদান ও লক্ষণ। স্বর্গীয় তত্ত্ব (Divine Theory) অনুযায়ী ঈশ্বরের অভিপ্রায়েই রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং শাসক তাঁরই অভিপ্রায়ে তাঁরই প্রতিনিধি হিসাবে শাসনাধিকার লাভ করেন। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে মধ্যযুগের রাজারা, তাঁরা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি—এই অজুহাতে প্রজাদের নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত আনুগত্য দাবি করতেন। রুশোর সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব (Social Contract Theory) অনুযায়ী প্রথম দিকে মানুষ ছিল স্বাধীন ও বাধামুক্ত; পরবর্তীকালে তারা নিজেরা নিজেদের সুবিধার জন্যই স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। মাতৃতত্ত্ব অনুযায়ী পরিবারের ওপর মায়ের কর্তৃত্ব এবং পিতৃতত্ত্ব অনুযায়ী পিতা বা বয়োজ্যেষ্ঠের কর্তৃত্ব থেকেই রাষ্ট্রের ধারণার উৎপত্তি। শক্তিতত্ত্ব (Force Theory) অনুযায়ী সবল দুর্বলের ওপর তার আধিপত্য চাপিয়ে দিয়েই রাষ্ট্র গঠন করে। আর ক্রমবিকাশ তত্ত্ব (Evolutionary Theory) অনুযায়ী কোনো আকস্মিকতা, চুক্তি বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং সামাজিক ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে; অন্য কথায় রাষ্ট্র ইতিহাসের ধারারই সৃষ্টি। মার্কসীয় তত্ত্বানুযায়ী রাষ্ট্র হল এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীসমূহকে উৎপীড়নের যন্ত্র। তাঁদের মতে, সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিচার বিভাগ, আইনব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে একশ্রেণী অপর শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখে। পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র তাদের স্বার্থের যন্ত্র, যা দিয়ে তারা শ্রমিকশ্রেণীকে দাবিয়ে রাখে, আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি সর্বহারা শ্রেণীর যন্ত্র, যা দিয়ে তারা পুঁজিপতিদের দাবিয়ে রাখে। শ্রেণীবিভক্তির পর্যায়েই রাষ্ট্রের উদ্ভব। এ-যাবৎ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র দেখা গেছে, যেমন, দাস-মালিকদের রাষ্ট্র, সামন্তবাদী রাষ্ট্র, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কল্যাণরাষ্ট্র ইত্যাদি।

রাষ্ট্র ও বিপ্লব State and Revolution. লেনিন অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সালে এই পুস্তকটি রচনা করেন। এটি প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের মে মাসে। এই গ্রন্থে রাষ্ট্রের মার্কসীয় তত্ত্ব এবং বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকা বিধৃত হয়। মার্কস-এঙ্গেলসের তত্ত্ব

ছিল এই যে, রাষ্ট্রের প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দায়িত্ব হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে দেওয়া এবং সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। লেনিন এই গ্রন্থে মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যের যথার্থতা সপ্রমাণিত করেন। সাম্যবাদী সমাজের দুই স্তরের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেনিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌল বিকাশপদ্ধতি, গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ, প্রশাসনে জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ইত্যাদির স্বরূপ তুলে ধরেন। তিনি এই গ্রন্থে নৈরাজ্যবাদ ও সুবিধাবাদ—উভয়েরই তীব্র সমালোচনা করেন, কেননা এরা মার্কসবাদের কথা বলে অথচ সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বকে অস্বীকার করে, কার্যত মার্কসবাদকেই নস্যাৎ করে দেয়। লেনিন এই গ্রন্থে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত রুশবিপ্লবের সারসংক্ষেপসংবলিত একটি অধ্যায়ও সংযুক্ত করবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু সেটা কখনোই হয়ে ওঠেনি।

রাষ্ট্র, সর্বৈব বা Totalitarian State. অর্থাৎ যে-রাষ্ট্রে রাষ্ট্রই সর্বৈব বা সকল কর্তৃত্বের অধিকারী। উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের অধিকার সীমিত এবং অধিকাংশ বিষয়ের ওপর সমাজের বা জনগণের অধিকারই স্বীকৃত। কিন্তু ফ্যাসিবাদীরা নাগরিকদের সকল অধিকার হরণ করে সকল ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। নাৎসি শাসনামলের জার্মানি, ফ্যাসিস্ট শাসনামলের ইতালি, ফ্রাঙ্কোর শাসনামলের স্পেন ইত্যাদিই এরূপ সর্বৈব রাষ্ট্রের উদাহরণ।

রাষ্ট্রদূত : Ambassador. একটি সার্বভৌম দেশে অপর একটি সার্বভৌম দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি। স্বদেশের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রদূতরা বিশেষ সুবিধাদি ভোগ করে থাকেন। অপরাধ যা-ই হোক-না কেন, ভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতকে হত্যা বা গ্রেফতার করা যায় না, বড়জোর তাঁকে বহিষ্কার করা যায়। রাষ্ট্রদূত তাঁর নিজ দেশে যেসব সংবাদাদি পাঠান বা নিজ দেশ থেকে যেসব সংবাদাদি প্রাপ্ত হন তা সেন্সর করা বিধেয় নয়। বস্তুত রাষ্টদূতের কাজ হল নিযুক্তিপ্রাপ্ত দেশে তাঁর স্বদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সার্বভৌমত্ববিষয়ক, নিরাপত্তাবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থসহ সর্বপ্রকার স্বার্থ রক্ষা করা। কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের পারস্পরিক রাষ্ট্রদূতকে হাই কমিশনার (High Commissioner) বলা হয়।

রাষ্ট্রদ্রোহ Sedition. রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে ক্ষতিকর কাজকেই বলা হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতা। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় যে, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তাদের প্রতিপক্ষের সকল কর্মকাণ্ডকে ঢালাওভাবে রাষ্ট্রদ্রোহিতা আখ্যায় আখ্যায়িত করে শ্বেতসন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে অবদমিত করার প্রয়াস পায়।

রাষ্ট্রযন্ত্র : State Machinery. যেসব প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর মাধ্যমে রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব ও কার্যাবলী বাস্তবায়িত করে, সেসব প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর সমষ্টিকেই বলে রাষ্ট্রযন্ত্র। আমলাতন্ত্র, সশস্ত্রবাহিনীসমূহ, বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ, পার্লামেন্ট, মন্ত্রিসভা ইত্যাদির সমষ্টিই হল রাষ্ট্রযন্ত্র। সাধারণত রাষ্ট্রক্ষমতায় যাঁরা অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁদের স্বার্থ ও নীতি মোতাবেকই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হয়। কখনো কখনো রাষ্ট্রযন্ত্রের একাংশের সঙ্গে অন্য অংশের স্বার্থের বা নীতির দ্বন্দ্বও বেধে যেতে পারে। যেমন, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কোনো বিপ্লবী চিন্তাধারা আমলাতন্ত্র বা অপর কারও পছন্দনীয় না হলে সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য যাঁরা কোনো বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটাতে চান তাঁরা সাধারণত গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকেও তাঁদের সুবিধানুযায়ী ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হন।

রাষ্ট্রহীনতা Statelessness. মার্কস-এঙ্গেলস-এর চিন্তাধারা অনুসারে 'রাষ্ট্র' হল কার্যত এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে শোষণ ও নিষ্পেষণের যন্ত্র। তদুপরি, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ফলেই মানবসমাজ আজ বহুধাবিভক্ত। সুতরাং, তাঁরা মনে করেন যে, যে-পর্যন্ত রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করা না যাবে, সে-পর্যন্ত শোষণেরও সম্পূর্ণ মূল্যোৎপাটন সম্ভবপর হবে না। তাই কট্টর মার্কসবাদীরা কমিউনিজমের চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্রহীনতা বা রাষ্ট্রহীন অবস্থা কায়েম হবে বলে বিশ্বাস করেন।

রাষ্ট্রীয়করণ Nationalisation. শিল্পকারখানা, ব্যাবসাবাণিজ্য, ব্যাংকবীমা, জমিজমা প্রভৃতি সম্পত্তি ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় অধিগ্রহণকে বলে রাষ্ট্রীয়করণ। বস্তুত যে-শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, রাষ্ট্রীয়করণের চরিত্রও ঠিক সেই রকমই হয়ে থাকে। যেমন, কোনো বুর্জোয়া সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয়কৃত শিল্পকারখানাদির চরিত্রও হয় বুর্জোয়া, মুৎসুদ্দিশ্রেণীর দ্বারা রাষ্ট্রীয়কৃত সম্পত্তির চরিত্র হয় মুৎসুদ্দি; আর সমাজতন্ত্রীদের শাসনাধীনে তা হলে তার চরিত্র হয় সমাজতান্ত্রিক। অনেকে রাষ্ট্রীয়করণ মাত্রকেই সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ বলে ভুল করে থাকেন।

রাসপুটিন, গ্রেগরি এফিসোভিচ (১৮৭১-১৯১৬) রুশ কৃষক বংশোদ্ভব একজন মরমি সন্ন্যাসী। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার রাজকুমার সারেভিচ অ্যালেক্সী (১৯০৪-১৮) কঠিন রোগাক্রান্ত হলে রাসপুটিন সম্মোহনের মাধ্যমে তাঁকে সারিয়ে তোলেন। এর ফলে জার ও জারিনা তাঁকে প্রতিশ্রুত ত্রাণকারী মেহেদি বলে বিবেচনা করতে শুরু করেন। ব্যক্তিগত জীবনে রাসপুটিন অত্যন্ত বদরাগী, বিকৃতরুচি ও দুশ্চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও জার ও জারিনার ওপর তাঁর প্রভাব এত বৃদ্ধি পায় যে তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং চার্চ ও রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতম পদসমূহে নিয়োগ ইত্যাদিও নির্ধারিত হত রাসপুটিনের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী। মদ্যপ রাসপুটিনের যৌন যথেচ্ছাচার সেন্ট পিটার্সবার্গের সমাজে তাঁকে খুবই ঘৃণ্য করে তোলে এবং পত্র-পত্রিকায়ও এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি শুরু হয়। রাজপরিবারের সদস্য, অমাত্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ রাসপুটিনের কবল থেকে মুক্তির জন্য পথ খুঁজতে থাকেন। ১৯১৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর রাজপুত্র ইউগুপোভ তাঁকে তীব্র আর্সেনিক বিষ মিশ্রিত কেক খাইয়ে দেন। কিন্তু এই অতি উচ্চমাত্রার বিষেও তাঁর মৃত্যু না হওয়ায় তাঁকে গুলি করে বহু কষ্টে হত্যা করা হয় এবং তাঁর মৃতদেহ একটি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। রাসপুটিনের প্রভাব চার্চ ও রাজতন্ত্রকে জনগণের কাছে ঘৃণিত করে তোলে। এখনও কোনো সরকার বা সরকার-প্রধানের ওপর অনভিপ্রেত প্রবল প্রভাব সৃষ্টিকারীদের রাসপুটিন বলে অভিহিত করা হয়।

রাসুল : বিশেষ দূত বা প্রেরিত পুরুষ। আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি মানুষ যাতে পথভ্রষ্ট হয়ে না যায়, এজন্য আল্লাহ্‌ যুগে যুগে মানবসমাজে মানুষের শিক্ষক ও আদর্শরূপে রাসুলদের প্রেরণ করেন। পরকালে রাসুলগণ স্ব স্ব অনুসারী বা উম্মতের কৃতকর্মের সাক্ষীস্বরূপ আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবেন। কারও কারও মতে যাঁদের ওপর কিতাব নাযেল হয় এবং যাঁরা উন্নততর জীবনবিধান প্রচারের জন্য আবির্ভূত হন, শুধু তাঁদেরকেই রাসুল বলা যায়। এই মতানুযায়ী সব রাসুলই নবী বটে, কিন্তু সব নবীই রাসুল নন। মিশকাত শরীফ অনুযায়ী নবীর সংখ্যা ১ লাখ ২৪ হাজার, কিন্তু রাসুলের সংখ্যা মাত্র ৩১৩ জন। রাসুলগণ কোনো অতিমানব নন, তাঁরাও সাধারণ মানুষ, তবে তাঁদের ওপর আল্লাহ্‌র ওহি নাজেল হত। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক উম্মার কাছে রাসুল

প্রেরিত হয়েছে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট জাতির ভাষায় তাঁদের বক্তব্য প্রচার করে গেছেন। ইসলামি মতে সকল রাসুলই ছিলেন একাত্মবাদী এবং একই সূত্রের ধারক। প্রত্যেক রাসুলই তাঁর পরবর্তী রাসুলকে অনুসরণ করার জন্য অনুসারীদের আজ্ঞা দিয়ে যেতেন। বাইবেলেও এর সাক্ষ্য রয়েছে। জন দি ব্যাপটিস্ট বলেছেন, "আমার পরে যিনি আসবেন তিনি আমার চেয়েও ক্ষমতাবান হবেন।" (ম্যাথিউ বর্ণিত ৩ ১১)। মোজেজ (হজরত মুসা) বলেছেন, "তোমাদের প্রভু তোমাদের মধ্যে থেকে আমার মতো একজন রাসুল সৃষ্টি করবেন। তোমরা অবশ্যই তাঁর কথায় মনোনিবেশ করবে।" যিশুও তাঁর অনুসারীদের পরবর্তী নবীর আগমনসংবাদ প্রদান করেছিলেন (জন ১৬ ১২-১৪)। অবশ্য তা সত্ত্বেও অনেকেই পরবর্তী রাসুলদের গ্রহণ করেননি। কুরআন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী হজরত মুহাম্মদ (সা)-ই সর্বশেষ নবী ও রাসুল এবং তাঁর পরে আর কোনো নবী বা রাসুলের আবির্ভাবের কোনোই সুযোগ নেই।

রাসেল, বার্ট্রান্ড : Bertrand Russel (১৮৭২-১৯৭০)। ১৯৫০ সালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এই ইংরেজ দার্শনিকের প্রধান কৃতিত্ব আধুনিক গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার বিকাশসাধন। রাসেলের মতে মানুষ তার ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়। ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যসমূহ নৈর্ব্যক্তিক। এগুলোকে বস্তুগত, মনস্তত্ত্বগত বা অপর কোনো শ্রেণীতে বিন্যাস করা ঠিক নয়। রাসেল ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হলেও ঠিক মার্কসীয় বস্তুবাদীও ছিলেন না। তিনি ছিলেন অনেকটা সন্দেহবাদী (Sceptic) দর্শনে বিশ্বাসী। তবে, তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির সপক্ষে চিরকাল আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। মানবতাবাদী রাসেলের 'দি প্রিন্সিপাল্স্ অব ম্যাথাম্যাটিক্স্', 'হিউম্যান নলেজ' ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

রিকল Recall বা প্রত্যাহার। এটি হচ্ছে জনগণের সেই ক্ষমতা, যেই ক্ষমতা দিয়ে জনগণ যাকে বা যাদেরকে নির্বাচিত করেছে, তারা ঠিকমতো বা ওয়াদামতো কাজ না করলে কিংবা অযোগ্যতা বা ব্যর্থতার পরিচয় দিলে কিংবা দুর্নীতিমূলক বা জনস্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনকে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই যে-কোনো সময় বাতিল করে দিতে পারে। প্রগতির যুগে (১৮৯০-১৯২০) এই ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বর্তমানেও যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো স্টেটে এই প্রথা প্রচলিত আছে। অনেকের মতে জনগণের রিকল করার ক্ষমতাই হল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) এবং জনগণের এই ক্ষমতা না থাকলে, একটা সরকার নির্বাচিত সরকার হলেও সেটাকে জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার (Government by the people) বলা যায় না।

রিগোবার্তা মেঞ্চু গুয়াটেমালার এক কুইচি ইন্ডিয়ান পরিবারে রিগোবার্তা মেঞ্চুর জন্ম। মায়া সভ্যতার জনক রেড ইন্ডিয়ানরা ২০ হাজার বছর যাবৎ এই অঞ্চলে বসবাস করে এলেও এবং গুয়াটেমালায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হলেও তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় শোষণ, বঞ্চনা নিপীড়ন ও দারিদ্র্য। কেড়ে নেওয়া হয় ২২টি মায়া আদিবাসীর সত্তা স্বকীয়তা ও মানবাধিকার। চরম দরিদ্র পরিবারের মেয়ে মেঞ্চুরও সুযোগ ঘটেনি স্কুলে যাওয়ার। পাঁচ বছর বয়স থেকেই ধনী জোতদারের জমিতে তাঁকে কাজ করতে হত ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত। মজুরি এতই কম ছিল যে, তা দিয়ে দু'বেলার খাদ্যও জুটত না। তাঁর এক ভাই অপুষ্টিতে মারা যায়। ১৯৮০ সালে এক মিছিল থেকে ফেরার

পথে মেঞ্চুর বাবা পুলিশের গুলিতে নিহত হলে তাঁকে কবরস্থ করার পয়সাও পরিবারের ছিল না। তাঁর ভাই পেত্রচিনো ও মা জুয়ান্নাকেও পুলিশ নির্মমভাবে হত্যা করে। শুধু মেঞ্চু পরিবারের নয়, সকল ইন্ডিয়ানদেরই ছিল একই অবস্থা। এই পটভূমিতে নিজ দেশের এবং বিশ্বের অধিবাসীদের মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মেঞ্চু এক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁরই প্রয়াসের ফলে জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে আদিবাসীদের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসাবে ঘোষণা দেয়। এ-প্রসঙ্গে জাতিসংঘের স্লোগান ছিল : Indigenous people A New Partnership. বিশ্বের আদিবাসীদের নিপীড়ন, নির্যাতন ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে অসামান্য অবদানের জন্য মেঞ্চু নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন।

রিগ্যানোমিক্স্ : Reaganomics. সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোন্যাল্ড রিগ্যানের অর্থনৈতিক পলিসিকেই সাংবাদিকরা এ-নামে অভিহিত করেন। জর্জ বুশ যিনি ১৯৮০ সালে রিগ্যানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অথচ ১৯৮৪ সালে তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ১৯৮৮ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি রিগ্যানোমিক্স্কে ঠাট্টা করে বলতেন ভুডু ইকোনমিক্স্ (Voodoo Economics)। রিগ্যানোমিক্স্-এর মূল কথা হল ধনীদের ট্যাক্স হ্রাস সকলের জন্যই কল্যাণকর ; কারণ, এর উপচেপড়া (trickle-down) সুবিধা সকলেই ভোগ করবে। অর্থনীতিবিদ আর্থার ল্যাফার (Arthur Laffer) রিগ্যানোমিক্স্কে সংজ্ঞায়িত করে বলেন যে, ট্যাক্স কমানোর ফলে ধনীদের অধিক সঞ্চয় হবে, ফলে অধিক বিনিয়োগ হবে এবং পরিণামে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। রিগ্যানোমিকসের সমর্থকদের মতে কম আয়ের লোকদের ট্যাক্স কমিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ তারা এ-বাবদ বেঁচে-যাওয়া অর্থ বিনিয়োগ করবে না, বরং নিজেদের ভোগে লাগাবে। কিন্তু রিগ্যানোমিক্স্ বাস্তবে সঠিক প্রমাণিত হয়নি। রিগ্যানের সময়কার ফেডারেল বাজেটের ঘাটতিই তার প্রমাণ। অনেকের মতে রিগ্যানোমিক্সের ব্যর্থতাই ১৯৯২ সালে ক্লিনটনের হাতে জর্জ বুশ-এর পরাজয়ের মৌল কারণ।

রিপাবলিকান পার্টি Republican Party. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের একটি। ১৮২৮ সালে কুইনসি অ্যাডামস ও হেনরি ক্লে-র নেতৃত্বে ডেমোক্রেটিক পার্টির একটি অংশ বেরিয়ে এসে এই দল গঠন করেন। ১৮৫৪ সালে দাসপ্রথা উঠিয়ে দেওয়ার দাবিতে ডেমোক্রেটিক পার্টির আরও একটি অংশ রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দিলে এ-দল বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৮৬০ সালে এই পার্টির নেতা আব্রাহাম লিংকন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি দাসপ্রথা তুলে দিতে উদ্যত হলে যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এতে রিপাবলিকানরাই জয়ী হয়। দেশের শিল্পসমৃদ্ধ উত্তরাঞ্চল এই পার্টিকে সমর্থন করে। ফলে, উত্তরাঞ্চলে এঁদের দাঁড়ায় শক্ত ঘাঁটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত রিপাবলিকানরা ইউরোপের ব্যাপারে জড়িত না হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য, বর্তমানে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গিগত এমন কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।

রিয়্যালপলিটিক : Realpolitic বা বাস্তবতাভিত্তিক রাজনীতি। শব্দটি জার্মান। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানির শাসক Otto von Bismarck-এর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিকে নামে অভিহিত করা হত। কাল্পনিক বা আবেগের রাজনীতির বিপরীতে

বাস্তবতার রাজনীতিকে বোঝানোর জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে কেউ-কেউ মনে করেন যে, মার্কিন রাজনীতিকেই বর্তমান যুগে সবচেয়ে বাস্তবতাভিত্তিক রাজনীতি বলা যায় ; কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতি কোনো অন্ধবিশ্বাস (dogma), অন্ধ আবেগ (whim) বা পূর্বনির্ধারিত ধারণা (pre-conceived notion)-এর দ্বারা পরিচালিত হয় না বরং তা পরিচালিত হয় বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে।

রুজভেল্ট, ফ্রাঙ্কলিন ডি. Franklin D. Roosevelt. (১৮৮২-১৯৪৫) মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট (১৮৫৮–১৯১৯)-এর পুত্র। নিউ ইয়র্কে জন্ম। হার্ভার্ড ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯১১ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে সিনেটর নির্বাচিত হন। ১৯১৩-২০ সালে উইলসন প্রশাসনে নৌবাহিনীর সহকারী সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২১ সালে তিনি অবশত্ব রোগে আক্রান্ত হন। একটু সুস্থ হয়েই তিনি রাজনীতিতে ফিরে আসেন এবং ১৯২৮ সালে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর নির্বাচিত হন। ১৯৩২ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট হুভারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটাধিক্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ৪৮টি রাজ্যের মধ্যে ৪২টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। নির্বাচনের সময় তিনি ওয়াদা করেছিলেন যে, নির্বাচিত হলে তিনি ব্যাপক জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে মহামন্দার মোকাবেলা করবেন। জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত প্রথম ভাষণে তিনি বলেন, "একমাত্র ভয়কে ছাড়া আর কোনোকিছুকেই আমাদের ভয় করার নেই।" তিনি নিউ ডীল নীতি গ্রহণ করেন এবং ফলে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে শুরু হয় ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নির্মাণচাঞ্চল্য। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে মেইন ও ভারমন্ট ছাড়া প্রতিটি রাজ্যে জয়লাভ করে তিনি মার্কিন ইতিহাসে এক রেকর্ড স্থাপন করেন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলেন এবং কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি প্রদান করেন (১৯৩৩)। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে তিনি আইন পাশ করান, যাতে প্রেসিডেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজন বোধ করলে যে-কোনো রাষ্ট্রের কাছে বিক্রয়, বিনিময় বা মেয়াদি ঋণের বিপরীতে অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করতে পারেন। ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট তিনি চার্চিলের সঙ্গে আটলান্টিক চুক্তি সম্পাদন করেন। জাপানিরা পার্ল হারবার আক্রমণ করলে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তিনি মিত্রশক্তির অন্যান্য নেতার সঙ্গে কাসাব্লাঙ্কা, কুয়েবেক, কায়রো, তেহরান ও ইয়াল্টা সম্মেলনে মিলিত হন। তিনি স্ট্যালিনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর আস্থাশীল ছিলেন বলে এবং চিয়াং কাইশেককে অতিমূল্যায়ন করতেন বলে অনেকেই তাঁর সমালোচনা করত। মূলত তাঁর অনুপ্রেরণাতেই গড়ে উঠেছিল জাতিসংঘ। কিন্তু এ-ব্যাপারে অনুষ্ঠিত সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনের ঠিক এক পক্ষকাল আগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রুজভেল্ট মৃত্যুবরণ করেন (১২ই এপ্রিল, ১৯৪৫)। তিনি চারবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েও মার্কিন ইতিহাসে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন। তিনি ১৯৪০ সালে ওয়েনডেল উইলকি এবং ১৯৪৪ সালে টমাস ডিয়ুয়ীকে নির্বাচনে পরাজিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

রুলিং Ruling. কোনো উচ্চতর কর্তা, কর্তৃপক্ষ বা আদালত কর্তৃক কোনো আইন. আইনের ধারা, আদেশ, অধ্যাদেশ, বিধি বা পদ্ধতির প্রশ্নে প্রদত্ত ব্যাখ্যা, যা সাধারণভাবে

চূড়ান্ত বলে গণ্য ও চ্যালেঞ্জের অতীত। পার্লামেন্টের স্পীকারকেও প্রায়শই রুলিং দিতে হয়

রুশো, জাঁ জ্যাক Jean-Jacques Rousseau. (১৭৭২-৭৮), ফরাসি দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও শিল্পজ্ঞ। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পাশাপাশি তিনি অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতেন। বস্তু ও আত্মাকে তিনি দুই শাশ্বত সূত্র বলে বিবেচনা করতেন। জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদে বিশ্বাস করতেন। সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি সামন্তবাদী শ্রেণী সম্পর্কে ও স্বৈরাচারী শাসনের তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্র, গণঅধিকার এবং জন্মগত অবস্থান-নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকারের ঘোরতর সমর্থক ছিলেন। বৈষম্যের কারণ হিসেবে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে দায়ী করলেও ক্ষুদ্র মালিকানার তিনি ছিলেন আপোসহীন সমর্থক। তিনি ছিলেন 'সামাজিক চুক্তি' (Social contract) মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর মতে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক রাষ্ট্রে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের হানাহানি লোপ পেয়ে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। সামন্তবাদী শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, শিক্ষাব্যবস্থাটা এমন হওয়া চাই, যাতে শিক্ষিতদের মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জন্মায়। বস্তুত তিনি ছিলেন পেটি বুর্জোয়া মতবাদের অন্যতম উদ্গাতা এবং তাঁর আদর্শে ছিল 'সৎ হস্তশিল্পী'দের প্রাধান্য।

রেজিমেন্টেশন : Regimentation. এই শব্দটির উদ্ভব হয়েছে রেজিমেন্ট (Regiment) বা সৈন্যদল থেকে। বস্তুত সশস্ত্রবাহিনীসমূহের কঠোর শৃঙ্খলাকেই বলে রেজিমেন্টেশন। একটা দেশের সমস্ত মানুষ বা একটা সংগঠনের সকল সদস্যের ওপর কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা আরোপ করা এবং তা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাগ্রহণের নীতিবিধানই হল রাজনৈতিক অর্থে রেজিমেন্টেশন।

রেড শার্ট : ইতালির নেতা গ্যারিবালডি (১৮০৭-৮২)-র অনুসারীবৃন্দ লাল জামা পরিধান করতেন বলেই এঁদের নাম হয় রেড শার্ট। রেড শার্ট বিপ্লবী ও নৈরাজ্যবাদীদের প্রতীক বলেও বিবেচিত।

রেডিক্যাল Radical. এর অর্থ হল মৌলিক সংস্কার বা পরিবর্তনবাদী। ১৯১৬ সালে ইংল্যান্ডে রেডিক্যাল পার্টি গঠিত হয়। সরকার ও তার কর্মপন্থার মৌলিক পরিবর্তনই ছিল এদের লক্ষ্য। পরে এ-দল শ্রমিক দলের সঙ্গে মিশে যায়। ফ্রান্সেও একসময় রেডিক্যাল সোশ্যালিষ্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রেডিক্যালিস্ট বা মৌলিক পরিবর্তনকামী রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক গ্রুপের অস্তিত্ব দেখা যায়। মার্কসবাদীদের মতে এরা প্রচলিত শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার কাঠামো ঠিক রেখে ওই কাঠামোরই স্বার্থে কিছু সংস্কার করতে চায় বিধায় এদেরকে বিপ্লবী বলা যায় না।

রেফারেন্ডাম Referendum. কোনো বিশেষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি জনগণ বা নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে উপস্থাপন করা এবং ভোটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের মতামত বা রায়সংগ্রহের পদ্ধতি। কোনো কোনো দেশে শাসনতন্ত্র সংশোধনের একমাত্র পদ্ধতিই হল রেফারেন্ডাম। যেমন, অষ্ট্রেলিয়ায়। আবার, সুইজারল্যান্ডে শুধু শাসনতন্ত্র সংশোধনই নয়, ৩০ হাজার নাগরিক দাবি করলে যে-কোনো আইনের ব্যাপারেও

রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠান করতে হয়। রেফারেন্ডাম শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ছাড়াও বিভিন্ন ইস্যুর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, ১৯৪৬ সালে রেফারেন্ডামের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়েছিল ভারত উপমহাদেশের কোন কোন অঞ্চল নিয়ে ভারত ও কোন কোন অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে।

রেশ্যানালাইজেশন Rationalisation বা যুক্তিযুক্তকরণ। কোনো বিষয়ের অযৌক্তিক অংশগুলোকে বাদ দিয়ে যুক্তিসম্মত উপায়ে তার পুনর্বিন্যাস করাই হল রেশ্যানালাইজেশন। শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে এর অর্থ হল নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে, সুষ্ঠু শ্রমবিভাগ করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদি নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় বের করা; অন্য যে-কোনো উপায়ে অপচয় রোধ করা, উৎপাদনব্যয় কমানো ও পণ্যকে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক করা ইত্যাদিকেই বলে রেশ্যানালাইজেশন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর শিল্পক্ষেত্রে শব্দটি ব্যাপকতা লাভ করে। সমাজ ও মতাদর্শের ক্ষেত্রেও এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় কোনো নীতি, আদর্শ, কৌশল বা কর্মসূচিকে স্থান ও কালের উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে।

রোবেস্‌পীয়ার, ম্যাক্সিমিলিয়ন ডি. (১৭৫৮-৯৪)। তিনি ১৭৮৯ সালে ফরাসি জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হন এবং একজন বিপ্লবী (Radical) বলে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি জেকোবিন ক্লাবেরও সদস্য ছিলেন। রোবেসপীয়ার তাঁর ধ্যান-ধারণা লাভ করেন রুশোর চিন্তাধারা থেকে। তিনি নিজেকে জনগণের সাধারণ ইচ্ছা (General Will)-র মূর্তরূপ বলে বিবেচনা করতেন। দুর্নীতিমুক্ত ও স্বীয় নীতির প্রশ্নে নির্দয় রোবেসপীয়ার প্যারিসের জনগণের সমর্থন নিয়ে দেশের 'গণ নিরাপত্তা কমিটি'-তে নিজের একাধিপত্য কায়েম করেন এবং তাঁর বিরোধীদের (যেমন, ডানটন, হেবার্ট ও গিরোন্ডিন সংঘের সদস্যবৃন্দকে) নির্মূল করে দেওয়ার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন। ১৭৯৩ সালের অক্টোবর মাসে গিরোন্ডিন সংঘের প্রায় সকল নেতাকেই হত্যা করা হয়। ১৭৯৪ সালের ২৪ মার্চ হেবার্ট এবং ৬ এপ্রিল ডানটনকে গিলোটিনের নিচে ফেলে হত্যা করা হয়। এ-ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন কুথোঁ, সেন্‌জাস্‌ (Saint-Just) প্রমুখ। বস্তুত ১৭৯৪ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রথমার্ধ পর্যন্ত, রোবেসপীয়ার তাঁর একনায়কত্ব চালান। তিনি এ-সময় এক 'সামাজিক বিপ্লব' শুরু করেন, যার ফলশ্রুতিতে অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে চলে যান। এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর বিরুদ্ধে 'পরম সত্তার' ধর্মীয় তত্ত্বজনিত অভিযোগ, যার ফলে তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৭৯৪ সালের জুলাই মাসে তাঁর মৃত্যুদণ্ডও কার্যকর করা হয়।

রোম অভিযাত্রা ফ্যাসিবাদী বেনিটো মুসোলিনির ক্ষমতায় আরোহণ (১৯২২)-এর নাটকীয় উপাখ্যানই রোম অভিযাত্রা (March on Rome) নামে খ্যাত। ফ্যাসিবাদীরা ইতালির কতিপয় শহরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে বসলে এ-বছরের গোটা গ্রীষ্মকাল জুড়ে একটা গৃহযুদ্ধের অবস্থা বিরাজমান থাকে। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের দিকে মুসোলিনি রাজধানীতে প্রবেশের সব ক'টি পথে তাঁর সমর্থকদের মোতায়েন করেন এবং ফ্যাসিবাদী সরকার গঠনের দাবি জানান। এই ফ্যাসিবাদী হুমকির মুখে রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল নতিস্বীকার করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করেন এবং মিলান থেকে রোমে এসে সরকার গঠনের জন্য মুসেলিনির প্রতি আহ্বান জানান (৩০ অক্টোবর)। ব্যাপারটির ওপর অতিনাটকীয়তা আরোপের জন্য একে বলা হয় রোম

অভিযাত্রা। মুসোলিনি নিজে একটি এক্সপ্রেস ট্রেনে করে রোমে এসে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গীরা অবশ্য একটি আনুষ্ঠানিক প্যারেডের পর ছত্রভঙ্গ হয়ে ফিরে যায়।

রোমান্টিকতা Romanticism, এর অর্থ হল কল্পনাপ্রবণতা বা আবেগপ্রবণতা। কল্পনাপ্রবণ, আবেগপ্রবণ বা অলীক বীরত্বকেও বলে রোমান্টিকতা। রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা কল্পনাপ্রবণ কিংবা আবেগের বশবর্তী হয়ে বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের দিকে ধাবিত হন তাঁদেরকে বলে রোমান্টিক বিপ্লবী। রাজনীতির ক্ষেত্রেও রোমান্টিকতা প্রায়শই দৃষ্ট হয়। উনবিংশ শতাব্দীর নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবীরাও (রাশিয়ার) ছিলেন প্রধানত রোমান্টিক। রোমান্টিকতা অধিংকাংশ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদেরও পরিচালিকা শক্তি। সর্বকালে পৃথিবীর দেশে দেশে রোমান্টিকদের কমবেশি দর্শন পাওয়া যায়। 'রোমান্টিসিজম' কথাটির বস্তুত উদ্ভব ঘটে ১৭৮৯ সালে, ব্রিটিশ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও স্যামুয়েল টি কোলরিজের যৌথ কাব্যগ্রন্থ 'লিরিক্যাল ব্যালাডস' প্রকাশের মধ্য দিয়ে। প্রাকৃতিকতা, কল্পনাপ্রবণতা ও প্রেমময় উচ্ছ্বাসের কাছে কবিতার মাধ্যমে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁরা ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের সূচনা করেন।

॥ ল ॥

লং মার্চ Long March. ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত চীনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কিয়াংসি প্রদেশে ছিল লালফৌজের ভিত্তি-এলাকা ও মূল ঘাঁটি। এ-সময়ে পার্টির অভ্যন্তরে অবস্থিত বাম হটকারীদের কার্যকলাপের ফলে চিয়াং কাইশেকের বাহিনী লালফৌজের ওপর ভয়াবহ চাপের সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায়, লালফৌজের মাও ঝে ডংয়ের নেতৃত্বাধীন অংশ নিজেদের ধ্বংস এড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে কিয়াংসি ত্যাগ করে এবং সরকারি বাহিনীর সঙ্গে বহু সংঘর্ষের মোকাবেলা করে প্রায় ১২,৫০০ কিলোমিটার (প্রায় ৭০০০ মাইল) অতিক্রম করে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে চীনের উত্তর-পশ্চিমের সেনশি এলাকায় এসে পৌঁছে। যুদ্ধ, বিপদ ও কষ্টসঙ্কুল এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমাই ইতিহাসে লং মার্চ নামে খ্যাত। মাও ঝে ডংয়ের নেতৃত্বাধীন লালফৌজের অংশ (যা প্রথম ফ্রন্ট আর্মি নামে পরিচিত) এক বছরে ওই পথ অতিক্রম করলেও, হুনান, হুপে প্রভৃতি এলাকা থেকে রওনা হওয়া অন্যান্য বাহিনীর শেষ অংশ সেনশি এসে পৌঁছায় ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে। ফলে এই দুই বছরকেই লং মার্চের সময়কাল বলে ধরা হয়। লং মার্চ লালফৌজকে অকালে ধ্বংসের হাত থেকেই শুধু রক্ষা করে না, বরং চলার পথে বিজয়ের পর বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে লালফৌজের শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ও বৃদ্ধি করে এবং কুয়োমিনতাং বাহিনীর মনোবল বহুল পরিমাণে ভেঙে দিতে সমর্থ হয়। লং মার্চ ব্যাপক এলাকার জনগণকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে এবং মুক্তাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণ ও কমিউনিস্ট ক্যাডার উভয়কেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে হাতে-কলমে জ্ঞানদান করে। লং মার্চকালীন অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সত্যিকার কর্মীদের মধ্য থেকে সুবিধাবাদীদের চিহ্নিত করতে সহায়তা করে এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শৃঙ্খলার আদর্শ স্থাপন করে।

লকআউট Lock out. শ্রমিকদের দাবি মানা না হলে শ্রমিকেরা যেমন ধর্মঘট করে, তেমনি মালিকপক্ষের শর্তাবলী শ্রমিকেরা গ্রহণ না করলে মালিকও কারখানা তালাবদ্ধ

করে দিতে পারেন, যাতে শ্রমিকরা কারখানার ভেতরে ঢুকতে এবং চাকরি করতে না পারে। মালিক কর্তৃক কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকদের বাগে আনার বা চাকরিতে রাখতে অস্বীকার করার এই কৌশলই হল লকআউট।

লক, জন John Locke (১৬৩২-১৭০৪) ব্রিটিশ বস্তুবাদী দার্শনিক। তাঁর প্রধান অবদান, 'মানবজ্ঞানসংক্রান্ত রচনা' (১৬৯০)। এতে তিনি বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। লকের মতে জগতের সবকিছু মানুষের জানার কোনো দরকার নেই; শুধু ততটুকুই জানা দরকার, যতটুকু তার আচরণ ও বাস্তব জীবনের জন্য প্রয়োজন। রাষ্ট্রক্ষমতা ও আইনসম্পর্কিত ব্যাপারে তিনি 'প্রাকৃতিক' স্তর থেকে 'সভ্য' স্তরের এবং অবস্থাভেদে বিভিন্ন ধরনের সরকারের তত্ত্ব হাজির করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের প্রযোজন মূলত শ্রমের মাধ্যমে লব্ধ সম্পদ ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য। সুতরাং সরকারের সেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নয়। তিনি সরকারের কাজকে তিন ভাগে ভাগ করেন, যথা (১) আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত (Legislative), (২) প্রশাসনসংক্রান্ত (Administrative) এবং (৩) ফেডারেল বিষয়-সংক্রান্ত (Federative)। ১৬৮৮ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডে তাঁর মতবাদ কার্যকর হয়। তাঁর চিন্তাধারা পরবর্তী কয়েক পুরুষ ধরে চিন্তাবিদদের প্রভাবিত করে। "অবস্থিত সামাজিক ব্যবস্থা যদি ব্যক্তিকে যথার্থ শিক্ষা ও বিকাশের সুযোগ না দেয়, তা হলে জনগণেরই উচিত সেই ব্যবস্থা পালটে দেওয়া"—তাঁর এই মতবাদকে বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া বিপ্লবের যুক্তি হিসাবে হাজির করেছিল।

লকারবি বিমান দুর্ঘটনা ১৯৮৮ সালের ২১ ডিসেম্বর ফ্রাঙ্কফুর্ট-লন্ডন-নিউইয়র্ক রুটে গমনকারী প্যান-অ্যাম-এর একটি বিমান আকাশে বিধ্বস্ত হয় এবং স্কটল্যান্ডের লকারবি নামক গ্রামে পতিত হয়। ২৭০ জন আরোহীর সকলেই মারা যায়। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তদন্ত চালিয়ে সাব্যস্ত করে যে, একটি মালিকবিহীন সুটকেসে বোমা রেখেই বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এবং এর জন্য দায়ী হচ্ছে আবদেল বাসেত আলি মেগ্রাহি ও লেমিন খলিফা ফাহিম নামক দুজন লিবীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৮৮ সালের ৩ জুলাই মার্কিন ফ্রিগেট ভিনসেন্ট থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে একটি ইরানি বিমানকে ভূপাতিত করা হয় এবং এর সকল যাত্রীও নিহত হয়। অনুমান করা হয় যে, এরই প্রতিশোধ হিসাবে লকারবির বিমান-বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ১৯৯১ সালে সকল দলিলপত্র তৈরি করে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র অপরাধীদের বিচারের দাবি জানায়। কিন্তু লিবিয়া কথিত অপরাধী দুজনকে ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে। ফলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে লিবিয়ার বিরুদ্ধে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এতে ৭ বছরে লিবিয়া ৩১ বিলিয়ন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অবশেষে লিবিয়া অনন্যোপায় হয়ে কথিত অপরাধী দুজনকে ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়।

লবিইং Lobbying ইংরেজি 'লবি' (Lobby) কথাটির অর্থ কোনো ভবনের মূল অংশের সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য অংশ। রাজনীতিতে লবিইং কথাটির মানে হচ্ছে, কোনো পার্লামেন্টে কোনো একটি বিল পাশ করানো বা ফেল কারানোর জন্য পার্লামেন্টের মূল অধিবেশনকক্ষের বাইরে যে-কোনো স্থানে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পার্লামেন্ট সদস্যদের পক্ষে আনার প্রয়াস। শব্দটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উদ্ভূত হলেও বর্তমানে জাতিসংঘসহ বিশ্বের সর্বত্র এটি বহুলভাবে ব্যবহৃত।

লরেন্স অব অ্যারাবিয়া Lawrence of Arabia. ব্রিটিশ কর্নেল টমাস এডওয়ার্ড লরেন্স বা টি. ই. লরেন্স (১৮৮৮-১৯৩৫)-ই লরেন্স অব অ্যারাবিয়া নামে খ্যাত। অক্সফোর্ডের জেসাস কলেজে আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট থাকাকালেই তিনি প্রত্নতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে অংশ নেন (১৯১০-১৪)। আরবদের সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে কায়রো থেকে জেদ্দা পাঠানো হয় (ডিসেম্বর ১৯১৬) এবং সেখানে তিনি বাদশাহ্ হোসেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুর্কিদের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহ গড়ে তোলেন। তিনি যেসব সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল দামাস্কাস-মদিনা রেলপথের ওপর আক্রমণ এবং মিত্রবাহিনীর মিশরস্থ ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগের মূল কেন্দ্রসমূহ দখল। এর মধ্যে আকাবা বন্দর দখল (জুলাই, ১৯১৭) ছিল অতীব তাৎপর্যবহ। ১৯১৭-১৮ সালের শীতকালে কর্নেল লরেন্স অ্যালানবির প্যালেস্টাইন বাহিনীর ডানদিকের আরবদের নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীকালে এই বাহিনীই দামাস্কাসে প্রবেশ করে (অক্টোবর, ১৯১৮)। যুদ্ধশেষে সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী, বিশেষত সিরিয়াকে ফরাসিআশ্রিত রাজ্য হিসেবে বজায় রাখার শর্ত ইত্যাদির মাধ্যমে আরবদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে বলে লরেন্স মনে করতেন। এই আত্মগ্লানিতে বিক্ষত লরেন্স নিজেকে জনগণের সামনে থেকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে রস (Ross) নাম ধারণ করে একজন সাধারণ নাবিক হিসেবে ব্রিটিশ বিমানবাহিনীতে যোগদানের চেষ্টা করেন। এই প্রতারণা ধরা পড়ার পর তিনি টি. ই. শ নাম ধারণ করে পুনরায় বিমানবাহিনীতে যোগ দেন। কিছুকাল তিনি ট্যাংকবাহিনীতেও কাজ করেন। ১৯৩৫ সালে ডরসেটে এক সড়ক-দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। 'জ্ঞানের সাত স্তম্ভ' (Seven Pillars of Wisdom) নামক গ্রন্থে তিনি আরব বিদ্রোহে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থ ১৯২৩ সালে সঙ্গোপনে এবং ১৯৩৫ সালে ব্যাপকভাবে ছাপা হয়।

লা ইন্টারন্যাশনাল লা ইন্টারন্যাশনাল (L' Internationale) হল পৃথিবীর সকল দেশের কমিউনিস্টদের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক সঙ্গীত। ১৮৭১ সালে ইউজিন পটার নামক একজন ফরাসি কমিউনিস্ট শ্রমিক এই সঙ্গীত রচনা করেন এবং বেলজিয়ামের পিয়ারে গেটার (Pierre Gayter) নামক অপর একজন শ্রমিক-সুরকার এর সুরপ্রদান করেন।

লাইসেজ ফেয়ার Laissez Faire বা যথেচ্ছাচার। সাধারণত ব্যক্তিস্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারের নামে ভালোমন্দ যা খুশি তা-ই করাকে বা করার অধিকারকে বলে লাইসেজ ফেয়ার বা যথেচ্ছাচার। এই যথেচ্ছাচারীরা দেশের প্রচলিত আইন-কানুনকে উপেক্ষা করার এবং সমাজের পক্ষে উপকারী হোক বা অপকারী হোক নিজেদের যা ইচ্ছা তা করার প্রবণতার দ্বারা পরিচালিত হয়। এর সঙ্গে গণতন্ত্রের কোনোই সম্পর্ক নেই। (যথেচ্ছাচারও দ্রষ্টব্য)

লাঠিচার্জ : কোনো মিছিলকারী, বিক্ষোভকারী, অবস্থান ধর্মঘটি বা ঘেরাওকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কর্তৃক পাইকারিভাবে লাঠিপেটা করাকেই বলে লাঠিচার্জ। এই শব্দটি বাংলা লাঠি থেকে উদ্ভূত হলেও বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত।

লায়লা খালেদ : প্যালেস্টাইন বংশোদ্ভূত লায়লা খালেদ ছিলেন একজন স্কুল-শিক্ষয়িত্রী। পরবর্তীকালে তিনি বিপ্লবী সংগঠন পি. এফ. এল. পি.-এর সদস্যা হন এবং ১৯৭০

সালে একটি ইসরাইলি বিমান হাইজ্যাক করে রাতারাতি খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেন। বিশ্বের প্রথম মহিলা হাইজ্যাকার লায়লা খালেদ ব্রিটেনে গ্রেফতার হন এবং তাঁর হাইজ্যাক মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরবর্তীকালে প্যালেস্টাইনের মুক্তি আন্দোলনে তিনি আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো অবদান রাখেননি।

লাল পতাকার বিরুদ্ধে লাল পতাকা এটি হল সমাজতন্ত্রের আলখাল্লায় সমাজতন্ত্রের ধুয়া তুলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে নস্যাৎ বা হেয় প্রতিপন্ন করে দেওয়ার একটি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশল। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা যখন উপলব্ধি করে যে, ধ্রুপদী কায়দায় পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ আর সম্ভবপর নয়, সম্ভবপর নয় শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে শুধুমাত্র গায়ের জোরে দাবিয়ে রাখা, তখনই তারা আশ্রয় নেয় বিভিন্ন অপকৌশলের। এই অপকৌশলেরই অন্যতম হল লাল পাতাকার বিরুদ্ধে লাল পতাকা উত্তোলন (Red Flag to Oppose Red Flag) করা। এই অপকৌশল অনুযায়ী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থ দিয়ে এবং বশংবদ বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের দিয়ে ভুয়া সমাজতান্ত্রিক দল বা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গড়ে তোলে। আবার অনেক ক্ষেত্রে অবস্থিত প্রগতিশীল দলের নেতৃত্বকে বা নেতৃত্বের একাংশকে ক্রয় করে কিংবা মস্তিষ্ক ধোলাই ও অন্যান্য উপায়ে চরিত্রহনন করে দলের কার্যধারা পালটে দেয়ার প্রয়াস পায়। কখনো তারা এসব কাজ করে প্রত্যক্ষভাবে, আবার কখনো করে পরোক্ষভাবে। স্বভাবতই, এরূপ ভুয়া বা বিচ্যুত সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের বিভ্রান্তিকর ও মেহনতি মানুষের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের দরুন 'সমাজতন্ত্র' ও 'সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব' ব্যাপারটাই হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যায় এবং এগুলোর প্রতি জনগণের অনীহা গড়ে ওঠে। আর এটি করতে পারলেই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের সাফল্য। একপর্যায়ে, অস্ত্রপ্রয়োগের চাইতে লাল পতাকার বিরুদ্ধে লাল পতাকা উত্তোলনকেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও বিপ্লবকে ঠেকানোর অধিকতর মোক্ষম হাতিয়ার বলে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করত। এরূপ লাল পতাকাধারী ভুয়া নেতৃত্বের বড় বড় বুলিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু সত্যিকার বিপ্লবী, ত্যাগী ও সাহসী কর্মীই নিঃশেষ হয়ে যেত, আজো যায়।

লালফিতার দৌরাত্ম্য : Red Tapism. এটা হল আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা যা স্বভাবতই যে-কোনো সিদ্ধান্তকে বিলম্বিত করে জনগণের হয়রানি ও ভোগান্তি বৃদ্ধি করে এবং জাতীয় ক্ষতিসাধন করে। কথাটি এসেছে সরকারি ফাইল বাঁধার জন্য ব্যবহৃত লাল রঙের ফিতা থেকে। এই দীর্ঘসূত্রিতা যে গণবিরোধী এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী এ-ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত।

লালফৌজ : Red Army. সমাজতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্বাধীনে গঠিত সশস্ত্রবাহিনী। ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লব এবং ১৯৪৯ সালের চীনবিপ্লবে প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে প্রধান আঘাতকারী হাতিয়ারই ছিল এই লালফৌজ। ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ারও স্ব স্ব দেশের লালফৌজ সাম্রাজ্যবাদ -উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামে বিশেষ অবদান রাখে।

লাল রক্ষী Red Guard. এরা হল রাশিয়ার সশস্ত্র কারখানা শ্রমিক, ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় সর্বপ্রথম এরূপ রক্ষিদলের সৃষ্টি হয়। ১৯১৭ সালের মার্চের দিকে শহরাঞ্চলে শৃঙ্খলারক্ষার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে এই বাহিনী পুনর্গঠন করা হয়।

এসময় এদের হাতে অস্ত্রও সরবরাহ করা হয়। বিপ্লবকালীন প্রতিটি সঙ্কটের সময় এই লাল রক্ষিবাহিনী মাঠে নামত। এরা খুব সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত না হলেও এদের বিপ্লবী উদ্দীপনা ও আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি ছিল না। এই বাহিনীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা শ্বেতরক্ষী বাহিনী গড়ে তুলেছিল।

লাল সন্ত্রাস Red Terrorism. শোষিত বা সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তি-আন্দোলনের ওপর বুর্জোয়া শাসক-শোষক গোষ্ঠী যে-নির্যাতন ও সন্ত্রাস চালায়, সেটাকে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে এবং শত্রুপক্ষকে ভীতসন্ত্রস্ত ও পর্যুদস্ত করার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরাও প্রায়শই পালটা সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। তারা শত্রুর উপর হামলা চালায়, শত্রুদের হত্যা করে, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। 'শ্বেত সন্ত্রাস'-এর বিরুদ্ধে এরূপ সন্ত্রাসকেই সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীরা 'লাল সন্ত্রাস' বলে অভিহিত করেন।

লাহোর প্রস্তাব : ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে ভারতের মুসলিমঅধ্যুষিত অঞ্চলসমূহকে নিয়ে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি এবং পূর্বাঞ্চলে আর-একটি রাষ্ট্রগঠনের কথা বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ দুই রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারটি পাশ কাটিয়ে যায় এবং পূর্বাঞ্চলে বাংলা ও আসাম প্রদেশের বদলে বঙ্গ প্রদেশের একাংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। বস্তুত লাহোর প্রস্তাবের ফলশ্রুতিতেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

লিউ শাও চি বা লিউ শাও কি (১৮৯৮-১৯৬৯)। চীনের হুনান প্রদেশের নিংসিয়াং (মাওয়ের জন্মস্থানের কাছাকাছি)-এ জন্ম। ১৬ বছর বয়সে তিনি মাও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'নয়া জনতা পাঠচক্র'-তে যোগ দেন এবং ১৯২০ সালে 'সমাজতান্ত্রিক যুবলীগ' গঠন করেন। ১৯২৭ সালের কুয়োমিনতাং নির্যাতনের সময় তিনি ও জো এন লাই কেনটন ও সাংহাইয়ের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৩০ সালে তিনি পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্যপদ লাভ করেন। কমিউনিস্টরা চীনের ক্ষমতা দখল করলে শাও চি কেন্দ্রীয় গণসরকারের ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। 'মহান উল্লম্ফন' বা 'গ্রেট লীপ ফরওয়ার্ড'-এর পর তিনি চীনের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হলে তাঁকে এবং তৎকালীন উপ প্রধানমন্ত্রী দেং জিয়াও পিং-কে পুঁজিবাদী পথের অনুসারী বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৬৭ সালে তাঁকে সমাজতন্ত্রের এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর পরিবারও হেনস্তার শিকার হন। তাঁর স্ত্রী ওয়াং গুয়াং মেইকেও মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়, যদিও তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর করা হয়নি। ১৯৬৯ সালের ১২ নেভম্বর হেনানের কাইফেং কারাগারে শাও চি মৃত্যুবরণ করেন। মাও ঝে ডঙের মৃত্যুর পর চীনে যে-পরিবর্তন ঘটে, তাতে লিউ শাও চিকে পুনরায় সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং বলা হয় যে, তিনিই ছিলেন একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট ও যাবতীয় ত্রুটির ঊর্ধ্বে। মাও-পরবর্তী চীনে তিনি এবং জো এন লাই সর্বোচ্চ সম্মানিত নেতা হিসেবে পরিগণিত হন। তিরিশের দশকে শাও চি যখন গেরিলাবাহিনীর রাজনৈতিক কমিশার ছিলেন, তখন তিনি 'কী করে ভালো কমিউনিস্ট হওয়া যায়' (How to be a Good Communist) শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন। এটিকে একসময় চীনা কমিউনিস্টদের জন্য বাইবেলের মতো জরুরি বিবেচনা করা হলেও, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় এটি বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করা হয়। পরে এই বইটি ও শাও চীর যাবতীয় রচনা অবশ্য পুনঃপ্রকাশ করা হয়।

লিংকন, আব্রাহাম : Abraham Lincoln. (১৮০৯-৬৫) কেনটাকীর এক অশিক্ষিত ও ভবঘুরে পরিবারে তাঁর জন্ম। পরে এই পরিবার ইলিনয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। প্রথম জীবনে লিংকন একটি ক্ষুদ্র দোকান চালাতেন। কিছুদিন তিনি পোস্টমাস্টার হিসেবেও কাজ করেন এবং আইন অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি স্প্রিংফিল্ডে এসে আইনব্যাবসা শুরু করেন। তিনি চারবার রাজ্য আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৫৪ সালে স্টিফেন ডগলাস কানসাস-নেব্রাস্কা আদালতের মাধ্যমে দাসপ্রথার ব্যাপারটিকে বিতর্কে নিয়ে এলে ডগলাসের বিরোধিতা করে আব্রাহাম লিংকন জাতীয় রাজনীতির সামনে চলে আসেন। ১৮৫৬ সালে তিনি রিপাবলিকান দলে যোগদান করেন এবং ১৮৫৮ সালে ডগলাসের বিরুদ্ধে সিনেটের সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ-সময় তিনি দাসপ্রথাকে আক্রমণ করে প্রচারকার্য চালান এবং ডগলাসের সঙ্গে ৭টি প্রকাশ্য বিতর্কে অবতীর্ণ হন। এই নির্বাচনে তিনি পরজিত হলেও ১৮৬০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন। তাঁর বক্তব্যের ফলশ্রুতিতে তিনি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বেই দাসঅধ্যুষিত সাতটি রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। ফলে, আমেরিকায় এক গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। ১৮৬৩ সালের পয়লা জানুয়ারি দাসপ্রথা রহিত করা হয়। অনেকেই বিদ্রোহী দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষপাতি হলেও লিংকন নমনীয় মনোভাব ও দক্ষিণাঞ্চলের পুনর্গঠনের নীতি গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ সালের গুড ফ্রাইডের রাত্রে ওয়াশিংটনের ফোর্ড থিয়েটারে একটি নাটক দেখে বেরুনোর সময় উইলকি বুথ নামক এক ব্যক্তি তাঁকে গুলি করে। পরদিন (১৫ এপ্রিল) লিংকন প্রাণত্যাগ করেন। দাস প্রথা রহিত করার পাশাপাশি গণতন্ত্রের মহান প্রবক্তা হিসেবেও লিংকন কালোত্তীর্ণ মহামানবে পরিণত হন। প্রসঙ্গত, তাঁর গেটিসবার্গের ভাষণ স্মরণযোগ্য।

লিঙ্গবাদ Sexism. আইন বা সমাজের দৃষ্টিতে লিঙ্গগতভাবে নারী বা পুরুষগণ কর্তৃক অপরপক্ষকে তুলনামূলকভাবে অযোগ্য বা নিকৃষ্ট বিবেচনা করা। বলা বাহুল্য, শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় পুরুষ কর্তৃক নারীকে হেয়, নিকৃষ্ট এবং গৃহ ও যৌনসামগ্রী হিসাবে বিবেচনা করা প্রসঙ্গে। নারীবাদীরা দাবি করেন বর্তমান সমাজব্যবস্থা পুরুষশাসিত এবং পুরুষরা নারীদের গায়ের জোরে দাবিয়ে রেখেছে। বস্তুত, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই নারী পুরুষের আইনগত অধিকার সম্পূর্ণ সমান ; কিন্তু বৈষম্যটা দেখা যায় প্রায়োগিক ক্ষেত্রে। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় নারী-পুরুষের আইনগত অধিকার সমান, কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন কোনো ক্ষেত্রেই নারীদের অবস্থান সমান নয়, উচ্চতর পদসমূহে তো নয়ই। নারীবাদ-বিরোধীদের মতে আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবেই নারী ও পুরুষ মূলত ভিন্ন ভিন্ন কাজের উপযোগী হিসাবে সৃষ্ট ; নারী ও পুরুষকে সম্পূর্ণ এককাতারভুক্ত করা অবাস্তব ও প্রকৃতিলিঙ্গবাদীদের দাবি হচ্ছে লিঙ্গ ভারসাম্য (Gender Balance)।

লিঙ্গবৈষম্যবিরোধী প্রোটকল Protocol Against Gender Dispairity. ১৯৯৯ সালের ১০ ডিসেম্বর অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বলিভিয়া, চিলি, কলাম্বিয়া, কোস্টারিকা, চেকপ্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, ইকুয়েডর, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, আইসল্যান্ড, ইতালি লিকটেনস্টেইন, লুক্সেমবুর্গ, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সেনেগাল ও সুইডেন,—এই ২২টি দেশ এই প্রোটোকলে স্বাক্ষরদান করে। উল্লেখ্য, ৬ অক্টোবর

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এই প্রোটকলের খসড়া অনুমোদন করে। এই প্রোটকল মোতাবেক লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার নারীরা নিজ নিজ দেশে অন্যায়ের প্রতিকার না পেলে, সরাসরি জাতিসংঘে অভিযোগ দায়ের করতে সমর্থ হয়েছে।

লিঙ্গসাম্য Gender Balance. এটি নারীর ক্ষমতায়ন আন্দোলনেরই অন্যতম শ্লোগান। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী শিল্প-ব্যাবসার মালিকানা, সম্পদের মালিকানা, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিয়োগ এবং পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে সমগুরুত্ব প্রদানসহ সকল ক্ষেত্রেই নারীদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের নিয়োগদান নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে বললেই চলে। যেমন, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক পদ, সর্বোচ্চ শিল্প বা ব্যবসায়িক প্রশাসনিক পদ, ম্যাজিস্ট্রেসি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি পদ প্রভৃতিতে নারীদের নিয়োগের হার একেবারেই নগণ্য। বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টেও নারী সদস্যের সংখ্যা বলতে গেলে অনুলেখ্য। অতএব, লিঙ্গসাম্যবাদীদের দাবি হচ্ছে এই যে, নারীরা যেহেতু পুরুষদের মতোই মানুষ, সেহেতু রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সকল পর্যায়ে নারীদের সমসুযোগ, সমনিয়োগ ও সমঅধিকার দিতে হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহও (NGOs) এ-ব্যাপারে অত্যন্ত সোচ্চার।

লিঞ্চ আইন Lynch Law. দেশের প্রচলিত আইন বা আদালতের ধার না ধেরে নিজেই অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণকে বলে লিঞ্চ আইন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া রাজ্যের জন লিঞ্চ (১৭৩৬-৯৬) নামক একজন ধনী কৃষক আইন-আদালতের কোনো তোয়াক্কা না করে নিজেই পলাতক নিগ্রো ক্রীতদাস ও নিগ্রো অপরাধীদের হত্যা করার মাধ্যমে শাস্তি দিত। তারই নামানুসারে এই 'লিঞ্চ আইন'-এর উৎপত্তি। তখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, বিশেষত এর দক্ষিণ অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গরা মার্কিন সভ্যতা বজায় রাখার অজুহাতে নিগ্রোদের অমানুষিক শাস্তি দিত এবং হত্যা করত। এই শাস্তি ও হত্যাকাণ্ডই 'লিঞ্চ ল' বলে কুখ্যাতি অর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে 'লিঞ্চ আইন' কোনো আইন নয়—এটা হল আইনের প্রতি তোয়াক্কা না করে নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া।

লিলি শান লাইন ১৯৩০ সালে জুন মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তৎকালীন সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা লিলি শানের নেতৃত্বে যে বাম সুবিধাবাদী লাইন অনুসৃত হয়, সেই লাইনই লিলি শান লাইন নামে খ্যাত। এই লাইনের অনুসারীরা বিপ্লবের জন্য আপামর জনগণকে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। মাও ঝে ডং দীর্ঘদিন ধরে দেশব্যাপী গ্রামীণ ঘাঁটি গড়ে তোলার মাধ্যমে শহরগুলোকে ঘেরাও করার যে তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন, লিলি শানরা সেটাকেও ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেন। সর্বোপরি, তাঁরা সর্বত্র তাৎক্ষণিক অভ্যুত্থানের সপক্ষে মতামত দেন। এই লাইন অনুযায়ী লিলি শান বিভিন্ন শহরে যুগপৎ অভ্যুত্থান ঘটানোর এক নীলনকশা প্রণয়ন করেন। লিলি শান চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, দুএকটা শহরে বিজয় লাভ করা গেলেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় সূচিত হবে। মাও ঝে ডং এই লাইনকে 'বাম হটকারিতা' বলে অভিহিত করেন। পার্টির ব্যাপক সদস্যেরা এই ভুল লাইন বর্জনের আহ্বান জানান। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় প্ল্যানারি সেশানে লিলি শান তাঁর ভুল স্বীকার করেন এবং পার্টি নেতৃত্ব ত্যাগ করেন।

পরবর্তীতে লিলি শান তাঁর ভুল সংশোধন করলে পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে তাঁকে পুনরায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয়।

লীগ অব নেশনস League of Nations. প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তির শর্তানুযায়ী এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি গঠিত হয় (১৯২০)। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে লীগ অব নেশনস বিলুপ্ত হয়ে যায়। লীগ অব নেশনস-এর মূল ভিত্তি ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন-এর ১৪ দফা। কিন্তু, মার্কিন কংগ্রেসই ভার্সাই চুক্তি অনুমোদন করতে এবং লীগের সদস্য হতে অস্বীকার করে। লীগের বিধান অনুযায়ী সাব্যস্ত হয় যে, কোনো দেশ লীগের কাছে নালিশ না জানিয়ে অন্য কোনো দেশ আক্রমণ করতে পারবে না। নালিশ জানানোর পর লীগ ছয় মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিতে না পারলে, সেই ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার তিন মাস পর সংশ্লিষ্ট দেশ ইচ্ছা করলে অন্য দেশটি আক্রমণ করতে পারবে। জাতিসংঘ ও লীগের উদ্দেশ্য মূলত একই হলেও এদের মৌল পার্থক্য ছিল শান্তির প্রতি হুমকিকে মোকাবেলার পদ্ধতিতে। লীগ এজন্য নিজের যোগ্যতা বা ক্ষমতার ওপর নির্ভর করত না, নির্ভর করত সদস্যগণ কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে লীগ-বিধি মেনে চলার ওপর। কিন্তু, জাতিসংঘের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক দায়িত্বই হল সংঘের নিজ উদ্যোগে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা। জাতিসংঘ আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ (যদিনা কোনো স্থায়ী সদস্য তার ওপর ভেটো দিয়ে বসে)। কিন্তু লীগ অব নেশনস তা পারত না। তা ছাড়া, একটি বৃহৎ শক্তি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) লীগ অব নেশনসে যোগদানই করেনি; অপর একটি বৃহৎ শক্তি (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ছিল বিপুলভাবে সমালোচিত; আরও দুটি শক্তি (ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য)-র সমর্থনও ছিল আধাকাঁচড়া। অপর তিনটি দেশ (জার্মানি, ইতালি ও জাপান) লীগ সনদের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করেছিল। ফলে, লীগ কার্যত তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিল।

লুক্সেমবার্গ, রোজা (১৮৭০-১৯১৯) পোল্যান্ডে তাঁর জন্ম। কিন্তু ১৮৯৫ সালে জনৈক জার্মান শ্রমিককে বিয়ে করে তিনি জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সমকালীন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে রোজা লুক্সেমবার্গ ছিলেন এক স্বকীয়তাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি পোল্যান্ড এবং লিথুয়ানিয়ার সমাজতান্ত্রিক গ্রুপসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। কার্ল লিবনেখট-এর সঙ্গে তিনি জার্মান স্পার্টাকাস লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। গোটা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাঁকে কারাবন্দি করে রাখা হয়। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ব্যাপারে তিনি তেমন একটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। আবার, চরমপন্থিদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা ছিল প্রতিরোধাত্মক। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মান কর্তৃপক্ষ তাঁকে এবং লিবনেখটকে গ্রেফতার করে এবং ১৯১৯ সালের ১৫ জানুয়ারি অত্যন্ত বর্বরতার সঙ্গে হত্যা করে।

লুডাইট আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডে এই আন্দোলন শুরু হয়। নতুন নতুন যন্ত্রের প্রচলন ক্রমবর্ধমান হারে শ্রমিকদের বেকারে পরিণত করে বিধায়, রাগান্বিত শ্রমিকেরা নতুন যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলা বা ক্ষতিগ্রস্ত করার আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন নেড লুড। তাঁরই নাম থেকে এই আন্দোলনের এই নামকরণ। লুডাইটরা ইয়র্কশায়ার, ল্যাঙ্কাশায়ার ও নটিংহামশায়ারে যন্ত্র

ভাঙা, যন্ত্র পোড়ানো ও কারখানা জ্বালানো শুরু করে। ১৮১১ থেকে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন চালু থাকে। কিন্তু শ্রমিকরা ক্রমশ উপলব্ধি করে যে, এরূপ আন্দোলনের দ্বারা প্রযুক্তিগত উন্নতিকে বাধা দেওয়া যায় না। তারা আরও বুঝতে পারে যে, তাদের বেকারত্বের জন্য যন্ত্র দায়ী নয়, দায়ী শিল্পের মালিক পুঁজিপতি। ফলে, এই আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়।

লুথার, মার্টিন Martin Luther (১৪৮৩-১৫৪৬), খ্রিষ্টীয় ধর্মসংস্কার (Reformation)-এর নেতা এবং প্রটেস্টান্ট (Protestant) ধারার প্রতিষ্ঠাতা। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর মতবাদ জার্মানির আধ্যাত্মিক জগৎকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর বাইবেলের অনুবাদ জার্মান ভাষার গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। 'চার্চ এবং ধর্মযাজকরাই হল ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী'—লুথার ক্যাথলিক পোপদের এই দাবির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি বলেন যে, মানুষের মুক্তি 'ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান' ও রহস্যবাদের মধ্যে নয়, বরং মুক্তি সরল বিশ্বাসে মধ্যে। তিনি আরও বলেন যে, ধর্মীয় সত্যও পোপ বা ধর্মযাজকের অনুশাসনের মধ্যে নয়, বরং গসপেলের মধ্যে নিহিত। মার্টিন লুথারের এই মতবাদ প্রাথমিক যুগের বুর্জোয়া বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে চার্চ এবং সামন্তবাদী আদর্শের সংঘাতকে প্রকট করে তোলে। তিনি জার্মান বার্গারদের অর্থসম্পদসম্পর্কিত স্বার্থেরও বিরোধিতা করেন, প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বের সমালোচনা করেন এবং বুর্জোয়া মানবতা ও অবাধ বাণিজ্যনীতির বিরুদ্ধেও মতপ্রকাশ করেন। ১৫২৫ সালের কৃষকযুদ্ধের সময় তিনি শাসকশ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করেন।

লুমুম্বা, প্যাট্রিস : আফ্রিকার বেলজিয়ান কঙ্গোর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বা। আন্দোলনের ফলে ১৯৬০ সালের জুন মাসে বেলজিয়ানরা কঙ্গোর স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হলে, প্যাট্রিস লুমুম্বা দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু অচিরেই দেশে ভয়াবহ উপজাতীয় কোন্দল দেখা দেয়। কাতাঙ্গা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোশে শোম্বে কাতাঙ্গার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। উপজাতীয় কোন্দলের সুযোগে বেলজিয়ানরা পুনরায় কঙ্গোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। এই গৃহযুদ্ধের একপর্যায়ে মার্কিন সমর্থক সেনাবাহিনী প্রধান জোসেফ কাশাভুবু রুশপন্থি লুমুম্বাকে হত্যা করেন। এ-ঘটনা ঘটে ১৯৬১ সালে।

লুম্পেন Lumpen বা ভবঘুরে। এরা সর্বহারা বটে, কিন্তু এরা কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত নয়। এদের না আছে কোনো নির্দিষ্ট পেশা, না আছে নির্দিষ্ট ঠিকানা। এদের অনেকেই ভিক্ষুক, চোর, ডাকাত বা অন্যান্য সমাজবিরোধী ও অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত। উৎপাদনযন্ত্রের সঙ্গে যে-সম্পর্ক শ্রমিককে বিপ্লবীতে রূপান্তরিত করে, এদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। ফলে, এরা কখনোই বিপ্লবী নয়, এরা বড়জোর ভাড়াটে হিসেবে খাটতে পারে মাত্র। মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে এদের অভিহিত করেছেন সমাজের আবর্জনা স্বরূপ, পুরানো সমাজ গহ্বরের নিম্নতম স্তর থেকে উৎক্ষিপ্ত অকর্মণ্য পূতিগন্ধময় এক বিরাট দঙ্গল হিসাবে। শ্রমিকবিপ্লবের স্রোত বেয়ে এরা এখানে-ওখানে আন্দোলনে ঢুকে পড়তে পারে। এদের জীবনধারণের অবস্থা এমনই যে এরা অতি সহজেই প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রকারীদের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হতে পারে।' অথচ নৈরাজ্যবাদীরা লুম্পেনদেরই সবচেয়ে বেশি বিপ্লবী বলে

বিবেচনা করে। বর্তমান যুগেও বস্তিবাসী, ভবঘুরে ও টোকাই জাতীয় লুম্পেনরা পয়সা পেলে যে-কোনো রাজনৈতিক দল বা গ্রুপেরই ভাড়া খাটে।

লেচ ওয়ালেসা পোল্যান্ডের গঠনতন্ত্রপন্থি শ্রমিকনেতা লেচ ওয়ালেসা ১৯৬৭ সাল থেকেই ছিলেন গদানস্ক শিপইয়ার্ডের একজন শ্রমিক, ইলেট্রিশিয়ান। তিনি ১৯৭০ সাল থেকেই কমিউনিস্ট একনায়ক জেরুজালেস্কির সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যান। তাঁর এই অকুতোভয় ভূমিকার জন্য তাঁকে ১৯৮৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। অংশত বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের ধ্বংসপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার জন্য এবং অংশত লেচ ওয়ালেসার নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের তীব্রতার জন্য, ১৯৮৯ সালে পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটে। পরবর্তী নির্বাচনে লেচ ওয়ালেসা বিপুল ভোটাধিক্যে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু, প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে এবং পরবর্তী নির্বাচনে তিনি সাবেক কমিউনিস্ট সরকারেরই তরুণ সদস্য আলেকসান্ডার কোয়াসনিউকি-র কাছে পরাজিত হন। পরাজয়ের পর তিনি পুনরায় তাঁর পূর্ব কর্মস্থল গদানস্ক শিপইয়ার্ডে ফিরে গিয়ে সেই ইলেকট্রিশিয়ানের পদে (বেতন মাসিক ৩৩০ ডলার) যোগদান করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

লেনদেনের ভারসাম্য Balance of Trade. এটা হল কোনো-একটি দেশের রফতানিবাবদ আয় এবং আমদানিবাবদ ব্যয়ের মধ্যকার ভারসাম্য। এই ভারসাম্যের প্রধান বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ হলেও এর অনেকগুলো বিষয় পরোক্ষ। যেমন, একটি দেশ বিদেশী ঋণের যে-সুদ প্রদান করে এবং স্বদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া ট্যুরিস্টরা বিদেশে গিয়ে যে-অর্থ খরচ করেন এ-সমস্ত ব্যয় এবং এ-জাতীয় আরও অন্যান্য খাতে ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রাকে অদৃশ্য বা পরোক্ষ আমদানি বলে গণ্য করা হয়। অপরদিকে, একটি দেশ বিদেশ থেকে আগত ট্যুরিষ্টদের ব্যয়, অন্যান্য দেশে প্রদত্ত ঋণবাবদ আদায়কৃত সুদ, জাহাজভাড়াবাবদ আয় ইত্যাদির মাধ্যমে যে-বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়, সেটাকে পরোক্ষ রফতানি বলে গণ্য করা হয়। যখন রফতানির তুলনায় আমদানি বেড়ে যায়, অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তখন লেনদেনের ভারসাম্য প্রতিকূল বলে বিবেচনা করা হয়।

লেনিন, ভ্লাদিমির ইলিচ : (১৮৭০-১৯২৪), মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মতবাদের উত্তরসূরী, রুশ ও আন্তর্জাতিক সর্বহারাদের নেতা এবং রুশ কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯১ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইনে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। এসময় তিনি স্থানীয় মার্কসবাদীদের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৮৯৪ সালে 'জনগণের বন্ধু কারা এবং তারা কীভাবে সোস্যাল ডেমোক্রেটদের বিরুদ্ধে লড়াই করে' শীর্ষক রচনায় তিনি নারোদবাদীদের ভুল তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দেন। অচিরেই তিনি স্থানীয় মার্কসবাদীদের সংঘবদ্ধ করেন এবং বন্দি হয়ে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ১৮৯০ সালে তিনি দেশত্যাগ করেন এবং বিদেশ থেকে 'ইসক্রা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই বহুলপ্রচারিত পত্রিকা রাশিয়ায় মার্কসবাদী সংগঠন নির্মাণে বিরাট ভূমিকা পালন করে। ১৯০৩ সালে রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বলশেভিক পার্টির জন্ম হলে, তিনি এ-দলের নেতৃত্বে চলে আসেন। তাঁর নেতৃত্বে এই দল ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে বিশ্বইতিহাসের প্রথম সফল

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে। পরিবর্তিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তাধারাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর'। (Imperialism Highest State of Capitalism)। এতে তিনি সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের গতিপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। ইতঃপূর্বে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'বস্তুবাদ ও হাতুড়ে সমালোচনা' (Materialism and Empirio Citicism) গ্রন্থে তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞানের সর্বশেষ বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদী দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ তুলে ধরেন। 'দার্শনিক নোটবই' (Philosophical Notebook)-এ তিনি দ্বান্দ্বিকতার ও মার্কসের 'ক্যাপিটাল'-এর আলোকে মূল্যবান চিন্তাধারা হাজির করেন। পরবর্তীকালে ৪৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর রচনাসমূহ। এসব রচনায় তিনি অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, দর্শন, সংস্কৃতি, বিপ্লবের কায়দা ও কৌশল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' (State and Revolution) গ্রন্থে তিনি শ্রেণী, শ্রেণীসংগ্রাম, রাষ্ট্র ও বিপ্লবের সমস্যাবলী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে জনগণের ভূমিকা, সাম্যবাদী সমাজের নির্মাণ, জনগণ, পার্টি ও নেতৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে অবদান রাখেন। বস্তুত বর্তমানে অধিকাংশ মার্কসবাদীরা মার্কসবাদ বলতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকেই বুঝিয়ে থাকেন।

লেবেন্‌স্‌রম : Lebensraum. এই জার্মান শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বাঁচার জন্য জায়গা'। জার্মান জাতীয়তাবাদীরাই এই স্লোগান তোলে। ১৯৩৩-৪৫ সালে হিটলারের আমলে এই স্লোগান প্রবলরূপ ধারণ করে। এই স্লোগানটি ব্যবহৃত হত মূলত নিম্নলিখিত দুটি প্রেক্ষিতে ১. জার্মানির কথিত উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা, যাদের খাদ্য উৎপাদনের জন্য দেশের পরিধি বৃদ্ধি করা অপরিহার্য এবং ২. জার্মানির প্রতিবেশী এলাকা, বিশেষত পূর্ব ইউরোপকে স্বীয় প্রভাববলয়ের অন্তর্ভুক্ত করার জার্মান দাবি।

লোকায়ত অধিকাংশ মনীষীর মতে, লোকায়ত বা চার্বাক দর্শনের প্রণেতা হলেন মহর্ষি চার্বাক। এই দর্শন অনুযায়ী প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র পথ এবং যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তা সত্যও নয়। লোকায়ত দর্শন ঈশ্বর, আত্মা, কর্মফল ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে না। এই দর্শন আত্মসুখবাদের দর্শন। এই দর্শন অনুযায়ী ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের একমাত্র কাম্য। চার্বাকের মতে সকল জড়বস্তু ও জীবদেহের উপাদান হল চারটি—ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (আগুন) ও মরুৎ (বাতাস)। প্রত্যেক দ্রব্যই কতগুলো পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। পরমাণুর বিশেষ ধরন ও পরিমাণের ওপর বস্তুর গুণাবলী নির্ভর করে। চেতনা দেহের অতিরিক্ত কিছু নয়; বরং তা দেহেরই একটি গুণ। চেতনা এবং ইন্দ্রিয় বিভিন্ন পরমাণুর বিশেষ সংমিশ্রণেরই ফল। জীবের মৃত্যুর পর এ-সমস্ত পরমাণু জড় প্রকৃতিতে অবস্থিত সমধরনের পরমাণুর সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। আত্মা বলে কিছুই নেই। সুতরাং আত্মার অমরত্বের প্রশ্নও অবান্তর। দেহঅবসানেই জীবনের পরিসমাপ্তি। মৃত্যুর পর আর কিছুই নেই। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের ক্রিয়ার ফলেই জগতের সৃষ্টি। স্বর্গ-নরক বলেও কিছু নেই। সুতরাং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও বৃথা। যে-কাজে দুঃখের তুলনায় সুখ বেশি সে-কাজ ভালো আর যে-কাজে দুঃখ অধিক সে-কাজ মন্দ। ভাববাদ ও আস্তিকতা-অধ্যুষিত সমাজে লোকায়ত দর্শন ছিল এক মূর্তিমান বিদ্রোহ। সেকালে এরূপ চিন্তার উদ্ভব রীতিমতো বিস্ময়কর।

লৌহ যবনিকা Iron Curtain. লৌহ যবনিকা বলতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউরোপীয় কমিউনিস্ট দেশসমূহের তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার ব্যবস্থাকে বোঝানো হত। এই কমিউনিস্ট দেশসমূহে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার যে-সীমাবদ্ধতা, অভ্যন্তরীণ যাবতীয় ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা এবং বিদেশে যাতায়াত ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে নাগরিকদের ওপর যে-কঠোর বিধিনিষেধ ছিল, সেটার প্রতি ইঙ্গিত করে অকমিউনিস্ট বিশ্ব এই শব্দটি ব্যবহার করত। মুক্তবিশ্বের অভিযোগ ছিল যে, এই কমিউনিস্ট দেশগুলোর অভ্যন্তরে কী ঘটছে, তা এই লৌহ যবনিকার দ্বারা বাকি বিশ্বের কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হত।

ল্যাটিন আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাসহ কতিপয় ইংরেজি ও ফরাসিভাষী অঞ্চল ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের তাবৎ অঞ্চলই সাধারণভাবে ল্যাটিন আমেরিকা বলে পরিচিত। ল্যাটিন আমেরিকাভুক্ত অঞ্চল একসময় স্পেন, ফ্রান্স বা পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল। মেক্সিকো, কিউবা, হাইতি, ডোমিনিকান রিপাবলিক, হন্ডুরাস, ভেনিজুয়েলা, গুয়াতেমালা, এল সালভাডর, নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা, পানামা, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু, ব্রাজিল, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, চিলি, উরুগুয়ে আর্জেন্টিনা ইত্যাদি ল্যাটিন আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত। ল্যাটিন আমেরিকাভুক্ত দেশসমূহের কাছে মার্কিন বিপ্লবের চাইতে ফরাসি বিপ্লবই অধিকতর প্রেরণাদায়ক। এসব অঞ্চলকে ল্যাটিন আমেরিকা বলার কারণ এই যে, এদের জনগণ মুলত ল্যাটিন ভাষাভাষী।

॥ শ ॥

শক্তিতত্ত্ব : Theory of Force. ড্যুরিং, কার্ল কাউটস্কি, কার্ল মার্কস প্রমুখ দার্শনিক এই তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন। এই তত্ত্বানুযায়ী, অধিকতর শক্তিশালী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠী স্বীয় শক্তির বলে দুর্বল বা তুলনামূলকভাবে কম শক্তিশালী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য কায়েম করেছে, তাদের দাবিয়ে রেখেছে, তাদের শোষণ করছে এবং নিপীড়ন চালাচ্ছে। এই তত্ত্বানুযায়ী শক্তিই ক্ষমতার নিয়ামক; আইনকানুন ইত্যাদিও আসলে শক্তিমানেরই স্বার্থের হাতিয়ার। এই তত্ত্ববাদীরা বিশ্বাস করেন যে, যে-কোনো শোষক, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বা ব্যবস্থা টিকে থাকে শক্তির বলে; সুতরাং তাকে উৎখাত করাও অধিকতর শক্তিপ্রয়োগ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে সম্ভবপর নয়।

শক্তির ভারসাম্য Balance of Power. ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হিসাবে ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৮৭১ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইতালি ত্রয়ীজোটের বিরুদ্ধে ব্রিটেন ব্রিটিশ-ফরাসি-রুশ ত্রিপক্ষীয় আঁতাত গড়ে তোলে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর শক্তির ভারসাম্য বিশ্বরাজনীতি ও কূটনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বস্তুত শক্তির ভারসাম্যের তত্ত্বানুযায়ী প্রতিপক্ষ বা বিরুদ্ধবাদী শক্তির সমান শক্তিঅর্জনের মাধ্যমেই আগ্রাসন বন্ধ এবং শান্তি বজায় রাখা সম্ভবপর। শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বানুযায়ী শক্তি বলতে কোনো দেশের নিজস্ব সামরিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাববলয়, মিত্রত্বের পরিধি এবং সমগ্র মিত্রজোটের সামরিক শক্তিকেও বোঝানো হয়। বর্তমান বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া।

এই দু রাষ্ট্রই চাইছে একে অপরের ধ্বংসক্ষমতা এবং প্রভাববলয়কে অতিক্রমের মাধ্যমে আপন-আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে। যখনই একজনের অস্ত্র ও প্রভাব বাড়ছে, অপরজন তখনই ভারসাম্যের স্বার্থে নিজের অস্ত্রশক্তি বৃদ্ধি করছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত গতিতে চলতে চলতে উভয় পক্ষে এমন ধ্বংস ক্ষমতা গড়ে উঠেছে, যা দিয়ে অগণিত বার গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভবপর। শক্তির এই ভারসাম্যের প্রতিযোগিতায় বেধে যাচ্ছে আঞ্চলিক যুদ্ধ, সৃষ্টি হচ্ছে উত্তেজনা, দেশে দেশে ঘটছে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, তীব্রতর হচ্ছে স্নায়ুযুদ্ধ। শুধু আদর্শ নয়, অনেক ক্ষেত্রে বাজারের প্রতিযোগিতা ও অর্থনৈতিক বিষয়ও শক্তির ভারসাম্যের কূটনীতিকে তীব্রতর করে দিচ্ছে। এজন্য, অনেক ক্ষেত্রে ভারসাম্যের আওতায় ঘটছে উপ-ভারসাম্য। দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন শক্তি ও সমীকরণ। যেমন, চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিহত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত মিত্রতার পথ বেছে নিয়েছিল। পেট্রোডলারের শক্তিতে শক্তিমান তেলউৎপাদনকারী দেশসমূহও এখন শক্তির ভারসাম্যে নিজেদের অবদান রাখার প্রয়াস পাচ্ছে। পাকিস্তান ও ভারতের আণবিক শক্তি অর্জনও এরূপ ভারসাম্যের প্রতিযোগিতাপ্রসূত। শক্তির ভারসাম্যের রাজনীতিই বর্তমান বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাবলীর প্রধান নিয়ামক।

শত ফুল ফুটতে দাও ১৯৫৭-৫৮ সালে মাও ঝে ডং-এর নেতৃত্বে চীনে 'শত ফুল ফুটতে দাও' বা 'Let Hundred Flowers Blossom' আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনের মূলকথা ছিল যে, যে-কারও যে-কোনো চিন্তা বা মতবাদকে প্রকাশ করার অধিকার দেওয়া উচিত। কেউ-কেউ মনে করেন যে, কঠোর সমাজতান্ত্রিক বিধিবদ্ধতা ও একপেশে অবস্থা থেকে সমাজকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। আবার কেউ-কেউ মনে করেন যে, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সমাজতন্ত্রের শত্রু, বিভ্রান্ত ও বিচ্যুতদের চিহ্নিত করা, যাতে পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সমাজতন্ত্রকে বিপন্মুক্ত করা যায়।

শস্য-আইন Corn Law. ১৮০৪ সালে ব্রিটেনে সর্বপ্রথম এই আইন পাশ হয়। ভূস্বামীরা (পার্লামেন্টে যাদের আধিপত্য ছিল একচ্ছত্র) তাদের মুনাফা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে আমদানিকৃত শস্যের ওপর উচ্চ শুল্ক ধার্য করে প্রথম শস্য-আইন পাশ করিয়ে নেয়। যুদ্ধ এবং তৎকালীন মহাদেশীয় ব্যবস্থার দরুন প্রথম শস্য-আইন তেমন একটা বাধা পায়নি। কিন্তু, ১৮১৪ সালে একটি সরকারি কমিটি এই মর্মে সুপরিশ করে যে, কেবলমাত্র এক কোয়ার্টার শস্যের মূল্য ৮০ শিলিং-এ উঠে গেলেই শস্যশুল্ক প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এই ভিত্তিতে ১৮১৫ সলে দ্বিতীয় শস্য-আইন পাশ হয়। ১৮২৮ সালে খাদ্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে ব্রিটেনের তৎকালীন বাণিজ্য সচিব (বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেন্ট) হাসকিনসন জনগণের দুর্দশা লাঘবার্থে আমদানিকৃত শস্যের মূল্যানুপাতে ব্যতিক্রমশীল শুল্ক আরোপের উদ্যোগ নেন। ১৮৩৯ সালের বাণিজ্যমন্দা, তৎপরবর্তীতে শস্যের ফলনহ্রাস এবং আয়ারল্যান্ডে আলুর দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদির ফলে অবস্থার অবনতি ঘটায় শস্য-আইনবিরোধী লীগের আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায়, প্রধানমন্ত্রী পিল ১৮৪২ সালে হাসকিনসনের শুল্ককাঠামোর পুনর্বিন্যাস করেন এবং ১৮৪৬ সালে শস্য-আইন বাতিল

করে দেন, যদিও লর্ড জর্জ বেন্টিং ও ডিজরেলির নেতৃত্বে তাঁর দলেরই একটা বিরাট অংশ শস্য-আইন বাতিলের ঘোরতর বিরোধী ছিল।

শস্য-আইনবিরোধী লীগ : ইংল্যান্ডে কৃষকদের বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করার জন্য শস্য-আইন পাশ করা হয় এবং ফলে রুটির দাম বেড়ে যায়। তাই এর বিরুদ্ধে ১৮৩৮ সলে মাঞ্চেস্টার থেকে শুরু হয় আন্দোলন। জন ব্রাইড ও রিচার্ড কবডেন ছিলেন এর নেতা। উঠতি পুঁজিপতিরা এই আন্দোলনকে সমর্থন দান করে এজন্য যে খাদ্যশস্যের দাম কমলে তারাও শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে রেহাই পাবে। ১৮৪৬ সালে শস্য-আইন বতিল হলে এই লীগ ভেঙে যায়। এই আইন বতিলের মাধ্যমে ইংল্যান্ড অবাধ বাণিজ্যের দিকে প্রথম পদক্ষেপ প্রদান করে।

শাইনিং পাথ Shining Path. পেরুর মাওবাদী গেরিলা সংগঠন। এর প্রধান ওসকার র‍্যামিরেজ ডুরান্ড। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ গেরিলা গ্রুপ বলে কথিত শাইনিং পাথ পেরুর স্বৈরশাসক আলবার্টো ফুজিমোরির সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান Peaceful Coexistence. বিভিন্ন মতবাদ বা ব্যবস্থাসম্পন্ন দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতমুক্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপশি অবস্থান করার নীতি। এই নীতি অনুযায়ী এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না এবং কোনো কৌশলেও স্বীয় মতবাদ অন্য রাষ্ট্রের জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে না। সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার স্বার্থে লেনিন সর্বপ্রথম এই নীতির কথা বলেন। পরবর্তীকালে অনেকেই এই নীতির কথা বলতেন। পঞ্চশীলা নীতিও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ভিত্তিতেই বিরচিত হয়েছিল।

শাসনতান্ত্রিকতা Constitutionalism. এমন অবস্থা, যে-অবস্থায় দেশের শাসনতন্ত্র আপামর জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতেই রচিত হয় এবং যে-অবস্থায় শাসনতন্ত্রের বিধিমালার বাইরে কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর কোনোকিছুই করার সুযোগ বা ঝোঁক থাকে না।

শিয়া : মুসলমান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ সম্প্রদায়। হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর মৃত্যুর পর হজরত আলি (রা)-ই ন্যায়ত ও ঐশীভাবে তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন—এটাই শিয়াদের অভিমত। মুসলিম উম্মা ও মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্বের প্রশ্নে সুন্নিদের মত ছিল এই যে, মত প্রকাশ করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিই রাসুল (সা)-এর উত্তরাধিকারী বা খলিফা হবেন এবং তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভব হবেন। এই চিন্তা অনুযায়ী সুন্নিরা প্রথম চার খলিফাকে যথার্থ বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু শিয়ারা গণসমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচিত খলিফার আনুগত্য স্বীকার করতে রাজি হন না। তাঁদের মত হল এই যে, শুধুমাত্র আহলুল বয়াত (নবীর পরিবার), অর্থাৎ হজরত আলি (রা) ও ফতিমা (রা)-এর বংশধরেরাই ইমামতের একমাত্র অধিকারী। এই মতানুযায়ী প্রত্যেক ইমাম তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী বা ইমাম মনোনীত করে যাবেন। শি' আতুল আলি বা আলির দল থেকেই সংক্ষেপে "শি' আ" কথাটির প্রচলন। শিয়ারা ইমামের মধ্যে আল্লাহ্‌র নূরের অংশ আছে বলে বিশ্বাস করেন। শিয়াদের ধর্মবিশ্বাস নিম্নরূপ ১. আল্লাহ্-য় বিশ্বাস ২. অনাদি অসৃষ্ট কুরআনে বিশ্বাস এবং ৩. আল্লাহ্‌র বিশেষভাবে

মনোনীত ও তাঁর সত্তার অংশীদার ইমামই রাসুল (সা) মুক্তির একমাত্র পথপ্রদর্শক, পরবর্তীকালে এই বিশ্বাস। শিয়াদের মতে ইমাম দেহত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁর ইলাহি সত্তা পরবর্তী ইমামের দেহে সঞ্চালিত হয়। অবশ্য শিয়াদের মধ্যেও বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে।

শির্ক্ সর্বশক্তিমান, সর্বস্রষ্টা, সর্বনিয়ন্তা, সর্বদ্রষ্টা, সদাসর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ্‌র সঙ্গে অপর কাউকে বা কোনোকিছুকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শরিক বা অংশীদার করাকেই বলে 'শির্ক্'। যেমন, আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও সার্বভৌমত্ব আছে, অপর কারও মৌল বিধান বা হুকুম দেওয়ার এখতিয়ার আছে, অপর কারও কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা আছে—এরূপ বিশ্বাস করা শির্ক্-এর অন্তর্গত। এক কথায় আল্লাহ্‌র তৌহিদ, ক্ষমতা ও এখতিয়ারে অন্য কারও সামান্যতম শরিকানা আছে মনে করাও শির্ক্। যেমন, কোনো নেতা, পির বা মহাপুরুষ ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন মনে করা শির্ক্ পর্যায়ভুক্ত। শির্ক্ মহাপাপ এবং শির্ক্‌কারী ইসলাম থেকে বিচ্যুত।

শিল্পবিপ্লব Industrial Revolution. এটি প্রথমে শুরু হয় ইংল্যান্ডে (১৭৫০-১৮৫০), তারপর সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত স্টীম ইঞ্জিনের আবির্ভাবের দরুন বৃহদাকার শিল্পকারখানা স্থাপন সম্ভবপর হয়ে ওঠে এবং ফলে ১. উচ্চতর প্রযুক্তির কারণে বৃহৎ শিল্পে শ্রমশক্তির প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে কম পড়ে এবং পণ্যের উৎপাদনমূল্যও তুলনামূলকভাবে কম পড়ে বিধায় এসব বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে; ২. বৃহৎ শিল্পের জন্য একদিকে প্রয়োজন পড়ে বিপুলপরিমাণ কাঁচামালের, অপরদিকে প্রয়োজন পড়ে বিপুলপরিমাণ উৎপাদিত পণ্যবিক্রয়ের জন্য বৃহত্তর বাজারের। তাই কাঁচামাল সংগ্রহ ও পণ্য বিক্রয়ের জন্য শিল্পোন্নত দেশসমূহকে হাত বাড়াতে হয় অন্যান্য দেশ, বিশেষত অনুন্নত দেশসমূহের দিকে; ৩. শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজে ধনী শিল্পপতি বা বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে এবং তাদের ধনসম্পদ ও সামাজিক প্রতিপত্তির সামনে সামন্ত প্রভুরা হীনবল ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে। শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতিতেই বিকাশ ঘটে পুঁজিবাদের, যা ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া-সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করে। শিল্পবিপ্লব স্থানীয় বিশ্বকে দ্রুত আন্তর্জাতিক বিশ্বে রূপান্তরিত করে। তা ছাড়া এই বিপ্লবের ফলে শিল্প সর্বহারা শ্রেণীরও সৃষ্টি হয়—যাদেরকে মার্কসীয় দর্শনানুযায়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌল শক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। শিল্পবিপ্লবের জন্য আদর্শ পূর্বশর্ত হল ১. পর্যাপ্ত পুঁজি ২. সামন্তবাদী ভূমি দাসত্বের কবলমুক্ত স্বাধীন শ্রমিক ৩. অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী বাজার ৪. লোহা ও কয়লা সম্পদ ৫. প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি এবং ৬. প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যোগাযোগের সুবিধা।

শিল্পায়ন Industrialisation. সামন্তব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করে সারা দেশে শিল্পকারখানার বিস্তারসাধন এবং নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে তুলে কৃষিপ্রধান দেশকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা। বলাবাহুল্য শিল্পায়নই হল পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া বা পশ্চিমা গণতন্ত্রের মৌল নিয়ামক।

শিল্পীয় গণতন্ত্র Industrial Democracy. এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় শিল্প ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকরাও অংশগ্রহণ করে।

শিল্পীয় রিজার্ভবাহিনী Industrial Reserve Force. বেকার শ্রমিকদেরই এই নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সর্বদাই বিপুলসংখ্যক শ্রমিক বেকার অবস্থায় থাকলে, মালিকরা এদের নিয়োগের ভয় দেখিয়ে কর্মরত শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারে। কর্মরত শ্রমিকরা যখনই বেতন বৃদ্ধি বা অন্য কোনো দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করে, মালিকরা তখন তাদের ছাঁটাই করে দিয়ে ওই বেকার শ্রমিকদের নিয়েগের মাধ্যমে কাজ চালানোর চেষ্টা করতে পারে। এই ভয়ে কর্মরত শ্রমিকরা অনেক সময় আন্দোলনে দ্বিধাগ্রস্ত হয় বা আন্দোলন শুরু করলেও পিছিয়ে আসে। বেকার শ্রমিকবাহিনী শ্রমিকদের ঐক্য ও আন্দোলনের অন্তরায়।

শীর্ষবৈঠক : Summit Conference. কোনো বিরোধ বা মীমাংসা বা কোনো যৌথ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা সরকার-প্রধানদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠককেই বলা হয় শীর্ষবৈঠক বা শীর্ষ সম্মেলন।

শুল্ক দেওয়াল : Tariff Wall. এটি হল কোনো আমদানিকৃত পণ্যের ওপর এমন অধিক হারে আমদানি শুল্ক ধার্য করা, যাতে ওই পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত হয় এবং স্বদেশে উৎপাদিত একই পণ্য আমদানিকৃত পণ্যের প্রতিযোগিতামুক্ত হয়ে বিকাশের সুযোগ পায়। সাধারণত অনুন্নত দেশসমূহই উন্নত দেশের পণ্যের আক্রমণ থেকে নিজের শিল্পোৎপাদনকে রক্ষা করার জন্য শুল্ক দেওয়াল তুলে থাকে। আবার, উন্নত দেশসমূহও নিজেদের পণ্যের বাজারের স্বার্থে প্রায়শই বিদেশী পণ্যের ওপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করে দেয়।

শুল্ক, প্রতিশোধমূলক Retaliatory Tariff. ধরা যাক 'ক' নামক কোনো দেশ 'খ' নামক অপর দেশ থেকে আমদানিকৃত কোনো পণ্যের ওপর উচ্চহারে শুল্ক বসিয়ে দিল। এর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে 'খ' নামক দেশও যদি 'ক' নামক দেশের কোনো পণ্যের ওপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক বসিয়ে দেয় তা হলে সেটাকে বলা হয় প্রতিশোধমূলক শুল্ক।

শুল্কযুদ্ধ : বা Tariff War. এটি হল দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সংঘটিত অর্থনৈতিক আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ। দুই দেশের অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে একটি দেশ অপর একটি দেশের পণ্যের ওপর বর্ধিত হারে শুল্ক ধার্য করে। এর জবাবে দ্বিতীয় দেশটিও প্রথম দেশটির পণ্যের ওপর আরও বেশি হারে শুল্ক বসিয়ে দেয়। প্রথম দেশ শুল্ক আরও বাড়িয়ে প্রতিশোধ নেয়। এই পালটাপালটির এক পর্যায়ে উভয় দেশই পরস্পরের পণ্য আমদানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। এভাবে সশস্ত্র সংঘর্ষের পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও বেধে যায়।

শুল্ক, সুবিধাদায়ী : কোনো বিশেষ দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর অন্যান্য দেশ থেকে আমদানিকৃত একই পণ্যের তুলনায় কম হারে আমদানি শুল্ক ধার্যই হল সুবিধা শুল্ক বা Preferential Tariff.

শূন্যতাবাদ Nihilism. ল্যাটিন ভাষায় নিহিল শব্দের অর্থ শূন্যতা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাশিয়ায় এই বিপ্লবী মতবাদ বিস্তারলাভ করে। এই মতবাদ অনুসারে কৃষকই বিপ্লবের মৌল শক্তি। আইভান তুর্গেনিভের 'ফাদারস অ্যান্ড সান্‌স্' উপন্যাসের মাধ্যমে এই মতবাদ খ্যাতি লাভ করে। এই মতবাদীরা কোনো ক্ষমতা, নীতি-নিয়ম বা

ধর্ম মানতে অস্বীকার করত এবং ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন বলে বিবেচনা করত। বলাবাহুল্য, নৈরজ্যবাদ ও শূন্যতাবাদ ঠিক এক বস্তু নয়।

শোপেনহাওয়ার, আর্থার Arthur Schopenhauer. (১৭৮৮-১৮৬০) জার্মান ভাববাদী দার্শনিক। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর ভীত বুর্জোয়ারা যখন আরও প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখনই তিনি পাদপদ্রীপের সামনে আসেন। তিনি বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বতত্ত্বের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আধিভৌতিক ভাববাদকে হাজির করেন। তিনি স্বস্থিত বস্তু (Thing-in-itself)-র তত্ত্ব বাতিল করে, অন্ধ ও যুক্তিহীন 'ইচ্ছা'-র ওপরই সকল গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, 'ইচ্ছা'-ই জগৎকে পরিচালনা করে; সুতরাং সমাজ ও প্রকৃতির নিয়মের প্রশ্ন অবান্তর। তিনি বিপ্লব ও আপামর জনগণকে ঘৃণা করতেন এবং তিনি ছিলেন একধরনের হতাশাবাদী। তাঁর 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' একসময় বিশ্বে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এক্ষেত্রেও তিনি বাস্তবমুখীতা ও গণমুখিতাকে ঘৃণা করতেন। বৌদ্ধধর্মের 'নির্বাণ'-এর ধারণা তাঁকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে হত্যা করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারাই ছিল নিটসের দর্শনের ভিত্তি।

শোভিনিজম Chauvinism. অন্ধ এবং উগ্র স্বদেশপ্রেম বা স্বাদেশিকতাকেই বলা হয় শোভিনিজম। শোভিনিস্টরা অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, জাত্যাভিমানি এবং অন্য জাতি বা অন্য দেশের প্রতি চরম অসহিষ্ণু হয়। ফ্রান্সের জনৈক সৈনিক নিকোলাস শোভিন (Nicholas Chauvin)-এর নাম থেকেই শোভিনিজমের উৎপত্তি। উগ্র দলীয়তার ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

শোয়েকার্নো, আহমদ : (১৯০১-১৯৭০) ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতা। ১৯২৭ সালে তিনি ইন্দোনেশীয় জাতীয় দল (পি. এন. আই.) গঠন করেন। ১৯৪২ সালে জাপানিরা ডাচদের হটিয়ে দিয়ে ইন্দোনেশিয়া দখল করে। হিরোশিমা-নাগাসাকির ঘটনায় জাপানিরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার সুযোগে ১৯৪৫ সালের ১৭ অগাস্ট শোয়েকার্নো ইন্দোনেশিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজে দেশের প্রেসিডেন্ট হন। মহাযুদ্ধের পর ডাচরা পুনরায় ইন্দোনেশিয়া দখল করতে চাইলে যুদ্ধ শুরু হয়, কিন্তু ডাচরা শেষ পর্যন্ত পরজিত হয় এবং ১৯৪৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর হেগ চুক্তির মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া চূড়ান্ত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু আঞ্চলিকতা, দারিদ্র্য ও স্ফীত জনসংখ্যাসম্পন্ন ইন্দোনেশিয়াকে এগুতে হয় সঙ্কটের মধ্য দিয়ে। কোনো মন্ত্রিসভাই দুবছরের বেশি স্থায়ী হতে পারে না। ১৯৫৮ সালের দিকে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। ১৯৬৪-৬৫ সালে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শেষের দিকে শোয়েকার্নো ধর্মাভিত্তিক নাহাদাতুল উলামা দল ও কমিউনিস্ট পার্টি (পি. কে. আই.)-র সঙ্গে নিজ দলের কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। ১৯৬৫ সালে তাঁর দেহরক্ষী বহিনীর সদস্য কর্নেল উনতুং সশস্ত্রবহিনীর ওমর দানি ও কতিপয় উচ্চপদস্থ অফিসারকে হত্যা করে। প্রত্যুত্তরে সেনাবাহিনী পি.কে.আই.-এর সদস্যসহ প্রায় তিন লক্ষ লোককে হত্যা করে। শোয়েকার্নোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুবান্দ্রিওকেও বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এর পরও শোয়েকার্নো প্রেসিডেন্ট থাকেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল সুহার্তো। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে সেনাবাহিনী পূর্ণ ক্ষমতা দখল করে এবং শোয়েকার্নোর ২১ বছরের ঝোড়ো শাসনের অবসান ঘটে।

ইন্দোনেশিয়ার জনগণ একসময় শোয়েকার্নোকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করত এবং তাঁকে আদর করে ডাকতো 'বাং (ভাই) কার্নো' বলে। তিনি নিজেও গর্ব করে বলতেন 'আমিই ইন্দোনেশিয়া'। পদচ্যুতির পর তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। ওই অবস্থায় ১৯৭০ সালের ২১ জুন তিনি পরলোকগমন করেন।

শোষণ Exploitation. কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির, কোনো শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর অথবা কোনো জাতি কর্তৃক অপর জাতির শ্রমের ফল বা ধনসম্পদ আত্মসাৎ করাই হল শোষণ। মার্কসীয় অর্থনীতি অনুযায়ী উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিক অর্থাৎ পুঁজিপতির দ্বারা শ্রমিকের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত শ্রম বা উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎই হল শোষণ, কেননা উদ্বৃত্ত শ্রম বা উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতি সৃষ্টি করে না, তা সৃষ্টি করে শ্রমিক। ব্যক্তিপর্যায়ে ছাড়াও শোষণমূলক রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপসহ বিভিন্ন উপায়ে আপামর জনগণকে শোষণ করাতে পারে। এ ছাড়া শিল্পোন্নত ও ক্ষমতাবান জাতিও শোষণ করতে পারে দুর্বল ও পশ্চাৎপদ জাতিকে।

শ্বেতপত্র : White Paper. সমকালীন অর্থনৈতিক বা সামাজিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারি নীতির ওপর সরকার যে-লিখিত বিবৃতি প্রদান করে সেটাকেই বলে শ্বেতপত্র। সাধারণত অর্থনৈতিক বা সামাজিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের পূর্বে জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়। অনেক সময় বিরোধীদল বা জনগণের তরফ থেকেও কোনো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে-লিখিত বিবৃতি প্রদান করা হয় সেটাও শ্বেতপত্র পর্যায়ভুক্ত। প্রায় সরকারই লেনদেনের ভারসাম্য, জাতীয় আয়ব্যয়, অর্থনৈতিক জরিপ ইত্যাদির ওপর প্রয়োজনে এরূপ বিবৃতি বা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে থাকে।

শ্বেতসন্ত্রাস White Terror. শোষক ও স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী মুক্তিকামী বিপ্লবী বা গণআন্দোলনকে অবদমিত করার উদ্দেশ্যে যে বেপরোয়া নিষ্পেষণ নিপীড়নযজ্ঞ চালায়, সেটাকেই বলে শ্বেতসন্ত্রাস।

শ্বেতাঙ্গের বোঝা Whiteman's Burden. এটি সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের একটি অজুহাতবিশেষ। ব্রিটিশ কবি ও সাহিত্যিক রুডইয়ার্ড কিপলিংই প্রথম বলেন যে, আফ্রিকা ও এশিয়ার উপনিবেশসমূহের অশ্বেতাঙ্গরা হল অর্ধদানব-অর্ধ-শিশু, অচেতন এবং বন্য জীববিশেষ, সুতরাং শ্বেতাঙ্গদের বোঝা বা দায় হল এদেরকে শাসন ও সভ্য করা। এই বক্তব্যে 'উদ্বুদ্ধ' শ্বেতাঙ্গরা তাই 'দায়িত্ব' নিয়েছিল আফ্রিকা-এশিয়ার পীত, বাদামি ও কৃষ্ণাঙ্গ 'ভাই'দের ইউরোপীয় সভ্যতা শিক্ষা দেবার। এজন্য, প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগেও তারা কুণ্ঠিত ছিল না। ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ, ধর্মপ্রচারক, সৈন্য ও ব্যবসায়ীরা এসব 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' অঞ্চলে 'সভ্যতার আলো' প্রবেশ করাতে তৎপর হয়ে পড়ে। স্বভাবতই তাদের অকথ্য নির্মমতা তাদের তথাকথিত ভ্রাতৃত্বের শঠতাকে নগ্ন করে তোলে। পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর বিকল্প হিসাবে 'বিশ্বের নৈতিক নেতৃত্ব'-এর ধুয়া তোলে।

শ্রম, অনুৎপাদক Unproductive Labour. অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকা, সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সদস্য, ধর্মযাজক ও চার্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, আইনজীবী, ডাক্তার, সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃতশিল্পীসহ বিভিন্ন বিনোদনজীবী,

বুদ্ধিজীবী প্রমুখের শ্রমকে অনুৎপাদক শ্রম হিসাবে আখ্যায়িত করেন, কেননা তাঁদের শ্রমের ফলে কোনো 'দ্রব্য' উৎপাদিত হয় না। তাঁর মতে যারা দ্রব্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত, শুধু তাদের শ্রমই উৎপাদনমূল শ্রম। কোনো উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও যারা সরাসরি উৎপাদন করে না (যেমন কেরানি, অ্যাকাউন্টেন্ট, গার্ড, পিওন এমনকি ম্যানেজার) তাদের শ্রমকেও কেউ-কেউ অনুৎপাদক শ্রম বলে অভিহিত করেন। তবে, অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ এমতের সঙ্গে একমত নন। তাঁদের মতে সেবামূলক কাজ বন্ধ হয়ে গেল দ্রব্য উৎপাদনও ব্যাহত হত। তাই দ্রব্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক সেবামূলক যাবতীয় কাজও উৎপাদনশীল এবং এ বাবদ শ্রমও উৎপাদক শ্রম।

শ্রম ও শ্রমশক্তি : Labour and Labour Power মার্কসের মতে শ্রম হল সেই প্রক্রিয়া, যেই প্রক্রিয়ায় মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অংশগ্রহণ করে এবং মানুষ প্রকৃতি বা তার উপাদানকে আপন কাজে লাগানোর ব্যাপারটির সূচনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। এক কথায়, প্রকৃতিকে বা প্রাকৃতিক উপাদানকে মানুষের আপন কাজে লাগানোর প্রয়াসই হল শ্রম। প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর কাজ চালিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে এবং সেসঙ্গে নিজেকে পরিবর্তিত করে; আর প্রকৃতিগত সম্পদকে নিজের কাজে লাগার উপযোগী করে নেয়। শ্রমের জন্য প্রয়োজন হয় হাতিয়ারের। শ্রমের ফলে উৎপাদন যত বাড়ে, ততই বাড়ে প্রয়োজন, বাড়ে নবতর উপকরণের চাহিদা, দেখা দেয় নবতর উৎপাদন ও হাতিয়ারের প্রয়োজনীয়তা। শ্রমের শারীরিক ধরনের ফলে মানুষের শারীরিক তথা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকারেরও পরিবর্তন ঘটে। এজন্যই বলা হয় যে, 'এপ্' (Ape) আকৃতি থেকে মানুষের আজকের আকৃতিতে আসার মূলেই ছিল উৎপাদনের জন্য শ্রম। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর মৌলিক পার্থক্যই হল এ-জায়গায় যে, অন্যান্য প্রাণী প্রকৃতি যা-ই যোগায় তাই নিয়েই বেঁচে থাকে. কিন্তু মানুষ প্রকৃতির ওপর কাজ করে বা শ্রম দিয়ে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করে নেয়। বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় শ্রমের ধরন বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন আদি সাম্যবাদী সমাজে সম্পদের মালিকানা ও শ্রম দুই-ই ছিল সামাজিক। ফলে শ্রমের দরুন যে-উৎপাদন হত, তা ভোগ করত গোটা সমাজ। এই ব্যবস্থায় শ্রমদানকারীর শ্রম শোষিত হত না। কিন্তু পরবর্তী শ্রেণীবিভক্ত সমাজসমূহের ভিত্তিই ছিল কোনো-না-কোনোরূপ শ্রমশোষণ। আর শ্রমশক্তি হল একজন মানুষের শ্রমদানের ক্ষমতার পরিমাণ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রমের মালিক বা শ্রমিক তার শ্রমশক্তি উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকের কাছে বিক্রয় করে। এই শ্রমশক্তিকে খাটিয়ে নিয়ে মালিক পণ্য উৎপাদন করে এবং উৎপাদন মূল্যের একটি অংশমাত্র শ্রমিককে দিয়ে বাকি অংশ নিজে আত্মসাৎ করে।

শ্রমখাজনা Wage Rent জমির খাজনা হিসাবে প্রদত্ত শ্রম। সামন্তবাদী ব্যবস্থায় কৃষকেরা ভূস্বামীদের জমিতে 'বেগার' খাটত এবং এভাবেই নগদ অর্থের বদলে শ্রম দিয়ে এদের জমির খাজনা পরিশোধ করত।

শ্রমবিভাগ Division of Labour. এটি হল এক-একটি দিকে এক-এক দল শ্রমিক নিয়োগ করার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত শ্রমিক অপর প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে এবং শুধু নিজ প্রক্রিয়া সম্পর্কেই বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। যতই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে ততই শ্রমবিভাগ বৃদ্ধি পায়।

যেমন, একটি মোটরগাড়ির সকল অংশই একই শ্রমিক তৈরি করে না। এক-একটি যন্ত্রাংশের জন্য এক-একটি বিভাগ থাকে, প্রত্যেক বিভাগের শ্রমিকরা শুধু তাদের বিভাগের যন্ত্রাংশ সম্পর্কেই দক্ষতা লাভ করে। পরে, বিভিন্ন বিভাগে উৎপাদিত যন্ত্রাংশকে অন্য বিভাগে সংযোজিত করা হয়, যে-বিভাগের শ্রমিকরা আবার সংযোজনপ্রক্রিয়া ছাড়া যন্ত্রাংশ নির্মাণপদ্ধতি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না।

শ্রমবিভাগ, সামাজিক : Social Division of Labour. সমাজের এক-এক দল মানুষের দ্বারা এক-একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হলে, পেশা বা শ্রমের এই বিন্যাসকে বলে সামাজিক শ্রমবিভাগ। যেমন, একটি সমাজে কৃষকরা কৃষিকাজ করে, শ্রমিকরা কলকারখানায় পণ্য উৎপাদন করে, জেলেরা মাছ ধরে, কামার কুমোর ছুতার মুচিরা স্ব-স্ব পেশায় কাজ করে। বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে শ্রমবিভাগও ব্যাপকতা লাভ করে।

শ্রমিকদল : Labour Party (ব্রিটেনের)। ১৯০০ সালে 'শ্রমিক প্রতিনিধি কমিটি' নামে এর প্রতিষ্ঠা হয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। এই দল সম্পদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিলেও 'সমাজতন্ত্র', 'শ্রেণীসংগ্রাম' ইত্যাদিকে সযত্নে এড়িয়ে যায়। ১৯০৬ সালের নির্বাচনে 'শ্রমিক প্রতিনিধি কমিটি' (LRC) ৫০ জন প্রার্থী দেয় এবং তাদের ২৯ জনই জয়লাভ করে। ওই বছরই কমিটির নাম পালটে 'শ্রমিকদল' রাখা হয়। এই দল উদারনৈতিক সরকার-এর সংস্কারমূলক কাজকে সমর্থন দিত। ১৯০৮ সালে অসবর্ন রায় (Osborne Judgement)-এ রাজনৈতিক কাজে ট্রেড ইউনিয়ন ফান্ড নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলে এই দল অর্থনৈতিক সঙ্কটে পতিত হয়। ১৯১১ সালে পার্লামেন্ট সদস্যদের বেতন দেওয়ার নিয়ম চালু হলে শ্রমিকদলের কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শ্রমিকদলের আর্থার হ্যান্ডারসন লয়েড জর্জের যুদ্ধ মন্ত্রিসভা (War Cabinet)-এর সদস্য হন এবং আরও ৬ জন সদস্য বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত হন। রুশবিপ্লবের জোয়ারের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৮ সালে শ্রমিকদল নিজেদের গঠনতন্ত্র পালটায় এবং উৎপাদন ও বণ্টনের প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। উদারনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২২ সালে শ্রমিকদল সরকারিভাবে বিরোধী দল হিসাবে স্বীকৃত পায়। পরের বছর এ-দলের নেতা র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু ১০ মাস পরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 'জিনোভিয়েভের চিঠি'-র প্রতিক্রিয়ার দরুন শ্রমিকদল পরাজিত হয়। ১৯২৯ সালের নির্বাচনে শ্রমিক দল (ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে) সরকার গঠন করে, কিন্তু রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের সম্মিলিত সদস্যসংখ্যা শ্রমিকদলের চাইতে বেশি হওয়ায় এই সরকার কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধনেই সমর্থ হয় না। ১৯৩১ সালে শ্রমিকদলে বিভক্তি দেখা দিলে ম্যাকডোনাল্ড জাতীয় সরকার গঠন করেন। ১৯৩২ সালে ল্যান্‌স্‌বেরি ও ১৯৩৫ সালে অ্যাটলি এ-দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁর মন্ত্রিসভায় শ্রমিকদলের দুজন (অ্যাটলি ও গ্রিনউড)-কে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং আরও ৫ জনকে মন্ত্রী পদমর্যাদা দান করেন। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে এই দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং অ্যাটলি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভা উপনিবেশসমূহকে স্বাধীনতা প্রদানের নীতি গ্রহণ করে।

শ্রেণী : Class. শ্রেণী হল সমাজের সেই প্রধান প্রধান অংশ, যারা ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত একটি সামাজিক উৎপাদনব্যবস্থায় স্ব স্ব অবস্থান, উৎপাদনের উপায়সমূহের সঙ্গে সম্পর্ক, সামাজিক সংগঠনে অবস্থান এবং সর্বোপরি সামাজিক সম্পদের মালিকানার বিচারে একে অন্যের থেকে পৃথক। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন উৎপাদনের উপায়সমূহ এবং শ্রম। শ্রমদাতাদের যখন উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর মালিকানা বা কর্তৃত্ব থাকে না, তখনই শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। স্বভাবতই উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকরা শ্রমের মালিকদের শোষণ করতে পারে এবং করেও। এজন্য প্রথমোক্ত দলকে বলা হয় শোষকশ্রেণী এবং শেষোক্ত দলকে বলা হয় শোষিতশ্রেণী। শ্রেণীর স্বরূপ কী হবে, তা নির্ভর করে উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিমালিকানার ধরন এবং শ্রমের সামাজিক বিভাগের স্তরের ওপর। এ-যাবৎ যে-তিনটি সুস্পষ্ট শোষণমূলক বা শ্রেণীবিভক্ত সমাজ দেখা গেছে, তাতে দাসসমাজে দাস-মালিক ও দাস, সামন্তসমাজে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাস এবং পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া ও সর্বহারারাই হল প্রধান শ্রেণী। প্রথমোক্তরা শোষক, শেষোক্তরা শোষিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই দুই চূড়ান্ত বা মৌলিক শ্রেণী ব্যতিরেকেও সমাজে কিছুসংখ্যক অমৌলিক শ্রেণী অবস্থান করতে পারে। সাধারণত এরা হয় বিগত উৎপাদনপ্রক্রিয়ার অবশেষ কিংবা বিকশমান উৎপাদনপ্রক্রিয়ার ফসল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পুঁজিবাদী সমাজে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রভু বা জোতদার কিংবা সামন্তসমাজে উঠতি বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব থাকতে পারে। পুঁজিবাদী দার্শনিকরা অবশ্য এভাবে শোষক ও শোষিত নামে দুই শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন না।

শ্রেণীচ্যুতি সাধারণভাবে এর অর্থ হল উচ্চতর শ্রেণী থেকে নিম্নতর শ্রেণীতে নেমে আসা। কিন্তু মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ ভিন্নতর। জন্মগতভাবে শোষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোনো মানুষ যদি শোষকশ্রেণীর স্বার্থ, মানসিকতা ও মূল্যবোধ ত্যাগ করে শোষিত মানুষের স্বার্থ, মানসিকতা ও মূল্যবোধের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং শোষিত মানুষের স্বার্থে সমাজ ও রাষ্ট্র-পরিবর্তনের সংগ্রামে শামিল হয়, তখনই মানুষটি শ্রেণীচ্যুত হল বলে বিবেচনা করা হয়। কোনো বুর্জোয়া বা পেটি বুর্জোয়া মামলায় বা অন্য কোনো উপায়ে সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলেই তাকে শ্রেণীচ্যুত বলা যাবে না; কেননা মানুষটি সম্পদ হারালেও ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ ও শোষকের মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়নি। একজন বক্তি তার সমস্ত সম্পদ দরিদ্র মানুষের জন্য বিলিয়ে দিলেও তাকে শ্রেণীচ্যুত বলা যাবে না, যদি দেখা যায় যে অবস্থিত শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার কোনো ক্ষোভ বা আপত্তি নেই। বস্তুত শ্রেণীচ্যুত হওয়ার মূল কথা হচ্ছে মানসিকতার আমূল পরিবর্তন। এটি অত্যন্ত কঠিন ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। দীর্ঘদিন সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলনে যুক্ত থেকেও, এমনকি বহু ত্যাগতিতিক্ষার পরও অনেকে মানসিকতার আমূল পরিবর্তন করতে পারে না বলেই দেখা দেয় সুবিধাবাদ, সাংশোধনবাদ ইত্যাদি উপসর্গ।

শ্রেণীদ্বন্দ্ব শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষকশ্রেণী ও শোষিতশ্রেণীর স্বার্থ থাকে পরস্পরবিরোধী। ফলে তাদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপেই যে-স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়, তাকেই বলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব (Class contradiction)। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে দুই বিপরীত শ্রেণীর সংঘাত বা দ্বন্দ্বের দিকটিই প্রধান, সমন্বয়ের দিকটি গৌণ। বস্তুবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, এই শ্রেণীদ্বন্দ্বই বিপ্লব, তথা সমাজ-পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। দাসসমাজে

দাস-ম্যালিক ও ক্রীতদাসদের দ্বন্দ্ব, সামন্তসমাজে সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাসদের দ্বন্দ্ব এবং পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া ও সর্বহারাদের দ্বন্দ্বই হল শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শ্রেণীমিত্র Class Ally. চূড়ান্ত শোষক ও চূড়ান্ত শোষিতের মাঝখানেও অন্যান্য মধ্যবর্তী জনগোষ্ঠী থাকে বা থাকতে পারে। এদের সকলকে শোষকের পক্ষে ঠেলে দেওয়া হলে শোষিতদের মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্য যারা আধাশোষিত তাদেরকেও চূড়ান্ত শোষিত শ্রেণীর মিত্র করে নিতে হয় এবং চূড়ান্ত শোষণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আঘাত হানতে হয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে পেটি বুর্জোয়াদের নিম্নতর অংশই সর্বহারা শ্রেণীর মিত্র হতে পারে। আবার জাতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদ (যতটুকু থাকে)-এর বিরুদ্ধে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে পর্যন্ত শ্রেণীমৈত্রী গড়ে উঠতে পারে।

শ্রেণীশত্রু Class Enemy. কোনো সমাজবিপ্লবের পটভূমিতে যারা চূড়ান্ত শোষক ও তাদের দোসর, তাদেরকেই বলা হয় শ্রেণীশত্রু। শ্রেণীশত্রুকে উৎখাত ও নির্মুল করা ছাড়া সমাজবিপ্লব সম্পাদন করা যায় না। তাই সমাজবিপ্লবের প্রধান কাজ হল শ্রেণীশত্রুকে চিহ্নিত করা এবং তাদের নির্মূল করা। এই নির্মূলীকরণ শারীরিক ও সামাজিক দুটোই হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারাই হল শ্রেণীশত্রু। আবার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদী গোষ্ঠী, তাদের দেশীয় অনুচর এবং সামন্তবাদী গোষ্ঠী (যতটুকুই থাক-না কেন)-কেই শ্রেণীশত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজের বাদবাকি অংশগুলোকে হয় পক্ষে আনা অথবা নিরপেক্ষ রাখাকেই বিপ্লবীরা কৌশল হিসাবে গ্রহণ করে।

শ্রেণীসংগ্রাম Class struggle. বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীসমূহের পারস্পরিক সংগ্রামই হল শ্রেণীসংগ্রাম। অন্য কথায় শোষক এবং শোষিতের সংগ্রামই শ্রেণীসংগ্রাম। দাসসমাজ থেকে পুঁজীবাদী সমাজ পর্যন্ত প্রতিটি শোষণমূলক সমাজের ইতিহাসই মূলত শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। বস্তুত শোষণমূলক সমাজ পরিবর্তনের মূলেই হল শ্রেণীসংগ্রাম। পুঁজিবাদী সমাজে সংগ্রাম মূলত বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণীর। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীকে উৎখাত করে সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মাধ্যমেই পুঁজিবাদী সমাজ তথা শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটতে পারে। সর্বহারা শ্রেণী তথা সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর শ্রেণীঅস্তিত্ব লোপ পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলেও, বেশ কিছুদিন পর্যন্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব টিকে থাকে বিধায় শ্রেণীসংগ্রামও বলবৎ থাকে। তবে শোষকশ্রেণী ক্ষমতায় না থাকায় এ-পর্যায়ে শ্রেণীসংগ্রামের রূপও পালটায়। স্ট্যালিনের মতে সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর শ্রেণীসংগ্রামকে বরং তীব্রতর করতে হয়। কিন্তু সংশোধনবাদীদের মতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর আর শ্রেণীসংগ্রামের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে শ্রেণীসংগ্রামের রূপের ক্ষেত্রে নবতর বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে। কারণ উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহ শ্রেণীসংগ্রামকে ঠেকানোর অন্যতম পন্থা হিসাবে তাদের স্ব-স্ব দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে ন্যূনতম জীবনমানের নিশ্চয়তাতো দিচ্ছেই, অনেকক্ষেত্রে দিচ্ছে বিলাসের সুযোগও। ফলে, এই শ্রমিকদের আচরণের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে ভিন্নতা। অন্যদিকে, অনুন্নত দেশসমূহে, যাদের প্রায় সকলেই কোনো-না-কোনো উপনিবেশবাদী শক্তির উপনিবেশ ছিল সেসব দেশেও পুঁজির

বিকাশের কালে পুঁজির বিকাশ ঘটেনি বলে এবং বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে এ-সমস্ত দেশে একেবারে স্বাধীন পুঁজির বিকাশ ঘটা আর সম্ভবপর নয় বলে, এসব দেশে প্রায়শই শক্তিশালী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব তেমন একটা দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, সমাজ সুস্পষ্টরূপে দুটি চূড়ান্ত শ্রেণীতে বিভক্ত নয় বরং বিশাল ও শক্তিশালী মধ্যবর্তী স্তর বিদ্যমান বিধায় এখানে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ধ্রুপদীভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে না। ফলে বর্তমানে বিশ্বে রুশ বা চীনা ধরনের শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লব বলতে গেলে অসম্ভব।

শ্রেণীসমন্বয় কোনো সাধারণ স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার মৈত্রী বা সমন্বয়কে বলে শ্রেণীসমন্বয় (Class Co-ordination)। যেমন, জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে অর্থাৎ বিদেশী আক্রমণ বা তাঁবেদারির কবল থেকে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ছিনিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণী একত্রে আগ্রাসনবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। অন্য কথায়, জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে পরাধীন বা আগ্রাসনাধীন দেশের বুর্জোয়া ও সর্বহারাদের মধ্যে শ্রেণীসমন্বয় গড়ে উঠতে পারে। আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নেও সর্বহারা শ্রেণী আধাসর্বহারা ও পেটি বুর্জোয়াদের ব্যপক অংশকে নিজেদের দিকে টেনে নিতে পারে যাতে তারা শত্রুপক্ষে গিয়ে শত্রুপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি করতে না পারে। বিপ্লবের প্রয়োজনে সর্বহারা, আধাসর্বহারা ও পেটি বুর্জোয়াদের মৈত্রী অর্থাৎ শোষিত ও আধাশোষিতদের মৈত্রীও শ্রেণীসমন্বয়ের উদাহরণ।

শ্রেষ্ঠত্ববোধ Superiority Complex. এটা আসলে হীনমন্যতাবোধ বা Inferiority Complex-এরই অপর পিঠ। অবচেতনমনে নিজেকে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবাই হল শ্রেষ্ঠত্ববোধ। আবার স্বীয় হীনমন্যতা বা ক্ষুদ্রতাকে ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অপরের প্রতি তাচ্ছিল্যজনক আচরণ ও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রবণতাকেও এ-নামে অভিহিত করা যায়। এটিও একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি।

॥ ষ ॥

ষড়দর্শন : বৈদিক যুগে ও পরবর্তীকালে উপনিষদের ভিত্তিতে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি দর্শন ছিল সর্বাধিক গরুত্বপূর্ণ: ১. ঋষি কপিলের সাংখ্য ২. ঋষি পতঞ্জলির যোগ ৩. ঋষি গৌতমের ন্যায় ৪. ঋষি কন্দের বৈশিষিক ৫. ঋষি জৈমিনীর পূর্ব মীমাংসা এবং ৬. ঋষি বেদব্যাসের উত্তর সীমাংসা। এই দর্শনসমূহ বেদান্ত দর্শন নামেও পরিচিত।

॥ স ॥

সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার Tyranny of the Majority. জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'অন লিবার্টি' নামক প্রবন্ধে এই পদটি ব্যবহার করেন। তাঁর শঙ্কা ছিল যে অশিক্ষিত অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষের ইচ্ছা ধ্বংসাত্মক হতে পারে, কেননা তারা স্বভাবগতভাবেই অসহিষ্ণু। ফলে তিনি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রে (Restricted Democracy) বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, কোনো দুর্নীতিবাজ মানুষ

ক্ষেপানো প্রতিভাবান নেতা (talented but corrupt demagoguc) অনায়াসেই গলাবাজির মাধ্যমে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনগণকে খেপিয়ে দিয়ে যে-কোনো অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারেন। এই মতবাদে বিশ্বাসী কেউ-কেউ আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন একনায়ক (enlightened dispot)-কে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারের চেয়ে কল্যাণকর বলে বিবেচনা করতেন।

সংগঠন Organisation. কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে, শৃঙ্খলার নির্ধারিত নিয়মাবলীর ভিত্তিতে স্বেচ্ছামূলকভাবে বহু ব্যক্তির মিলিত অস্তিত্বই হল সংগঠন। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা অপর কোনো লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গঠন করা যেতে পারে। সুতরাং, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাফ ন্যাটো ইত্যাদি জোট, এমনকি জাতিসংঘও সংগঠনের সংজ্ঞাভুক্ত।

সংবিধান পরিষদ Constituent Assembly. কেউ-কেউ এটাকে গণপরিষদও বলে থাকেন। এই পরিষদের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের একটিই কাজ, আর তা হল, দেশের জন্য একটি সংবিধান বা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর কোথাও কোথাও সংবিধান পরিষদের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়, আবার কোথাও কোথাও এই পরিষদকেই আইন পরিষদ বা পার্লামেন্টে রূপান্তরিত করা হয়। (কনস্টিটুয়ান্ট অ্যাসেম্বলীও দ্রষ্টব্য।)

সংশোধনবাদ : Revisionism. এটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের নামে মার্কসবাদবিরোধী সুবিধাবাদী ধারা। মার্কসবাদের মূলতত্ত্বকে সংশোধন করে বলেই এর নাম সংশোধনবাদ। সংশোধনবাদীরা 'বিপ্লব'-এর বদলে 'বিবর্তন' এবং 'শ্রেণীসংগ্রাম'-এর বদলে 'শ্রেণী সমন্বয়'-এর তত্ত্ব প্রদান করে। লেনিনের মতে, সংশোধনবাদীরা মার্কসবাদকে বুর্জোয়া স্বার্থে ব্যবহার করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে বুর্জোয়া দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটায়। সংশোধনবাদীরা পরিবর্তিত পরিস্থিতির নামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী চরিত্রকে নিষ্প্রভ করে, আন্তর্জাতিকতার বদলে জাতীয়তাকে প্রাধান্য দেয় এবং দ্বান্দ্বিক এ ঐতিহাসিক বস্তুবাদকেও ঢেলে সাজাতে চায়। তারা আরও মনে করে যে পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রে বিবর্তিত হওয়া সম্ভবপর। সংশোধনবাদের উদ্ভব ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বিংশ শতাব্দীতে বার্নস্টাইন, কাউটস্কি প্রমুখকে সংশোধনবাদের ধারক বলে গণ্য করা হয়। অধুনা অবস্থার বিচিত্র পরিবর্তন ঘটেছে। রুশবিরোধীরা স্ট্যালিন-পরবর্তী রাশিয়া ও তার সমর্থকদেরও সংশোধনবাদী বলে গণ্য করত। চীনপন্থিরা বলত যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সংশোধনবাদের চূড়ান্তে গিয়ে সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে। অপরপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সমর্থকদের মতে রাশিয়া নয়, বরং চীনই সংশোধনবাদের পথ গ্রহণ করেছিল, সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী ও দীর্ঘায়ু করছিল এবং বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদী ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে মদদ দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকেই নস্যাৎ করে দিচ্ছিল। অনেকে মনে করেন যে, কিছু-কিছু অতিশুদ্ধাচারী ব্যক্তি বা শিবির মার্কসবাদকে ধর্মীয় অনুশাসনের মতো অনড় শাশ্বত বলে ধরে নেন, মার্কসবাদ যে 'বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ, তা বিস্মৃত হন, নবতর পরিস্থিতি ও সমীকরণকে ধর্তব্য বলে গণ্য করেন না এবং এভাবে কার্যত মার্কসবাদের নামে মার্কসবাদবিরোধী গোঁড়ামিবাদেরই শিকার হন। অবশ্য

বর্তমান বিশ্বের মার্কস-এঙ্গেলস লেনিন-স্ট্যালিন মাওয়ের তত্ত্ব বা দর্শনের হুবহু অনুসারী প্রায় কেউই নেই, এমনকি রাশিয়া বা চীনের পার্টিও নয়।

সংশোদনবাদী Revisionist. সমজাতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কথাই হল শ্রেণীসংগ্রামের প্রক্রিয়ায় বিপ্লব সাধন করে শোষকশ্রেণীর উচ্ছেদ ও শোষিতের একনায়কত্ব কায়েম করা। কিন্তু, যারা শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণীসমন্বয় এবং বিপ্লবের পরিবর্তে বিবর্তনের তত্ত্ব হাজির করেন, তাঁদেরকেই সাধারণভাবে বলা হয় সংশোধনবাদী। কিন্তু বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে যেখানে বনেদি পুঁজিবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের মৌলিক চাহিদারও অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করে ফেলেছে, সেই পরিস্থিতিতে বনেদি কায়দায় তো দূরের কথা, আদৌ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন সম্ভপর কি না তা নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহেও ক্লাসিক্যাল সমাজতন্ত্র কায়েম করা আর সম্ভবপর নয় বলেই অনেকে মনে করেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংশোধিত চিন্তাকেই অনেকে সংশোধনবাদের বদলে বর্তমান সময়োপযোগী যথার্থ সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বলার পক্ষপাতী। এঁদের মতে যাঁরা স্থানকাল বিবেচনা না করে বনেদি শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে থাকেন তাঁরাই অসমাজতন্ত্রী এবং তাঁদের জন্যই সমাজতন্ত্রের আজ এই দুর্দশা।

সংসদীয় দল : Parliamentary Party. কোনো রাজনৈতিক দলের পার্লামেন্ট বা আইন সভায় নির্বাচিত সদস্যদের সমষ্টিগতভাবে বলা হয় সংসদীয় দল। সংসদীয় দলে সাধারণত একজনকে নেতা নির্বাচিত করা হয়। সরকারি সংসদীয় দলের নেতা থাকেন সাধারণত নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। সংসদীয় দল মূল দলের নীতি ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্লামেন্টের বিভিন্ন ইস্যুতে অংশগ্রহণ করে।

সংস্কার অবস্থিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বহাল রেখে তার কিছু-কিছু দোষক্রুটি সংশোধনের জন্য গৃহীত কর্মকাণ্ডকে বলে সংস্কার (Reform)। যেমন, শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকে বহাল রেখে প্রায়শ এই ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার উদ্দেশ্যে সরকার স্বাস্থ্য, স্ব-কর্মসংস্থান, কুটির শিল্প ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক ইস্যুতে যেসব পদক্ষেপ নেয় বা আইন পাশ করে সেগুলোকেই বলে সংস্কার। বিপ্লববিরোধীরা মনে করেন যে, সংস্কারের মাধ্যমেই সমাজের দোষক্রুটিসমূহ দূর করে সমাজকে সুন্দর করা সম্ভবপর। এইরূপ মতবাদকে বলা হয় সংস্কারবাদ (Reformism)। অপরদিকে বিপ্লববাদীরা মনে করেন যে মলম লাগিয়ে যেমন সিফিলিসের চিকিৎসা সম্ভবপর নয়, তেমনি সংস্কারের মাধ্যমেও কোনো শোষণমূলক বা বৈষম্যমূলক সমাজ থেকে শোষণ বা বৈষম্যের অবসান ঘটানো সম্ভবপর নয়। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন যে, দেশীবিদেশী শোষকশ্রেণী বস্তুত জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার জন্য, বিপ্লবী ধারাকে স্তিমিত করার জন্য এবং শোষণ ও বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থাটাকে পাকাপোক্ত করার জন্যই বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সংস্কারবাদ Reformism. সমাজের মৌল ও প্রধান সমস্যাকে বাদ দিয়ে ছোটখাটো সংস্কারমূলক কাজ করার নীতিকেই বলে সংস্কারবাদ। এটা হল একটা জরাজীর্ণ বাড়িকে ভেঙে নতুন বাড়ি বানানোর বদলে ওই জরাজীর্ণ বাড়ির ওপরই কিছু চুনকাম করার মতো। সংস্কারবাদীরা একটা সমাজের দারিদ্র্য, বৈষম্য, দুর্নীতি, শিক্ষাহীনতা, নীতিহীনতা

ইত্যাদির জন্য যে-সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা দায়ী, তা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন না, বরং ওই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ঠিক রেখে কিছু রাস্তাঘাট নির্মাণ, রিলিফ প্রদান, কুটির শিল্পের জন্য উৎসাহপ্রদান, কিছু বিদ্যালয় স্থাপন, হিতোপদেশ দান ইত্যাদির পথ গ্রহণ করেন। অনেকের মতে, এসব হল শোষক বা কায়েমি স্বার্থবাদীদের একটা কৌশল, যাতে জনগণের দৃষ্টিকে সামাজিক বিপ্লবের দিক থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা যায়। কায়েমি স্বার্থবাদী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তি ও প্রতিষ্ঠানও এরূপ সংস্কারমূলক কাজকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে, যাতে সমাজবিপ্লবকে ঠেকিয়ে তাদের বাজার ও প্রভাববলয়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা যায়।

সক্রিয়তাবাদী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে এমন কিছু লোক থাকে, যারা দলের আর্দশ উদ্দেশ্য মেনে চললেও কার্যত নিষ্ক্রিয় থাকে। আবার এমন কিছু লোকও থাকে, যারা সবসময় সক্রিয় থাকার পক্ষপাতী। এদের বলা হয় সক্রিয়তাবাদী বা Activist। আবার যাঁরা তত্ত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, অথচ বাস্তব কাজে তেমন একটা অংশ গ্রহণ করেন না, তাঁদের বিপরীতে বাস্তব কাজকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপকারীদেরও সক্রিয়তাবাদী বলা হয়। কোনো বিপদসঙ্কুল সময়ে যাঁরা কোনো বিশেষ কাজকে হঠকারী বা বিপজ্জনক বলে মনে করেন, তখনও যাঁরা ওই কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী তাঁদেরও সক্রিয়তাবাদী বলা হয়। তবে, সাধারণ অর্থে নিষ্ক্রিয়তাবাদীদের যারা বিপরীত তাদেরই সক্রিয়তাবাদী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

সক্রেটিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯-৩৯৯) গ্রিসের এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁর মতবাদ ছিল এই যে, অনুমান অপেক্ষা বাস্তবজ্ঞানই সত্য, সত্য ও সৎগুণ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং অজ্ঞানতাই পাপ ও মিথ্যাচারের উৎস। অন্যের ভ্রান্ত মতবাদকে পরাজিত করে সঠিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি তার্কিক (Dialectical) প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিপক্ষকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এমন জায়গায় নিয়ে আসতেন যে তাঁদের তাঁর মতবাদ গ্রহণ করা ছাড়া অপর কোনো উপায় থাকত না। তৎকালীন তরুণসমাজ তাঁর প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন প্লেটো ও জেনোফোন। প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদ-এর ভিত ভেঙে দিচ্ছেন, এই অভিযোগে সক্রেটিস অভিযুক্ত হন এবং বিচারকের রায় অনুযায়ী ৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি হেমলক বিষ পান করে প্রাণত্যাগ করেন। সোফিস্ট পণ্ডিতরা ছিলেন তাঁর ঘোরতর বিরোধী।

সত্য, ধ্রুব ও আপেক্ষিক Truth, Absolute and Relative. এটি হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রথমত যা জানা হয়েছে ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যা জানা যাবে এ-দুয়ের মধ্যেকার এবং দ্বিতীয়ত আমাদের জ্ঞানের যে-অংশ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে পরিবর্তিত হতে পারে ও যে-অংশ অপরিবর্তনীয়, এ-দুয়ের মধ্যেকার সম্পর্কের ব্যাখ্যা। ধ্রুব সত্য হল, যা পুরোপুরি জানা হয়েছে এবং যা ভবিষ্যতেও পরিবর্তিত হবে না। আর আপেক্ষিক সত্য হল, যা পরিবর্তনীয়। বস্তুত এ-দুয়ের মধ্যে কোনো চীনের প্রাচীর নেই। অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে একসময় ধ্রুব সত্য বলে বিবেচিত বিষয়ও পরবর্তী সময়ে ধ্রুব নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। আবার অনেক বিষয় আছে, যা একাধারে ধ্রুব ও আপেক্ষিক। যেমন, একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে; পৃথিবী, সৌরজগৎ ইত্যাদির গতি হিসাবে না

ধরলে ওই মুহূর্তে ট্রেনের ওই গতিই ধ্রুব; কিন্তু অন্যান্য গতিকে বিবেচনায় আনলে ওই গতি আপেক্ষিক। আবার বাজারে যখন এক কিলোগ্রাম চিনি ওজন করা হচ্ছে তখন তা ধ্রুব, অর্থাৎ এক কেজি চিনির ওজন এক কেজিই বটে; কিন্তু ১০ হাজার কিলোমিটার (বা যে-কোনো) উচ্চতায় নিয়ে মাপলে দেখা যাবে যে ভূপৃষ্ঠের এক কেজি ওখানে আর এক কেজি নেই, অনেক কমে গেছে। আবার মহাশূন্যে অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের আওতার বাইরে এর কোনো ওজনই থাকবে না। তেমনি, ম্যাক্রো বা স্থূল বিচারে এক কিলোগ্রাম সর্বদা এক কিলোগ্রামই বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যাবে যে, বস্তুর পরমাণুতে বিরতিহীন ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে প্রতি মুহূর্তেই ওজনের তারতম্য ঘটছে, যদিও তা অতি সূক্ষ্ম বলে সাধারণ মাপযন্ত্রে ধরা যাচ্ছে না। সমাজের ক্ষেত্রে এটা আরও সত্য। কেননা, সমাজ হল অনেক মানুষ, অনেক মনন ও দৃষ্টিভঙ্গি, অনেক স্বার্থ এবং অনেক দিকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমাহার। ফলে, চূড়ান্ত বিচারে সমাজের সবকিছুই আপেক্ষিক। লেনিনের মতে, সকল আদর্শই ঐতিহাসিকভাবে আপেক্ষিক, কিন্তু এটা ধ্রুব সত্য যে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক আদর্শই বাস্তব সত্যভিত্তিক। বস্তু আপেক্ষিক, কিন্তু বস্তু ও ঘটনাবলীর দ্বান্দ্বিকতা প্রক্রিয়া হিসাবে ধ্রুব।

সত্যাগ্রহ : সর্বোদয়, অর্থাৎ গান্ধীবাদী নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের রূপ বা ধরন। এর অর্থ সত্যের প্রতি আগ্রহ বা সত্যকে আঁকড়ে থাকা। গান্ধীবাদীদের মতে সত্যকে আঁকড়ে থাকলে মিথ্যা পরাভূত হতে বাধ্য। অত্যাচার-শোষণ যেহেতু মিথ্যা, সেহেতু সত্যের প্রতি অপ্রতিহত নিষ্ঠার মাধ্যমে অত্যাচার ও শোষণকে নির্মূল করা সম্ভবপর। সত্যাগ্রহ 'হিংসাত্মক' সকল প্রক্রিয়ার বিরোধী, কেননা 'হিংসা' অসত্য। গান্ধীজির মতে, যা হিংসাত্মক বা রক্তাক্ত পথে অর্জিত, তা হিংসাত্মক বা রক্তাক্ত পথেই ধ্বংস হতে বাধ্য। উদাহরণ হিসাবে তিনি কমিউনিস্ট দেশে ক্রমাগত 'পার্জিং' বা তথাকথিত আদর্শবিরোধীদের নির্মূল করার নামে নরহত্যা ও নির্যাতনের কথাও উল্লেখ করতেন। সত্যাগ্রহীদের মতে 'লোকশিক্ষা' এবং 'লোকশক্তি' জাগিয়ে তোলাই হল আন্দোলনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

সত্তা : কোনোকিছুর নিজের সঙ্গে বা অন্যকিছুর সঙ্গে সাযুজ্যই হল সত্তা। কিন্তু, যেহেতু বস্তুমাত্রই সদাপরিবর্তনশীল, সেহেতু সত্তাও ধ্রুব নয়। সত্তা বাস্তব, বিমূর্ত নয়। সত্তা আপেক্ষিক এবং সত্তার মধ্যেও স্ববিরোধিতা বর্তমান। বস্তুত, বস্তুর সত্তা অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল, কিন্তু তার পরিবর্তন ও বিকাশ ধ্রুব।

সত্তাবাদ Substantialism. এই মতবাদ অনুসারে সকল বস্তুর বাহ্য আকারের অন্তরালে প্রকৃত সত্তা বা Substance বিদ্যমান রয়েছে।

সন্ত্রাসবাদী Terrorist. যারা রাজনৈতিক কারণে বা উদ্দেশ্যে হিংসাত্মক কাজ বা সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়, তাদেরকেই বলে সন্ত্রাসবাদী। সাধারণত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী যখন গণতান্ত্রিক বা আইনসঙ্গত উপায়ে দাবি আদায়ের বা ক্ষমতাহস্তান্তরের পথ বন্ধ করে দেয়, তখনই আন্দোলনকারীরা সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। দেশকে উপনিবেশবাদী বা সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্যও সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবীরাও একধরনের সন্ত্রাসবাদী। তবে, সাধারণভাবে বিপ্লবীদের সঙ্গে সন্ত্রসবাদীদের পার্থক্য হল এই যে, সন্ত্রাসবাদীরা কার্যত জনগণের ভূমিকার ওপর গুরত্ব আরোপ করে না, অথচ বিপ্লবীরা জনগণকেই ইতিহাস ও

সমাজ বিকাশের নিয়ামক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উভয়ে প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করা সত্ত্বেও, নিহিলিস্ট বা নৈরাজ্যবাদীরা ছিল শুধুই সন্ত্রাসবাদী, কিন্তু বলশেভিকরা ছিল বিপ্লবী। অনুরূপভাবে, ব্রিটিশ-বিতাড়ন আন্দোলনে অস্ত্রধারণকারী অনুশীলন ও যুগান্তর দলকে বলা হয় সন্ত্রাসবাদী, কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রধারণকারীদের বলা হয় মুক্তিযোদ্ধা।

সন্দেহবাদ Scepticism. সবকিছুকে সন্দেহ করার দর্শন। সন্দেহবাদীদের একদল মনে করেন যে, সত্য বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সবকিছুকে সন্দেহ করে যেতে থাকাই বিধেয়। অপর দল মনে করেন যে, মানুষের সীমিত জ্ঞান দিয়ে সত্যে উপনীত হওয়া কখনোই সম্ভবপর নয় বিধায় চিরসন্দেহই যথার্থ।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০) উপনিবেশবাদী ইংরেজরা এদেশের ঐতিহ্যবাহী গ্রামসমাজব্যবস্থাকে ভেঙে দিলে এবং জনগণের ওপর কর ও বিবিধ শোষণ চাপিয়ে দিলে, বিপুলসংখ্যক কৃষক ও কারিগর জীবিকাহীন হয়ে পড়ে। একই সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর বেকার ও ক্ষুধার্ত সৈনিকরাও ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে। সর্বোপরি, ইংরেজরা মুসলমান ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের দলবদ্ধ তীর্থভ্রমণে বাধা দিলে এবং তীর্থযাত্রীদের ওপর মাথাপিছু কর ধার্য করে দিলে সন্ন্যাসী ও ফকিররাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ফলে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতৃত্বে জীবিকাহীন কৃষক, কারিগর ও সৈন্যেরা ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীরা অনেক ক্ষেত্রে জমিদারদের খাদ্য ও সম্পত্তিও লুট করে। তৎকালীন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস এই বিদ্রোহকে পেশাদারদের দুস্যুতা ও ডাকাতি বলে অভিহিতি করেন। বিদ্রোহীরা প্রথম আঘাত হানে ঢাকার ইংরেজ কুঠির ওপর। তখন কলকাতার কুঠির পরই ছিল ঢাকার কুঠির স্থান। দ্বিতীয় আঘাত হানা হয় রাজশাহীর রামপুর, বোয়ালিয়া কুঠির ওপর। ১৭৬৭ সালে আক্রান্ত হয় পাটনার কুঠি। এই বিদ্রোহের প্রধান এবং সবচেয়ে শক্তিশালী নায়ক ছিলেন ফকির মজনু শাহ। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মুসা শাহ, চেরাগ আলি, ভবানী পাঠক, দেবীচৌধুরাণী, কৃপানাথ, নূর মোহাম্মদ, পীতাম্বর, শ্রীনিবাস, অনুপনারায়ণ প্রমুখ। একসময় এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৫০ হাজারে উন্নীত হয়। এই বিদ্রোহকে ৭টি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, প্রথম পর্ব (১৭৬৩-৬৯); দ্বিতীয় পর্ব (১৭৭০-৭২)—এই পর্বে দিনাজপুর-বগুড়া-জলপাইগুড়ি এলাকার বিপুলসংখ্যক কৃষক অংশগ্রহণ করে; তৃতীয় পর্ব (১৭৭৩-৭৮), এই পর্বে রংপুর ও ময়মনসিংহে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে; চতুর্থ পর্ব (১৭৭৫-৮০), এই পর্বে বিদ্রোহ খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং ফকির ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দেয়, মজনু শাহ ঐক্য আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে অনেকটা সফল হন; পঞ্চম পর্ব (১৭৮১-৮৬), এই পর্বে ময়মনসিংহ, বগুড়া প্রভৃতি এলাকায় বিদ্রোহ জোরদার হয়, ১৭৮৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে ফকির মজনু শাহ আহত হন এবং কয়েকদিন পরই তাঁর মৃত্যু ঘটে; ষষ্ঠ পর্ব (১৭৮৭-৯২) এই পর্বে নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠক, দেবীচৌধুরাণী, মুসা শাহ, চেরাগ আলি প্রমুখ; অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মুসা শাহ নিহত হন; সপ্তম বা শেষ পর্ব (১৭৯৩-১৮০০) পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, মালদহ, কুচবিহার প্রভৃতি এলাকায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লেও লর্ড কর্নওয়ালিস তা অবদমিত করতে সক্ষম হন। এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল অভিজ্ঞতার অভাব, বিক্ষিপ্ততা, অন্তর্কোন্দল,

সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি। তথাপি, এই বিদ্রোহই পরবর্তীকালের ব্যাপক কৃষকবিদ্রোহ ও সিপাহিবিদ্রোহের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলে।

সবুজ গ্রন্থ : Green Book. লিবিয়ার নেতা কর্নেল মুয়ামার গাদ্দাফির রাজনৈতিক দর্শনসংবলিত পুস্তক। কর্নেল গাদ্দাফি মনে করেন যে, বর্তমানে যেটাকে 'গণতন্ত্র' বলে অভিহিত করা হচ্ছে, চূড়ান্ত বিচারে তা আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর সংখ্যালঘিষ্ঠেরই শাসন। তিনি আরও মনে করেন যে, সরকার এবং পার্টি দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন হিসাবে বিরাজ করলে দুয়ের মধ্যে ব্যত্যয় ও সংঘাত হতে বাধ্য। গাদ্দাফির মতে, শোষণ ও বৈষম্য কোনোক্রমেই গ্রহণীয় নয় এবং আল-কুরআনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। এই পটভূমিতে সবুজ গ্রন্থের মৌল বক্তব্য নিম্নরূপ ১. তথাকথিত পার্লামেন্টারি আইন নয়—প্রাকৃতিক আইনই হতে হবে রাষ্ট্রের ভিত্তি; ২. প্রচলিত সরকার, যা আসলে জনগণের ঘাড়ে চেপে বসা সরকার, তার অবলুপ্তি ঘটাতে হবে এবং তৎপরিবর্তে দেশের উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র জনগণের কমিটি (People's Committee) প্রতিষ্ঠা করতে হবে; ৩. সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে—তবে তা কমিউনিজমভিত্তিক নয়, বরং তা হবে আল-কুরআনভিত্তিক; ৪. প্রত্যেক নাগরিককের মৌলিক চাহিদা মেটাতে হবে; ৫. ভূমির ওপর থেকে ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটাতে হবে; ৬. স্বাধীনতা অবিভাজ্য, সুতরাং সুখের জন্য প্রত্যেক মানুষকে তার প্রয়োজন মেটানোর স্বাধীনতা দিতে হবে এবং ৭. সকল কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে হবে মুনাফার অবসান।

সবুজপত্র : বা Green Paper. কোনো প্রস্তাবিত আইন পার্লামেন্টে পাশ করানোর পূর্বে, সরকার তার যে-খসড়া ও পটভূমি আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে থাকেন, সেটাকেই বলা হয় সবুজপত্র।

সবুজ বিপ্লব Green Revolution. বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, সেচব্যবস্থা, উন্নত বীজ ইত্যাদি প্রচলনের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করাকেই বলা হয় সবুজ বিপ্লব। এই বিপ্লবের মৌল উদ্দেশ্য হল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র State of the Entire People. যে-রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণের ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে তাকেই বলে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র। সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ের স্তরে এরূপ রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। বস্তুত, এটা হল সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের পরবর্তী স্তর, যে-স্তরে সর্বহারা শ্রেণীর ঐহিহাসিক দায়িত্ব সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং সাম্যবাদী সমাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রের মূল কথা হল এই যে, এই রাষ্ট্র কোনো শ্রেণী কর্তৃক কোনো শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার যন্ত্র নয়, বরং সকল জনগণেরই রাষ্ট্র। এই পর্যায়ে জনগণের সাম্যবাদী স্ব-প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয় এবং সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক স্যমবাদী সামাজিক সম্পর্কে রূপ পরিগ্রহ করে। সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে সকলেই তাদের সাধ্যানুযায়ী উৎপাদন করে এবং প্রয়োজনানুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী ও সুবিধাদি লাভ করে। বলাবাহুল্য, এরূপ রাষ্ট্র বা সাম্যবাদ অদ্যাবধি কোথাও কায়েম হয়নি। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ধস নামার পর আর তা কখনো আদৌ কায়েম হবে কি না তাও কেউ বলতে পারে না।

সমতা Equality. বুর্জোয়াসমাজে এর অর্থ হল 'আইনের চোখে সমতা'—রাজনৈতিক

বা অর্থনৈতিক সমতা নয়। সমাজতন্ত্রীদের মতে, ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তি এবং শোষকশ্রেণীকে নির্মূল করার পূর্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 'সমতা'-র প্রশ্ন অবান্তর। সুতরাং, সমাজতন্ত্রের বিজয়ের মাধ্যমেই শুধু 'সমতা'-র ভিত্তি রচনা করা সম্ভব।

সমতাবাদ Egalitarianism. এই মতবাদীদের মতে একটা রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা একদম সমান-সমান হতে হবে। সমতাবাদীদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের মতে, এই সমতা হবে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ও অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক রাজনৈতিক দল করার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার, ভোট দেওয়ার এবং আইনের আশ্রয় পাওয়ার ক্ষেত্রে একদম সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করবে। দ্বিতীয় ভাগের মতে, সমতা হতে হবে সুযোগ (Opportunity)-এর ক্ষেত্রে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ পেশা এবং সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সম্পূর্ণ সমান সুযোগ থাকতে হবে। যেমন– পিতার অবস্থান বা সামর্থ্য নির্বিশেষে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের যে শিক্ষায়তনে খুশি সেই শিক্ষায়তনে পড়ার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। তৃতীয় ভাগের মতে, সমতা শুধু সুযোগের ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও সমতা থাকতে হবে। এই মতবাদের বিরোধীদের মতে, সমতাবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করে, উদ্যোগকে ব্যাহত করে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বলতার পরিচয় দেয়।

সমতাবাদী দল Levellers. ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর গৃহযুদ্ধের সময় এই দল গঠিত হয়। এদের লক্ষ্য ছিল সর্ব প্রকার সামাজিক বৈষম্য নির্মূল করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এই দল ক্রমওয়েলের একনায়কবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ১৬৪৯ সালে বিদ্রোহ করে এবং পরিণামে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সমবায় Co-operative. কিছুসংখ্যক ব্যক্তি যখন যৌথভাবে কোনো অর্থকরী কর্মকাণ্ডে শামিল হয়; তখন তাদের সম্মিলিত রূপ বা সংগঠনকে বলে সমবায়। সমবায় বিভিন্ন প্রকার হতে পারে; যেমন, ভূমিহীনদের সমবায়, কৃষকদের সমবায়, ব্যবসায়ীদের সমবায়, বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সমবায় ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিশ্র সমবায়ও গড়ে উঠতে দেখা যায়। সমবায় ব্যবস্থায় সমবায়ীরা তাদের সম্পদ (যেমন, জমি বা অপর কোনো উৎপাদনযন্ত্র ও উপকরণ ও পুঁজি)-কে একত্র করে, একত্রে খাটায় এবং লভ্যাংশকে যার যার বিনিয়োজিত পুঁজি, শ্রম ইত্যাদি অনুপাতে ভাগ করে নেয়। সমবায়ের ব্যবস্থাপনায় থাকে সমবায়ীদের নির্বাচিত কমিটি। ডেনমার্ক ও অন্যান্য স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসহ পৃথিবীর কিছু-কিছু দেশে ব্যাপক সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর হয়েছে।

সমরবাদ Militarism. সামাজিক শক্তির দ্বারাই অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা যায়—এই মতবাদ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে হিটলার ও মুসোলিনি এই মতবাদের ভিত্তিতে স্ব স্ব সামরিক শক্তি গড়ে তোলেন এবং নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। আধুনা, পরাশক্তি ও উঠতি পরাশক্তিসমূহও কার্যত সমরবাদের শিকার হয়ে সভ্যতাবিধ্বংসী ভয়াবহ অস্ত্রনির্মাণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সমসমাজ Egalitarian Society. এরূপ সমাজব্যবস্থার মূলকথা হল মানবজাতির সকল সদস্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতাবিধান। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমতাবাদ বা Egalitarianism- এর ভিত্তিতে স্ব স্ব দেশের শ্রেণীদ্বন্দ্বকে অনেকখানিই ভোঁতা করে দিয়েছে; সমাজের পিছিয়ে-পড়া মানুষদের মৌলিক সমস্যাদিও মোটামুটি মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সমসমাজ মতবাদীরা মনে করেন যে, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, শ্রেণীঘৃণা ও শ্রেণী-একনায়কত্বের পথে না গিয়েও মেহনতি মানুষের সমস্যার সমাধান করা যায় এবং সামাজিক বৈষম্যও কমিয়ে আনা সম্ভবপর হয়।

সমাজকল্যাণ : Social Welfare. সরকার ও বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহসংস্থান ইত্যাদির ব্যাপারে যে-সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সেগুলোকে বলা হয় সমাজসেবা বা সমাজকল্যাণমূলক কাজ। সমাজতন্ত্রীদের মতে এসব সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক কাজ আসলে বৈষম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন তো করেই না, বরং জনগণকে পঙ্গু ও করুণানির্ভর করে তোলে, সমাজের বিপ্লবী পরিবর্তনকে পিছিয়ে দেয় এবং বৈষম্যপূর্ণ সমাজটাকেই পাকাপোক্ত করার প্রয়াস পায়।

সমাজতন্ত্র Socialism. এটি সাম্যবাদ বা Communism- এর পূর্ববর্তী স্তর। এই স্তরে ধনিক বা বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণী ও তাদের মিত্রেরা ক্ষমতা দখল করে। এই স্তরে কলকারখানা, জমি ইত্যাদি সম্পত্তির ওপর সমাজের তথা জনসাধারণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কাল্পনিক সমাজতন্ত্র (Utopian Socialism)-এর চিন্তা শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে। এই মতবাদীরা মনে করতেন যে বিপ্লব নয়, প্রচারের মাধ্যমেই আদর্শ সমাজ কায়েম করা সম্ভবপর। চার্লস ফ্যুরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭), সেন্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫), রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) প্রমুখ ছিলেন এই ঘরানার দার্শনিক। প্রুধোঁ (১৮০৯-৬৫) প্রমুখও সমাজতন্ত্রের নামে নৈরাজ্যবাদী দর্শন প্রদান করেন। ১৮৪৮ সালে মার্কস (১৮১৮-৮৩) ও এঙ্গেলস (১৮২০-৯৬) 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' প্রকাশ করলে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। তাঁরা প্রমাণ করেন যে, একমাত্র শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তি অর্জন সম্ভবপর। এর ফলশ্রুতিতে দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে ওঠে এবং বিশ্বের সকল সমাজতন্ত্রীদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়। ১৮৬৫ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর উদ্যোগে প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৭০ সালে ফরাসি বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বে 'প্যারি কমিউন' গঠিত হয়। কিন্তু অচিরেই কমিউনের পতন ঘটে এবং ১৮৭২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক ভেঙে যায়। ১৮৮৯ সালে এঙ্গেলসের উদ্যোগে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হয়। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি রাশিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করে। ১৯১৮ সালে লিবনেষ্ট (১৮৭১-১৯১৯) ও রোজা লুক্সেমবার্গ জার্মানিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়ে ব্যর্থ হন এবং তাঁদের গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯২০ সালে লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হয়। ইতিমধ্যে, পৃথিবীর বহুদেশেই সামাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপর ইউরোপের চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও যুগোস্লাভিয়ায় সমাজতন্ত্র কায়েম হয়। ১৯৪৯ সালে চীনে

সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদের ধ্বংসাবশেষকে উচ্ছেদ করে মাও ঝে ডংয়ের নেতৃত্বে নয়া গণতন্ত্র বা জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর কোরিয়াও একইভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়। পরবর্তীতে কিউবা, মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরাক, ইয়ামেন, তানজানিয়া, জিম্বাবি প্রভৃতি দেশে নতুন পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলে। ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশসমূহে নতুন ধরনের সমাজতন্ত্র বা ইউরো-কমিউনিজমের তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ৮০-র দশক থেকেই শুরু হয় সমাজতন্ত্রের পতন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে 'সমাজতন্ত্র'কে বর্জন করে। চীনসহ অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশও গ্রহণ করে মুক্তবাজার অর্থনীতি বা পুঁজিবাদের পথ।

সমাজতন্ত্র, ইসলামি : ইসলাম ধর্মে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে, ইসলামের প্রথম যুগের খলিফারা, বিশেষত দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর বিন খাত্তাব (রা)-এর আমলে যে-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করার প্রয়াস পাওয়া হয়েছিল, বিশেষত মহানবী (সা)-র অন্যতম সাহাবি হজরত আবু যর গিফ্‌ফারি (রা) কুরআন-সুন্নাহ্‌ভিত্তিক যে অর্থনৈতিক দর্শনের রূপরেখা প্রদান করেছেন সেটাকেই বলা হয় ইসলামি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক বলার কারণ এই যে, এই ব্যবস্থাও শোষণ ও স্বৈরাচারকে অস্বীকার করে, বৈষম্যের অবসানের কথা বলে এবং মূলত ব্যক্তিমালিকানাকে নিরুৎসাহিত করে। বর্তমানে কিছু-কিছু রাষ্ট্রে ইসলামি সমাজতন্ত্র কায়েমের চেষ্টা চলছে। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামি সমাজতন্ত্রের মূল পার্থক্য এই যে, ইসলামি সমাজতন্ত্র একদিকে সমাজে সমাজতন্ত্র বা সুষম বণ্টনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, অন্যদিকে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ওপরও পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, যা মার্কসবাদীরা করে না। বর্তমানে ইরান, লিবিয়া প্রভৃতি কতিপয় দেশে স্ব স্ব পন্থায় এরূপ সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করার প্রয়াস চলছে।

সমাজতন্ত্র, খ্রিস্টীয় Christian Socialism. এটা কোনো সুসংগঠিত আদর্শ বা আন্দোলন নয়। এই মতবাদের প্রবক্তারা বলে যে, সমাজতন্ত্র ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক মূল্যবোধগত মিল আছে বিধায়, একধরনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব। কেউ-কেউ আবার এ-যুক্তিও প্রদর্শন করেন যে, খ্রিস্টধর্মই বনেদি মার্কসবাদকে একটি নৈতিক ভিত্তি দিতে পারে। এই মতবাদীরা মনে করেন যে, সাম্য, সম্পদের সামাজিক অংশীদারিত্ব, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, প্রতিযোগিতা বর্জন, মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বের অবসান ইত্যাদি উপাদান সমাজতন্ত্র ও খ্রিস্টধর্ম—উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে লভ্য। কোনো কোনো দেশের ক্যাথলিক চার্চও এ-ধরনের বক্তব্য প্রচার করে। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সের Mouvement Republicaine Populaire-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ল্যাটিন আমেরিকা ও নেদারল্যান্ডসেও খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রের প্রবণতা দেখা যায়।

সমাজতন্ত্র, জাতীয় National Socialism. এটি ছিল জার্মানির নাৎসি পার্টির মতবাদ। নাৎসিরা উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা বললেও তারা আসলে শ্রেণীর অস্তিত্বে ও শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস করত না। তারা বিশ্বাস করত জার্মান জাত্যাভিমানে এবং মনে করত যে অজার্মানরা জার্মান জাতির ঐক্যের পক্ষে হুমকিস্বরূপ। জাতীয় সমাজতন্ত্র ছিল কার্যত ফ্যাসিবাদ, বর্ণবাদ এবং ইহুদি বিরুদ্ধবাদ দ্বারাই প্রভাবিত।

সমাজতন্ত্র, সংসদীয় Parliamentary Socialism. বুর্জোয়া পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করা যায়,—এই মতবাদ। মার্কসবাদীদের মতে এরূপ চিন্তা সংশোধনবাদী (Revisionist)। ব্রিটেনের লেবার পার্টি সংসদীয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে। এর সমালোচকদের মতে বুর্জোয়া পার্লামেন্টে যারাই নির্বাচিত হবে তারাই কমবেশি একই রূপ আচরণ করবে এবং পার্লামেন্টে পাশ-করা আইনের মাধ্যমে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিবর্তন হবে অসম্ভব। এর উত্তরে সংসদীয় সমাজতন্ত্রীদের বক্তব্য হল এই যে, পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পর সমাজতন্ত্রীরা আইন প্রণয়ন করে গোটা বুর্জোয়া ব্যবস্থাটাকে বাতিল করে দিতে পারে এবং সমাজতন্ত্রায়নের যাবতীয় ক্ষমতা সরকারকে দিতে পারে। তাঁদের আরও যুক্তি হল এই যে, পুঁজিবাদী-গণতান্ত্রিক সমাজের মানুষ সশস্ত্র বিপ্লব বা শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী হবে না। ইতালির গ্রামসি (Gramsci) এইরূপ তত্ত্ব দিয়েই ইতালির কমিউনিস্ট পার্টিকে বিপ্লবের পথ থেকে পার্লামেন্টারি আন্দোলনের পথে নিয়ে আসেন।

সমাজতন্ত্র, সবুজ Green Socialism. পরিবেশবাদী দল (Ecological or Environmental Political Parties) ও আন্দোলনসমূহই এই মতবাদের কথা বলে। বস্তুত, জার্মান ইকোলজি পার্টিই গ্রীন সোশ্যালিস্ট পার্টি নামে পরিচিত। সবুজ সমাজতন্ত্রীরা পরিবেশগত উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং পাশাপাশি মানুষের জীবনধারণে পরিবেশের বস্তুগত উন্নয়ন, উদার সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদির ওপর জোর দেয়। বর্ণগত সহিষ্ণুতা ও বাক্‌স্বাধীনতাকেও তারা গুরুত্ব প্রদান করে। সর্বহারা বা শ্রমিকশ্রেণীর চাইতে মধ্যবিত্ত রেডিক্যালদের কাছেই এদের আবেদন বেশি। সবুজ সমাজতন্ত্র পরিবেশবাদ (Environmentalism) হিসাবেও পরিচিত।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র Socialist Democracy. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রদত্ত গণতান্ত্রিক সুযোগকে বলে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। এরূপ গণতন্ত্রে জনগণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কাঠামো ইত্যাদির বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে না বটে; কিন্তু এই ব্যবস্থা ও কাঠামোর আওতায় পর্যাপ্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। সোভিয়েত নেতা মিখাইল সুসলভ প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন।

সমাজতন্ত্রী, ভুয়া যারা মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু কার্যত সমাজতন্ত্রের মূলসূত্রসমূহে (যেমন দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম, সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব ও একনায়কত্ব ইত্যাদিতে) বিশ্বাস করে না, তাদেরকেই বলা হয় ভুয়া সমাজতন্ত্রী। অনেক সময় সমাজতন্ত্রের শত্রুরাই সমাজতন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ভুয়া সমাজতন্ত্রীদের খাড়া করে দেয়। আবার মতের মিল না হলে সমাজতন্ত্রীদের এক দলও অপর দলকে ভুয়া সমাজতন্ত্রী বলে আখ্যায়িত করে।

সমাজসচেতনতা Social Consciousness. অর্থাৎ সমাজের মূল দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের ধারা ও ফল সম্পর্কে সচেতনতা। অবস্থিত বিশ্বপরিস্থিতি ও তার আলোকে সংশ্লিষ্ট সমাজের অবস্থান. উক্ত সামাজের ইতিহাস ও বর্তমান রূপকাঠামো, সম্ভাব্য পরিণতি ইত্যাদিও সমাজসচেতনতার বিষয়।

সমান্তরালবাদ Parallelism. স্পেনীয় দার্শনিক বেনেডিক্ট স্পিনোজা (১৬৩২-৭৭)-র মতবাদ। তাঁর মতে জড়বস্তু বা দেহ এবং চেতনা বা মন উভয়ের মাধ্যমেই ঐশ্বরিক সত্তা স্পন্দিত। ফলে, মানসিক ঘটনাবলী ও শারীরিক বা বাস্তব ঘটনাবলী চলে পরস্পরের সমান্তরালে। সুতরাং, এদের মিলিত হওয়া অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয়। বস্তুতে ও চৈতন্যে বা শরীরে ও মনে একই ঈশ্বরের সত্তার প্রকাশ ঘটার তত্ত্বই সমান্তরালবাদ।

সমালোচনা-আত্মসমালোচনা : Criticism and Self-criticism. সংগঠন, নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্য থেকে দোষত্রুটি ও ভুলভ্রান্তি দূরীকরণের একটি পদ্ধতি। মার্কসই এই পদ্ধতির কথা প্রথম উল্লেখ করেন। লেনিন সমালোচনা-আত্মসমালোচনাকে মার্কসীয় সংগঠনের অন্যতম মূলনীতি হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই প্রক্রিয়া অবৈরী দ্বন্দ্বসমূহ সমাধানের মোক্ষম উপায়। মাও ঝে ডংও সমালোচনা-আত্মসমালোচনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বস্তুত, শুধু সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের ক্ষেত্রেই নয়, যে-কোনো সংগঠন ও আন্দোলনকে সুষ্ঠুতর করার জন্য এই প্রক্রিয়া অপরিহার্য। এই প্রক্রিয়ার কয়েকটি মৌল দিক হল নিম্নরূপ ১. সমালোচনা-আত্মসমালোচনার উদ্দেশ্য হবে কোনো ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করা নয়, বরং সহানুভূতির সঙ্গে ভ্রান্তিসমূহ দূর করা; ২. ব্যক্তিগত স্বার্থ, গ্রুপস্বার্থ, বন্ধুত্ব বা অন্য কোনো কারণে ভুল বা দোষের সমালোচনা থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত নয়; ৩. সমালোচনা হওয়া উচিত বস্তুভিত্তিক, নির্ভিক, সার্বিক ও গঠনমূলক; ৪. অন্যের কাজ বা দোষের সমালোচনার পূর্বে নিজের দোষত্রুটি ও ভ্রান্তিসমূহ চিহ্নিত করা দরকার এবং তা সংশোধন করা দরকার। কেননা, আত্মসমালোচনা ছাড়া শুধু সমালোচনায় কখনোই কোনো ফল লাভ করা যায় না। যেমন, যে-ব্যক্তি সংগঠনের মধ্যে নিজেই গ্রুপিং করেন, তিনি যদি অন্যের গ্রুপিং-এর সমালোচনা করেন, তা হলে কোনো ফল হবে না। বলাবাহুল্য, সুষ্ঠু সমালোচনা-আত্মসমালোচনার প্রক্রিয়া ছাড়া কোনো সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনেরই সঠিক বিকাশ সম্ভবপর নয়। সমালোচনা-আত্মসমালোচনা পদ্ধতির সুষ্ঠু অনুসরণই আমলাতান্ত্রিকতা, সেচ্ছাচারিতা ও ব্যক্তিবাদিতারও অবসান ঘটায়; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করে এবং সত্যিকার যৌথতা ও গণতান্ত্রিকতার বিকাশ ঘটায়। সমালোচনা-আত্মসমালোচনার নামে যাতে যথেচ্ছাচার বা নৈরাজ্যের সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও সংশ্লিষ্টদের খেয়াল রাখা দরকার।

সমুদ্রতল চুক্তি Seabed Treaty. ১৯৭০ সালে জাতিসংঘের ২৫তম অধিবেশনে অনুমোদিত এই চুক্তি অনুযায়ী মহাসাগরসমূহের পৃষ্ঠে যাবতীয় পারমাণবিক ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক অস্ত্র মোতায়েন ও পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য প্রভৃতিও এই চুক্তির অংশীদার।

সম্পদ : Resource. একটি নির্দিষ্ট সময়ে সে-সমস্ত বস্তুই সম্পদ, যে-সমস্ত বস্তু নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করে ১. তাদের উপযোগ বা Utility. থাকতে হবে, অর্থাৎ তা কোনো-না-কোনোভাবে তৃপ্তির কারণ হতে হবে; ২. তাদের আর্থিক মূল্য থাকতে হবে; ৩. তাদের সরবরাহের সীমা থাকতে হবে; এবং ৪. তাদের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে। সম্পদের অবশ্যই মালিক থাকতে হবে, তা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজ যা-ই হোক-না কেন। সম্পদ বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন ভূসম্পদ, অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পদ (কলম, ঘড়ি, কাপড়, আসবাবপত্র, বই ইত্যাদি), বাণিজ্যিক সম্পদ

(কল. কারখানা, দোকানপাট, মালামাল ইত্যাদি), সামাজিক সম্পদ (স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ইত্যাদি)। এগুলোকে বলে প্রকৃত সম্পদ। ব্যাংকনোট, ব্যাংকজমা, সেভিংস সার্টিফিকেট ইত্যাদিকে সম্পদ বলে ধরা হয় না, কেননা একটা দেশে অবস্থিত দ্রব্যের বা বস্তুগত সম্পদের পরিমাণ দিয়েই সেদেশ সম্পদশালী নাকি গরিব তা নির্ণয় করা হয়; ব্যাংকজমা, নোট ইত্যাদির পরিমাণ দিয়ে নয়। তবে, কোনো ব্যক্তি তাঁর জমা টাকাকে সম্পদ বলে বিবেচনা করতে পারেন বটে, কেননা তিনি ওই টাকার বিনিময়ে সম্পদ আহরণ করতে পারেন।

সম্পদ, জাতীয় National Resource. এটি হল কোনো জাতির সমগ্র সম্পদের সমষ্টি। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-৯০)-এর মতে সূর্যের আলো, বৃষ্টি পানি, নদী, জলপ্রপাত, খনি, জমি ইত্যাদি প্রকৃতির দানসমূহই হল জাতীয় সম্পদ। বলাবাহুল্য, এই মতানুযায়ী শিল্পজাত পণ্যাদি উপরোক্ত সম্পদসমূহেরই পরিবর্তিত রূপ মাত্র। একটি জাতির জাতীয় সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় চারটি উপায়ে ১. আয়করের পরিমাণের সাহায্যে, ২. মোট পুঁজির মাধ্যমে ৩. পুঁজির ওপর ধার্য করা করের হিসাবে এবং ৪. আদমশুমারির সময় জনগণের আয়ব্যয়ের খতিয়ান নেওয়ার মাধ্যমে। উপরোক্ত কোনো পদ্ধতিই পুরোপুরি ত্রুটিহীন নয় বিধায় অনেকের মতে জাতীয় সম্পদের পরিমাণ বাস্তবিকই নির্ধারণ করা অসম্ভব।

সরকার : Government. যেসব ব্যক্তি কোনো-একটি দেশের শাসনসংক্রান্ত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালনা করেন, তাঁদেরকেই সম্মিলিতভাবে বলা হয় 'সরকার'। পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের সরকার দেখা গেছে; যেমন, রাজতান্ত্রিক সরকার (যে-সরকারে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজারাই সর্বেসর্বা; উদাহরণ, আলেজান্ডার বা সম্রাট আকবরের সরকার), সামন্তবাদী সরকার (রাজতন্ত্রেরই এক রূপ, যেখানে সামন্তপ্রভুরাও কর্তৃত্ববান, যেমন হাউস অব কমন্স গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার) ধনিকতন্ত্র (বা Plutocracy) পুরোহিততন্ত্র (বা Theocracy), স্বৈরতন্ত্র (বা Autocracy কিংবা Absolutism, যেখানে শাসক একজন বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন এবং তারা স্বেচ্ছাচারী), একনায়কত্ব (ব্যক্তি বা শ্রেণীর একাধিপত্য), গণতন্ত্র (জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার), সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ (প্রচলিত আর্থে সরকারহীন সরকার, কেননা ওই পর্যায়ে শোষণ ও আধিপত্যকারী শ্রেণী অবলুপ্ত হয়ে যায়) ইত্যাদি। মানবসমাজে শ্রেণীর উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষকশ্রেণীর মধ্যে যারা প্রবল, সরকার অবশ্যম্ভাবীরূপেই তাদেরই নিয়ন্ত্রণে ও দখলে থাকে। গ্রিক সভ্যতার সময় সিটিস্টেটসমূহে যে-গণতন্ত্র গড়ে উঠেছিল, তা আসলে ছিল অভিজাততন্ত্র, কেননা ওই গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল শুধুমাত্র দাস-মালিকদের (যারা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৭%); দাসদের (যারা মোট জনসংখ্যার ৯৩%) সে-সমাজে মানুষ বলেই গণ্য করা হত না। পরবর্তীতে উদ্ভূত সকল সরকারও ছিল শোষকদের প্রবল অংশের সরকার। ইসলামের আবির্ভাবের পর সরকারকে জনগণের ইচ্ছাধীন এবং শোষণমুক্তির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার প্রয়াস পাওয়া হয়। কিন্তু ত ৎকালীন বিশ্বব্যাপী সামন্তবাদের পটভূমিতে তা খুব একটা শিকড় গাড়তে পারেনি। বস্তুত, খুলাফায়ে রাশেদার পরপরই ইসলামি বিশ্বও পুনরায় কোনো-না-কোনোরূপ রাজতন্ত্রে ফিরে যায়। তথাপি ইসলাম সমগ্র জনগণের সরকারেরই দাবি উত্থাপন করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর উগ্র জাতীয়তাভিত্তিক ফ্যাসিবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন হিটলার, মুসোলিনি, ফ্রাঙ্কো প্রমুখ। ১৯৪৯ সালে চীনে গঠন করা হয় নয়া-গণতান্ত্রিক সরকার (সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সকল নিপীড়িত জনগণের সরকার)। সম্প্রতি আর একধরনের সরকার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন লিবিয়ার মুয়ামার গাদ্দাফি। তাঁর সরকারপদ্ধতিতে সমগ্র জনগণ সরাসরিই সরকারে অংশগ্রহণ করবে এবং সমগ্র জাতিই একটিমাত্র কাঠামো ও শৃঙ্খলার আওতায় থাকবে।

সরকার, গণপ্রতিনিধিত্বশীল Representative Government. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকার। সাধারণত এরূপ সরকারের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট বা আইনসভাই হয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

সরকার, প্রেসিডেন্সিয়াল যে-সরকারে প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি শুধু রাষ্ট্রপ্রধানই নন, সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রের চীফ এক্সিকিউটিভও বটে, সেই সরকারকে বলা হয় প্রেসিডেন্সিয়াল সরকার। এই পদ্ধতির সরকারে প্রধানমন্ত্রী থাকলেও তিনি সরকারপ্রধান বা চীফ ও এক্সিকিউটিভ নন। প্রেসিডেন্সিয়াল সরকার স্বৈরাচারীও হতে পারে, আবার গণতান্ত্রিকও হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্সসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতির সরকার চালু আছে।

সর্বজনীন ভোটাধিকার সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার (Universal Adult Franchise). সামাজিক অবস্থান, জাতি ধর্ম বর্ণ ও নরনারী-নির্বিশেষে দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের স্বাধীনভাবে ভোটদানের অধিকারকেই বলে সর্বজনীন ভোটাধিকার। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত আঠারো বছরের ঊর্ধ্ববয়স্ক সকল নরনারীই ভোটদানের অধিকার লাভ করে। ফরাসি বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে ১৭৯১ সালে ফ্রান্সে সর্বপ্রথম সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়। অতঃপর ১৮৭১ সালে জার্মানিতে এবং ১৮৯০ সালে স্পেনেও এ-অধিকার প্রদান করা হয়। ইংল্যান্ডে চার্টিস্ট আন্দোলনে (১৮৪৮) এ-দাবি উত্থাপিত হলেও এ-অধিকার কার্যত স্বীকৃতিলাভ করে ১৯২৮ সালে।

সর্বমত সমন্বয়বাদ Electicism. এটি একটি প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক মত। এই মতের সমর্থকগণ কোনো একটি বিশেষ মত গ্রহণ না করে, সকল মতের শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলো সংগ্রহ করতেন এবং সেই বিষয়গুলো দিয়ে একটি নীতিশাস্ত্র রচনা করে সে-অনুযায়ী জীবনযাপন করাকে যথার্থ বিবেচনা করতেন।

সর্বহারাদের অগ্রবাহিনী Vanguard of the Proletariat. মার্কসবাদীরা কমিউনিস্ট পার্টিকেই সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রবাহিনী বা নেতৃত্বদানকারী স্তর বলে বিবেচনা করেন। এই পার্টিই জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে জাগিয়ে তোলে এবং বিপ্লবে তাদের নেতৃত্ব দেয়। বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পর সমাজতান্ত্রিক সমাজনির্মাণের প্রয়োজনে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়ক (Dictatorship of the Proletariat) কায়েম করা হয়, যা কার্যত কমিউনিস্ট পার্টিরই একদলীয় শাসন। মার্কস ও এঙ্গেলস সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রবাহিনীর তত্ত্বের উদ্যোক্তা হলেও লেনিন, স্ট্যালিন ও মাও সেতুংও স্ব স্ব প্রয়োজন অনুযায়ী এর সংজ্ঞাকে পুনর্বিন্যস্ত করে নেন।

সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ Proletarian Internationalism. সকল দেশের সকল সর্বহারা ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সংহতির আদর্শ। শ্রমজীবী মানুষ ও

তাদের সংগঠন পরিচালনার এটি অন্যতম মূল নীতি। মার্কস-এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এ সর্বপ্রথম এই ঐক্যের আহ্বান জানান। এই আদর্শের মূলমন্ত্র একটি স্লোগানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। স্লোগানটি হল 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। শ্রমিকশ্রেণী তার সংগ্রামকে অন্য দেশের সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে না; কেননা, শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু শুধু নিজদেশের বুর্জোয়ারাই নয়, অন্য দেশের বুর্জোয়ারাও বটে। ফলে সকল দেশের সর্বহারা শ্রেণীর মৌল স্বার্থ একই সূত্রে গ্রথিত বলে সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদীরা বিশ্বাস করেন।

সর্বহারা শ্রেণী Proletariat. যে-সমস্ত মানুষের নিজেদের কোনো জমি বা উৎপাদনের উপকরণ নেই, যারা বেঁচে থাকার জন্য সারাজীবন মজুরির বিনিময়ে অন্যের সম্পত্তিতে কাজ করে, তারাই হল সর্বহারা শ্রেণী বা শ্রমিকশ্রেণী বা প্রোলেটারিয়েট। মার্কস-এঙ্গেলস সর্বহারা শ্রেণীকে শ্রমিকশ্রেণী বলেছেন এজন্য যে, তাঁদের দেখা ইউরোপের শিল্প-শ্রমিকেরা ছিল গ্রাম থেকে ছিন্নমূল। মজুরিদাসত্বের শৃঙ্খলা ছাড়া তাদের হারানোর মতো কোনো জমি বা কারখানা বা অন্য কোনো সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বহু দেশে, বিশেষত সাবেক ঔপনিবেশিক দেশসমূহে এমন অনেক শিল্প শ্রমিক রয়েছে, যারা গ্রাম থেকে ছিন্নমূল নয় বরং যাদের গ্রামে নিজস্ব বাড়ি ও কমবেশি জোতজমিও রয়েছে। আবার উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে শ্রমিকদের আজ শৃঙ্খল ছাড়াও হারানোর মতো রয়েছে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, ফ্রিজ-টেলিভিশন-মোটর ইত্যাদি উপকরণ, ইনশিওরেন্স-গ্রুপ ইনশিওরেন্সসহ বহুবিদ সুবিধা। ফলে এদের চরিত্র সাবেকি শিল্পশ্রমিকদের (সর্বহারাদের) তুলনায় অনেকখানি স্বতন্ত্র।

সর্বহারা শ্রেণীর একনায়ত্ব Dictatorship of the Proletariat. বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তিকে হটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি। একনায়কত্ব কথাটির দ্বারা একের ওপর অন্যশ্রেণীর আধিপত্য বোঝায়। যেহেতু সর্বহারা শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরপরই বুর্জোয়াশ্রেণী অন্তর্হিত হয়ে যায় না এবং দেশের ভেতরে-বাইরে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হুমকিরও অবসান ঘটে না, সেহেতু শ্রেণীর অবসান না হওয়া পর্যন্ত শ্রমজীবী মানুষের শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। সর্বহারা শ্রেণী তার একনায়কত্বকে ব্যবহার করে শোষকগোষ্ঠীর বাধাকে প্রতিহত করার জন্য, বিপ্লবের বিজয়কে সুসংহত করার জন্য, বুর্জোয়াদের পুনরভ্যুত্থানের যাবতীয় প্রয়াসকে ব্যহত করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তকে বানচাল করার জন্য। কিন্তু, সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রধান কাজ সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক; আর সেটা হল ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণকে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব কোনো লক্ষ্য নয়, শ্রেণীহীন-শোষকহীন সমগ্র জনগণের সমাজ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য ধাপমাত্র। এর অন্যতম মৌল নীতি হল সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণ ও কৃষকদের মৈত্রী গড়ে তোলা। সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি, যা মেহনতি মানুষেরই অগ্রণী বাহিনী, এই একনায়কত্বের নেতৃত্বে থাকে ও প্রধান পরিচালিকা শক্তির দায়িত্ব পালন করে। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের সহায়ক হিসাবে থাকে জনগণ, শ্রমিক, কৃষক, যুবক, মহিলা ও ছাত্রদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সমবায়, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি। এগুলোই জনগণের সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণীর সেতুবন্ধ হিসাবে কাজ করে।

সর্বাধিনায়ক Commander-in-Chief. সশস্ত্রবাহিনীসমূহের প্রধানকেই বলে সর্বাধিনায়ক। সাধারণত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধীনে সশস্ত্রবাহিনীসমূহের অর্থাৎ স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী ইত্যাদির আলাদা আলাদা প্রধান বা চীফ অব স্টাফ (Chief of Staff) থাকতে পারেন।

সর্বাশাবাদ Optimism. এই দার্শনিক মতবাদের মৌলকথা নিম্নরূপ: ১. সর্ব অবস্থাতেই মনে আশা পোষণ করা উচিত ২. ঈশ্বরের তৈরি বিশ্বসংসারই সর্বোৎকৃষ্ট, এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোনো জগৎ নাই (দার্শনিক লাইবনিজ এই মতবাদ পোষণ করতেন) এবং ৩. বিশ্বে শেষ পর্যন্ত অমঙ্গলের ওপর মঙ্গলের এবং অশুভের ওপর শুভের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবেই।

সর্বেশ্বরবাদ সমস্ত কিছুই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সমস্ত কিছু,—এই দার্শনিক মতবাদই সর্বেশ্বরবাদ বা Pan-Theism।

সর্বোদয় সর্বোদয় বা জনগণের সকল অংশের উদয় বা সার্বিক অগ্রগতি হল গান্ধীবাদী আন্দোলনের মৌল লক্ষ্য। সর্বোদয় বলতে গান্ধীজী বোঝাতেন আপামর জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মুক্তি। শুধুমাত্র রাজনৈতিক মুক্তি ছিল তাঁর কাছে অর্থহীন। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে রাস্কিনের 'আনটো দিস লাস্ট' গ্রন্থটি পড়ে সর্বোদয়ের ধারণা লাভ করেন। তাঁর মতে, "অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র ধাপ্পামাত্র। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতারই ফলশ্রুতি হল সাম্রাজ্যবাদ। সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসনও তেমনি নির্যাতনমূলক হতে পারে। তাই সরকার হওয়া উচিত নির্দলীয় বা সর্বদলীয়। আন্তদলীয় হানাহানি, চাঁদা উত্তোলন ও বক্তৃতা 'প্রকৃত গণতন্ত্র' হতে পারে না।" সর্বোদয়বাদীরা উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণে এবং ঘাসমূলের জনগণকে সংগঠিত করে 'পঞ্চায়েত রাজ' কায়েমে বিশ্বাস করেন। একবার একদল ইউরোপীয় ও আমেরিকান মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে চান, পাশ্চাত্য রাজনৈতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী সর্বোদয়কে কী বলে অভিহিত করা যেতে পারে। গান্ধীজি বলেন যে, একে বলা যেতে পারে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিষ্ঠিত 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' বা Democratic Socialism. গান্ধীজি তাঁর এই নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের প্রক্রিয়া হিসাবে 'সত্যগ্রহ'-কেই বেছে নেন। জয়প্রকাশনারায়ণ এবং আচার্য বিনোবাভাবে ছিলেন সর্বোদয় আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। সমাজতন্ত্রের মতোই সর্বোদয় বিশ্ববিপ্লবে বিশ্বাস করে। এজন্য এর পতাকায় 'জয় হিন্দ' এর বদলে উৎকীর্ণ থাকে 'জয় জগৎ'।

সল্ট মারাত্মক অস্ত্র সীমিতকরণ আলোচনা বা Strategic Arms Limitation Talks. সংক্ষেপে SALT. দুই পরাশক্তি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা ১৯৬৯ সালের ১৭ নভেম্বর হেলসিংকিতে মারাত্মক অস্ত্র সীমিতকরণের জন্য সর্বপ্রথম মিলিত হন। এরপর কয়েক দফায় তাঁদের মধ্যে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আন্ত মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ, বিভিন্ন প্রকার পারমাণবিক ও রশ্মিবোমা সীমিতকরণ ইত্যাদিই ছিল এই আলোচনার বিষয়বস্তু।

সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান : অত্যাচারী ও শোষণমূলক শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী নেতৃত্বে পরিচালিত ও সংঘটিত জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানই

হল সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান বা Insurrection. নিয়মতান্ত্রিক বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে যখন অত্যাচারী শাসক-শোষক গোষ্ঠীকে সরানো আর সম্ভবপর হয় না, তখনই জনগণ বা গণসমর্থিত রাজনৈতিক দল এই পথ বেছে নেয়।

সশস্ত্র নিরপেক্ষতা Armed Neutrality. কোনো যুদ্ধের সময় কোনো রাষ্ট্র যদি যুদ্ধমান কোনো পক্ষ অবলম্বন না করে, অথচ কোনো পক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হলে তা মোকাবেলার জন্য সামরিকভাবে প্রস্তুত থাকে, তা হলে এরূপ নিরপেক্ষতাকে বলা হয় সশস্ত্র নিরপেক্ষতা।

সহঅবস্থান, শান্তিপূর্ণ : ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ ও সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন বিভিন্ন দেশ পরস্পরের প্রতি কোনো বৈরী ভূমিকা না নিয়ে, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করে এবং নিজ নিজ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বহাল রেখে পরস্পর পাশাপাশি অবস্থান করলে, তাকে বলে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান (Peaceful Coexistence)।

সহবাস : Cohabition. ১৯৮৬-৮৮ সালে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সমাজতন্ত্রী ফ্রাঙ্কো মিতেরাঁ (Francois Mitterand) আর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মধ্যপন্থি ও ডানপন্থি কোয়ালিশনের নেতা জ্যাক শিরাক (Jaques Chirac)। একই সরকারে এই দুই বিপরীত আদর্শের লোকের সহ অবস্থানকে বোঝানোর জন্যই সহবাস শব্দটি ব্যবহার করা হত। বস্তুত, এ-পরিস্থিতি শুধু ফ্রান্সে নয়, অন্যান্য দেশেও ঘটে থাকে। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রেসিডেন্ট হয়েছেন রিপাবলিকান দল থেকে, অথচ কংগ্রেসের উভয় হাউসেই রয়েছে ডেমোক্র্যাটদের প্রাধান্য ; কিংবা তার উলটোটি। এক কথায় একই সরকারে দুই বিপরীত বা প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সহ অবস্থানকেই বলে সহবাস।

সাইয়িদ কুতুব (১৯০৬-৬৬) সাইয়িদ কুতুব মিশরের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকারী অন্যতম সংগঠন, পরবর্তীকালে জামাল আবদুল নাসেরের স্বৈরাচারী শাসনবিরোধী রাজনৈতিক দল 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন'-এর নেতা, দলীয় মুখপত্র 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন'-এর সম্পাদক, সাহিত্যিক এবং ইসলামি বিশ্বের অন্যতম পণ্ডিত ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি গ্রেফতার ও অকথ্য শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে নাসের সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। নাসের সরকার কোনো আইনজীবীকে আসামিপক্ষ সমর্থন করার অনুমতি দেয় না। ১৯৬৬ সালে সাইয়িদ কুতুব ও তাঁর দুজন সাথিকে মিলিটারি ট্রাইবুন্যাল মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে এবং বিশ্বের মুসলিম জনমতকে উপেক্ষা করে ১৯৬৬ সালের ২৫ আগস্ট তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব', 'ইসলামি সমাজ বিপ্লবের ধারা' ইত্যাদি।

সাংখ্য 'সং' অর্থ সম্যক ও 'খ্যা' অর্থ জ্ঞান। অর্থাৎ 'সম্যক জ্ঞান' বা পূর্ণ জ্ঞানের ওপর প্রাধান্য দেয় বলেই এই দর্শনের নাম 'সাংখ্য'। মহর্ষি কপিল এই দর্শনের প্রবর্তক। দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী সাংখ্য দার্শনিকদের মতে দুটি মূলতত্ত্ব আছে,—প্রকৃতি এবং পুরুষ। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ, প্রকৃতি অচৈতন্য। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি সক্রিয়, পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা, পুরুষ কূটস্থ-নির্বিকার, প্রকৃতি পরিণামী ও বিকারশীল। পুরুষ নির্গুণ বা গুণাতীত, প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, পুরুষ দ্রষ্টা, প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ বিষয়ী, প্রকৃতি বিষয়।

সাংখ্যমতে, পুরুষ চুম্বকের ন্যায় নিষ্ক্রিয়। পুরুষ হল আত্মাস্বরূপ যা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন। চৈতন্যই পুরুষের ধর্ম। পুরুষ জগতের সৃষ্টি এবং পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেন, কিন্তু নিজে কখনো জগৎসৃষ্টিতে বা পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করে না। আর সক্রিয় প্রকৃতিই জগৎসৃষ্টির আদি কারণ। প্রকৃতি হল অচৈতন্যময় সত্তা, যা সর্বসময় পরিবর্তনের খাতে প্রবাহিত। প্রকৃতির একমাত্র কাজ পুরুষের সন্তুষ্টিবিধান। প্রকৃতি তিনটি গুণের আধার—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সক্রিয় প্রকৃতির সঙ্গে চেতন পুরুষের সংযোগের ফলেই জগতের অভিব্যক্তি ঘটে; অন্যথায় তা ঘটতে পারে না। প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য পুরুষের ভোগের জন্য। আবার মুক্তিলাভের জন্য পুরুষেরও প্রয়োজন বন্ধন, কারণ, বন্ধন না থাকলে মুক্তির তো প্রশ্নই ওঠে না। সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী অভিব্যক্তি বা জীবাত্মাকে তার কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করতে হয়। এই অভিব্যক্তিবাদের মূল উদ্দেশ্য জীবাত্মাকে দুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। নৈতিক শিক্ষা ও সংযমের মাধ্যমে জীবাত্মা সম্যক জ্ঞান বা মোক্ষ লাভ করতে পারে। লক্ষ্যণীয়, সাংখ্যদর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতি যথাক্রমে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির সঙ্গেই সাযুজ্যপূর্ণ।

সাংবিধানিক রাজতন্ত্র : Constitutional Monarchy. যে-শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানি আছেন বটে, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা সংবিধানের বিধির দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং কার্যত যেখানে পার্লামেন্টই মৌল ক্ষমতার অধিকারী—সেইরূপ রাজতন্ত্রকে বলা হয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। ব্রিটেন, জাপান, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, নেপালসহ পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এরূপ রাজতন্ত্র চালু আছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধারণত জনগণের অবস্থিত চিন্তাচেতনা ও ধ্যান-ধারণাকে দ্রুত পালটে দেওয়ার কার্যক্রমকেই বলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব (Cultural Revolution)। তবে ইতিহাসে সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলতে সাধারণত ষাটের দশকের চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবকেই বোঝায়। ১৯৫৮ সালে সূচিত বিরাট উল্লম্ফন কর্মসূচি আশানুরূপ সুফল বয়ে না আনায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। অনেকে মাও ও তাঁর অনুসারীদের সমালোচনা শুরু করেন। অপরদিকে মাওপন্থিরা ব্যর্থতার জন্য 'পার্টি ও সরকারের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা পুঁজিবাদপন্থি (Captitalist Roaders) ও বিচ্যুত'দের দায়ী করেন। এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে, ১৯৬৫ সালে মাও ঝে ডং, লিন বিয়াও (বা লিন পিয়াও)-এর নেতৃত্বাধীন পিপলস লিবারেশন আর্মির সহায়তায় পার্টি, সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসহ সকল পর্যায় থেকে বিরুদ্ধবাদীদের নির্মূল করার এক ব্যাপক অভিযান শুরু করেন। এই অভিযানই চীনের ইতিহাসে সাংস্কৃতিক বিপ্লব নামে খ্যাত। ১৯৬৬ সালের মধ্যে এই অভিযান বা বিপ্লব সমগ্র চীনে ছড়িয়ে পড়ে। মাওয়ের সমর্থক ছাত্র-যুবকেরা সর্বত্র গড়ে তোলে 'রেড গার্ড' বা লাল প্রহরী। বুর্জোয়া ও বিপ্লবী চিন্তাধারার বিরোধী বলে কথিত অসংখ্য নেতা-কর্মী ও কর্মচারীরা বহিষ্কৃত, এমনকি নিহত হন। ১৯৬৮ সালে চীনের রাষ্ট্রপ্রধান, লং মার্চের সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক, 'হাউ টু বি এ গুড কমিউনিস্ট' গ্রন্থের রচয়িতা লিউ শাও কি (লিউ শাও চি)কেও একই অভিযোগে রাষ্ট্র ও পার্টির সকল পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই সময়েই বহিষ্কৃত হন এ দেং জিয়াও পিং-সহ আরও অনেকে। ১৯৬৭-৬৮ সাল নাগাদ রেড গার্ডরা বস্তুত চীনের সকল কর্মকাণ্ডের একক হোতা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৬৯ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান নেতা লিন বিয়াও-কে মাও-এর উত্তরাধিকারী মনোনীত করা

হয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে রেড গার্ডদের বল্গাহীন যথেচ্ছাচার এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় রেড গার্ডদের ঠেকানোর জন্য সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো হয়। ১৯৭১ সালের মধ্যেই লিন বিয়াও ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পালানোর পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। মাওয়ের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখলকারী দেং জিয়াও পিং (তেং শিয়াও পিং)-পন্থিরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তীব্র সমালোচনা করেন, লিউ শাও কি সহ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে নিগৃহীত সকলকে সসম্মানে পুনর্বাসিত করেন এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হোতা প্রধান চারজনকে 'চার কুচক্রী' বলে অভিহিত করে শাস্তিপ্রদান করনে। এখন মনে করা হয় যে, রেড গার্ডরা ব্যক্তিস্বার্থে ও ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর জন্যই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।

সাদা কলারের শ্রমিক White Collar Workers. শিল্পকারখানার কেরানি, ব্যবস্থাপকবৃন্দ, প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কর্মচারীবৃন্দ, পেশাদার কর্মচারী (যেমন, অ্যাকাউন্টেন্ট, ডিজাইনার, কেমিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি) প্রমুখকে বলা হয় সাদা কলারের শ্রমিক, কেননা মেশিন, কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য ইত্যাদির নিবিড় সংস্পর্শে গিয়ে তাদেরকে সাধারণত কাপড় নোংরা করতে হয় না। যান্ত্রিক উন্নয়ন, বিশেষত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাদির যতই উন্নয়ন ঘটছে, ততই সাদা কলারের শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাদা কলারের শ্রমিকের সংখ্যা সাধারণ শ্রমিকের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। ব্রিটেনেও এদের সংখ্যা মোট শ্রমিকের প্রায় অর্ধেকের মতো। কম্পিউটার প্রযুক্তি ও অটোমেশনের বিকাশের ফলে সাবেকি ধরনের নোংরা কাপড় পরিহিত শ্রমিকের ভবিষ্যতে হয়তো কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।

সাধারণ আইন Common Law. কোনো বিচারক যদি কোনো মামলায় কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য বিচারকও যদি উক্ত সিদ্ধান্তকে নজির বা প্রিসেডেন্স হিসাবে বিবেচনা করে একইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তা হলে বিচারের এই ভিত্তিকে সাধারণ আইন বা কমন ল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের আইনব্যবস্থায় এরূপ আইনের ভূমিকা ব্যাপক। বলাবাহুল্য, সাধারণ আইন কোনো আইনসভার দ্বারা প্রণীত আইন বা Civil Law-এর চাইতে স্বতন্ত্র।

সাধারণ ক্ষমা General Amnesty. কোনো সরকার বা কর্তৃপক্ষ যখন সাজাপ্রাপ্ত, বিচারাধীন ও অভিযুক্ত নির্বিশেষে কোনো ধরনের সকল রাজবন্দি বা যুদ্ধবন্দিকে মুক্ত করে দেয়, তখন তাকেই বলে সাধারণ ক্ষমা।

সাধারণ পরিষদ, জাতিসংঘের United Nations' General Assembly. সংক্ষেপে UNGA. জাতিসংঘের সকল সদস্যই এই পরিষদের সদস্য। এর বার্ষিক অধিবেশনে প্রত্যেক সদস্য পাঁচজন প্রতিনিধি ও পাঁচজন বিকল্প প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের ভোট থাকে একটি। প্রত্যেক বছরের সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবারে এই পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদ কিংবা মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চাইলে সেক্রেটারি জেনারেল বিশেষ অধিবেশনও আহ্বান করতে পারেন। জাতিসংঘে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তি বা বহিষ্কার, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রশ্নে সুপারিশ প্রণয়ন, জাতিসংঘের অন্যান্য পরিষদ ও

সংস্থায় সদস্য নির্বাচন, অছিসংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ, বাজেটসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিরূপণ ইত্যাদিই সাধারণ পরিষদের কর্মপরিসরের অন্তর্ভুক্ত। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি এবং উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হয়। সেক্রেটারি জেনারেল এবং নিরাপত্তা পরিষদসহ জাতিসংঘের সকল পরিষদ ও সংস্থা তাদের কার্যবিবরণী এই পরিষদে পেশ করে এবং পরিষদ তা আলোচনা করে সাধারণ নীতিমালা নির্ধারণ করে। সাধারণ পরিষদের কার্যাবলী মূলত এর চারটি কমিটি (যথা, মূল কমিটি ও পদ্ধতিগত কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি ও এড-হক কমিটি)-র মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই পরিষদের প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সান ইয়াৎ সেন : (১৮৬৭-১৯২৫) ম্যাকাও-এর কাছে এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর শিক্ষাজীবন কাটে হনলুলুতে। প্রথম জীবনে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বও গ্রহণ করেন। হংকং-এও তিনি কিছুকাল ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেন। তিনি মাঞ্চুবিরোধী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৮৯৪ সালে 'চীন রক্ষা লীগ' (Save China League) গঠন করেন। এর সদস্যদের অধিকাংশই ছিল চীন থেকে নির্বাসিত। ১৮৯৭ সালে লন্ডনস্থ চীনা কনস্যুলেটের কর্মকর্তারা তাঁকে অপহরণ করে, অবশ্য পররাষ্ট্র দফতরের হস্তক্ষেপের ফলে অল্পদিন পরেই তাঁকে ছেড়ে দেয়। ১৮৯৮ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'তিন নীতি' ঘোষণা করেন। এই তিন নীতি হল স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। এই আদর্শের ভিত্তিতেই ১৯০৫ সালে গঠন করা হয় 'সাধারণ মৈত্রী লীগ' (League of Common Alliance), পরবর্তীকালে কুয়োমিনতাংও গঠিত হয় একই আদর্শের ভিত্তিতে। ১৯১১ সালে চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অবশ্য তিনি দ্রুত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে নানকিংস্থ বিপ্লবী অ্যাসেম্বলি কর্তৃক 'সম্মিলিত চীনা প্রদেশসমূহ' (United Provinces of China)-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু দেশকে সত্যিকার অর্থে ঐক্যবদ্ধ করার মানসে কয়েক মাস পরেই তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি ইউয়ান শি কাই ও তার চক্রের বিরোধিতা করেন এবং চীনের দক্ষিণাঞ্চলে, বিশেষত ক্যান্টন (বর্তমান গোয়াংজো) এলাকায় যথেষ্ট প্রভাববিস্তার করেন। ১৯২২ সাল থেকে তিনি রুশ সাহায্য পেতে শুরু করেন এবং ১৯২৪ সালে তাঁর বক্তব্যকে এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করেন যাতে কমিউনিস্টরাও কুয়োমিনতাং-এ যোগদান করতে পারে। ১৯২৫ স্যালে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁরই নিকটাত্মীয় চিয়াং কাই শেক তাঁর স্থলভিষিক্ত হন। কিন্তু চিয়াং কাই শেক-এর অনুসারী এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে দ্রুত মতভিন্নতা দেখা দেয়।

সাপটা : SAARC Preferential Trade Arrangements (SAPTA). অর্থাৎ সার্ক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যব্যবস্থা। সাপটার উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ব্যাবসা-বাণিজ্য উন্নয়নকল্পে পারস্পরকে অগ্রাধিকারমূলক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। এই সুযোগ-সুবিধার অন্যতম হচ্ছে সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পণ্য আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যশুল্ক রহিত বা হ্রাস করা।

সাফটা South Asia Free Trade Agreement (SAFTA) অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। ২০০০ সালের মধ্যে সার্কভুক্ত ৭টি দেশের মধ্যে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত

ব্যাবসা-বাণিজ্য চালু করা সাফটার লক্ষ্য। এ-ব্যাপারে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, সাফটা চালু হলে কার্যত এই ৭টি দেশের মধ্যে যে-দেশটি সবচেয়ে শিল্পায়িত ও শক্তিশালী সেই দেশটিই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে।

সামন্তবাদ Feudalism. এটি দাস বা আদি গোষ্ঠীব্যবস্থাকে অপসারিত করে উদ্ভূত সমাজব্যবস্থা। সামন্তসমাজের দুই প্রধান শ্রেণী হল সামন্ত প্রভু এবং ভূমিদাস বা কৃষকেরা। সমকালীন অমাত্য এবং চার্চ বা ধর্মীয় পুরোহিতেরাও ছিল শোষক সামন্তপ্রভুদের গোত্রভুক্ত। শোষিত কৃষক বা ভূমিদাসদের কোনো রাজনৈতিক অধিকারই ছিল না। শহরগুলো ছিল মালিক, ভ্রাম্যমাণ শ্রমিক বা জার্নিম্যান, শিক্ষানবিশ, অদক্ষ শ্রমিক প্রভৃতি অধ্যুষিত। সামন্তবাদী ব্যবস্থায় জমির মালিক ছিল ভূস্বামী বা সামন্তপ্রভু। কৃষক বা ভূমিদাসদের জমির ওপর কোনো স্বত্ব ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, ভূমিদাসরা সংশ্লিষ্ট সামন্তপ্রভুর সঙ্গে ব্যক্তিগত আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য ছিল এবং কার্যত তারা পরোক্ষ পণ্যরূপেই ব্যবহৃত হত, যেমন সামন্তপ্রভু তার জমিদারি বিক্রয় বা হস্তান্তরিত করে দিলে, ওই জমিদারিস্থ ভূমিদাসরাও নতুন প্রভুর হাতে হস্তান্তরিত হয়ে যেত। দাসদের সঙ্গে ভূমিদাসদের পার্থক্য ছিল এই যে, ভূমিদাসদের ক্রীতদাসদের মতো বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হত না এবং তারা আলাদা গৃহস্থালি, সামান্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিজেদের এক্তিয়ারে রাখতে পারত। এই ব্যবস্থায় শ্রম-খাজনা, সেবা-খাজনা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুদ্রা-খাজনারও প্রচলন ছিল। অধিকাংশ সময় এই খাজনা শুধু ভূমিদাসের উদ্বৃত্ত শ্রমই নয়, প্রয়োজনীয় শ্রমটুকু পর্যন্ত শোষণ করে নিত। উপরিকাঠামোয় সামন্তবাদের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ১. সামন্তবাদী রাষ্ট্র অনিবার্যভাবেই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের ওপর অধিষ্ঠিত ছিল এবং ২. সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর ধর্মীয় আদর্শের ছিল একচ্ছত্র প্রভাব। সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্র ছিল প্রধানত স্থবির এবং প্রযুক্তি ছিল খুবই প্রাথমিক ধরনের।

সাময়িক যুদ্ধবিরতি Armistice. সাধারণত স্থায়ী শান্তিচুক্তির উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা শুরুর জন্য সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রাখাকেই বলে সাময়িক যুদ্ধবিরতি।

সামরিক আইন Martial Law. অর্থাৎ সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক দেশশাসনের আইন। সশস্ত্রবাহিনী দুভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসতে পারে। এক. দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যিনি সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়কও বটেন, তিনি কোনো সময় জরুরি বিবেচনা করলে পার্লামেন্ট, মন্ত্রিসভা ইত্যাদি ভেঙে দিয়ে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে সশস্ত্রবাহিনীর হাতে দেশশাসনের ভার অর্পণ করতে পারেন; দুই. সশস্ত্রবাহিনী বা প্রধান সেনাপতি বা অপর কোনো কর্মকর্তা সামরিক অভ্যুত্থান বা কু দ্যতার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক সরকারকে বা অপর সামরিক সরকারকে অপসারণ করে ক্ষমতা দখল করতে পারেন। সামরিক আইন জারি হলে স্বভাবতই সামরিক কর্তারাই বেসামরিক কর্তৃত্বও গ্রহণ করেন। এ-ব্যাপারে প্রচলিত শাসনতন্ত্র ও আইন অপর্যাপ্ত বিধায় সামরিক শাসককরা শাসনতন্ত্র স্থগিত বা বাতিল করে সামরিক অধ্যাদেশ ইত্যাদির মাধ্যমেই শাসনকার্য পরিালনা করেন। মোট কথা, সামরিক আইন হল সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও তা পরিালনা করার আইন, যে-আইন জারি হলে সাধারণত দেশের শাসনতন্ত্র অকার্যকর হয়ে যায় এবং প্রচলিত আইনের ওপর সামরিক আইন প্রাধান্য লাভ করে। অনুন্নত বিশ্বের

প্রায় দেশে প্রায়শই সশস্ত্রবাহিনীসমূহ ক্ষমতা দখল করে এবং সামরিক আইন জারি করে। সামরিক আইন সাংবিধানিক ও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত না হলেও কার্যত আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত।

সামরিক গণতন্ত্র Military Democracy. রাষ্ট্রের উদ্ভবের কালে যে-গণতন্ত্রের সূচনা হয়, সেটাকেই মরগ্যান নাম দিয়েছেন সামরিক গণতন্ত্র। গ্রিস (খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে নবম শতাব্দী), রোম (খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম-ষষ্ঠ শতাব্দী) প্রভৃতি এলাকায় এই গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এই তন্ত্রকে সামরিক গণতন্ত্র বলার কারণ এই যে, এই সময় জননেতা, সামরিক নেতা ও ধর্মীয় নেতাদের হাতে ক্রমবর্ধমানহারে ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং নবগঠিত রাষ্ট্রের সম্পদবৃদ্ধির একমাত্র উপায় হিসাবে অন্য দেশ জয় বা লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে একটি সামরিকগোষ্ঠীই কার্যত রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা একচ্ছত্র ভোগের সুযোগ লাভ করে। বর্তমান সময়েও অনুন্নত বিশ্বের কিছু কিছু দেশে সামরিক বাহিনীর সদস্য ও কর্তারা রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধাদি অনেকটা একচ্ছত্রভাবেই ভোগ করেন। জনগণের নামে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের এই আধুনিক প্রক্রিয়াকেও অনেকে সামরিক গণতন্ত্র বলে মনে করেন। আর সামরিক বাহিনী মূল ক্ষমতায় থেকে জনগণকে যে নিয়ন্ত্রিত গঠতান্ত্রিক অধিকারাদি প্রদান করে, সেটাকেও অনেকে সামরিক গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেন।

সামরিকীকরণ Militarization. কোনো জাতি বা তার অংশবিশেষকে সামরিক আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিন্যস্ত করা বা সামরিক বাহিনীসুলভ মনোবৃত্তিসম্পন্ন করে তোলাকে বলে সামরিকীকরণ। সাধারণত সমরনায়করা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে কখনো কখনো এ-নীতি গ্রহণ করেন। আবার দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আক্রান্ত বা বিপন্ন হলে বা বিপন্নের সম্ভাবনা দেখা দিলেও জনগণকে সামরিকীকৃত করতে দেখা যায়।

সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধ বয়সে, বেকারত্বের সময় কিংবা অসুস্থ অবস্থায় সরকার সংশ্লিষ্ট নাগগরিকদের ভরণপোষণ, আশ্রয় ও চিকিৎসার যে-দায়িত্ব নেয়, তাকেই বলে সামাজিক নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তাব্যয় যখন সম্পূর্ণরূপে রাজস্ব থেকে বহন করা হয়, তখন এটাকে বলে সামাজিক নিরাপত্তা। আর এরূপ নিরাপত্তা প্রকল্প যদি সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার ফান্ড বা কর্মচারীদের চাঁদালব্ধ অর্থ থেকে মেটানো হয়, তা হলে সেটা হয় যৌথ বীমাব্যবস্থা। লর্ড বিভারিজই সর্বপ্রথম এই সমাজিক নিরাপত্তার ধারণা প্রদান করেন। ইংরেজিতে একে বলে Social Security.

সামাজিক ভারসাম্যহীনতা Social Imbalance. বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত সামগ্রীর সঙ্গে গণসেবা (Public Service) -এর পরিমাণের ভারসাম্যহীনতাকে বোঝানোর জন্য অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কেনেথ গলব্রেথ এই কথাটি প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে, এই ভারসাম্যহীনতার দরুনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রাচুর্য দেখা দিলেও গণসেবার ক্ষেত্রে সে-তুলনায় উন্নতি সাধিত হয়নি। অবশ্য সাধারণভাবে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা বলতে বোঝায় সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্যজনিত ভারসাম্যহীনতা।

সামাজিক সম্পদ Social Property. এটি আসলে সমাজের সকল সদস্যের যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ। পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক সম্পদ বলতে সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ইমারত, শিক্ষায়তন, পাঠাগার, শিল্প-পরিবহণ সংস্থা ইত্যাদিকেই বোঝানো হয়।

সামাজিক সম্পর্ক : Social Relationship. এটি হল জনগণের যৌথ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গড়ে-ওঠা পারস্পরিক সম্পর্ক। বস্তুগত সম্পদ উৎপাদনই হল মানবসমাজবিকাশের মৌল ভিত্তি। তাই উৎপাদনসম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক বলে বিবেচিত। বস্তুত উৎপাদনসম্পর্কই রাজনৈতিক, আইনগত এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের চরিত্রের নিয়ামক। উৎপাদনসম্পর্কের ওপর সামাজিক সম্পর্কের নির্ভরশীলতা-সম্পর্কিত উপলব্ধিই ইতিহাসের গতিধারার যথার্থ ব্যাখ্যাকে সম্ভবপর করে তোলে।

সামুরাই বিদ্রোহ সামুরাইরা হল জাপানের একটি যোদ্ধাসম্প্রদায়। তারা সাধারণত দাইমিয়ো বলে পরিচিত বৃহৎ ভূস্বামীদের সম্পদ ও স্বার্থরক্ষার কাজ করত। ১৮৬৮ সালের চার্টার অনুযায়ী দাইমিয়োরা তাদের সম্পত্তি সরকারের হাতে সমর্পণ করলে সামুরাইরা তাদের গুরুত্ব ও আয়ের পথ হারিয়ে ফেলে। সরকার তাদের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করলেও তারা সেটাকে যথোপযুক্ত বলে বিবেচনা করে না। এ-সময়ে সাতসুমোমাইগো নামক সামুরাই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি মেইজি রাজদরবারে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তিনি রাজপদ ছেড়ে দিয়ে সামুরাইদের সংগঠিত করেন এবং ১৮৭৭ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু আধুনিকতর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সরকারি বাহিনী সামুরাইদের পরাজিত করে এবং সাতসুমোমাইগো যুদ্ধে নিহত হন। এর প্রতিশোধ হিসাবে সামুরাইরা জাপানের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওকুবোকে হত্যা করে। এর ফলে রাজকীয় গার্ডদের মধ্যেই সন্ত্রাস ও ভয় দেখা দেয়। কিন্তু যুদ্ধমন্ত্রী ইয়ামাগাতা দ্রুত গার্ডবাহিনী পুনর্গঠন করেন এবং অবস্থা আয়ত্তে নিয়ে আসেন।

সাম্যবাদ Communism. সমাজতন্ত্রেরই উচ্চতর পর্যায়। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সাম্যবাদের পার্থক্য প্রকারগত নয়, বরং মাত্রাগত। সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে যৌথ খামার এবং সমবায়ী মালিকানা উভয়েরই অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু সাম্যবাদী পর্যায়ে থাকে এক ধরনের ব্যবস্থা—রাষ্ট্র বা সমগ্র জনগণের মালিকানা। সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে শ্রমিক এবং যৌথ খামারের কৃষকদের মধ্যে প্রভেদের অস্তিত্ব থেকে যায়, কিন্তু সাম্যবাদী পর্যায়ে তা সম্পূর্ণ লোপ পায়। অনুরূপভাবে সাম্যবাদী পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে অন্যদেরও কোনো তারতম্য থাকে না। সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের দরুন আসে প্রাচুর্য। ফলে, তখন আর মুদ্রা ও পণ্যের অস্তিত্ব থাকে না—উৎপাদিত পণ্য জনগণের মধ্যে বণ্টিত হয় সরাসরি এবং যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী। সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদন ও বণ্টনের মূল কথা হল, “প্রত্যেকে তার সাধ্যানুযায়ী শ্রম দেবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী জীবন ধারনের উপকরণ পাবে।” সাম্যবাদী সমাজে অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উপরিকাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে। সাম্যবাদী বিকাশের পর্যায়ে রাজনৈতিক ও আইনগত প্রতিষ্ঠান (Institution)-সমূহের অবলুপ্তি ঘটে (Withers away)। সমগ্র জনগণ সাম্যবাদী জীবনপদ্ধতির কতগুলো সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম মেনে চলে। বলাবাহুল্য, এইসব সাধারণ নিয়মই সমাজের চাহিদা

মেটাতে সক্ষম হয়। এ-সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছুই থাকে না বিধায় এই সমাজে কোনোপ্রকার চুক্তিরও অস্তিত্ব থাকে না। এমতাবস্থায় স্বভাবতই রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটে এবং পার্টির ঐতিহাসিক ভূমিকারও পরিসমাপ্তি ঘটে। সাম্যবাদী সমাজে জাতিতে জাতিতে তারতম্যেরও কোনো অস্তিত্ব থাকে না। বস্তুত সাম্যবাদী সমাজ অবস্থান করে অত্যন্ত উন্নত উৎপাদিকা শক্তি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং আত্মপ্রশাসনের ভিত্তির ওপর। সমাজতান্ত্রিক সমাজ থেকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের পথে প্রধানত তিনটি মৌলিক বিষয়ে নির্ধারক গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এই তিনটি মৌলিক বিষয় হল ১. সাম্যবাদের বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি সৃষ্টি; ২. সাম্যব্যবাদী সামাজিক সম্পর্কের বিকাশ এবং ৩. সাম্যবাদী সমাজের যোগ্য মানুষ গড়ে তোলা। সাম্যবাদী সমাজের মানুষ হয় সর্বোচ্চ সামাজিক সচেতনতাসম্পন্ন মানুষ। তাদের মধ্যে নিখুঁত শারীরিক স্বাস্থ্য, নৈতিক উচ্চমান এবং আত্মিক সম্পদের সুসমন্বিত বিকাশ ঘটে। এই সমাজে ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যেও স্থাপিত হয় অনবদ্য ছন্দোবদ্ধ সম্পর্কের। উল্লেখ্য যে, সাম্যবাদী সমাজের উপরোক্ত চিত্র এখনও তত্ত্বে সীমাবদ্ধ। বিশ্বের কোনো সমাজতান্ত্রিক সমাজকেই সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটানো সম্ভবপর হয়নি। বরং, উলটো বহু সমাজতান্ত্রিক সমাজ আবার পুঁজিবাদে ফিরে গেছে।

সাম্যবাদী শ্রম Communist Labour. সাম্যবাদী সমাজ কায়েম হলে সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে শ্রম হবে প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি প্রয়োজন, শুধুমাত্র কর্তব্য নয়। লেনিনের মতে, সাম্যবাদী শ্রম হল সেই শ্রম, যা সাম্যবাদী সমাজের প্রত্যেক সদস্য প্রদান করবে স্বেচ্ছায়, কোনো মূল্যহারের বিনিময়ে নয়, কোনো পুরস্কারের লোভেও নয়, বরং সমগ্র সমাজের কল্যাণের উপলব্ধি এবং অভ্যাস থেকে।

সাম্প্রদায়িকতা Communalism. ধর্মীয়, জাতিগত বা আঞ্চলিক সংকীর্ণতাকেই বলে সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতার অপর বৈশিষ্ট্য হল অন্য ধর্ম, জাতি বা অঞ্চলের ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা—যা প্রায়শই দাঙ্গায়ও রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার উদাহরণ হিসাবে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের মুসলিমবিদ্বেষ, দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাপার্ট-হিড, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উপজাতীয় সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুত পৃথিবীর প্রায় দেশেই কোনো-না-কোনো রূপে সাম্প্রদায়িকতার কমবেশি অবস্থিতি রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ Imperialism. মার্কসীয় মতে, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ, একচেটিয়া, ও সর্বশেষ স্তর। এর উদ্ভব ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' শীর্ষক গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন ১. উৎপাদন ও পুঁজির পুঞ্জীভবন এমন এক স্তরে পৌছেছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে একচেটিয়া বা মনোপলির এবং এই মনোপলিগুলোই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করছে, ২. ব্যাংকপুঁজি ও শিল্পপুঁজির সম্মিলনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে ধনকুবেরদের লগ্নিপুঁজি, ৩. পুঁজি রফতানি (যা পণ্য রফতানি থেকে স্পষ্টতই ভিন্নতর), বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, ৪. পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংঘ গড়ে উঠেছে এবং তারা বিশ্বটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে এবং ৫. মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তির মধ্যে পৃথিবীটার আঞ্চলিক বণ্টন সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু বস্তুত অর্থনৈতিকভাবে পৃথিবীটা এদের মধ্যে অনেকটা ভাগ হয়ে গেলেও পরস্পরের

বাজার দখলের জন্য এদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বও বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে পুঁজিবাদী একচেটিয়াসমূহের শক্তি ও রাষ্ট্রশক্তি সম্মিলিতভাবে ব্যাপকতর ভিত্তিতে অনুন্নত বিশ্বের ওপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে এবং একচেটিয়াসমূহ দিনে দিনে আরও শক্তিশালী হচ্ছে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরেও রয়েছে এবং বাড়ছে অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব ইত্যাদির সমস্যা। এর সমাধান করতে গিয়ে তারা ক্রমবর্ধমান হারে জড়িয়ে পড়ছে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে, সমরবাদে, আশ্রয় নিচ্ছে বিভিন্ন অপকৌশল ও সংস্কারমূলক ব্যবস্থার। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও স্বার্থের পটভূমিতেই গড়ে উঠছে আঞ্চলিক উত্তেজনা, স্থানীয় যুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রায় অনুপস্থিতিতে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা আসলে তাদের পরস্পরেরেই বিরুদ্ধে। কিন্তু তাই বলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ভেঙে পড়ে বিশ্বজুড়ে সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ কায়েম হওয়ার লক্ষণ এ-যাবৎ আদৌ প্রকট হয়ে ওঠেনি।

সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক Social Imperialism. লেনিনের মতে, যে মুখে সমাজতন্ত্রী, অথচ কাজে সাম্রাজ্যবাদী সেইই হল সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে চীন ও চীনপন্থিরা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বলে অভিহিত করত, কেননা তাদের মতে নামে সমাজতন্ত্রী হলেও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কার্যত সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় লগ্নিপুঁজি খাটাত, বাজারের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হত, অনুন্নত বিশ্বকে শোষণ করত, এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলে সরাসরি আগ্রাসনও চালাত—যেমন, চালিয়েছিল হাঙ্গেরিতে কিংবা কিউবায়। আবার রুশ সমর্থকদের মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল যথার্থই সামাজতন্ত্রী। কেননা, এর অভ্যন্তরীণ উৎপাদনব্যবস্থা পুঁজিবাদী ছিল না, ছিল সমাজতন্ত্রী। তবে উদ্বৃত্ত ও রফতানিযোগ্য পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার খুঁজে বের করা রুশ জনগণের স্বার্থেই অপরিহার্য ছিল। অতএব, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বাজারের দ্বন্দ্ব আদৌ সাম্রাজ্যবাদী কাজ নয়; বরং তা আসলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী উদ্যোগ। তা ছাড়া বিভিন্ন দেশে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে নস্যাৎ করে প্রগতির শক্তিকে সামরিক সহযোগিতাদানও আগ্রাসন নয়, বরং তা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দায়িত্ব। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি, বিভক্তি ও সমাজতন্ত্র পরিত্যাগের পর বর্তমান রাশিয়ার আর সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বর্তমান রাশিয়া বড়জোর হতে পারে আর-এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। বলাবাহুল্য, বর্তমানে (১৯৯৮) রাশিয়ার সমালোচনাকারী চীনও মার্কস-লেনিন-মাওয়ের পথ সম্পূর্ণ পরিহার করে গ্রহণ করেছে মুক্তবাজার অর্থনীতি ও পুঁজিবাদের পথ।

সাম্রাজ্যবাদ, সুদখোর এই কথাটি লেনিনই সর্বপ্রথম তাঁর Imperialism; the Highest State of Capitalism—গ্রন্থে ব্যবহার করেন। যে-সমস্ত রাষ্ট্র স্ব স্ব উপনিবেশ বা প্রভাবাধীন এলাকায় মূলধন বিনিয়োগের পরিবর্তে ঋণ প্রদান করে এবং এই ঋণের সুদকেই আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়, সে-সমস্ত রাষ্ট্রকেই বলা হয় সুদখোর সাম্রাজ্যবাদ (Usuary Imperialist)।

সার্ক South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC). বাংলায় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতি। সার্ক-এর সদস্য হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ। সদস্যদেশসমূহের সরকার-প্রধানরা পালাক্রমে এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এর একটি সেক্রেটারিয়েটও

রয়েছে। সার্ক-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার এই ৭টি রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, যোগাযোগ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সমন্বয়ে সার্ক-এর একটি স্ট্যান্ডিং কমিটিও রয়েছে। সার্ক গঠিত হয় ১৯৮৫ সালে।

সার্বভৌমত্ব Sovereignty. এটা হল রাষ্ট্রের সেই বিশেষত্ব, যার দরুন রাষ্ট্র নিজের আয়ত্তাধীন সমগ্র এলাকার অভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সর্বেসর্বা হয় এবং অপর কোনো রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল থাকে না। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব হল রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি, সকল বস্তু ও সকল ঘটনার ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব । আর বহিঃক্ষেত্রের সার্বভৌমত্ব হল বাইরের কোনো শক্তির নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবমুক্ত থাকা।

সাহাবি অর্থ সহচর। তবে সাহাবি বলতে আসলে বোঝায় তাঁদেরকে, যাঁরা রাসুলুল্লাহ্ (সা)-র সহচর ছিলেন। যেসব মুসলমান জীবনে অন্তত একবার হলেও রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁদেরকেও সাহাবি বলে অনেকে গণ্য করেন। যাঁরা সরাসরি রাসুলুল্লাহ্ (সা)কে দেখেননি, কিন্তু সাহাবিদের দেখেছেন ও সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় তাবেঈন, আর, অনুরূপভাবে, যাঁরা শুধু তাবেঈনদের দেখেছেন ও সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় তাবে তাবেঈন। সাহাবিদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ থাকলেও সকল সাহাবিই পুণ্যবান ও শ্রদ্ধেয় বলে অধিকাংশ মুসলমান মনে করেন।

সি.আই.এ. মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা, Central Intelligence Agency. এরই সংক্ষেপিত রূপ হল সি.আই.এ. (CIA)। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালেসের উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায়। এই সংস্থা প্রধানত আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরির দায়িত্বে নিয়োজিত। বিশ্বের দেশে দেশে তৎপরতা চালিয়ে গোপন সংবাদাদি সংগ্রহ, বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন-সংস্থা ইত্যাদিতে এজেন্ট বা সাবএজেন্ট নিযুক্তকরণ, সরকার, রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রভাবিতকরণ, বুদ্ধিজীবীদের মস্তক-ধোলাই ইত্যাদি এর কর্মপরিধির অন্তর্গত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সিআইএ সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যুক্ত এবং সিআইএ তার কার্যাবলীর জন্য আর কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।

সিংহাসনত্যাগ সংকট, ১৯৩৬ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড মিসেস সিম্পসন নাম্নী এক মহিলাকে বিয়ে করতে চাইলে এ-সংকটের সৃষ্টি হয়। প্রথানুযায়ী, ব্রিটেনের রাজা বা রানির বিয়ের আগে মন্ত্রিসভার মতামত নেওয়ার কথা। প্রধানমন্ত্রী বল্ডউইন অনুভব করেন যে, মিসেস সিম্পসন মার্কিন বংশোদ্ভব একজন সাধারণ নাগরিক, ক্যাথলিক এবং দু-দুবার বিবাহিতা ও স্বামী-পরিত্যক্তা। তাঁর সঙ্গে রাজার বিয়ে রাজার (যিনি চার্চ অব ইংল্যান্ডের সুপ্রিম গভর্নরও বটেন) সুউচ্চ সম্মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না এবং জনগণও এ-বিয়েকে মেনে নেবে না। যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত মর্গানপন্থি বিয়ে (একটি প্রাইভেট আইন, যাতে রাজার স্ত্রীকে রানি হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় না) ব্যবস্থা অন্তত করা যায় কি না, তাও বিবেচনা করা হয়; কিন্তু ডোমিনিয়ন সরকারসমূহের সঙ্গে আলোচনার পর তাও পরিত্যক্ত হয়। ফলে রাজার সামনে খোলা

থাকে দুটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের যে-কোনো একটি গ্রহণ করা হয় মিসেস সিম্পসনকে পরিত্যাগ করা অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসন ত্যাগ করা। রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড দ্বিতীয়টিই বেছে নেন এবং ১৯৩৬ সালের ১১ ডিসেম্বর সিংহাসন ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁর ছোটভাই ডিউক অব ইয়র্ক রাজা ষষ্ঠ জর্জ হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অষ্টম এডওয়ার্ড সিম্পসনকে নিয়ে ফ্রান্সে চলে যান।

সি.টি.বি.টি Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) বা সমন্বিত পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি। ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে সম্পাদিত এই চুক্তিতে ১৪০টি দেশ স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভয়াবহ অস্ত্র, বিশেষত আণবিক অস্ত্র নির্মাণ ও পরীক্ষা বন্ধ করা। ভারতসহ কিছু দেশ এ-চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। বরং ১৯৯৮ সালের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান একাধিক আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। অনেকে মনে করেন যে, সিটিবিটি-এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্রের মালিকানা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে অন্য কাউকে এরূপ অস্ত্র অর্জন করতে না দেওয়া।

সিন ফিন : Sinn Fein. ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত আয়ারল্যান্ডের প্রজাতন্ত্রী দল। সিন ফিন কথাটির অর্থ হল 'আমাদের একা থাকতে দাও'। এর উদ্দেশ্য ছিল আয়ারল্যান্ডের জন্য স্বকীয়তা অর্জন করা। ১৯১৪ সালে ডাবলিনে এক জঙ্গি শ্রমিক-বিক্ষোভের ফলশ্রুতিতে দলের প্রতিষ্ঠাতা আর্থার গ্রিফিথের হাত থেকে নেতৃত্ব জঙ্গি নেতা জেমস্ কনোলির হাতে চলে আসে। ১৯১৬ সালের 'ঈস্টার অভ্যুত্থান'-এ সিন ফিনের কিছুসংখ্যক কর্মী নিহত হয় এবং অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে দলের নেতৃত্বে আসেন ডি ভ্যালেরা। ১৯১৯-২০ সাল ছিল ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের সময়। ১৯২২ সালে দল বিভক্ত হয়ে যায়। গ্রিফিথ ব্রিটেনের সঙ্গে আপোস করে আইরিশ ফ্রি স্টেট গঠন করেন, আর ডি ভ্যালেরা একটি নয়া প্রজাতন্ত্রী সেনাদল গঠনের মাধ্যমে দলের 'ফায়ানা ফেইল' ঐতিহ্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হন।

সিনেট : Senate. এটি হল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের উচ্চতর কক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চতর কক্ষের নামও সিনেট। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে (আয়তন ও জনসংখ্যা-নির্বিশেষে) দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সিনেট গঠিত। সিনেটাররা সাধারণ ভোটে ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং প্রতি ২ বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর নেন। একজন সিনেটরের বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর হতে হয় এবং অন্যূন ৯ বছর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব থাকতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে সিনেটের সভাপতি থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো চুক্তি সম্পাদন করলে সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক তা অনুমোদিত হতে হয়।

সিন্ডিকেট : Syndicate. একধরনের শিল্প ও ব্যবসায়ী সংঘ। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান চুক্তির মাধ্যমে সিন্ডিকেট গঠন করে। সিন্ডিকেটভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনেকখানি লোপ পায়। এর বদলে সিন্ডিকেটই মূলত তার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য বিক্রয় ও কাঁচামাল সংগ্রহ ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সিন্ডিকালিজম Syndicalism. এটি হল ট্রেড ইউনিয়ন বা বাণিজ্য ও পেশাসংঘভিত্তিক সমাজবাদ। ফরাসি 'সিন্ডিকেট' শব্দ থেকে সিন্ডিকালিজমের উৎপত্তি। সিন্ডিকেট-এর অর্থ ট্রেড ইউনিয়ন বা বাণিজ্যসংঘ। এটি বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের একটি মতবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী সমাজবিপ্লব ও ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের ভিত্তি হল ট্রেড ইউনিয়ন। নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে এর মিল আছে বলে অনেকে একে নৈরাজ্যবাদী-সিন্ডিকালিজম (Anarcho-Syndicalism) নামেও অভিহিত করেন। মাইকেল বাকুনিন, জর্জ সোরেল প্রমুখ ছিলেন এই মতবাদের প্রবক্তা। এই মতবাদ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দল বা তার রাজনৈতিক ভূমিকার কথা অস্বীকার করে এবং পুঁজিবাদী শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবর্তে শিল্পকেন্দ্রিক কার্যকলাপ বা ধর্মঘট ইত্যাদিকে সমর্থন করে। এই মতবাদ অনুযায়ী শ্রমিকদের ধর্মঘট করে কর্মস্থল ছেড়ে আসা ঠিক নয়; তাদের উচিত কর্মস্থল অধিকার করে থাকা এবং উৎপাদন বন্ধ বা হ্রাস করে দেওয়া। এরূপ ধর্মঘটকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারলে বিপ্লব সংঘটিত করা ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব বলে সিন্ডিকালিস্টদের ধারণা। বিপ্লবের পর ট্রেড ইউনিয়নসমূহই কলকারখানা, খনি ইত্যাদি দখল করে সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী সেসব পরিচালনা করবে; রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করবে এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মিলিত সংঘই রাষ্ট্রের স্থান দখল করবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের পরিবর্তে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও তাদের প্রতিনিধিগণই সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদি পরিচালনা করবে। বহুর দ্বারা পরিচালিত এই সমাজ হবে একটি সক্রিয় অর্থনৈতিক সংগঠন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই মতবাদ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোয় বিস্তার লাভ করে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ, বিশেষত ১৯১৭ সালে রুশবিপ্লবের পর এর সমর্থকসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায় এবং অধিকাংশ সিন্ডিকালিস্ট স্ব স্ব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। শুধু স্পেনে এর প্রভাব আরও কিছুকাল অক্ষুণ্ন থাকে। ১৯৩৬ সালে ফ্যাসিবাদের জয়লাভের ফলে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সিন্ডিকালিজম, নৈরাজ্যবাদী : নৈরাজ্যবাদী সিন্ডিকালিজম বা Anarcho–Syndicalism হল ট্রেড ইউনিয়নভিত্তিক নৈরাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থা। এই মতবাদ অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নই হল শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র সংগঠন এবং অর্থনৈতিক ধর্মঘটই হল শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র সংগ্রাম। প্রধানত ফরাসি নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক প্রুধোঁর শিক্ষার ভিত্তিতেই এই মতবাদ গড়ে ওঠে। একসময় স্পেন, ইতালি ও ফ্রান্সে এই মতবাদ প্রবল আকার ধারণ করলেও অচিরেই তা স্তিমিত হয়ে যায়।

সিন্থেসিস থিসিস (Thesis) ও অ্যান্টিথিসিস (Anti-Thesis)-এর সমন্বয় বা সংশ্লেষণকে বলে সিন্থেসিস (Synthesis)। সিন্থেসিস থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের দ্বন্দ্ব অন্তর্মিলনের ফল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সময় থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের সমন্বয় ঘটিয়ে সিন্থেসিস বের করা সম্ভবপর হয় না। যেমন, বুর্জোয়া ও কমিউনিস্টদের সম্মিলন বা সংশ্লেষণ ঘটিয়ে মাঝামাঝি কিছু-একটা করা বুর্জোয়া বা কমিউনিস্ট কারও পক্ষেই খুব একটা গ্রহণীয় হয় না। আবার, রাজনীতিতে সিন্থেসিস যে একেবারেই হয় না, তা নয়। যেমন, কমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া চিন্তার মাঝামাঝি অবস্থান হল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের, যদিও কমিউনিস্টরা তাদের বলে ছদ্মবেশী বুর্জোয়া। আর বুর্জোয়ারা তাদের বলে কমিউনিস্ট। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরূপ সিন্থেসিস হতে পারে।

সিপাহিবিদ্রোহ বস্তুত সিপাহিবিদ্রোহ (১৮৫৭) ছিল ভারতে একশত বছরের ইংরেজ শাসন-শোষণেরই এক অনিবার্য পরিণতি। এই যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে জমিহারা কৃষক, কারিগর, শ্রমিক, মোল্লা, পুরোহিত ও সিপাহিসহ সকল শ্রেণীর মানুষ যোগদান করে। রাজন্য এবং জমিদারদের একটা অংশও এতে যোগ দেয়। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহিদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাতস্বরূপ গোরু ও শূকরের চর্বিমিশ্রিত বন্দুকের টোটা সরবরাহ ছিল একটা উপলক্ষমাত্র। সর্বপ্রথমে ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে এবং বিদ্রোহী মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়। ১১ মে মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে বিদ্রোহীগণ ভারত-শাসক ঘোষণা করে। বাহাদুর শাহ্ নামে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও মূল ক্ষমতা এবং বিচারের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ছিল বিদ্রোহ পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত রাষ্ট্রীয় সভা বা Court of Administration.-এর হাতে। এই বিদ্রোহের সময় নতুন জমিদারগোষ্ঠী এবং শহুরে ব্যবসায়ী, মহাজন, সরকারি কর্মচারী ও ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রমুখ ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করে। বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত এই বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করলেও তা প্রবল আকার ধারণ করে বিহার ও উত্তর ভারতে। এই বিদ্রোহের মূল নেতা ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া টোপি প্রমুখ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ব্যর্থতার কারণসমূহ ছিল নিম্নরূপ ১. সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব, ২. অসংবদ্ধ বিক্ষিপ্ত নেতৃত্ব, ৩. স্বার্থের বিভিন্নতা, ৪. যোগ্য সেনানায়কের অভাব, ৫. আপামর জনগণকে উপেক্ষা, ৬. কোনো কোনো সেনানায়কের বিশ্বাসঘাতকতা, ৭. অস্ত্রের দিক থেকে পাশ্চাৎপদতা, ৮. টেলিগ্রাফসহ ইংরেজদের উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা এবং ৯. জনযুদ্ধের কৌশল অবলম্বন না করা ইত্যাদি। পরাজয়ের পর সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বদলে ব্রিটিশরাজ সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষে প্রতিক্রিয়ার শক্তি জোরদার হয়ে ওঠে।

সিভিল ডিফেন্স : Civil Defence. এটি হল কোনো যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের জানমালের ক্ষতি ঠেকানো বা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বোমাবর্ষণের আশঙ্কা দেখা দিলে এর উদ্ভব ঘটে। ব্রিটেন ও জার্মানি এ-ব্যাপারে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়ায় এই দুই দেশে জানমালের ক্ষতি তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয় ; অথচ জাপান এরূপ কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় তাদের ক্ষতি হয় অনেক বেশি। সিভিল ডিফেন্স সামরিক দিক থেকেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, কোনো দেশের জনগণ এ-ব্যাপারে প্রশিক্ষিত ও সতর্ক থাকলে, শত্রুপক্ষের পক্ষে ওই জনগণের মনোবল ভাঙা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয় কোনো দুর্যোগেও সিভিল ডিফেন্স খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আণবিক বা পারমাণবিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে সিভিল ডিফেন্স খুব বড় ভূমিকা রাখতে না পারলেও রাসায়নিক অস্ত্র, আগ্নেয় বোমাসহ অন্যান্য অস্ত্রের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

সিভিলসমাজ Civil Society. হব্‌স্‌, লক্‌, এমনকি হেগেল পর্যন্ত রাষ্ট্র ও সিভিলসমাজ-এর মধ্যে একটি প্রভেদরেখা টেনে দিয়েছেন। সিভিলসমাজ হচ্ছে সেই সুসংগঠিত সমাজ, যে-সমাজকে রাষ্ট্র শাসন করে। সেইসব কাঠামোকে নিয়েই সিভিলসমাজ, যার মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন জনগণ বসবাস করে। পরিবার, আত্মীয়তার সম্পর্ক, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হল

সিভিলসমাজের কাঠামো। তবে আধুনিক-সমাজবিদ-রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, রাষ্ট্র ও সিভিলসমাজের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট প্রভেদরেখা টানা সম্ভবপর নয়, সমীচীনও নয়। কারণ, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কহীনভাবে সিভিলসমাজ টিকতে পারে না। আবার, অন্যদিকে সিভিলসমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাজনৈতিক কর্তৃত্বও নিরর্থক হয়ে যায়। বস্তুত, রাষ্ট্র ও সিভিলসমাজ পরস্পর-গ্রথিত। অবশ্য, অনেক দেশেই রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সরকার সিভিলসমাজের চিন্তাচেতনা, অনুভূতি ও কল্যাণের তোয়াক্কা করে না, বরং স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী আচরণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সিভিল সার্ভেন্ট Civil Servant. আমলা রাষ্ট্রের অরাজনৈতিক ও নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরই বলা হয় সিভিল সার্ভেন্টস। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই সিভিল সার্ভেন্টরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, অরাজনৈতিক কর্মকর্তা হিসাবে সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করেন এবং রাজনৈতিক সরকারের উত্তান-পতন যা-ই হোক না কেন তাঁরা অবসরগ্রহণের সময় পর্যন্ত চাকুরিতে বহাল থাকেন। প্রায়শই দেখা যায় যে সিভিল সার্ভেন্টরা স্থায়ী ধারাবাহিকতাসম্পন্ন ও অধিকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিধায় তাঁরাই রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সরকারও তাঁদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন। রাজনৈতিক সরকার যত বেশি দুর্বল, অনভিজ্ঞ ও ক্ষণস্থায়ী হয়, সিভিল সার্ভেন্টরাও ততবেশি ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। অবশ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু-কিছু দেশে গুরুত্বপূর্ণ পদে সিভিল সার্ভেন্টরা রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং সরকারের পরিবর্তন ঘটলে তাঁদেরও পরিবর্তন ঘটে যায়। পরিহাসের ব্যাপার হল এই যে এঁদের নাম সিভিল সার্ভেন্ট বা জনগণের ভৃত্য হলেও, এঁরা প্রায় সর্বদাই জনগণের সর্বময় কর্তা বা মালিক মোক্তারের মতোই আচরণ করেন।

সিমলা চুক্তি : ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ (যা আসলে ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ)-র অবসানের পর ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ভারতীয় শৈলনিবাস সিমলায় যে-চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেটাই সিমলা চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তিতে উভয় দেশ পারস্পরিক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, স্ব-স্ব সেনাবাহিনীকে স্ব-স্ব আন্তর্জাতিক সীমানার ভেতরে ফিরিয়ে নেওয়া, পারস্পরিক অপপ্রচার বন্ধ করা, দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের লক্ষ্যে এবং দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বিনিময় ইত্যাদি শুরু করা সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করে।

সিয়াটো : South East Asia Treaty Organisation. (SEATO) বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা। ১৯৫৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ফিলিপিনস ও থাইল্যান্ড—এই আটটি দেশের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ম্যানিলায় এ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বলে এর অপর নাম ম্যানিলা প্যাক্ট। এর প্রধান কার্যালয় ছিল ব্যাংককে। এই সংস্থার অন্তর্গত সদস্যরা একমত হয় যে, যে-কোনো সদস্যদেশ কোনো বহির্শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে বা কোনো দেশে কোনো অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিলে, সকল সদস্যদেশ হামলাকারী বা গোলযোগকারীর বিরুদ্ধে যৌথব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর সদস্যগণ অর্থনৈতিক ব্যাপারেও পরস্পরকে

সহযোগিতা প্রদান করবে বলে একমত হয়। মূলত এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্টবিরোধী সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। পরবর্তীকালে এই সংস্থার সদস্যদের অনেকেই সংস্থার উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং পাশ্চাত্য সদস্যসমূহ, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় বিরূপ ভাব প্রকাশ করে। পরিণতিতে সিয়াটো বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সিয়াসিত্তাহ্ রাসূলুল্লাহ (সা)-র তিরোধানের পর বিভিন্ন ব্যক্তি সত্য-মিথ্যা, নির্ভরযোগ্য-বানোয়াট হাজার হাজার হাদিস উপস্থাপন করে। এমতাবস্থায়, বিভিন্ন সত্যাশ্রয়ী ইমামগণ কতিপয় নীতিমালার ভিত্তিতে যথার্থ বা সহি হাদিস নিরূপণে সচেষ্ট হন। সহি হাদিস সঙ্কলকদের মধ্যে যে-ছয়জনকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে ধরা হয়, তাঁরা হলেন হজরত বুখারি (রা), হজরত তিরমিজি (রা), হজরত মুসলিম (রা), হজরত আবু দাউদ (রা), হজরত নাসায়ী (রা) ও হজরত ইবনে মাজা (রা)। এই ছয়জনকেই বলা হয় সিয়াসিত্তাহ্ বা যথার্থ ছয়জন।

সিল্ক রুট : চীনের হান রাজবংশের রাজধানী চ্যাং আন (বর্তমান নাম জিয়ান) থেকে শুরু করে মধ্যএশিয়ার আমুর-সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই Silk Route বা রেশম পথ। ১৮৭৭ সালে জার্মান ভূগোলবিদ ফার্ডিন্যান্ড ভন রিখটোফেন প্রথম রেশম পথের কথা উল্লেখ করেন। অ্যালবার্ট হারম্যান নামক অপর এক জার্মান ইতিহাসবিদের মতে, এই পথ সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথেই চলত চীনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের, বিশেষত ভারতবর্ষের ব্যাবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে রেশমের কারবার। হান সম্রাট উদি (১৫৭-৮৭ খ্রিস্টপূর্ব)-র নির্দেশে ঝাং কিয়ান নামক জনৈক দূত পশ্চিমা দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়েই এ-পথের খোঁজ প্রদান করেন। তাং রাজবংশ (৬১৮-৯০৭)-এর রাজত্বকালে এই পথে পরিচালিত ব্যবসায়িক লেনদেনের ফলে রাজধানী চ্যাং আন শুধু রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রেই পরিণত হয় না, বরং এটি একটি আন্তর্জাতিক মহানগরীতেও পরিণত হয়। এ-সময় বিশ্বের ৭০টি দেশের সঙ্গে রেশম পথে চীনের বাণিজ্যিক লেনদেন চলত। ৭৫৫ সালে এক বিদ্রোহের ফলে হান রাজা জুয়ান জং সিংহাসনচ্যুত হলে এই রেশম পথ ধরেই তিনি শিচুন প্রদেশে পালিয়ে আসেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর ছেলে সুজং গানসু প্রদেশে নয়া রাজত্ব স্থাপন করেন।

সিলেক্ট কমিটি Select Committee. পার্লামেন্ট বা আইনসভায় উত্থাপিত কোনো প্রস্তাবকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করার জন্য ওই পার্লামেন্টেরই কতিপয় সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটিকে বলে সিলেক্ট কমিটি।

সীমিত যুদ্ধ Limited War. এটি এমন যুদ্ধ যাতে পরাশক্তিদের জড়িয়ে পড়ার বা পারমাণবিক যুদ্ধ শুরুর সম্ভাবনা থাকে না। আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ, ব্রিটেন-আর্জেন্টিনা যুদ্ধ ইত্যাদিই হল সীমিত যুদ্ধের উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের বিরুদ্ধে উপসাগরীয় যুদ্ধকেও সীমিত যুদ্ধ বলে অভিহিত করে। পঞ্চাশের দশকের কোরিয়ার যুদ্ধের ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম সীমিত যুদ্ধ কথাটি ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধসংক্রান্ত দার্শনিকদের মতে সীমিত যুদ্ধ হল সেই যুদ্ধ, যে-যুদ্ধে যুদ্ধমান কোনো পক্ষেরই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

সুইসাইড স্কোয়াড Suicide Squad. কোনো যুদ্ধ বা সংগ্রামের সময় গঠিত ক্ষুদ্র বাহিনী বা স্কোয়াডবিশেষ, যার সদস্যেরা স্বপক্ষের স্বার্থে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে এমন দুঃসাহসিক

কাজ হাতে নেয়, যে-কাজে মৃত্যু প্রায় অবধারিত। নিজেদের আত্মাহুতি দিয়ে হলেও শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য জেনেশুনে দায়িত্ব গ্রহণকারী এরূপ স্কোয়াডকে বলে আত্মাহুতির স্কোয়াড (Suicide Squad) বা মৃত্যু স্কোয়াড (Death Squad)।

সুকি, আউং সান জন্ম ১৯৪৬ সাল। মায়ানমারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মানসকন্যা আউং সান সুকির বাবা আউং সান ছিলেন মায়ানমারের স্বাধীনতার স্থপতি ও অবিসম্বাদিত জাতীয় নেতা। ১৯৪৭ সালের ১৯ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টায় মন্ত্রী সভার বৈঠক চলাকালীন অবস্থায় আততায়ীরা তাঁকে এবং মন্ত্রীসভার ৫ জন সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। অতঃপর মায়ানমারে সামরিক আধিপত্যের যুগ শুরু হয়। ১৯৮৯ সালের ১০ জুলাই থেকে সামরিক জান্তা সুকিকে কার্যত গৃহবন্দি করে রাখে। ওই অবস্থায় ১৯৯০ সালের নির্বাচনে সুকি ও তাঁর দল ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে এবং সুকিকে বন্দি অবস্থায় রেখে দেয় ; ২১৯০ দিন চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি রাখার পর ১৯৯৫ সালের ১০ জুলাই জান্তা সুকিকে নামেমাত্র মুক্তি দেয় ; কিন্তু কখনোই ক্ষমতা হস্তান্তর করে না। ১৯৯১ সালে সুকি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সুকির দলের নাম National League for Demoeracy (NLD)। তিনি এখনও পর্যন্ত কার্যত গৃহবন্দি। এ ছাড়াও সামরিক জান্তা আরও প্রায় ১০০০ রাজবন্দিকে কারাগারে আঁটকে রেখেছে। এমতাবস্থায় ৬ জন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, লেচ ওয়ালেসা (পোল্যান্ড, ১৯৮৩), ডেসমন্ড টুটু (দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯৮৪), অস্কার অ্যারিয়া সানচেজ (কোস্টারিকা, ১৯৮৭), জোসে রামোস হোর্তা (পূর্ব তিমুর, ১৯৮৭), নাদিন গোর্ডিমার (দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং ডেরেক ওয়ালকট (সেন্ট লুসিয়া) গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মায়ানমারের সামরিক জান্তার প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু সামরিক জান্তা এতে কোনই কর্ণপাত করে না।

সুখবাদ : Hedonism. সুখবাদীদের মতে যা-কিছুই সুখ বা আনন্দ দেয়, তা-ই 'ভালো', আর যা দুঃখ দেয় তা-ই 'মন্দ'। প্রাচীন দার্শনিক এপিকিউরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪১-২৭০) প্রমুখ ছিলেন এই দর্শনের উদ্গাতা। জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩), জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) প্রমুখের উপযোগবাদ (Utilitarianism)-ও মূলত এই দর্শন থেকেই উদ্ভূত। ভারতীয় দার্শনিক চার্বাকও অনেকটা সুখবাদের প্রবক্তা ছিলেন। সুখবাদীরা আত্মসুখ বা স্বল্পকালীন ইন্দ্রিয়সুখকেও পরম কাম্য বলে মনে করেন। এরূপ আত্মসুখের প্রবক্তাদের বলা হয় আত্মসুখবাদী বা Egoistic Hedonisty.

সুখবাদ, সার্বজনীন Universal Hedonism. এই মতানুযায়ী সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ সাধনের চেষ্টাই কাম্য ও আনন্দময়। ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬), জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) প্রমুখ দার্শনিকই এই মত প্রচার করেন।

সুন্নাত : অর্থ পথ, প্রথা, অভ্যাস বা সংবিধি। অনেকে মনে করেন যে, আল্লাহ্ এবং রাসুল (সা)-এর পথ বা প্রথার মধ্যে তফাত থাকার যেহেতু কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সেহেতু যা-ই ফরজ, তা-ই সুন্নাত। তবে সুন্নাত বলতে সাধারণ মানুষ হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর সুন্নাতকেই বুঝে থাকেন। যে-সমস্ত বিষয় কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, অথচ যা মুহাম্মদ (সা) নিয়মিত পালন করতেন এবং তাঁর অনুসারীদের পালন করতে বলতেন সেগুলোই সুন্নাত। সুন্নাত প্রধানত দুপ্রকার। প্রথম প্রকারের সুন্নাত পালন না করলে পাপ

হয়। দ্বিতীয় প্রকারের সুন্নাত পালন না করলে পাপ হয় না, তবে পালন করলে পুণ্য হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সুন্নাত কুরআনের ব্যাখ্যা ও পরিপূরক। সুন্নাত এদিক থেকে তিন রকমের হতে পারে। ১. কুরআনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলসম্পন্ন, ২. কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং ৩. কুরআনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন।

সুন্নি ও শিয়া গোটা মুসলিম বিশ্ব মূলত দুই শিবিরে বিভক্ত। তবে সুন্নিদেরই সংখ্যাধিক্য। হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর সুন্নাহর প্রতি বিশ্বস্ততা থেকে সুন্নি নামের উৎপত্তি। চিন্তার ক্ষেত্রে সুন্নিরা চারজন প্রধান ইমাম বা নেতার অনুসারী। এঁরা হলেন আবু হানিফা, মালিক বিন আন্নাস, শা'ফি এবং হাম্বল। এই চারজন ইমামের মধ্যে আইনগত বিষয়ের ব্যাখ্যা ইত্যাদি কতিপয় বিষয়ে ছাড়া মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। আর শিয়া শব্দের অন্যতম অর্থ 'পক্ষপাতী'। হজরত আলি (রা)-র প্রতি পক্ষপাতিত্ব থেকে শিয়া নামের উৎপত্তি। শিয়াদের মতে হজরত মুহম্মদ (সা)-এর আধ্যাত্মিক ও জাগতিক ক্ষমতা উভয়েরই উত্তরাধিকারী ছিলেন হজরত আলি (রা)। সুতরাং তিনি এবং তাঁর বংশধরেরাই ছিলেন খিলাফতের একমাত্র বৈধ ও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত উত্তরাধিকারী। শিয়ারা খলিফা নির্বাচনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁদের মতে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোনো উপাস্য নেই, হজরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর প্রেরিত পুরুষ এবং হজরত আলি (রা) তাঁর প্রতিনিধি। খলিফার পদও স্বর্গীয়ভাবে নির্ধারিত বিধায় এ-ব্যাপারে গণতন্ত্রের কোনোই সুযোগ নেই। কারবালার যুদ্ধে ইমাম হোসেন (রা)-এর শাহাদাত শিয়াদের জঙ্গি চরিত্র বাড়িয়ে দেয়। তাঁরা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা অক্ষুণ্ন রাখেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শিয়ারাও একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। শিয়াদের মধ্যে যাঁরা ইসনা আশারিয়া বা দ্বাদশপন্থি, তাঁরা মনে করেন যে, তাঁদের দ্বাদশ ইমাম মোহাম্মদ ইবনুল হাসান সামারা থেকে সশরীরে অন্তর্হিত হয়েছেন এবং তিনি কিয়ামত বা চূড়ান্ত ধ্বংসের পূর্বে ইমাম মেহেদি হিসাবে পুনরায় আবির্ভূত হবেন।

সুপ্রিম সোভিয়েত এটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। এর দুটি কক্ষ ইউনিয়নসমূহের সোভিয়েত (Soviet of the Unions) এবং জাতিসমূহের সোভিয়েত (Soviet of the Nationalities)। উভয় কক্ষের অধিকার ছিল সমান। সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্যদের বলা হত ডেপুটি। প্রথম কক্ষে গড়ে প্রতি তিন লক্ষ জনগণঅধ্যুষিত এলাকা থেকে একজন ডেপুটি নির্বাচিত হতেন। দ্বিতীয় কক্ষে প্রত্যেক অঙ্গ প্রজাতন্ত্র থেকে ৩২ জন, প্রত্যেক স্বশাসিত প্রজাতন্ত্র থেকে ১১ জন, প্রত্যেক স্বশাসিত অঞ্চল থেকে ৫ জন এবং প্রত্যেক স্বশাসিত এলাকা থেকে ১ জন করে ডেপুটি নির্বাচিত হতেন। সুপ্রিম সোভিয়েতে ৬১টি জাতির প্রতিনিধিত্ব ছিল। সুপ্রিম সোভিয়েত তার একটি 'প্রেসিডিয়াম' ও 'সুপ্রিম কোর্ট' নির্বাচিত করত এবং মন্ত্রিপরিষদ গঠন করত। সুপ্রিম সোভিয়েতের অধিকাংশ ক্ষমতা প্রেসিডিয়ামের ওপর ন্যস্ত থাকত এবং প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যানই হতেন কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাধর ব্যক্তি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ায় সুপ্রিম সোভিয়েতও পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে।

সুবিধাবাদ Opportunism. ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের জন্য সুবিধামতো নীতি পরিবর্তনের নামই হল সুবিধাবাদ। অনেকে মুখে আদর্শের কথা বলে, কিন্তু কার্যত সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে নীতি পরিবর্তন করে, দল পরিবর্তন করে এবং বিভিন্ন

আঁতাঁতে লিপ্ত হয়। কৌশল পরিবর্তন এবং নীতি পরিবর্তন হুবহু এক কথা নয়। এরূপ নীতি পরিবর্তনকারীরা যে-আদর্শের কথাই বলুক-না কেন এবং যে-যুক্তিই খাড়া করুক না কেন, এদেরকে সুবিধাবাদী বলেই গণ্য করা হয়। পার্থক্য এই যে, কেউ সুবিধাবাদের আশ্রয় নেয় সরাসরি, কেউ তা করে আদর্শ, জনকল্যাণ ইত্যাদির মুখোশের অন্তরালে।

সুবিধাবাদ, ডানপন্থি Right Opportunism. সমাজতন্ত্রী বা বামপন্থিরা মনে করেন যে, ডানপন্থি বা বুর্জোয়া পেটিবুর্জোয়ারা তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে এবং পুঁজি ও মুনাফার স্বার্থে সুবিধামতো যে-কোনো দল বা ব্যক্তির সঙ্গে আঁতাঁত করতে পারে ও যে-কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক শিবিরে ভিড়ে পড়তে পারে। এরূপ ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহ ক্ষমতার জন্যও সুবিধামতো যে-কোনো কৌশল অবলম্বন করতে পারে এবং যে-কারও সঙ্গে হাত মেলাতে পারে। বামপন্থি বা কমিউনিস্টদের মধ্যেও যাদের যে-কোনোভাবে বা যে-কারও সঙ্গে আঁতাঁত করে ক্ষমতায় যাওয়ার বা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সুবিধা আদায়ের প্রবণতা রয়েছে, তাদেরকেও বলা হয় সুবিধাবাদী বা বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া চিন্তা-চেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তি।

সুয়েজ সংকট ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের সংযোগকারী ১০১ মাইল দীর্ঘ এই খালটি চালু হয় ১৮৬৯ সালে। সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানি নামে একটি কোম্পানি এই খালটি নিয়ন্ত্রণ করত এবং এর মধ্য দিয়ে চলাচলকারী জাহাজসমূহের ওপর শুল্ক ধার্য ও তা আদায় করত। এই কোম্পানির ৮ লক্ষ শেয়ারের মধ্যে ৩,৫৩,৫০৪টিরই মালিক ছিল ব্রিটিশ সরকার। এই কোম্পানি মূলত পরিচালিত হত ফরাসিদের দ্বারা। ১৯৬৮ সালে এই কোম্পানির কার্যকারিতার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর খালের নিয়ন্ত্রণভার মিশর সরকারের ওপর প্রত্যার্পণের কথা ছিল। ১৮৮৮ সালে সম্পাদিত কনস্টান্টিনোপল কনভেনশন মোতাবেক সাব্যস্ত হয়েছিল যে, যুদ্ধের সময়ই হোক আর শান্তির সময়ই হোক, যুদ্ধজাহাজ বা বাণিজ্যজাহাজ বা অপর যে-কোনো জাহাজের এই খাল দিয়ে গমনাগমনের ব্যাপারে কোনোকালেই কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে সম্পাদিত ব্রিটিশ-মিশর চুক্তি অনুযায়ী সুয়েজ খাল এলাকা থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত হবে বলেও সাব্যস্ত হয়। ১৯৫৬ সালের ২৬ জুলাই মিশর সরকার অকস্মাৎ কোম্পানিটিকে জাতীয়করণ করে বসে এবং বলে যে এই খাললব্ধ আয় মিসরের আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য অপরিহার্য। অবশ্য মিশর ঘোষণা করে যে, কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডারদের শেয়ারমূল্য পরিশোধ করা হবে। এর ফলে সৃষ্টি হয় এক তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। ২ আগস্ট ১৯৫৬ ব্রিটিশ সরকার সুয়েজের ব্যাপারে সামরিক ব্যবস্থাগ্রহণের কথা ঘোষণা করে। লন্ডনে এবং জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ২৯ অক্টোবর ইসরায়েল মিশর আক্রমণ করে বসে। যুক্তরাজ্য মিশর ও ইসরায়েলকে সুয়েজ এলাকা থেকে ১০ মাইল দূরে সরে যেতে চূড়ান্তপত্র বা আলটিমেটাম প্রদান করলে মিশর তা মানতে অস্বীকার করে। ৩১ অক্টোবর ব্রিটিশ-ফরাসি সম্মিলিত বাহিনী মিশর আক্রমণ করে এবং খালের উত্তরদিকের কিয়দংশ দখল করে নেয়। অংশত জনমতের চাপে এবং অংশত সোভিয়েত ইউনিয়নের হুমকি ও সামরিক প্রস্তুতির মুখে ৬ নভেম্বর ব্রিটিশ-ফরাসিরা যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। ফলে উক্ত এলাকা থেকে ব্রিটিশ, ফরাসি ও ইসরায়েলের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপেই লোপ পায়। মিশর ইতিমধ্যে খাল বন্ধ করে দিয়েছিল। জাতিসংঘ মিশনের মধ্যস্থতায় ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে খাল পুনরায়

খুলে দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালের জুলাইতে মিশর প্রাক্তন কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডারদের ২ কোটি ৯০ লক্ষ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়।

সেংঘর, লিওপোল্ড ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণকারী লিওপোল্ড সেংঘর একজন বিশ্ববিখ্যাত আফ্রিকান কবি ও রাজনৈতিক নেতা। ১৯৬০ সালে তিনি ফরাসি উপনিবেশবাদের কবলমুক্ত সেনেগালের প্রথম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে, তিনি তাঁর সহযোগী আবদু দিউফের হাতে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। রাষ্ট্রক্ষমতায় না থাকলেও সেংঘরই সেনেগালের সবচেয়ে সম্মানিত ও প্রভাবশালী বক্তিত্ব।

সেকিউলারিজম Secularism. "র‍্যানডম হাউস ডিকশনারি অব দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ"-এ সেকিউলার বা 'ধর্মনিরপেক্ষ'-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ক. যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয় (Not regarded as religious or spiritually sacred) খ. যা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় (Not pertaining to or connected with religion) এবং গ. যা কোনো ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত নয় (Not belonging to a religious order)। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এটি হল একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন, যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় (Rejects all forms of religious faith). এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সংজ্ঞাও অনুরূপ। অর্থাৎ যাঁরা কোনো ধর্মের অন্তর্গত নন, কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন এবং আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার বিরোধী—তাঁদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ। অনেকের মতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা সমার্থক। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন; কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নন। (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদও দ্রষ্টব্য)

সেতুঋণ Bridging Loan. মূলত এটি হল কোনো বস্তু বিক্রয়ের পূর্বে অন্য বস্তু ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা। যেমন, একটি পুরানো বাড়ি বিক্রয়ের পূর্বে নতুন বাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণপ্রদান।

সেন্টকম Centcom. কথাটি আসলে 'সেন্ট্রাল কমান্ড' (Central Command)-এর সংক্ষেপিত রূপ। ১৯৮৮ সালের পয়লা জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সামরিক কমান্ড গঠন করে। বস্তুত দিয়াগো গার্সিয়া, ওমান, সোমালিয়া ও কেনিয়াসহ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্থাপিত বিভিন্ন মার্কিন সামরিক ঘাঁটি, পারস্য উপসাগরের মুখে অবস্থিত বিমানবাহীর নৌবহর এবং ১৯৮০ সালে গঠিত 'র‍্যাপিড ডেপ্লয়মেন্ট ফোর্স' (Rapid Deployment Force)-কে সমন্বিত কমান্ডের অধীনে আনাই ছিল সেন্টকম গঠনের উদ্দেশ্য। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, কুয়েত ও বাহরাইনসহ ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের ১৯টি দেশ সেন্টকম-এর সামরিক তৎপরতার আওতাভূক্ত থাকবে বলে সাব্যস্ত হয়।

সেন্ট সাইমনবাদ এটি হল ফরাসি দার্শনিক সেন্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫) প্রবর্তিত কাল্পনিক সমাজবাদ। তিনি সমাজের প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে সাধ্যমতো নেওয়ার এবং প্রত্যেককে প্রয়োজনমতো দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মতবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজ বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে না ওঠায় কাল্পনিক বলে চিহ্নিত হয় এবং কোথাও সাফল্য অর্জন করে না।

সেন্টো Cento. কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা বা সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশনেরই সংক্ষেপিত রূপ হল সেন্টো। ১৯৫৮ সালের বাগদাদ অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে ইরাক ১৯৫৯ সালে বাগদাদ প্যাক্ট থেকে সদস্যত্ব প্রত্যাহার করলে এই প্যাক্টভূক্ত বাকি সদস্যেরা (যুক্তরাজ্য, তুরস্ক, ইরান ও পাকিস্তান) চুক্তির নতুন নামকরণ করে সেন্টো। এর প্রধান কার্যালয় অবশ্য ১৯৫৮ সালেই বাগদাদ থেকে আংকারায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৬০ সালে সেন্টোভুক্ত দেশসমূহের সামরিক কর্মকর্তারা তেহরানে এক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে মার্কিন বিমানবাহিনীপ্রধান এবং ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানও উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে সংস্থার একটি সম্মিলিত সামরিক কমান্ড গঠনের প্রস্তাব করা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ-ব্যাপারে অত্যন্ত ঠাণ্ডা দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে। তদুপরি, জনসংখ্যার হিসাবে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ও 'নিরপেক্ষ' ভারতকে কোনো রকমেই খ্যাপানো যাবে না, এই অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেন্টোকে শক্তিশালী করার বদলে ভারতকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করলে পাকিস্তান সেন্টোর ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে, অনুরূপ অন্যান্য চুক্তি ও সংস্থার মতো সেন্টোও কালক্রমে গুরুত্ব ও তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে এবং বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সেন্সরশিপ Censorship. সেন্সরশিপ হচ্ছে কোনো রাষ্ট্র, ধর্মীয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন—চার্চ) বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো লিখিত বা প্রকাশিত বা ধারণকৃত বক্তব্যকে নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা। ধর্মীয় ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা, প্রেরিত পুরুষ, ধর্মগ্রন্থ, ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার ইত্যাদির বিরুদ্ধ বা সমালোচনামূলক কোনো বক্তব্য বা পুস্তকাদিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার জন্য সেন্সরশিপ ব্যবহার করা হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি ও স্বার্থবিরুদ্ধ পুস্তক, বক্তব্য ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেন্সরশিপ প্রয়োগ করা হয়। ক্ষমতাসীন সরকার তার দলীয় স্বার্থেও সেন্সরশিপ প্রয়োগ করে থাকে। জনগণের স্বার্থ বা চরিত্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ কোনো পুস্তক, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদিও সেন্সরশিপ-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। স্বৈরাচার ও একনায়কতন্ত্রসম্পন্ন দেশে সেন্সরশিপের বেপরোয়া প্রয়োগ দেখা যায়। অনেক সময় পত্রিকায় খবর সেন্সর করে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা যাতে ফাঁস হয়ে না যায়, এজন্য ব্রিটেনে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন (Official Secrets Act) এবং এর ডি-নোটিস (D-Notice)-এর ব্যবস্থা রয়েছে।

সোফা : Status of Forces Agreement (SOFA). মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশের সঙ্গে কোনো সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে যৌথ অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে এই চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। সাধারণত কোনো দুর্যোগ মোকাবেলা, মাদকদ্রব্য চোরাচালান রোধ ইত্যাদি ইস্যুর মোকাবেলার জন্যই এরূপ চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং যৌথ অভিযানে অংশগ্রহণকারী মার্কিন সৈন্যদের কর্মকাণ্ডের সীমা ও আচরণবিধি কী হবে তাও চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে।

সোভিয়েত Soviet. এটি একটি রুশ শব্দ। এর অর্থ হল পরিষদ। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় সর্বপ্রথম 'শ্রমিক পরিষদ' (সোভিয়েত বলে পরিচিত)সমূহের উদ্ভব ঘটে। ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবের পর সোভিয়েতই হয় কমিউনিস্ট ক্ষমতার মূল ভিত্তি। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত নিম্নতর স্তরের সোভিয়েতসমূহ পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে উচ্চতর স্তরের সোভিয়েতসমূহ নির্বাচিত করত। সোভিয়েতের মূল কথাই হল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে

আপামর জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ। সোভিয়েতের মধ্যে বিচার ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সমন্বয় ঘটে এবং সোভিয়েত স্থানীয় ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হিসাবে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। ১৯৩৬ সালে সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে পরোক্ষ নির্বাচনপ্রথা বাতিল করা হয় এবং সকল স্তরের সোভিয়েত জনগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

স্যাবোটাজ : Sabotage. সন্ত্রাসবাদী বা গোপন কার্যকলাপের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সম্পত্তি বা স্বার্থের হানি ঘটানোকেই বলে স্যাবোটজি। অনুরূপভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের, কোনো জনগোষ্ঠীর বা কোনো যুদ্ধ বা কর্মপ্রক্রিয়ার ক্ষতিসাধনকেও স্যাবোটাজ বলে অভিহিত করা হয়।

স্টাখানোভাইট Stakhanovite. এ হল সেই শ্রমিক, যে তার ওপর প্রদত্ত উৎপাদন-কোটার অতিরিক্ত উৎপাদন করে। রাশিয়ার খনিশ্রমিক আলেক্সি স্টোখানোভ সর্বদাই তার ওপর প্রদত্ত কোটা অতিক্রম করত বলে, স্টাখানোভকে জাতীয়ভাবে অনুসরণযোগ্য উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হত। স্টাখানোভাইটদের দেওয়া হত অতিরিক্ত মজুরি ও অন্যান্য অতিরিক্ত সামাজিক সুবিধা। অবশ্য পরবর্তীকালে রাশিয়ায় ব্যক্তিগত কৃতিত্বের চাইতে সমষ্টিগত কৃতিত্বের ওপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

স্টার্ট বিপজ্জনক অস্ত্র হ্রাস আলোচনা বা Strategic Arms Reduction Talks (START) হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যেকার একটি ধারাবাহিক আলোচনা—যার উদ্দেশ্য ছিল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রসমূহ, বিশেষত মাঝারি ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ হ্রাসকরণ। বস্তুত একপক্ষ অপরপক্ষকে অস্ত্র হ্রাস করার জন্য চাপ দিলেও কার্যত উভয়েই প্রতিনিয়ত তাদের ভয়াবহ অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়ে যেতে থাকে। এটি বিপজ্জনক অস্ত্র সীমিতকরণ আলোচনা (SALT)-র মতোই একটি ব্যাপার।

স্টার্লিং এলাকা : Sterling Region. ১৯৩১ সালে যুক্তরাজ্য মুদ্রার ক্ষেত্রে স্বর্ণমান বা 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' বর্জন করলে কিছুসংখ্যক রাষ্ট্রও স্বর্ণমান বর্জন করে তাদের স্ব স্ব মুদ্রাকে যুক্তরাজ্যের মুদ্রা বা স্টার্লিং-এর মানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডে তাদের মুদ্রা-রিজার্ভ জমা রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এ-সমস্ত দেশকে নিয়েই স্টার্লিং এলাকা গঠিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তৎপরবর্তীকালে স্বর্ণ ও ডলারের চরম দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিলে স্টার্লিং এলাকার সদস্যেরা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে বাধ্য হয়। এই নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী স্টার্লিং এলাকার ভেতর বিনিময়ের স্বাধীনতা থাকলেও এটা সাব্যস্ত হয় যে, এলাকাভুক্ত কোনো দেশ বেশি ডলার আয় করলে উদ্বৃত্ত ডলার স্টার্লিং-এর জন্য ব্রিটিশ ট্রেজারিতে বিক্রি করে দেবে এবং কোনো দেশের ডলার ব্যয় ডলার আয়ের চেয়ে বেশি হলে, সে দেশ ব্রিটিশ ট্রেজারি থেকে স্টার্লিং-এর বদলে ডলার ক্রয় করতে পারবে। ১৯৬১ সালের পর স্টার্লিং এলাকার সীমানা বলতে যুক্তরাজ্য, এর উপনিবেশসমূহ, কানাডা ব্যতীত সমস্ত কমনওয়েলভুক্ত দেশ এবং মায়ানমার, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, জর্ডান, লিবিয়া এবং পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরের উপকূলবর্তী সাতটি স্বাধীন দেশকে বোঝানো হত।

স্ট্যান্ডিং কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি একটি সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী দলের পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যবর্তী স্তর। সকল স্তর ও অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বৃহত্তর

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সবসময় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর নয় বিবেচনায় কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্য থেকে বাছাই-করা সদস্যদের নিয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি যখন অধিবেশনে নেই, তখন কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্টির যাবতীয় কার্য পরিচালনাই হল স্ট্যান্ডিং কমিটির কাজ। স্ট্যান্ডিং কমিটির মধ্য থেকেও অনুরূপ কারণে এবং অনুরূপভাবে পলিটব্যুরো নির্বাচন করা হয়।

স্ট্যালিন, জোসেফ ভিসারিওনোভিচ (১৮৭৯-১৯৫৩) জর্জিয়ায় জন্ম। পিতা ছিলেন পেশায় মুচি। বিপ্লবী ধ্যানধারণার জন্য ১৮৯৯ সালে তিনি স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন এবং দুবার সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ১৯০৩ সালে তিনি প্যারিসে আসেন। ১৯০৬ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত নির্বাসিত রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯০৭ সালে অনুষ্ঠিত লন্ডন সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি বলশেভিক পার্টির সংখ্যালঘু জাতিসমূহবিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেন এবং ১৯১৩ সালে ভিয়েনায় 'মার্কসবাদ ও জাতিগত সমস্যা' শীর্ষক রচনা প্রকাশ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি প্রাভদার সম্পাদক নিযুক্ত হন। অক্টোবর বিপ্লবের সময় পেট্রোগ্রাডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং লেনিনের সরকারে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসংক্রান্ত কমিশার নিযুক্ত হন। ১৯২২ সালে তিনি রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিপ্লবপরবর্তী গৃহযুদ্ধের সময় জেনারেল ইয়ুদেনিং-এর শ্বেতবাহিনীর হাত থেকে পেট্রোগ্রাডকে রক্ষা করেন এবং অনুরূপভাবে জেনারেল ডেনিকিনের হাত থেকে জারিৎসিনকে উদ্ধার করেন। ১৯২৩ সালে জিনোভিয়েভ ও কামেনভ তাঁর পক্ষ নেন এবং ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যু হলে স্ট্যালিন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইতিমধ্যে ট্রটস্কির সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। ১৯২৮ সাল থেকে তিনি 'এক দেশভিত্তিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করেন এবং ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে ট্রটস্কিকে তুরস্কে নির্বাসিত করা হয়। ১৯৪১ সালের ৭ মে স্ট্যালিন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও গ্রহণ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা কমিশার এবং মার্শাল হিসাবে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুশবাহিনী পরিচালনা করেন এবং তেহরান, ইয়াল্টা ও পটসডম সম্মেলনে অংশ নেন। যুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি মূল ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৩ সালে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরসূরিরা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্ববাদ (Personality Cult) সৃষ্টির অভিযোগ আনয়ন করেন। ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির ২২তম কংগ্রেসে তাঁকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর মমিকৃত মৃতদেহ পর্যন্ত ক্রেমলিনের পার্শ্ববর্তী রেডস্কোয়ার থেকে অপসারিত করা হয়। উত্তরসূরিরা তাঁর নাম মুছে দেওয়ার চেষ্টা করলেও বাস্তবতা হল এই যে, তিনি সুদীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং এ-সময়ের মধ্যেই রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর রচনাসমূহের অন্যতম হল 'লেনিনবাদের ভিত্তি', 'লেনিনবাদের সমস্যা' প্রভৃতি। অনেকেই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিনকে (কেউ-কেউ মাও ঝে ডঙকেও) একই ধারাবাহিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেন।

অনেকে এটাও মনে করেন যে, স্ট্যালিনের উত্তরসূরিরা যদি তাঁর নীতি আদর্শে অটল থাকতেন, তা হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতন নাও হতে পারত।

স্থলমাইনবিরোধী আন্দোলন বিশ্বে প্রধানত তিন ধরনের স্থলমাইন আছে, যথা ১. ব্লাস্ট মাইন (মাটির নিচে লুকানো এসব মাইন সামান্য চাপেই বিস্ফোরিত হয়) ২. ফ্র্যাগমেন্টেশন মাইন (মাটির ওপর পাতা এসব মাইনের বিস্ফোরণ ঘটানো হয় সংযুক্ত তারের সাহায্যে) এবং ৩. বাইন্ডিং ফ্র্যাগমেন্টেশন মাইন (এগুলো নিক্ষেপযোগ্য)। গত ১৩০ বছর ধরে শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসব মাইন পেতে রাখা হয়। সারা বিশ্বে আনুমানিক ২০ থেকে ৩০ কোটি স্থলমাইন পাতা আছে এবং এর ফলে প্রতি বছর গড়ে ২৬০০০ শিশু, নারী ও নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে অথবা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি স্থলমাইন তৈরি ও পাতার জন্য খরচ পড়ে মাত্র তিন ডলার ; অথচ এর একেকটি নিষ্ক্রিয় করতে খরচ হয় ১০০০ ডলার। স্থলমাইনকে বলা হয় নীরব সৈন্য। যুদ্ধ থেমে যায়, সৈন্যেরা চলে যায়, কিন্তু এই মাইন তার কাজ করেই যেতে থাকে। আশির দশকে ভিয়েতনাম-ফেরত পঙ্গু যোদ্ধা রবার্ট মিলার 'ভিয়েতনাম ভেটারন্‌স্ আমেরিকান ফাউন্ডেশন'-এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণের জন্য আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯৯১ সালে মিলার জোডি উইলিয়াম্‌স্‌কে আহ্বান জানান স্থলমাইনবিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মার্কিন মহিলা জোডি উইলিয়াম্‌স্ শুরু করেন আন্তর্জাতিক স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ আন্দোলন। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লয়েড এক্সওয়ার্দি। স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ আন্দোলনে অনবদ্য ভূমিকার জন্য জোডি উইলিয়াম্‌স্ ১৯৯৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। ব্রিটেনের সাবেক প্রিন্সেস অব ওয়েলস ডায়ানাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং স্থলমাইন বিস্ফোরণে পঙ্গু ও আহতদের জন্য কাজ শুরু করেছিলেন। বর্তমানে এই আন্দোলনের অপর নেত্রী জর্ডানের রানি নুর। এখনও প্রতি ২০ মিনিটে পৃথিবীর কোনো না কোনো দেশে কেউ-না-কেউ স্থলমাইন বিস্ফোরণে প্রাণ হারাচ্ছে কিংবা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এ-পর্যন্ত ১৩৬টি দেশ স্থলমাইন ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, অপসারণ ও মওজুদ অস্ত্র ধ্বংসকরণের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়ে অটোয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, পাকিস্তান ও ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ এখনও (১৯৯৯) এ-চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।

স্থান ও কাল Time and Space. এটি বস্তুর অবস্থানের মৌল স্বরূপ। দার্শনিকদের কারও কারও মতে স্থান ও কাল বাস্তবিকই বাস্তব ও বর্তমান, আবার কারও কারও মতে স্থান-কাল আসলে বিমূর্ত ব্যাপার এবং শুধুমাত্র মানুষের চেতনাতেই এর অবস্থান। বার্কলি, হিউম, ম্যাক প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকদের মতে স্থান ও কালের কোনো বস্তুগত অস্তিত্ব নেই; মানুষের চেতনাতেই শুধু এর স্থিতি। কিন্তু বস্তুবাদীদের মতে স্থান-কালের বস্তুতই অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাঁরা স্থান-কালনিরপেক্ষ কোনো বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে বস্তুকে স্থান-কাল থেকে আলাদা করা অসম্ভব। স্থানের রয়েছে তিনটি মাত্রা বা ডাইমেনশন; আর কালের রয়েছে মাত্র একটি মাত্রা। স্থান ও কাল উভয়েই অবিভাজ্য এবং সর্বব্যাপী। স্থান বা স্পেস (Space) একই সময়ে অবস্থিত বস্তুসমূহের পারস্পরিক অবস্থান নির্দেশ করে আর সময় (Time) পরিবর্তনশীল বস্তু ও

ঘটনাবলীর পরম্পরা নির্দেশ করে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মতে স্থান-কালের সঙ্গে গতিশীল বস্তুর শুধু যে সম্পর্কই আছে তা নয়, বরং স্থান-কালই হল গতির মৌল কথা। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে এই বিষয়ে নিউটনীয় ধারণাকেই প্রাধান্য দেওয়া হত এবং মনে করা হত যে, বস্তু ও গতির স্বরূপ স্থান-কালনিরপেক্ষ। আধুনিক পদার্থবিদ্যা এ-ধারণার অপনোদন করেছে।আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বের অন্যতম মূলকথা হল এই যে, স্থান-কালের অবস্থান বস্তুনিরপেক্ষ নয় বরং স্থান-কাল হল এক মহাবিশ্বীয় আন্তঃসম্পর্কেরই অংশ এবং পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য।

স্থিতাবস্থা : এটি ল্যাটিন Status Quo (অর্থ : যথাপূর্ব) শব্দটির বঙ্গানুবাদ। এর অর্থ হল রাজনীতি, যুদ্ধাবস্থা, সরকার বা রাষ্ট্রীয় কাঠামো, কর্মকাণ্ড ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে পূর্ববর্তী অবস্থা বজায় রাখা।

স্নায়ুযুদ্ধ : ঠাণ্ডাযুদ্ধ (Nerve War অথবা Cold War) সরাসরি অস্ত্রপ্রয়োগের বদলে দুই প্রতিপক্ষ যখন পরস্পরকে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, প্রচার, গোয়েন্দাতৎপরতা ও সামরিক হুমকিসহ বিভিন্নভাবে পরোক্ষ কায়দায় ঘায়েল বা মানসিকভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করে, তখন এরূপ তৎপরতাকে বলে স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডাযুদ্ধ, কেননা এরূপ তৎপরতা প্রতিপক্ষের স্নায়ুর ওপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করে।

স্পার্টাকাস : স্পার্টাকাস ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের অন্তঃপাতি থ্রেসের একজন মেষপালক। পরে তিনি রোমানদের ক্রীতদাসে পরিণত হন। কিছুদিন পর তিনি রোম থেকে পালিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসদের একটি বিরাধী দলের সঙ্গে মিলিত হন এবং এদের সংগঠিত করে তিনি সমগ্র ইতালিব্যাপী এক ক্রীতদাসবিদ্রোহের আয়োজন করেন। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহী ক্রীতদাসরা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্য শুরু করে। এই বিদ্রোহের ফলে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয় এবং রোম সাম্রাজ্যের বেশ কয়েকটি বাহিনী বিদ্রোহীদের হাতে পরাজিত হয়। অবশেষে খ্রিষ্টপূর্ব ৭১ সালে রোমীয় সেনাপতি মার্কাস লিমিনিয়াস ক্রেসাস দাস বিদ্রোহ দমন করেন। স্বয়ং স্পার্টাকাসও এক খণ্ডযুদ্ধে নিহত হন।

স্পার্টাকাসপন্থি খ্রিস্টপূর্ব ৭২-৭১ সালে ইতালির ব্যাপক দাসবিদ্রোহের নায়ক স্পার্টাকাস-এর নাম থেকে স্পার্টাকাসপন্থি শব্দের সৃষ্টি হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানির বামপন্থি বিপ্লবী কার্ল লিবনেখট ও রোজা লুক্সেমবার্গ আপোসবাদী জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে স্পার্টাকাসপন্থি (Spartacist) নামে নয়া বিপ্লবী দল গঠন করে রুশ শ্রমিক বিপ্লবের অনুকরণে জার্মানিতেও শ্রমিক বিপ্লবের আয়োজন করেন। ১৯৩৯ সালে স্পার্টাকাসপন্থিদের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জার্মানির ব্যাভারিয়া ও বার্লিনের কয়েকটি অঞ্চলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। কিন্তু অনতিকাল পরেই স্পার্টাকাসপন্থিরা পরাজিত হয় এবং এই রিপাবলিকসমূহ নির্মূল হয়ে যায়। লিবনেখট ও রোজা লুক্সেমবার্গও গুপ্ত আততায়ীর হাতে নিহত হন। অবশিষ্ট স্পার্টাকাসপন্থিরা 'জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি' নাম গ্রহণ করে টিকে থাকার চেষ্টা করেন।

স্পিনোজা, বেনেডিক্ট (১৬৩২-৭৭) ওলন্দাজ বস্তুবাদী দার্শনিক। ইহুদি সম্প্রদায়ের স্বাধীন চিন্তার পক্ষে বক্তব্য রাখার দরুন তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়। তিনি দর্শনে জ্যামিতিক পদ্ধতির প্রবর্তক। যে-ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে স্পেনীয় সামন্তবাদী

রাজতন্ত্রের কবলমুক্ত নেদারল্যান্ডসে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল, সেই পরিস্থিতিতেই তাঁর দর্শনের উদ্ভব। তাঁর মতে, জ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রকৃতির ওপর আধিপত্য ও মানুষের উন্নয়ন। প্রয়োজনের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কেমন করে মানুষের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা যায়, এটাই ছিল তাঁর দর্শনের মৌল প্রতিপাদ্য। দেকার্তের দ্বৈতবাদ-এর খণ্ডন করে তিনি দেখান যে, প্রকৃতি আপন কারণেই বিরাজমান, এর পেছনে অপর কোনো কারণ নেই। তাঁর মতে ধর্মের উদ্দেশ্য হল উচ্চ নৈতিক মানের বিকাশ ঘটানো। সুতরাং ধর্ম বা রাষ্ট্র কারওরই উচিত নয় চিন্তার স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা। হবসের উত্তরসূরি হলেও তিনি রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক সরকারই হল শ্রেষ্ঠ সরকার। এঙ্গেলস তাঁর বিখ্যাত 'ডায়ালেক্টিকস্ অব নেচার' গ্রন্থে স্পিনোজার চিন্তাধারার প্রশংসা করেন।

স্পীকার পার্লামেন্টের সভাপতিকেই বলে স্পীকার। তিনি পার্লামেন্টের অধিবেশন পরিচালনা করেন। তিনিই পার্লামেন্টের সর্বময় কর্তা।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে স্পেনের সাম্যবাদী, নৈরাজ্যবাদী, সমাজতন্ত্রী, ট্রটস্কিবাদী ও প্রজাতন্ত্রীদের সম্মিলিত গণফ্রন্ট বা পপুলার ফ্রন্ট রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে ১৯৩৬ সালের ১৮ জুলাই স্পেনীয় মরক্কোর সেনানায়করা জেনারেল সানজুরজো (দুমাস পরে নিহত) ও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। ১৯৩৬ সালের অক্টোবরে ফ্রাঙ্কো নিজেকে স্পেনের রাষ্ট্রপ্রধান বলে ঘোষণা করেন। স্পেনের কার্ডিজ, সারাগোসা, সেভিল এবং বারগোস এলাকা বিদ্রোহীদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ফলে, ইতালি পরিণত হয় ফ্যাসিবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের এক যুদ্ধক্ষেত্রে। রাশিয়া স্পেন সরকাররে পক্ষে উপদেষ্টা ও প্রযুক্তিবিদ প্রেরণ করে। ফ্যাসিবাদবিরাধীরা আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠন করে। এই ব্রিগেড ১৯৩৮ সাল জুড়ে এব্রো নদীর উপকূলে তীব্র যুদ্ধ চালায়। ফ্রাঙ্কো সাহায্য পান জার্মানি ও ইতালির কাছ থেকে। ইতালি ৫০ হাজার স্বেচ্ছাসেবী প্রেরণ করে। এই গৃহযুদ্ধকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় (১) প্রথম ছয় মাসে উচ্চতর সামরিক দক্ষতা দেখিয়ে বিদ্রোহীরা পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বিপুল বিজয় অর্জন করে। স্বায়ত্তশাসনের আশায় বাস্ক ও ক্যাটালোনিয়ানরা সরকারকে সমর্থন করে। ফলে, উত্তর ও পূর্বদিকে সরকার দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৩৬ সালের শেষাশেষি ফ্রাঙ্কো স্পেনের অর্ধেকেরও বেশি এলাকা নিজ আয়ত্তে নিয়ে আসেন এবং পর্তুগাল সীমান্তের ওপর আধিপত্য কায়েম করেন, (২) ১৯৩৭ সালে জাতীয়তাবাদীরা (ফ্রাঙ্কোপন্থিরা) মাদ্রিদকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গুয়াডালাজারায় ইতালীয় বাহিনীকে পরাজিত করে। সরকারি বাহিনী টেরুয়েল পুনর্দখল করে। জাতীয়তাবাদীরা উত্তরাঞ্চলে অনেকটা সফল হয় এবং জুন মাসে বিলবাও বন্দর হস্তগত করে, (৩) ১৯৩৮ সালে ফ্রাঙ্কো জার্মানি ও ইতালির কাছ থেকে বৃহত্তর সাহায্য লাভ করেন, ফলে তাঁদের আক্রমণ তীব্রতর হয়। অগাস্ট মাসে তাঁরা সরকারকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হন। দীর্ঘকাল মাদ্রিদকে অবরোধ করে রাখা হয় এবং ক্রিসমাসে জাতীয়তাবাদীরা ক্যাটালান ফ্রন্টে সরকারি ব্যূহ ভেদ করে ফেলে, (৪) সরকারের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রাশিয়ার নীতি পরিবর্তন (রাশিয়া সাহায্য বন্ধ করে দেয়) সরকারের পতনকে ত্বরান্বিত করে দেয়। জাতীয়তাবাদীরা

১৯৩৯ সালের ২৬ জানুয়ারি বার্সিলোনা দখল করে। ২৮ মার্চ ভেলেনসিয়া ও মাদ্রিদ আত্মসমর্পণ করে। এই গৃহযুদ্ধে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়।

স্পেন্সার, হার্বার্ট : Herbert Spencer. (১৮২০-১৯০৩)। ব্রিটিশ দার্শনিক স্পেন্সার ছিলেন মুক্ত নীতি বা Laissez Faire বা অবাধ নীতির অন্যতম প্রবক্তা। তিনি রাষ্ট্র কর্তৃক কোনোপ্রকার বিধিনিষেধ জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ কোনোপ্রকার প্রতিষ্ঠান গড়ার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ এবং তথাকথিত আইনকানুন ও সাহায্যের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে ব্যক্তি ও সমাজকে ইচ্ছামতো চলতে দিলে আপনাআপনিই বিবর্তনমূলক পদ্ধতিতে একটা যথার্থ ব্যবস্থা ও ভারসাম্য গড়ে উঠবে এবং সেটাই হবে সর্বোত্তম ব্যবস্থা। তাঁর বিখ্যাত রচনাসমূহ হচ্ছে 'দি প্রপার স্ফেয়ার অব গভর্নমেন্ট' (১৮৪২)। 'দি ম্যান ভার্সাস দি স্টেট' (১৮৮৪) প্রভৃতি।

স্পেন্সারবাদ : ব্রিটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদ। এ-মতবাদের মূল কথা হল ক্রমবিকাশবাদ। তাঁর দর্শনের দু অংশ   ১. আজ্ঞেয়তাবাদ এবং ২. ক্রমবিকাশবাদের ভিত্তিতে বস্তুজগৎ ও মানুষের বিশ্লেষণ। স্পেন্সারের মতে ক্রমবিকাশই হল বস্তুর ক্রমপরিণতি। অনির্দিষ্ট, অসংবদ্ধ ও সরল অবস্থা থেকে বস্তু ক্রমশ নির্দিষ্ট, সংবদ্ধ ও জটিল অবস্থার দিকে বিকশিত হতে থাকে। এই মতবাদ অনুযায়ী নীহারিকাপুঞ্জ থেকে গ্রহের সৃষ্টি, সমুদ্র-পর্বত ইত্যাদির সৃষ্টি বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সমন্বয়ে, ভ্রূণ অবস্থা থেকে অস্থি-রক্ত-মজ্জা-স্নায়ু ইত্যাদির উদ্ভব। অনুরূপভাবে, সংবেদনশীলতা ও স্মৃতির সমন্বয়ে জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞানের পরিণতি বিজ্ঞানে এবং বিজ্ঞানের পরিণতি দর্শনে।

স্বনির্ভর   Self-Reliant. মানে নিজের ওপর নির্ভরতা বা অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হওয়া। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ চায়, অনুন্নত বিশ্বের দেশসমূহ তাদের ওপর অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে নির্ভরশীল হয়ে থাকুক। কারণ, তা হলেই তারা এই অনুন্নত দেশসমূহকে তাদের একচ্ছত্র বাজার হিসাবে ব্যবহার করে উচ্চমূল্যে তাদের উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রয় করতে পারে এবং এ-সমস্ত দেশকে তাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের হাতিয়ার বা পণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এজন্য তারা বিভিন্ন জোট, চুক্তি, সাহায্য, ঋণ, অনুদান ইত্যাদিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে, যাতে অনুন্নত বিশ্বের সদস্য দেশসমূহ কখনোই স্বনির্ভর হতে না পারে। এই পটভূমিতেই বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের জনগণ স্বনির্ভরতার আওয়াজ তোলে। তারা চায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকে পরনির্ভরতার বলয় ছিন্ন করতে। আজকের আন্তর্জাতিক বিশ্বে শাব্দিক অর্থে কোনো দেশই শতকরা ১০০ ভাগ স্বনির্ভর নয়। এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী দেশসমূহও তাদের কাঁচামালের জন্য ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য এবং প্রভাববলয় বৃদ্ধির জন্য অন্যের ওপর কমবেশি নির্ভরশীল। সুতরাং, স্বনির্ভরতার ব্যাপারকে বুঝতে হবে আপেক্ষিক অর্থে। অর্থাৎ, যে-দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন ইত্যাদি অন্য কোনো দেশের স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, যে-দেশ তার অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রশাসন, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে ও বাস্তবায়িত করতে সমর্থ, যে-দেশ স্বদেশের সমগ্র জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজনমতো সদ্ব্যবহার করতে সমর্থ এবং যে-দেশের সম্পদ ও মাথাপিছু

আয় সে-দেশের সমগ্র জনগণকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট, সেই দেশকেই বলা যায় স্বনির্ভর। অঞ্চল বা পরিবার পর্যায়েও এই সংজ্ঞা সমভাবে প্রযোজ্য।

স্বনির্ভরতা বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর যখন জার্মানির ওপর বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন জার্মানিতে স্বনির্ভরতা বা প্রয়োজনীয় সকল কিছু জার্মানিতেই উৎপাদনের চিন্তা জোরদার হয়ে ওঠে। বস্তুত স্বনির্ভরতা বলতে প্রাথমিকভাবে বোঝায় অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, অর্থাৎ একটা দেশের প্রয়োজনীয় সম্পদ নিজ দেশেই উৎপাদন করা এবং অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা ও আমদানি হ্রাস করা। বর্তমান আন্তর্জাতিক বিশ্বে কোনো দেশের পক্ষেই প্রয়োজনীয় সকল কিছু উৎপাদন করা এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতি দরজা বন্ধ করে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাই বর্তমানে স্বনির্ভরতা বলতে বোঝায় বাইরের অর্থনৈতিক সাহায্য, ঋণ, অনুদান, করুণা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল না হওয়া এবং জাতির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু উৎপাদন বা আমদানির জন্য নিজস্ব ক্ষমতা অর্জন করা। অনেকে প্রকৃত স্বনির্ভরতা বলতে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক স্বনির্ভরতাকেও বুঝিয়ে থাকেন, কেননা তাঁদের মতে, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা মৌল ব্যাপার হলেও অর্থনীতির সঙ্গে এসব ব্যাপারগুলো এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, এর কোনো একটি ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে স্বনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভবপর নয়। অনুন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে স্বনির্ভর আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে। এরূপ আন্দোলনকারীদের অনেকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়েই স্বনির্ভরতার প্রবক্তা।

স্বয়ংক্রিয়তা Automation. কোনো কাজ মানুষকে দিয়ে করানোর পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকে দিয়ে করানোকে বলে স্বয়ংক্রিয়তা। যেমন, রেলগাড়ি-জাহাজ-বিমান ইত্যাদি থেকে শুরু করে আধুনিক স্বয়ংচালিত কলকারখানা ইত্যাদিই হল স্বয়ংক্রিয়তার উদাহরণ। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়তারও উন্নতি ঘটছে। যেমন, মানবশক্তির বদলে স্টীম, বিদ্যুৎ বা আণবিক শক্তিতে যে শুধু কলকারখানাই চলছে তা নয়—ওই যন্ত্রের চালুকরণ, বন্ধকরণ, তদারক, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিও ক্রমশ কমপিউটার, রোবট ইত্যাদি যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। শুধু কলকারখানাই নয়, গৃহস্থালি, বিনোদন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ক্রমশ স্বয়ংক্রিয়তার প্রসার ঘটছে। কারও কারও মতে স্বয়ংক্রিয়তার এই বিস্তার মানুষকে বেকার ও অলস করে তুলছে, যা চূড়ান্ত বিচারে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। আবার, স্বয়ংক্রিয়তার সমর্থকদের মতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম ও চাহিদারও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে, ফলে বেকার বা অলস হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকছে না। শিল্পোন্নত দেশসমূহের কর্মমুখরতাকেই তাঁরা এর প্রমাণ বলে বিবেচনা করেন।

স্বয়ংসম্পূর্ণতা : গ্রিক Autarkeia. শব্দের উচ্চারণ হল Autarky. এর শাব্দিক অর্থ হল 'আত্মশাসন'। কিন্তু এ-শব্দটি প্রধানত ব্যবহৃত হয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা স্বয়ম্ভরতা অর্থে। এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য হল এই যে, কোনো দেশ তার প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করবে এবং পরনির্ভরতা মূলত পরিহার করবে এবং বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ বা হ্রাস করবে। যুদ্ধের সময় শত্রুবেষ্টিত হয়েও যাতে কোনো দ্রব্যের অভাবে পড়তে না হয়, তার জন্য নাৎসি-জার্মানিতে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। অধুনা কোনো একটি ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকেও উক্ত ক্ষেত্রে Auturky অর্জন বলে ধরে নেওয়া হয়।

স্বয়ংসিদ্ধ Automatic. এর অর্থ হল যা আপনা-আপনিই ঘটে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা কোনো মানুষ বা জীববিশেষের ইচ্ছা ও প্রয়াসনিরপেক্ষভাবেই ঘটে, তাকেই বলা হয় স্বয়ংসিদ্ধ। যেমন—চন্দ্র-সূর্যের আবর্তন, সাগরের জোয়ার-ভাটা, ভূমিকম্প, ঝড়-বৃষ্টি, আগ্নেয়গিরির উদ্ভব ইত্যাদি। বস্তুবাদীদের মতে, মানবসমাজে কোনো ঘটনাই স্বয়ংসিদ্ধরূপে ঘটে না, প্রতিটি ঘটনার পেছনেই থাকে কারও না কারও প্রয়াস ও সক্রিয়তা। অপরদিকে, ভাববাদীরা মনে করে, যা ঘটার তা ঘটবেই, তার পেছনে কারও ইচ্ছা বা প্রয়াস থাক বা না-থাক।

স্বরাজ Self-Government. শাব্দিক অর্থে স্বরাজ অর্থ স্বশাসন। এর দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, স্বায়ত্তশাসন বা পূর্ণ স্বাধীনতা বোঝানো যেতে পারে। এই শব্দ ও রাজনীতির উদ্গাতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধি। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত স্বরাজের দাবিই ছিল কংগ্রেসের মূল দাবি। এরপর কংগ্রেস স্বাধীনতা দাবি করে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে স্বরাজ সম্পর্কে বলেছেন, "এটা খুবই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের নেতাদের প্রায় সকলেই স্বরাজ শব্দের দ্বারা স্বাধীনতার চেয়ে যথেষ্ট কম কিছুকে বোঝাতেন।" কিন্তু মজার বিষয় এই যে, গান্ধিজি কোনোদিনই এই কথাটির ব্যাখ্যা করেননি, আর এ-সম্পর্কে কেউ স্পষ্টভাবে চিন্তা করুক এটাও তিনি চাইতেন না। ফলে, বিভিন্ন জন স্বরাজ শব্দের বিভিন্ন রকম অর্থ করতেন। অনেকে এর দ্বারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন (Dominion Status) বুঝতেন।

স্বর্ণমান Gold Standard বলতে বোঝায় এমন একটি মুদ্রাব্যবস্থা, যাতে যে-কোনো সময় ব্যাংকনোটকে নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণে পরিণত করা যায়। স্বর্ণমান তিন প্রকার ১. পূর্ণ স্বর্ণমান : এই মুদ্রা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার নোট (কাগুজে নোট)-এর পরিবর্তে এর ওপর লিখিত বা নির্ধারিত হারে স্বর্ণমুদ্রা দিতে বা নির্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণমুদ্রা বিক্রয় করতে বাধ্য থাকে; ২. স্বর্ণপিণ্ডমান (Gold Bullion Standard) এই মুদ্রা ব্যবস্থায় দেশে বাস্তবিক কোনো স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে না; কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট ভাঙিয়েও ব্যাংক থেকে কোনো স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায় না; শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট দামে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করতে বাধ্য থাকে এবং ৩. স্বর্ণ বিনিময় মান (Gold Exchange Standard) এই মুদ্রাব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার নোটের পরিবর্তে স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা দিতে বা ক্রয়-বিক্রয় করতে বাধ্য থাকে না; কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেবল বৈদেশিক মুদ্রার হুণ্ডি ক্রয়-বিক্রয় করতে বাধ্য থাকে। স্বর্ণের অবাধ আমদানি-রপ্তানি স্বভাবতই স্বর্ণমানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে। স্বর্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিধায় স্বর্ণমানভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা স্থিতিশীল হয়। এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে-নোট বা কাগুজে মুদ্রা বাজারে ছাড়ে তা মজুত স্বর্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে। স্বর্ণমান না থাকলে মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায় এবং কাগুজে মুদ্রা মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার ও আর্থিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। বস্তুত মুদ্রাব্যবস্থার স্থিতিশীলতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পর্যাপ্ত স্বর্ণ মজুত ও মুদ্রাস্ফীতি রোধের ওপর নির্ভর করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ডে স্বর্ণমানভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা চালু ছিল। বর্তমানে অর্থনীতিবিদগণ স্বর্ণের সঙ্গে সম্পর্কহীন মুদ্রাব্যবস্থারই অধিক পক্ষপাতী।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহ Less Developed Countries (LDCs)। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত দেশসমূহকেই কেউ-কেউ এ-নামে অভিহিত করেন।

বস্তুত পরাশক্তিসমূহ অনুন্নত বিশ্বের জনগণকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই এ-সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশকে এ-নামে অভিহিত করে বলে অনেকের ধারণা। প্রকৃতপক্ষে, অনুন্নত বিশ্ব, অনুন্নত দেশসমূহ, স্বল্পোন্নত দেশসমূহ, উন্নয়নশীল দেশসমূহ ইত্যাদি একই দেশসমূহেরেই ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণযুক্ত নাম।

স্ব-সরকার : Self-Government. বাইরের কোনো সরকার বা কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বমুক্ত অবাধ নির্বাচন ও গণপ্রতিনিধিত্বভিত্তিক জনগণের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা। পৌরসভাসহ নিম্নতর স্তরের গণ-নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহকেও স্ব-সরকার হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

স্বস্তিকা : Swastika. এটি হল আর্যদের প্রতীকচিহ্ন। এই চিহ্নটি হিটলারের নেতৃত্বাধীন নাৎসিরাও ব্যবহার করত। তবে আকৃতির দিক থেকে নাৎসিদের স্বস্তিকা ছিল ভারতীয় স্বস্তিকার বিপরীত।

স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের এটি হল—মানহানিকর, রাজদ্রোহমূলক বা অশ্লীল না হলে যে-কোনো সংবাদ, সমীক্ষা, আদর্শ বা মতামত সংবাদপত্রে প্রকাশের স্বাধীনতা। অর্থাৎ, সংবাদপত্রে মতামত প্রকাশের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব না থাকা। সাধারণত স্বৈরাচারী ব্যবস্থাতেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে না। আবার, কোনো আদর্শভিত্তিক (যেমন, সমাজতান্ত্রিক) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানেও উক্ত আদর্শের স্বার্থের অজুহাতে আদর্শবিরোধী কোনোকিছু প্রকাশ করার অধিকার প্রদান করা হয় না। অনুন্নত বিশ্বে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ব্যাপার অধিকতর দৃশ্যমান।

স্বায়ত্তশাসন : স্বশাসন বা স্ব-আয়ত্তের শাসন। গ্রিক শব্দ Autonomy (স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার) থেকে এর উৎপত্তি। কোনো পরাধীন দেশ স্বায়ত্তশাসন চাইতে পারে। আবার একই দেশের ভেতরে কোনো অঞ্চল বা প্রদেশ বা জাতিসত্তা নিজেদের স্বকীয়তা ও অধিকার রক্ষার্থে স্বায়ত্তশাসন দাবি করতে পারে।

স্বৈরতন্ত্র : Authoritarianism বা Autocracy বা Despotism-ই হল স্বৈরতন্ত্র, স্বৈরশাসনবাদ বা স্বেচ্ছাচারবাদ। এই মতবাদের সমর্থকদের মতে গণতন্ত্র জাতিকে বিভক্ত ও দুর্বল করে; সুতরাং রাষ্ট্রকে সংহত ও শক্তিশালী করার জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী একক বা কতিপয় ব্যক্তিত্বের শাসন প্রতিষ্ঠা করা দরকার। স্বৈরতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত এবং প্রায়শই গণস্বার্থবিরোধী।

স্বৈরশাসনবাদ : স্বৈরতন্ত্র দ্রষ্টব্য

স্যামাউল উনদোং : বা নয়া সমাজ আন্দোলন (New Community Movement). দক্ষিণ কোরিয়ার জনৈক অধ্যাপক কিম-কে এর উদ্গাতা বলে বিবেচনা করা হয়। বস্তুত ১৯৬১ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় যে জাতীয় পুনর্গঠন আন্দোলন শুরু হয়, তা-ই ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে স্যামাউল উনদোং নাম ধারণ করে। দক্ষিণ কোরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পার্ক চুং হি রাষ্ট্রীয়ভাবে এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করলে এই আন্দোলন সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের মূল কথা হচ্ছে, পরিশ্রম, আত্মসহায়তা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন। এই আন্দোলনের অংশ হিসাবে প্রাথমিকভাবে সরকার কৃষকদের অনুপ্রেরণাদানের লক্ষ্যে

তাদের বাঁচার পরিবেশ ও মান উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদান করে, অর্থাৎ গৃহহীনদের জন্য গৃহ, পাকশালা, সেনিটারি পায়খানা জাতীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা করে দেয়। পাশাপাশি, গ্রামবাসীদের দ্রুত উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক রাস্তাঘাট ও বিদ্যুতায়নেরও ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটানো হয়। ফলে, গ্রামাঞ্চলে বিপুল সাড়া জাগে এবং দুই দশকের মধ্যেই গ্রামীণ জনগণের অবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটে। দক্ষিণ কোরিয়ার ৩৪,৬৬৫টি গ্রামের প্রতিটি গ্রামেই এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং এর সমন্বয় সাধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। প্রথমদিকে গ্রামগুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত এবং সে-অনুযায়ী কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। সরকারের সকল পর্যায়ের নেতারা বাধ্যতামূলকভাবে এই আন্দোলনের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলনের সকল পর্যায়ের নেতাদের বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় ব্যাপক প্রশিক্ষণব্যবস্থা। এই আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল, "ওপরওয়ালারা যাবে নিচের দিকে, আর নিচেরওয়ালারা আসবে উপরের দিকে" (Top-down, bottom-up)। ফিলিপিনসের ব্লিস বারাংগে ব্রিগেডস্ (Bliss Barangay Brigades), মালয়েশিয়ার ফেল্ডা প্রকল্প (FELDA Project), থাইল্যান্ডের নয়া গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প, ইন্দোনেশিয়ার পেলিটা প্রকল্প (PELIETA Project), নেপালের 'গ্রামে ফিরে চলো' (Back to the Village), কেনিয়ার হারামবায়ি (Harambyee), ঘানার নবোয়া (Nnoboa) প্রভৃতি কার্যক্রম স্যামাউল উনদোং কার্যক্রমের সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্লোগান Slogan. সেকালে যখন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদাযের যুদ্ধ বাধত, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়গত ধ্বনি দিতে দিতে শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এই সম্প্রদায়গত রণধ্বনিকেই বলা হত স্লোগান। বর্তমানে যে-কোনো আদর্শের বা কর্মসূচির পক্ষে উত্তোলিত সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো ও অর্থবহ সম্মিলিত আওয়াজকেই বলে স্লোগান। কোনো নেতা বা দলের পক্ষেও স্লোগান উত্তোলিত হতে পারে।

॥ হ ॥

হকিং, স্টিফেন ডব্লু আইনস্টাইনের পরেই বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ ও জ্যোর্তিবিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাত। জন্ম ১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি অক্সফোর্ডে। ১৯৬২ সালে তিনি যখন পি-এইচ. ডি.-র ছাত্র তখনই তাঁর মটর নিউরন রোগ ধরা পড়ে এবং তিনি পঙ্গুত্বের দিকে এগুতে থাকেন। এই অবস্থায় তিনি Cains callege-এর ফেলো নিযুক্ত হন এবং কসমোলজির ওপর গবেষণা শুরু করেন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সূত্র ধরে তিনি আবিষ্কার করেন যে একসময়ে সৃষ্টির সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রই একটি একক বস্তু হিসাবেই ছিল এবং বিগ ব্যাং-এর ফলেই এই এক বস্তু ভেঙে এত গ্রহ নক্ষত্রের উদ্ভব এবং ক্রমসম্প্রসারণ। তিনি আরও বলেন যে এই সিঙ্গুলারিটি থেকেই দুনিয়ার শুরু এবং বিগ ব্যাং থেকেই সময়ের আরম্ভ। বিগ ব্যাং-এর আগে বলে কোনোকিছু নেই। ১৯৭০-৭৪ সাল থেকে তিনি কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole) নিয়ে কাজ করেন এবং আবিষ্কার করেন যে ব্ল্যাক হোল সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার নয়, ব্ল্যাক হোলও গরম বস্তুর মতো বিকিরণ ঘটায়। ১৯৮৩ সালে তিনি তত্ত্ব প্রদান করেন যে "সময় ও কাল—দুইই সসীম মাত্রার কিন্তু এরা কোনো সীমানার দ্বারা আবদ্ধ নয়।" বর্তমানে তিনি

সম্পূর্ণরূপেই চলাচলে অক্ষম ও বাক্‌শক্তিরহিত। সর্বক্ষণ হুইলচেয়ারে বসে কমপিউটারের সাহায্যেই কথা বলেন। এখনও তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত অঙ্ক ও তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে জড়িত এবং গবেষণায় নিয়োজিত। তাঁর সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিগ ব্যাং থেকে ব্ল্যাক হোল (A Brief History of Time From the Big Bang to Black Hole)। ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী বইটির এক কোটি কপিরও বেশি বিক্রি হয়ে গেছে। স্টিফেন ডব্লু হকিং-এর আবিষ্কার মানুষের চিন্তার জগতে বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং সৃষ্টিসম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

হটলাইন Hot-line. সাধারণভাবে এটি হল দুই রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যেকার সরাসরি টেলিফোন বা বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা, যাতে প্রয়োজনের সময় দুজন তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি যোগাযোগ করতে সমর্থ হন। তবে, প্রায়শই হটলাইন বলতে সর্বোচ্চ মার্কিন প্রশাসন, তথা হোয়াইট হাউস এবং সর্বোচ্চ সোভিয়েত প্রশাসন তথা ক্রেমলিন-এর মধ্যেকার সরাসরি যোগাযোগব্যবস্থাকে বোঝানো হয়ে থাকে।

হঠকারিতা, বামপন্থি : বা অতিবাম কর্মকাণ্ড বা Left Disorder. সাচ্চা বামপন্থিরা বিশ্বাস করেন যে, বিপ্লবই হল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র উপায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একথাও বিশ্বাস করেন যে, বিপ্লবেরও জোয়ার-ভাটা আছে, বিপ্লবী পরিস্থিতি সবসময় বিরাজ করে না। তাই কোনো কোনো সময়ে একপা এগিয়ে দুপা পিছিয়ে আসতে হয়, কোনো সময় চুপচাপ থেকে সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। যাঁরা বিপ্লবের গতিধারা ও বিপ্লবী পরিস্থিতির ধার না ধেরে কিংবা শত্রুর পালটা হামলা মোকাবেলার ক্ষমতা আছে কি নেই তা বিবেচনা না করে সর্বদাই যুদ্ধংদেহি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকাটাকেই বিপ্লবী কাজ বলে বিবেচনা করেন, তাঁদেরকেই বলে বামপন্থি হটকারি। অসময়ে বা অপ্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও শত্রুর ওপর আঘাত হানা বা শত্রুকে উস্কানি দেওয়াই হল বামপন্থি হটকারিতার অন্যতম লক্ষণ। বামপন্থি হটকারিতা বিপ্লবকে এগিয়ে দেয় না, বরং পিছিয়ে দেয়; এমনকি বিপ্লবী শক্তির ধ্বংসও ডেকে আনে। অনেক সময় বামপন্থি হটকারিতা থেকে আসে হতাশা এবং হতাশা থেকে আসে সুবিধাবাদ। এ-ধরনের আবেগসর্বস্ব বিপ্লবীরা প্রায়ই বামপন্থি হটকারিতা ও ডানপন্থি সুবিধাবাদের মধ্যে দোল খেতে থাকে।

হতাশাবাদ : কাউকে দিয়ে বা কারও চেষ্টাতেই কিছু হবে না, শেষ পর্যন্ত সবকিছু মন্দ বা খারাপের দিকেই যাবে,—এরূপ চিন্তাধারা বা মতবাদকে বলে হতাশাবাদ (Defeatism)। হতাশাবাদ মানুষকে শুধু নিষ্ক্রিয়ই করে না, অনেক সময় অগ্রগতি ও সাফল্যের প্রতিবন্ধকও করে তোলে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বারংবার ব্যর্থতা, বারংবার প্রতারণা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে কারও কারও মধ্যে হতাশাবাদ জন্ম নেয়। হতাশাবাদকে ইংরেজিতে Pessimism-ও বলা হয়।

হবস, টমাস : (১৫৮৮-১৬৭৯) সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ বুর্জোয়াবিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত ব্রিটিশ বস্তুবাদী দার্শনিক হবস 'সমাজ'-এর ঐশ্বরিক উৎপত্তির তত্ত্ব নাকচ করে দেন এবং তার বদলে সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব (Social Contract Theory) হাজির করেন। তাঁর মতে, ধারণাসমূহ (Ideas) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ফসল, কোনো অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিগত ব্যাপার নয়। তাঁর দুই প্রধান গ্রন্থ 'De Cive' (১৬৪২) এবং 'Leviathan' (১৬৫১)।

হরতাল : এটি একটি গুজরাটি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে কোনো দাবি বা প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মবিরতি বা ধর্মঘট। বর্তমানে, কোনো দাবি বা প্রতিবাদের ভিত্তিতে অফিস-আদালত, দোকানপাট, শিল্পকারখানা ও যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়াকেই বলা হয় হরতাল।

হরিজন বা অচ্ছুৎ : ইংরেজিতে Untouchable. হিন্দু বর্ণাশ্রম অনুযায়ী সবচেয়ে নিম্নবর্ণের মানুষেরাই হরিজন বা অচ্ছুৎ বলে অভিহিত। ভারতে বর্তমানে প্রায় পনেরো কোটি হরিজন রয়েছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা হরিজনদের পশুর চেয়েও অধম বলে জ্ঞান করত এবং দোকানে-রেস্টুরেন্টে জলাশয়ে বা নদীর ঘাটে হরিজনদের প্রবেশ করতে দেওয়া হত না, কারণ উচ্চবর্ণদের ধারণা ছিল, হরিজনদের স্পর্শে আসবাবপত্র, খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় জলসহ যাবতীয় কিছু অপবিত্র হয়ে যায়। ১৯৫০ সালে কেউ অচ্ছুৎ নয় বলে এবং কাউকে অচ্ছুৎ বিবেচনা করে কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না বলে সাংবিধানিক বিধি জারি করা হয়। কিন্তু এতে হরিজনদের প্রতি অবিচার আদৌ বন্ধ হয় না। ফলে, ১৯৫৫ সালে ভারতীয় পার্লামেন্টে হরিজনদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে আইন পাশ করা হয়। কিন্তু তার পরও হরিজনদের প্রতি অবিচার ও নির্যাতন থামেনি। এ-যাবৎ লক্ষ লক্ষ হরিজনকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অস্ত্রের আঘাতে কিংবা পুড়িয়ে হত্যা করেছে। অনন্যোপায় হরিজনরাও ক্রমশ সংঘবদ্ধ হচ্ছে এবং তাদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। একই ধর্ম, একই গায়ের রং, একই ভাষা ইত্যাদি হওয়া সত্ত্বেও এরূপ বৈষম্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

হস্তক্ষেপ : Intervention. অপর একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এমন ভূমিকা পালন করা, যা সে-রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিঘ্নিত করে। এরূপ হস্তক্ষেপকে শুধু তখনই যুক্তিযুক্ত বলা যেতে পারে, যখন কোনো আশ্রিত রাজ্যের বৈদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যাবে বলে অপর রাষ্ট্রের চুক্তিভিত্তিক অধিকার থাকে কিংবা যখন হস্তক্ষেপকারী রাষ্ট্রের কোনো নাগরিককে রক্ষার প্রশ্ন আসে অথবা যখন আত্মরক্ষার তাগিদে হস্তক্ষেপ করা ব্যতীত অন্য কোনো গত্যন্তর না থাকে কিংবা যখন জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে একত্র হয়ে কোনো যুদ্ধবাজ শক্তিকে প্রতিহত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এরূপ কারণ ছাড়া হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি।

হস্তশিল্পী বা কারিগর (Handicraftsman)। এরা ছিল পুঁজিবাদপূর্ব সামন্ত সমাজের শ্রমিক। এরা নিজেরাই ছিল উৎপাদনের উপকরণের মালিক। এই উপকরণ দিয়ে এরা নিজ হাতে কাজ করে পণ্য উৎপাদন করত এবং আপন শ্রমে উৎপাদিত পণ্য নিজেরাই বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত।

হাই কমিশনার : কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহ পরস্পরের মধ্যে যে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে তাঁকেই বলা হয় হাই কমিশনার। কিন্তু কমনওয়েলথভুক্ত কোনো দেশ কোনো কমনওয়েলথ-বহির্ভূত দেশে কিংবা কমনওয়েলথ-বহির্ভূত কোনো দেশ কমনওয়েলথভুক্ত কোনো দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করলে তাকে রাষ্ট্রদূত (Ambassador)-ই বলা হয়।

হাউস অব কমন্স : House of Commons. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুই পরিষদের মধ্যে এটি নিম্ন পরিষদ। ১৯১১ এবং ১৯৪৯ সালে পার্লামেন্ট বিধির দ্বারা হাউস অব লর্ডসের

ক্ষমতা হ্রাস করার ফলে বর্তমানে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে হাউস অব কমন্সই প্রাধান্য লাভ করেছে। এর সদস্যসংখ্যা ৬৩০ জন (ইংল্যান্ড ৬১১ + ওয়েলস ৩৬ + স্কটল্যান্ড ৭১+ উত্তর আয়ারল্যান্ড ১২)। হাউস অব লর্ডসের সদস্য, চার্চ অব ইংল্যান্ডের যাজকবৃন্দ, চার্চ অব স্কটল্যান্ড ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের যাজকবৃন্দ, সরকারের অধীনে লাভজনক কাজে বা পদে নিয়োজিত ব্যক্তি (সরকারি কর্মচারী, শেরিফ, সরকারি কাজেরত ঠিকাদার প্রভৃতি) এবং আইন দ্বারা অন্যভাবে অযোগ্য ঘোষিত ব্যক্তি ছাড়া জনগণের যে-কেউ হাউস অব কমন্সের সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত হাউস অব কমন্স-এর সদস্যরা নির্বাচিত হন পাঁচ বছরের মেয়াদে।

হাউস অব লর্ডস House of Lords. এটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চতর পরিষদ। আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক লর্ডেরা এর সদস্য। আর্চবিশপবৃন্দ এবং ইংল্যান্ডের ২৪টি চার্চের বিশপরা হলেন আধ্যাত্মিক লর্ড এবং রাজকীয় ডিউক; অন্যান্য ডিউক এবং আর্ল-মার্কুইস-ভাইকাউন্ট-ব্যারনসহ সকল লর্ড (যাঁরা যুক্তরাজ্যের পিয়র), তাঁরা হলেন জাগতিক লর্ড। হাউস অব লর্ডসে তাঁদের আসন বংশানুক্রমিক। এ ছাড়া স্কটিশ পিয়ারদের ১৬ জন প্রতিনিধি (তাঁদের দ্বারাই নির্বাচিত), আপিলের ৯ জন লর্ড (সারা জীবনের জন্য) প্রমুখও এর সদস্য। হাউজ অব লর্ডস-এর সদস্যদের কোনো বেতন বা ভাতা নেই, তবে তাঁরা দৈনিক অনতিরিক্ত তিন গিনি খরচ নিতে পারেন। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা নয় শতাধিক হলেও সাধারণত এর অধিবেশনে ৫০ জনের বেশি উপস্থিত থাকেন না। ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের সংশোধনী বিধির পূর্বে এই হাউসের ভেটোক্ষমতা ছিল। এই হাউসে সভাপতিত্ব করেন লর্ড চ্যান্সেলার (যিনি মন্ত্রিসভারও একজন সদস্য হিসাবে বিবেচিত)।

হাউ টু বি এ গুড কমিউনিস্ট চীনবিপ্লবের অন্যতম নেতা, চীনের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান লিউ শাউ কি (লি শাউ চি) ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে ইয়েনানস্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ইনস্টিটিউটে কমিউনিস্ট কর্মীদের সামনে যথার্থ কমিউনিস্ট হওয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে যে-আলোচনা করেন, সেটাই 'কী করে একজন ভালো কমিউনিস্ট হতে হয়' বা 'হাউ টু বি এ গুড কমিউনিস্ট' নামে ছাপা হয়। শাউ কি সে-সময় পার্টি স্কুল ও ক্যাডারদের উদ্বুদ্ধকরণেরও দায়িত্বে ছিলেন। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত তাঁর এ-বক্তব্য তখন পার্টির প্রতিটি সদস্যের জন্য অবশ্যপাঠ্য ছিল। ১৯৬৬ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হলে শাউ কিকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসাবে চিহ্নিত করে, তাঁকে রাষ্ট্র ও পার্টির সকল পদ থেকে অপসারিত করা হয় এবং তাঁর এই পুস্তিকাসহ সকল রচনা বাজেয়াপ্ত করা হয়। মাও ঝে ডংয়ের মৃত্যুর পর চীনে নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হলে, তাঁরা পুনরায় প্রয়াত শাউ কি-কে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর রচনাদি পুনঃপ্রকাশ করেন।

হাওয়ালা কেলেঙ্কারি হাওয়ালা অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা হুণ্ডির কারবার। ১৯৯১ সালের মে মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) হুণ্ডি ব্যবসায়ী সুরেন্দ্র কুমার জৈন-এর বাসা ও অফিসে হামলা চালিয়ে বিভিন্ন কাগজপত্রের মধ্যে একটি ডায়েরিও জব্দ করে। এই ডায়েরি থেকে জানা যায় যে, সুরেন্দ্র জৈন ও তার ভাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে প্রায় ৬৫ কোটি রুপি ঘুষ প্রদান করেন। এই

ডায়েরিতে ১১৫ জনের নাম পাওয়া যায়, যার ৬৭ জনই রাজনীতিবিদ এবং বাদবাকিরা আমলা ও অন্যান্য পেশার লোক। এতে দেখা যায় যে, স্বয়ং রাজীব গান্ধিও জৈন ভ্রাতাদের কাছ থেকে ৮ লক্ষ ডলার ঘুষ নিয়েছিলেন। যাই হোক, ১৯৯৬ সালের ১৬ জানুয়ারি গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই প্রাথমিকভাবে দশজনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। এই দশজন হলেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও, মন্ত্রী মাধব রাও সিন্ধিয়া, মন্ত্রী বলরাম ঝাকর, মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা, বিজেপি সভাপতি লালকৃষ্ণ আদভানি, সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী দেবীলাল, প্রাক্তন মন্ত্রী অর্জুন সিং, কল্পনাথ রাই, আরিফ মোহাম্মদ, বিহারের বিজেপি নেতা যশোবন্ত সিং এবং দেবীলালের নাতি প্রদীপ কুমার। এ ছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী, পরিবেশমন্ত্রী রাজেশ পাইলট, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এন. তুলে এবং বস্ত্রমন্ত্রী কমলনাথের বিরুদ্ধেও ঘুষগ্রহণের অভিযোগ ওঠে। এমনকি রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংও অভিযোগ থেকে মুক্তি পাননি। স্বভাবতই এই কেলেঙ্কারি নিয়ে দেশ-বিদেশে প্রবল তোলপাড় শুরু হয়। ১৯৯৩ সালের দিকে মামলাটিকে আপাতত ধামাচাপা দেওয়া হলেও সাংবাদিকদের বিভিন্ন রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালের দিকে আবার এই কেলেঙ্কারির ব্যাপারটি সামনে চলে আসে। এই কেলেঙ্কারিই ছিল প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের রাজনৈতিক পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

হাঙ্গেরির প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় সমাজতান্ত্রিক হাঙ্গেরিতে প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের সূচনা ঘটে। বিদ্রোহীরা কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিপ্লবীদের হত্যা শুরু করে এবং কিছুদিন পর্যন্ত রাজধানী বুডাপেস্টের ওপর নিয়ন্ত্রণও বলবৎ রাখে। হাঙ্গেরিতে প্রতিবিপ্লবীদের বিজয় ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় ভাঙনসৃষ্টির এই সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টা সে-সময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ৪ নভেম্বর হাঙ্গেরির জনগণ পুনরায় কৃষক শ্রমিকের বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার জনগণের সমর্থনের জোরে প্রতিবিপ্লবের শক্তিকে নির্মূল করে দেয়।

হাতুড়েবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ এই মতবাদীদের মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাই হল প্রকৃত জ্ঞানের একমাত্র উপায়। বার্কলে, হিউম, ম্যাক, বোগদানভ প্রমুখই ছিলেন এই মতবাদের প্রবক্তা। এই মতবাদের দুর্বলতা হল এই যে, এই মতবাদীরা ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার ওপর আধিভৌতিক গুরুত্ব আরোপ করেন, বৈজ্ঞানিক যুক্তি তত্ত্বের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন এবং চিন্তার আপেক্ষিক স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেন।

হাতুড়ে সমালোচনা Empirio-Criticism. এর অপর নাম Machism. এই চিন্তার মৌল কথা হল এই যে, ন্যূনতম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সর্বাধিক জ্ঞানার্জনই যে-কোনো জ্ঞানের যথার্থতার মূলকথা। এই মতবাদীরা 'মূল সমন্বয়'-এর এক তত্ত্ব হাজির করে বলেন যে, বস্তু ও ভাব অবিচ্ছিন্ন এবং এভাবে তাঁরা ভাববাদী আদর্শবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তা ছাড়া এই মতবাদীরা মনে করেন যে জগৎ নিরপেক্ষ বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ।

হাদিস বা সুন্নাহ্। হজরত মুহাম্মদ (সা) বিভিন্ন সময়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ে এবং আল-কুরআনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে-সমস্ত বক্তব্য দিয়েছেন বা যা-কিছু অনুশীলন করেছেন সেগুলোরই সমষ্টিগত নাম হল হাদিস। কুরআনের পরই হাদিস হল মুসলিম আইন ও জীবন ব্যবস্থার বৃহত্তম উৎস। হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর মৃত্যুর পর মুসলমানেরা বিভিন্ন প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আইনগত ও ধর্মীয় বিষয়ে এবং

কুরআনের কোনো বক্তব্য সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন তা জানতে চাইত। এর ফলেই তাঁর বক্তব্যাদি সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শুরু হয় তাঁর নিকটতম সঙ্গী বা সাহাবিদের কাছ থেকে হাদিসসংগ্রহ। কুফা, বসরা, মদিনা ও মক্কায় হজরত আয়েশা (রা), আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা), আবু হোরায়রা (রা), আন্নাস বিন মালিক (রা), ইবনে আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা), হাসান আল বসরি (রা) প্রমুখের নেতৃত্বে হাদিসসংগ্রহের কাজ শুরু হলেও, প্রকৃতপক্ষে হাদিস পূর্ণাঙ্গভাবে সংকলিত হয় উমাইয়া খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজের রাজত্বকালে। ইমাম জুহরির তত্ত্বাবধানে ইমাম মালিক এজন্য আহলে হাদিস সমিতি গঠন করেন এবং ১১৬০টি হাদিস সংকলন করেন। হাদিসের ৬টি নির্ভরযোগ্য সংকলন বা 'সিয়া সিত্তাহ'-র সংকলক ছিলেন যথাক্রমে ইমাম বুখারি (রা) ইমাম মুসলিম (রা), ইমাম আবু দাউদ (রা), ইমাম ইবনে মাজা (রা), আবু ঈসা আল তিরমিজি (রা) ও আবু আবদুর রহমান আল নাসাঈ (রা)। তাঁদের সংকলিত হাদিস সংখ্যায় কমবেশি থাকলেও, তাঁদের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য ছিল না। হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর মৃত্যুর পর বিভিন্ন জন বিভিন্ন স্বার্থে ভুয়া হাদিস উদ্ধৃতি করতে শুরু করলে, কোনটি সঠিক আর কোনটি বেঠিক তা নির্ণয় করাই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, সঠিক বা সহি হাদিস নির্ণয়ের জন্য কতগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়; যেমন—ক. রিওয়ায়েত বা বর্ণনা প্রদানকারীদের জানার উৎস, উদ্দেশ্য, হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছে কি না সেসব বিষয় পরীক্ষা করে দেখা ও খ. দিরায়াত বা যুক্তিগ্রাহ্যতা পরীক্ষা, অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদ (সা) এরকম কথা বলতে পারেন কি না, সংশ্লিষ্ট হাদিসটি কুরআনের বক্তব্যের বা মানবতার পরিপন্থি কি না—এসব পরীক্ষা করা। শিয়ারা অবশ্য উপরোক্ত ছয়জন ইমামের সংকলিত হাদিসে বিশ্বাস করেন না। তাঁদেরও আবার ৫টি হাদিস সংকলন রয়েছে। এগুলো সংকলন করেছেন আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব (রা), শেখ মোহাম্মদ ইবনে আলি (রা), মুহম্মদ ইবনে হাসান (রা), সৈয়দ আর রাজি (রা) প্রমুখ।

হামাস : আরবি 'হামাস' শব্দের অর্থ 'উৎসাহ'। আবার, আরবি ভাষায় 'ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন'-এর প্রথম অক্ষরগুলির সম্মিলিত রূপও 'হামাস'। ১৯৮৭ সালে গাজার শেখ আহমদ ইয়াসিন হামাস-এর প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক ও সামরিক শাখা-সংবলিত এই সংস্থাটি আসলে আশির দশকের ইনতিফাদা বা ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানেরই বর্তমান সংগঠিত রূপ। ইয়াসির আরাফাতের আপোসবাদিতা এবং ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন শান্তিপ্রক্রিয়ার বিরোধী হামাস-এর লক্ষ্য হচ্ছে প্যালেস্টাইনে ইরানি মডেলের ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এর অপর প্রেরণার উৎস মিশরের 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন'। হামাস ইয়াসির আরাফাতের ভূমিকাকে ইহুদিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ বলে মনে করে এবং জঙ্গি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সত্যিকার স্বাধীন-সার্বভৌম প্যালেস্টাইন কায়েম সম্ভব বলে বিবেচনা করে।

হারাকিরি : জাপানের প্রাচীন সামুরাই ঐতিহ্য অনুযায়ী কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজেই নিজের পেট চিরে আত্মহত্যা করার প্রক্রিয়া হল হারাকিরি। রাজনীতিতে কোনো আত্মঘাতী নীতি বা কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে হারাকিরি শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

হিটলার, এডল্‌ফ্ (১৮৮৯-১৯৪৫) আপার অস্ট্রিয়ায় জন্ম। তিনি প্রথম জীবনে একজন বাণিজ্যিক চিত্রকর হিসাবে জীবিকার্জনের চেষ্টা করেন। ১৯১৪ সালে তিনি ব্যাভারীয়

সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কর্পোরাল হন এবং দুবার আয়রন ক্রস লাভ করেন। ১৯১৯ সালে তিনি একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক গ্রুপে যোগদান করেন। অচিরেই এই গ্রুপটি 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মান শ্রমিকদল' (যার ডাক নাম ছিল নাৎসি) নাম ধারণ করে। এ-সময় ইহুদি সম্প্রদায় ও ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯২৩ সালে ব্যর্থ মিউনিখ পুশে অংশ নেওয়ার অপরাধে তিনি ১৩ মাস কারাদণ্ড ভোগ করলেও জাতীয় খ্যাতি লাভ করেন। এ-সময় কারাগারে বসে তিনি 'মেইন ক্যাম্ফ' (Mein Kampf) বা 'আমার সংগ্রাম' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৩০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী মন্দা, বেকারত্ব ইত্যাদির পটভূমিতে হিটলারের দল জার্মানির দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসাবে বেরিয়ে আসে। ১৯৩৩ সালে তিনি জার্মানির চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। চার সপ্তাহ পর রাইখস্ট্যাগ-এ অগ্নিসংযোগ করা হলে তিনি এই অজুহাতে একদলীয় শাসন কায়েম করেন। ১৯৩৪ সালের ৩০ জুন তিনি তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপ্রধান হিন্ডেনবুর্গের মৃত্যু হলে তিনি ১৯৩৪ সালের ২ অগাস্ট নিজেকে জার্মান রাইখের ফ্যুয়েরার ঘোষণা করেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও সুপ্রিমকমান্ডার হয়ে বসেন। জার্মানির সকল সরকারি অফিসারকে তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হয়। পরবর্তী তিন বছর তিনি সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে এবং ভার্সাই প্যাক্টের দরুন জার্মানির হাতছাড়া হয়ে যাওয়া অঞ্চলসমূহ পুনর্দখলে মনোযোগী হন। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে তিনি রাইনল্যান্ড দখল করে নেন। হিটলার ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে অস্ট্রিয়া এবং ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে চেকোস্লোভাকিয়া দখল করেন। অতঃপর তিনি পোল্যান্ড দাবি করলে (১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা ঘটে। ১৯৪০ সালের ২২ জুন জার্মান সৈন্যেরা প্যারিসে প্রবেশ করে। অতঃপর তিনি পূর্বদিকে মনযোগ দেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে ইতিপূর্বে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ করে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের পর নেমে আসতে থাকে একের পর এক পরাজয়। ব্রিটেন আক্রমণ করেও হিটলার সুবিধা করতে পারেননি। তাঁর প্রধান মিত্র ইতালিও ইতিমধ্যে হীনবল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মিত্রবাহিনী নরম্যান্ডিতে অবতরণ করলে জার্মান সৈন্যদের মনোবল ভেঙে যায়। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে বার্লিনেরও পতন ঘটে। অন্তিম মুহূর্তে তিনি তাঁর ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারের অভ্যন্তরেই তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেয়সী ইভা ব্রাউনকে বিয়ে করেন এবং ৩০ এপ্রিল স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেন। বার্লিনের পতন ও তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইউরোপে কার্যত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে।

হিন্দি-চীনি ভাই ভাই : বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে এই স্লোগান ভারতে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময়ে গড়ে-ওঠা ভারত-চীন বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে ভারতে ভাবাবেগের ঝড় বয়ে যায়। চৌ এন লাই স্বয়ং ভারতসফরে আসেন। কিন্তু এই বন্ধুত্ব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। ১৯৫৯ সালে চীন তিব্বতকে আপন দেশের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হয় চীন-ভারত সীমান্তযুদ্ধ। এই দুই ঘটনা হিন্দি-চীনি ভ্রাতৃত্বের আপাত-অবসান ঘটিয়ে দেয়।

হিন্দু এজেন্ডা উগ্রপন্থি হিন্দু সংগঠন 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' (ভিএইচপি) কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচিই হল হিন্দু এজেন্ডা। এই এজেন্ডায় ঘোষণা করা হয় যে, ১. অযোদ্ধার

বিতর্কিত স্থানে রামমন্দির নির্মাণের জন্য ভিএইচপি সংগ্রাম চালিয়ে যাবে ; ২. মথুরা ও বারাণসীর প্রাচীন সমজিদসমূহও ধ্বংস করে দেওয়া হবে ; ৩. জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ করতে হবে ; ৪. দেশে সমন্বিত দেওয়ানি আইন প্রচলন করতে হবে ইত্যাদি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভারতকে একটি উগ্র হিন্দু-রাষ্ট্রে পরিণত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

হিপ্পি : সমাজের প্রচলিত বিধিনিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন যুবগোষ্ঠী, যাদের বৈশিষ্ট্য হল মাদকদ্রব্য সেবন, পোশাক-আশাক ও চালচলনে প্রচলিত রীতি ভাঙা, অবাধ যৌন স্বাধীনতা, রাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণা ইত্যাদি। প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই এদের উদ্ভব। সমাজতত্ত্ববিদদের মতে অতিপ্রাচুর্যসম্পন্ন সমাজের সমাজবন্ধনের শিথিলতা, অতিযান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতা ইত্যাদি জনিত হতাশারই ফসল হচ্ছে এই হিপ্পিরা।

হিমলার, হেনরিখ : (১৯০০-৪৫) মিউনিখে জন্ম। ১৯২৭ সালে তিনি ঝটিকাবাহিনীর উপনেতা এবং ১৯২৯ সালে নেতার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩৬ সালে তাঁকে সম্মিলিত জার্মান পুলিশবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি রাইখ প্রশাসনের প্রধান এবং ১৯৪৩ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর কর্তৃত্বাধীন গেস্টাপো (গুপ্ত পুলিশ)বাহিনী নৃশংসতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। কুখ্যাত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পসমূহও ছিল তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। ১৯৪৫ সালের ২১ মে তিনি ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়েন এবং এর দুদিন পরেই আত্মহত্যা করেন।

হিস্ট্রি উইল অ্যাবজলভ্ মি : পঞ্চাশে দশকের মাঝের দিকে কিউবার তরুণ আইনজীবী ফিডেল ক্যাস্ট্রো স্বৈরাচারী শাসক বাতিস্তার বিরুদ্ধে আদালতে এক মামলা দায়ের করেন এবং তাঁর শাস্তি দাবি করনে। স্বভাবতই মামলা খারিজ হয়ে যায়। এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ক্যাস্ট্রো একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন এবং কিছুসংখ্যক সশস্ত্র সহযোগীকে নিয়ে তৎকালীন কিউবার দ্বিতীয় বৃহত্তম সেনানিবাস মনকাডা ব্যারাক আক্রমণ করে বসেন। স্বভাবতই মুষ্টিমেয়সংখ্যক বিপ্লবীরা ব্যর্থ হন। অনেকে গুলিবিনিময়ে মারা পড়েন, বাদবাকিরা পালিয়ে যান। পালিয়ে যাওয়ার পথে ক্যাস্ট্রো সিয়েরা মায়েস্ত্রা নামক স্থানে ধরা পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়। তিনি হাসপাতালে ছিলেন বলে হাসপাতালেই বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন বসে। এই মামলায় ক্যাস্ট্রো নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে ট্রাইব্যুনালের সামনে তিনি যে-বক্তব্য রাখেন, তাই পরবর্তীকালে 'ইতিহাসই আমাকে মুক্ত করবে' (History Will Absolve Me) নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যায়। বিচারে তাঁর আজীবন কারাদণ্ড হলেও কিছুদিন পর এক সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়ে তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পরপরই তিনি মেক্সিকোয় পালিয়ে গিয়ে সেখানে বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন এবং কিছুদিন পর 'গ্রান্‌মা' জাহাজযোগে কিউবায় ফিরে এসে বাতিস্তাকে পরাজিত করে ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি কিউবার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন।

হীনম্মন্যতাবোধ বা Inferiority Complex. অবচেতন মনে নিজের হীনতা বা ক্ষুদ্রতা সম্পর্কিত যে ধারণা জন্মায়, বাহ্যিক আচরণে তার প্রতিফলন ঘটে। এই হীনম্মন্যতা বা ক্ষুদ্রতাবোধ একটি মনস্তাত্ত্বিক রোগবিশেষ।

হুইগ Whig. ব্রিটেনের সেই রাজনৈতিক দলের সদস্য, যে-দল ১৬৮০ সাল থেকে রাজা বা র‍্যানির ক্ষমতা কমিয়ে পার্লামেন্টের ক্ষমতাবৃদ্ধির পক্ষে কাজ করে আসছে। মূল

হুইগরা ১৬৭৯ সালে এক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে স্কটল্যান্ডের নিম্নাঞ্চলে অবস্থান নেন এবং স্কটল্যান্ডকে ইংল্যান্ডের সঙ্গে একই ধর্মীয় সূত্রে আবদ্ধ করার বিরাধিতা করেন। ১৬৮০ সালে হুইগরা ক্যাথলিক কোনো রাজা বা রানির ব্রিটিশ সিংহাসনে উপবেশনের বিরোধিতা করেন। ১৮৬৮ সালে গ্ল্যাডস্টোন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত হুইগরাই টোরিদের ওপর আধিপত্য করেন। এ-সময় থেকে হুইগরা প্রধানত লিবারেল নামেই পরিচিত হতে থাকেন।

হুইপ Whip. পার্লামেন্ট বা আইনসভার সেই সদস্য, যাঁর ওপর তাঁর দলের অন্যান্য সদস্যদের পার্লামেন্টে হাজির করানোর দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। সাধারণত কোনো প্রশ্নে ভোটাভুটির সময় সরকার ও বিরোধীদল উভয়পক্ষেরই প্রয়োজন পড়ে স্ব স্ব পক্ষের যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক সদস্যকে পার্লামেন্টে হাজির রাখার। এই দায়িত্বটি হুইপের ওপরই ন্যস্ত থাকে। তিনি তাগাদা দিয়ে তাঁর দলের সদস্যদের পার্লামেন্টে হাজির করান। এমনিতে, হুইপ করার মানে হচ্ছে সচেতন করা। সরকারি দল ও বিরোধীদল উভয়েই স্ব স্ব হুইপ নিয়োগ করে।

হুকবালা হাপ : ফিলিপিনো ভাষার এই শব্দটির অর্থ গণমুক্তি ফৌজ। ১৯৪৮ সালের দিকে প্রেসিডেন্ট রেক্সাসের আমলে কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন হুকবালা হাপ ব্যাপক কৃষকবিদ্রোহের সূচনা করে। ১৯৫০ সালের দিকে হুকবালা হাপকে দমনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসে। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধেই প্রেসিডেন্ট র‍্যামন মাগাসেসের আমলে হুকবালা হাপদের কর্মকাণ্ডের তীব্রতা স্তিমিত হয়ে আসে। যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, অনেকটা নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের ওপর সার্বিক নির্ভরতাই ছিল হুকবালা হাপদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

হুজুগে রাজনীতি Demagogy. গ্রিক শব্দ Demagogos থেকে এর উৎপত্তি। গ্রিসের অবক্ষয়ের যুগে এথেন্সে ও গ্রিসের অন্যান্য নগররাষ্ট্রে যেসব জননেতার উদ্ভব ঘটেছিল, এই শব্দটি দিয়ে তাদেরকেই বোঝানো হত। ডেমাগিগ হচ্ছে এমন একধরনের রাজনীতি, যাতে সংশ্লিষ্ট নেতা ও দল জনগণের সরলতা, অন্ধ বিশ্বাস, অর্থনৈতিক দৈন্য বা অপর কোনো দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মিথ্যা বা অর্ধসত্য অথচ আবেগপ্রবণ বক্তব্য, ওয়াদা ইত্যাদির মাধ্যমে গণসমর্থন আদায় করেন এবং রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের প্রয়াস পান। এককথায় ডেমাগগ হচ্ছে বক্তৃতাসর্বস্ব, গলাবাজি ও লোক-খ্যাপানো রাজনীতি। এরূপ নেতাদের বলে ডেমাগগ (Demagogue)।

হুন্ডি Bill of Exchange. পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বাবদ টাকা দেওয়ার 'অঙ্গীকারপত্র' বা 'নির্দেশপত্র'। যেমন 'ক' 'খ'-এর কাছে টাকা পায়। এমতাবস্থায় 'ক' 'গ'-এর কাছ থেকে কোনো পণ্য কিনল এবং 'খ'-কে নির্দেশ দিল, যেন 'খ' নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা 'গ'-কে মিটিয়ে দেয়। 'ক'-এর এই নির্দেশনামাই হল হুণ্ডি। ১১৬০ সালে ইউরোপের ইহুদিরাই সর্বপ্রথম এর প্রচলন করে। ব্যাংকের চেকও একধরনের হুণ্ডি। তবে, বর্তমানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ব্যাংক-বহির্ভূত অবৈধ পন্থায় অর্থ লেনদেনের প্রক্রিয়াই 'হুণ্ডি' নামে অধিক পরিচিত।

হেগেল, জন উইলহেল্‌ম্‌ ফ্রেডারিখ (১৭৭০-১৮৩১)। জার্মান ক্লাসিক্যাল দার্শনিকদের অন্যতম হেগেল তরুণ বয়সে ফরাসি বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন এবং জার্মান

রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের ব্যর্থতা ও নেপোলিয়নের উদ্ভবের পর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। তার মধ্যে দেখা দেয় দ্বৈততা। একদিকে ইউরোপের বিপ্লবী আবহ এবং অন্যদিকে জার্মান বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীলতা, এ-দুয়ের প্রভাব তাঁকে দোদুল্যমান ও আপোসমুখী করে তোলে। তিনি একাধারে বস্তুবাদী ও পরম সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮১২-১৬ সালে তিনি তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্বের দর্শন হাজির করেন। তিনিই সর্বপ্রথম পরিমাণ বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে গুণগত পরিবর্তন এবং নিরাকরণের নিরাকরণ-এর তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তিনি কান্টের বস্তুর স্বস্থিতিশীলতা (Thing-in-itself) তত্ত্বেরও সমালোচনা করেন। কিন্তু তিনি তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্বের ওপর পরম সত্তাকে আরোপ করতে গিয়ে স্ববিরোধিতার শিকার হয়ে পড়েন। সমাজ পরিবর্তন কি হওয়া উচিত, এ-ব্যাপারেও তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট নিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হন। মার্কস তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্ব, ইতিহাস-সচেতনতা ও যুক্তিতত্ত্বের প্রশংসা করেন। মার্কস বলেন যে, হেগেলের বস্তুবাদ ছিল যথার্থ, কিন্তু তাঁর পা ছিল ওপরের দিকে, আমরা তাঁকে পায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি (অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতামুক্ত করেছি) মাত্র।

হেবরন হত্যাকাণ্ড ১৯৯৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েলের হেবরনে বসতি স্থাপনকারী বারুচ গোল্ডস্টেইন নামক জনৈক ইহুদি সম্পূর্ণ বিনা উসকানিতে ঐতিহাসিক হেবরন মসজিদের ভেতরে ঢুকে বেপরোয়া গুলি চালায় এবং ঠাণ্ডা মাথায় নামাজরত ৭০ জন মুসল্লিকে হত্যা করে। এর ফলে ইসরায়েল-পিএলও শান্তিচুক্তি সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায়। তবে ১৯৯৪ সালের ৩১ মার্চ হেবরনের নিরাপত্তার ব্যাপারে পিএলও ও ইসরায়েলের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

হেবিয়াস কর্পাস Habeas Corpus. এই ল্যাটিন কথাটির হুবহু অর্থ হচ্ছে 'সশরীরে হাজির করতে হবে'। আইনশাস্ত্র অনুযায়ী বন্দিকে আদালতে হাজির করার জন্য এবং তাকে আটক করার কারণ দর্শানোর জন্য আদালত বা বিচারক কর্তৃক জারিকৃত পরোয়ানাই হল হেবিয়াস কর্পাস। ১৬৭৯ সালে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম এই আইন বিধিবদ্ধ করা হয়।

হেলসিংকি চুক্তি Helsinki Accord. ন্যাটো ও ওয়ারশ জোটের সদস্য ও জোটবহির্ভূত ১৩টি দেশসহ ইউরোপের মোট ৩৫টি দেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের পয়লা আগস্ট ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির লক্ষ্য হচ্ছে : ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী স্থিতাবস্থা বহাল রাখা; খ. ন্যাটো ও ওয়ারশ জোটের মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধি করা এবং গ. সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

হেলসিংকি প্রক্রিয়া Helsinki Process. ১৯৭৩-৭৫ সালে হেলসিংকি কনফারেন্সের বিভিন্ন সেশনের (কয়েকটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল জেনিভায়) আলাপ-আলোচনার ফলে ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকারসংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদির ওপর ঐকমত্যের ভিত্তিতে হেলসিংকিতে যে চূড়ান্ত আইন-প্রণয়ন করা হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতা হেলসিংকি প্রক্রিয়া হিসাবে খ্যাত। এই প্রক্রিয়ায় 'ইউরোপের প্রতিরক্ষা ও সহযোগিতা কনফারেন্স' (Conference on Security and Co-operation in Europe—CSCE) নামক সংগঠনের জন্ম হয়, যার প্রধান কার্যালয় প্রাগে অবস্থিত। এই প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক গুরুত্ব এখানে যে, এর সঙ্গে আলবেনিয়া ও যুগোস্লাভিয়াসহ সকল ইউরোপীয় রাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত কতিপয়

নব্যস্বাধীন রাষ্ট্রও এর অন্তর্ভুক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এই প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সি.এস.সি.ই. যুগোশ্লাভ সংকটের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ন্যাটো বা ইউরোপীয় কমিউনিটির তুলনায় এর গুরুত্ব বেশি এজন্য যে, এর সঙ্গে সকল ইউরোপীয় রাষ্ট্রই জড়িত।

হোমরুল Home Rule বা স্বায়ত্তশাসন। ১৮৭০ সালে আইজ্যাক কট(১৮১৩-৭৯) আয়ারল্যান্ডের জন্য হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। তাঁর দাবির মূল কথা ছিল, ডাবলিনে এমন একটি পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করা, আয়ারল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যার সর্বময় ক্ষমতা থাকবে। কটের পর জঙ্গি নেতা পার্নেল এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন আয়ারল্যান্ডের হোমরুল-এর পক্ষ নেন, কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও পার্লামেন্টে বিল পাশ করাতে ব্যর্থ হন। যা-ই হোক, ১৯২১ সালের জুন মাসে উত্তর আয়ারল্যান্ড পার্লামেন্টও স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। কিন্তু দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড হোমরুলের চেয়েও অধিক স্বাধীনতা দাবি করে। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদান করা হয়। ১৮১৬ সালে বালগঙ্গাধর তিলক ও অ্যানি বেসান্ট ভারতবর্ষেও হোমরুল আন্দোলন শুরু করেন। পরে মহাত্মা গান্ধি, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতাও হোমরুল দাবি করেন।

হোয়াইট পরিকল্পনা : ১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত ব্রেটন উড্‌স্ কনফারেন্সের ঠিক পূর্বে মার্কিন অর্থসচিব হোয়াইট আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থাসংক্রান্ত এই পরিকল্পনা প্রদান করেন। এই পরিকল্পনা মার্কিন পরিকল্পনা নামেও খ্যাত। লর্ড কেইন্‌স-এর মতো তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল সহজে ভাঙানোর উপযোগী মুদ্রা এবং স্থিতিশীল বিনিময়হারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটানো। বস্তুত হোয়াইট ও কেইনসের পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF) গঠন করা হয়।

হোয়াইট হাউস ওয়াশিংটনে অবস্থিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন। এই ইমারতের কাজ শুরু হয় ১৭৯২ সালে, কিন্তু এর কাজ শেষ হওয়ার আগেই প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন মারা যান। ১৮০০ সালে প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামসই এই ইমারতের প্রথম বাসিন্দা। ১৮১৪ সালে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে এর অংশবিশেষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আগুন ও গোলাগুলির ধোঁয়ার দাগ মোছার জন্য ভবনটির মূল খয়েরি রঙের ওপর সাদা রং করে দেওয়া হয়। সেই থেকেই এর নাম হয় হোয়াইট হাউস।